লীলা মজুমদার রচনাবলী

২

সম্পাদনায়

সমীর মৈত্র

এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট ॥ কলিকাতা-সাত

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১

প্রকাশিকা :

গীতা দত্ত
এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি
এ/১৩২,১৩৩ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা—৭০০ ০০৭

মুদ্রাকর :

মৃণাল দত্ত
একলা প্রিন্টিং প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৭২/১, শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলিকাতা—৭০০ ০০৬

বাঁধাই :

বিদ্যুৎ বাইন্ডিং ওয়ার্কস
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

লীলা মজুমদার রচনাবলী

সূচীপত্র

গুপীর গুপ্তখাতা	৯
লঙ্কাদহন পালা	৮৭
উপেন্দ্রকিশোর	১২৩
ভূতের গল্প	১৮৭
নানা নিবন্ধ	২৮৯
বক ধার্মিক	৩৪৫

গুপীর গুপ্তখাতা

গুপীর গুপ্তখাতা

এক

অনেকদিন আগের ঘটনা, ভুলে যাব মনে করে সব এই লিখে দিলাম। রোজরোজ একরকম হত, হঠাৎ একদিন এমনি হল যে মনে করলে এখনো গা শিরশির্ করে।

একটা গাড়িতে ঠান্‌দিদি, শ্যামাদাসকাকা, বিরিঞ্চিদা আর আমি।

গাড়ি চলেছে তো চলেইছে, থামবার নামটি করে না। এদের কি খিদে তেষ্টাও পায় না? সঙ্গে কিছু নেই তা তো নয়। ঐ টিফিন-ক্যারিয়ার একদম বোঝাই করা এই বড়-বড় চপ লুচি আলুরদম শোনপাপড়ি।

খিদের চোটে পেটটা ব্যথা-ব্যথা করছে। উঠেছি সেই কোন ভোরে; অত সকালে কখনো আমার ঘুম ভাঙে না। কাকেরা ডাকে নি, যারা রাস্তায় জল দেয় তারা আসে নি, আকাশ তখনো নীল হয় নি, তারারা নেবে নি, বগাই ওঠে নি, খাটের পায়ার কাছে নাক ডাকাচ্ছে আর ঘুমের ঘোরেই একটু একটু ল্যাজ নাড়াচ্ছে।

বগাইয়ের জন্য খুব খারাপ লাগছে। বেশ আমার পাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে থাকত। কাউকে কিছু করত না।

অত ভোরে উঠতে হয় না। পাশ ফিরে আবার ঘুমুতে যাব, এমনি সময় কানে এল খুট্‌খুট্ ঠুক্‌ঠাক্ গুজ্‌গুজ্ ফিস্‌ফিস্। মনে হল ঘর কথা কইছে, ঘরের বাইরের কেষ্টচুড়োর গাছ কথা কইছে। এত কথা বলাবলির মধ্যে ঘুমুই কি করে?

উঠে পড়লাম। দোর-গোড়ায় গিয়ে দেখি কিনা আমার ঠান্‌দিদি সারা গায়ে চাদর মুড়ি দিয়ে, মস্ত এক পুঁটলি বগলে ফস্‌ফস্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন।

আর কথাটি নয়, ছুটে গিয়ে পেছন থেকে ঠান্‌দিদিকে জাপ্‌টে ধরলাম। ঠান্‌দিদি এমনি চমকে গেলেন যে আরেকটু হলে পড়েই যাচ্ছিলেন। তবেই হয়েছিল আর কি! চ্যাঁচামেচি করে একাকার কাণ্ড করতেন, তখন যাওয়া-টাওয়া সব বন্ধ।

আমি বললাম, "কোথায় যাচ্ছ তোমরা?"

কোনোরকমে সামলিয়ে নিয়েই আমার মুখ চেপে ধরে ঠান্‌দিদি বললেন, "স্‌-স্‌-স্‌-স্‌।"

বলে আঙুল দিয়ে সিঁড়ির নীচেটা দেখিয়ে দিলেন।

সিঁড়ির নীচে দুটো লোক হাতছানি দিয়ে ঠান্‌দিদিকে ডাকছে। দেখলাম তারা হল পাশের বাড়ির বিরিঞ্চিদা আর আমার শ্যামাদাস কাকা। তা হলে কি হবে, আমাকে দেখে সবাই কি বিরক্ত! একে আবার কেন আনা হল? এখুনি সব মাটি করে দেবে।

রেগে চেঁচিয়ে বললাম, "বেশ, বেশ, আমি নাহয় ফিরেই যাচ্ছি। সেজদাদামশাইকে গিয়ে সব বলে দিচ্ছি—ও সেজদাদু—"

অমনি সব ভোল বদলে গেল, তখন আমাকে সে কি সাধাসাধি! লক্ষ্মীটি চুপ কর। চল, তোকে কাট্‌লেট খাওয়াব, গাড়ির মধ্যে চেয়ে দ্যাখ, টিফিনক্যারিয়ারে ভর্তি চপ কাটলেট ডিমের ডেভিল। কারো কাছে কিছু বলিস নি কিন্তু।

অবাক হয়ে দেখি গলির মুখে সত্যি সত্যি বিরিঞ্চিদার রঙচটা পুরোনো ফোর্ড গাড়িটা দাঁড়িয়ে। ভেতরে মেলা জিনিস আর একটা বিরাট পেতলের টিফিনক্যারিয়ার।

মাথার ওপরে চেয়ে দেখি আকাশের রঙ একটু ফিকে হয়ে এসেছে, তার ওপর দিয়ে কালো এক ঝাঁক পাখি বাঁকা হয়ে উড়ে যাচ্ছে, তাদের ডানার ঝাঁপ্‌টানি শুনতে পেলাম।

আর বলতে হল না। এক দৌড়ে ওপরে গিয়ে নতুন জুতোটা পরে নিলাম, একটা প্যান্ট শার্ট নিলাম, চোখেমুখে জল দিয়ে, ভালো করে চুলটা আঁচড়ে, লাট্টু, লেত্তি, খুদে আয়না-চিরুনি ইত্যাদি দরকারি জিনিস পকেটে পুরে, তিন মিনিটের মধ্যে গাড়িতে গিয়ে চেপে বসলাম। মা

বাবা বোম্বাই গেছেন, পুঁটলিও গেছে সঙ্গে, কাউকে কিছু বলতেও হল না। নইলে আর যাওয়া হয়েছিল!

এসে দেখি বিরিঞ্চিদা ঘন ঘন হাতঘড়ি দেখছে, যেন আমার জন্য কতই-না দেরি হয়ে গেছে। সেধে তো সঙ্গে নিয়েছ বাপু, এখন তেজ দেখালে চলবে কি করে! বুকটা একটু একটু টিপ্‌টিপ্‌ করছিল; এখন এই শেষ মুহূর্তে ধরা পড়লেই তো সব পণ্ড! সেজদাদুর নাকি ইঁদুরের পায়ের শব্দে ঘুম ছুটে যায়।

কিন্তু কিচ্ছু হল না। বিরিঞ্চিদার গাড়ি, তবে বিরিঞ্চিদা দারুণ ক্যাবলা; গাড়ি চালাতে ভয় পায়। তাই শ্যামাদাসকাকা চালাচ্ছে। আমি গিয়ে তার পাশে বসলাম। পারলে আমি কখনো পেছনে বসি না। শ্যামাদাসকাকা খুব ভালো গাড়ি চালায়, স্টার্ট দিতে এতটুকু আওয়াজ হল না। ঐ তো লড়্‌বড়ে গাড়ি, মনে হয় চলতে গেলে এখনি সব খুলে খুলে পড়ে যাবে।

কাছাকাছি কোথাও নয়, চললাম সটান কলকাতার বাইরে। পথঘাট ভোঁ ভাঁ, এত ভোরে কারো ঘুম ভাঙে নি। মাটি থেকে এক হাত ওপরে একটা ধোঁয়া মতো বিছিয়ে রয়েছে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

আস্তে আস্তে ভোর হয়ে এল, পূর্ব দিক ফরসা হবার আগেই দেখলাম পশ্চিম দিকটা লাল হয়ে উঠেছে। গোয়াল ঘরে সব গোরুরা ডাকতে লাগল, এখান থেকে ওখান থেকে মুরগিরা বেরিয়ে এল। গাঁয়ের লোকদের জেগে ওঠা দেখতে পেলাম।

গাড়িতে কেউ কথা বলে না। এমনিতেই বিরিঞ্চিদার গাড়িতে এমনি দারুণ শব্দ হয় যে খুব না চ্যাঁচালে কিছু শোনা যায় না। তার ওপর মনে হল এদের সবার মনে যা ভয়। দু-একবার জিগ্‌গেসও করলাম, কিন্তু কেউ কিছু বলে না, উলটে সে কি ধমক-ধামক করতে লাগল। কি দরকার রে বাবা। তোরা ভয় পেলে আমার আর কি!

খিদে খিদে পাচ্ছিল; কাল রাতে পিসিমার কড়াইতে আঠা তৈরি করা নিয়ে রাগমাগ করে ভালো করে খাই নি, তায় এখন কত বেলা হয়ে যাচ্ছে, কেউ খাওয়া-টাওয়ার কথা বলে না কেন?

নড়ছি-চড়ছি, এমনি সময় বিরিঞ্চিদা আমার কানের কাছে মুণ্ডুটা এনে বলল, "এই চুপ করে বোস না, বেশি কথা-টথা বলিস না, তা হলে তোকে এই এত বড় একগাদা চুইং-গাম দেব।"

আমি তো অবাক। একটা টিকটিকির ল্যাজ কাউকে কখনো দেয় না, ও দেবে আমাকে একগাদা চুইং-গাম। তবেই হয়েছে!

এমনি করে কত মাইল যে চলে এসেছি তার ঠিক নেই। বেশ বেলা বেড়েছে এমন সময় দূর থেকে দেখি রাস্তা যেখানে রেলের লাইন পার হয়েছে, সেখানে বিরাট তেঁতুলগাছের তলায় মেলা লোকের ভীড়।

বেশ খানিকটা দূরেই আছি, কিন্তু শ্যামাদাসকাকা দেখলাম খুব ঘাবড়েছে। স্টিয়ারিংটাকে কষে চেপে ধরেছে, হাতের গিঁটগুলো সব সাদা সাদা হয়ে উঠেছে। চুলগুলোও খাড়াখাড়া, সারা কপাল জুড়ে এই বড়-বড় ঘামের ফোঁটা।

সত্যি বিষম ভিড়। আরেকবার অবাক হয়ে যেই শ্যামাদাসকাকার দিকে তাকিয়েছি, সে কর্কশ গলায় বলল, "কিছু করবার না থাকে তো আমার দিকে না তাকিয়ে বুড়ো আঙুল চোষ।"

ততক্ষণে শ্যামাদাসকাকার কপালের পুরোনো ঘামগুলো গলে গিয়ে নদী হয়ে, ওর জামার গলা দিয়ে নামতে লেগেছে আর তার জায়গায় নতুন সব ঘামের ফোঁটা দেখা দিয়েছে।

ভিড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। দেখি একটা চা-ওলা তার ছোট্ট তোলা উনুন, চোঙা দেওয়া পেতলের চা-দানি আর টুকরি করে মাটির ভাঁড় নিয়ে, একেবারে কাছ ঘেঁষে বসে আছে। কিন্তু শ্যামাদাসকাকা যেন দেখতেই পাচ্ছে না।

মুণ্ডু ঘুরিয়ে পেছনের সীটের দিকে চেয়ে দেখলাম। ঠানদিদি আর বিরিঞ্চিদাও চোখ গোল গোল করে এ ওর দিকে চেয়ে আছেন, গালের রঙ ফ্যাকাশে, মুখে কথাটি নেই। কি জানি বাবা!

ভিড়ের জন্য গাড়ি থামাতে হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে মুণ্ডু বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম যারা ট্রেনে কাটা পড়েছে তাদের মাথাগুলো একেবারে আলাদা হয়ে গেছে কি না।

কিন্তু কিচ্ছু দেখা গেল না, মড়া না, কিছু না। চা-ওলার কাছে দেখলাম কাচের বাক্সে বাঁদর-বিস্কুট। কি ভালো খেতে বাঁদর-বিস্কুট, শক্ত, সোঁদা গন্ধ, চমৎকার! কিন্তু পয়সাকড়ি নেই।

এদিকে এরা সব যেন ভয়ে কাঠ।

ভিড়ের মধ্যে চেয়ে দেখি ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করে রয়েছে সন্দেহ-জনক কত যে লোক তার ঠিক নেই। সেইসঙ্গে লাঠি হাতে নীল

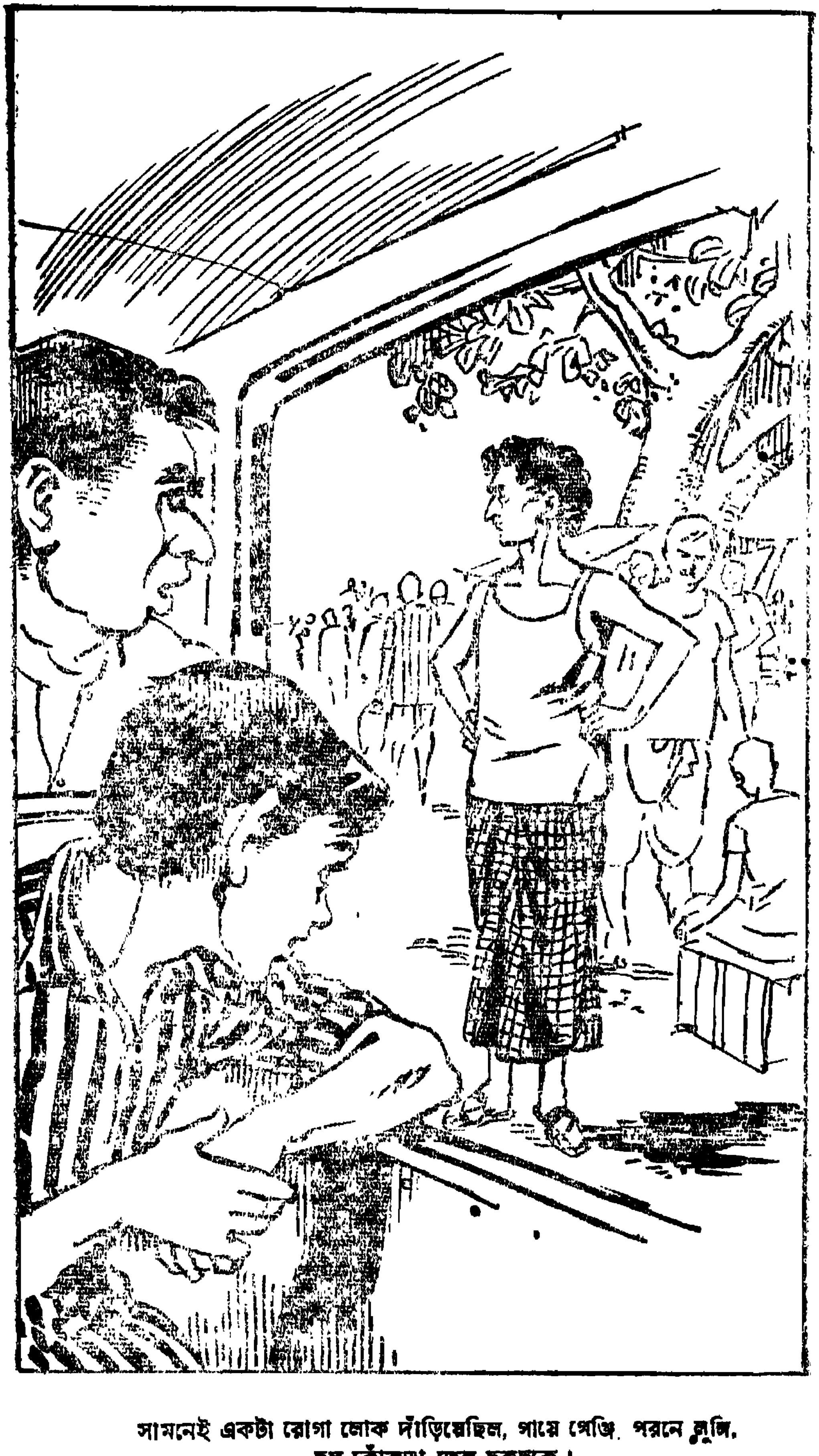

সামনেই একটা রোগা লোক দাঁড়িয়েছিল, গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি,
চুল কোঁকড়া তেল-চুক্‌চুকে।

পাগড়ি কত পুলিস ! কিছু একটা যে ঘটেছে সেটা ঠিক।

ডেকে জিগ্গেস করতে গেলাম, 'এই পাহারাওয়ালা, কুছ হুয়া ?' কিন্তু জিগ্গেস করব কি, মুখ হাঁ করতেই বিরিঞ্চিদা আর ঠান্দি ফিরে আমার মুখ চেপে ধরলেন। আর শ্যামাদাসকাকা পর্যন্ত আমার দিকে ফিরে বললে, "ইডিয়ট্ !"

সামনেই একটা রোগা লোক দাঁড়িয়েছিল, গায়ে গেঞ্জি, পরনে লুঙ্গি, চুল কোঁকড়া তেল-চুক্চুকে।

সে আমাদের গাড়ির পাদানির ওপর চড়ে পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে হাসতে লাগল। দেখলাম ওর কানে সোনার মাকড়ি পরা আর একটু করে চুণ লাগানো। তা হলে নাকি পান খেলেও মুখ পোড়ে না। একদিন দেখতে হবে।

লোকটা নিজের থেকে বললে, "এখানকার জমিদারবাবুর স্ত্রীর মুক্তোর মালা হারিয়েছে। তাই ধরপাকড় চলছে।"

আমাদের গাড়ির লোকেরা এতক্ষণ কাঠ-পুতুলের মতো সামনের দিকে চেয়ে বসেছিল, এবার তিনজনে একসঙ্গে বিষম একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে, ঐ লোকটার সঙ্গে মেলা গল্প জুড়ে দিল।

ঐখানে লেভেলক্রসিং-এর ধারে, ভিড়ের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে, শ্যামাদাসকাকা ও বিরিঞ্চিদা আর ঠান্দিদি সেই লুঙ্গিপরা মাকড়ি-কানে অচেনা লোকটাকে কি যে না বলল তার ঠিক নেই।

অবাক হয়ে সব শুনলাম ; আগে এ-সব কিছুই জানতাম না।

বলল আমরা নাকি মোটরে গয়া যাচ্ছি ঠান্দিদির বাবার পিণ্ডি দিতে। অথচ ঠান্দিদির যে আবার বাবা আছে এ তো কখনো শুনি নি। নিজেই উনি যথেষ্ট বুড়ো।

ঠান্দিদি নাকি পিণ্ডি দেবেন, বিরিঞ্চিদা জোগাড় দেবে, শ্যামাদাস-কাকা গাড়ি চালাবে। আর আমি হলাম ঠান্দিদির নাতি, নাকি কেঁদে-কেটে সঙ্গ নিয়েছি, ঠান্দিদিকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারি না।

এই বলে ঠান্দিদি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চুল নোংরা করে দিলেন। আমি এমনি অবাক হয়ে গেছলাম যে কিচ্ছু বললাম না। শুধু পকেট থেকে আয়না-চিরুনি বের করে, চুলটাকে যত্ন করে ফের আঁচড়ে নিলাম। আশা করি এতেই ওঁকে যথেষ্ট শিক্ষা দেওয়া হল।

ঠিক সেই সময় সাদা পেন্টেলুন পরা কালো ইন্সপেক্টরবাবু ভিড়

ঠেলে এসে হাজির। আর অমনি লুঙ্গিপরা লোকটা টুপ্ করে নেমে হাওয়া।

শ্যামাদাসকাকাও ঘন ঘন হর্ন দিতে লাগল, ঠান্‌দিদি আর বিরিঞ্চিদা ইদিক-উদিক গাছপালা দেখতে লাগলেন, যেন কিছুই জানেন না।

ইন্সপেক্টরবাবুকে শ্যামাদাসকাকা সিগারেট খাওয়াল, আর সে বললে, "ও-কে।"

অমনি ভিড়টা দুভাগ হয়ে গেল আর আমরা রেলের লাইন পার হয়ে, ওপারের পথ ধরলাম।

আর থাকতে পারলাম না। স্টিয়ারিং-এর ওপর শ্যামাদাসকাকার হাতটা চেপে ধরে বললাম, "বলতেই হবে কেন পালাচ্ছ তোমরা।"

ওর হাতটা অমনি স্টিয়ারিং থেকে খসে গেল আর গাড়িটাও ল্যাগ্‌ব্যাগ্ করে উঠল। শ্যামাদাসকাকা তো হাঁ।

পেছন থেকে ঠান্‌দিদি গম্ভীর গলায় বললেন, "পেছনে হুলিয়া লেগেছে, না পালিয়ে উপায় নেই।"

দুই

হুলিয়া লেগেছে। ইস্। শ্যামাদাসকাকার কাছে আরেকটু ঘেঁষে বসলাম। সে বললে, "উঁ। উঁ। গিয়ার চিপ্‌কিও না।"

বিরিঞ্চিদা বললে, "আমরা ফেরারি, ঘরবাড়ি ছেড়ে চিরকালের মতো চলে যাচ্ছি। হল এবার? ভোর-ইস্তক খালি বলে—কোথায় যাচ্ছি, কেন যাচ্ছি। কেমন, এবার খুশি তো?"

ঠান্‌দিদি ব্যস্ত হয়ে বললেন, "না, না, চিরদিনের জন্য নয় মোটেই। ডিসেম্বর মাসে ওর পরীক্ষা না? তা ছাড়া মসলার কৌটা তো ফেলে এসেছি। তার জন্যও একবার ফেরা দরকার।"

তার পর সবাই চুপচাপ।

কে জানে হুলিয়ারা কামড়ায় কি না।

পথটা ক্রমে নির্জন হয়ে এসেছে। দুপাশের বড়-বড় বটগাছ পথের ওপর ঝুঁকে পড়ে, পাতায় পাতায় মিলিয়ে, মাথার ওপর যেন ছাদ তৈরি করছে।

বিষম নিরিবিলি। এত নিঝুম যে দিনের বেলাতেও ঝিঁঝিঁ পোকা

ডাকছে। শুনতে শুনতে কেমনধারা ঘুম এসে যায়। মনে হয় ঝিঁঝিরা কত দূরে চলে যাচ্ছে। আবার কাছে আসছে।

শ্যামাদাসকাকা হঠাৎ পথের ধারে গাছতলা ঘেঁষে গাড়ি থামিয়ে, ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

অমনি আমিও সিটের পেছনে চড়ে বসে ঠান্‌দিদির দিকে মুখ করে রেগে বললাম, "কেন বললে কান্নাকাটি করে সঙ্গ নিয়েছি? তোমরা নিজেরা আমাকে জোর করে ধরে আনো নি? কাটলেট খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে, চুইং-গাম দেবে বলে আমাকে নিয়ে আসো নি? পাছে সেজদাদুকে সব বলে দিই সেই ভয়ে।"

ওরা তার কোনো উত্তর না দিয়ে, নিশ্বাস বন্ধ করে একসঙ্গে বলল, "কি সব বলে দেবে? তুমি তার কি জানো?"

কি আর করি, পকেট থেকে টিনের ব্যাঙ বের করে কট্ কট্ করতে লাগলুম। তাই দেখে ওরাও আবার সব আরাম করে বসল। রুমাল দিয়ে ঘাম মুছবে বলে শ্যামাদাসকাকা পকেটে হাত পুরে দিল। দিয়েই কিন্তু একহাত লাফিয়ে উঠে চাপা গলায় বিরিঞ্চিদাকে বলল, "বিরিঞ্চি, দেখ তো পকেটে যা মনে হল, সত্যি সত্যি তাই কি না!"

বিরিঞ্চিদা পেছনের সিট থেকে ঝুঁকে পড়ে সোজা শ্যামাদাসকাকার পকেটে হাত চালিয়ে দিল। টেনে বের করল এক ছড়া মুক্তোর মালা। ঠিক যেমনটি গোপলার বইতে পড়েছিলাম, গোল গোল জমানো চোখের জলের মতো এক ছড়া মুক্তোর মালা। তাতে সকালবেলার রোদ পড়ে লাল নীল সবুজ রঙ ঠিকরোচ্ছে। শুনেছি এ-সবের জন্য রক্তগঙ্গা বয়।

ঠান্‌দিদি বললেন, "ইস্ শ্যামাদাস, তোর পেটেও এত ছিল!"

বিরিঞ্চিদা বলল, "তুই সব পারিস রে শ্যামাদাস। কিন্তু কখন করলি তাই ভাবছি।"

আমি বললাম, "শ্যামাদাসকাকা করবে জমিদার-গিন্নির মালা চুরি! আরশুলো দেখলে ওর দাঁতকপাটি লেগে যায়, ও করবে চুরি! কি হয়েছে বলব? ঐ লুঙ্গিপরা লোকটি নির্ঘাৎ মালাটা ওর পকেটে চালান করেছে। ধরা পড়বার ভয়ে।"

ঠান্‌দিদি শিউরে উঠে বললেন, "ওরে শ্যামাদাস, রুমাল দিয়ে ওটাকে মুছে ফেল রে। ছুঁয়েছিস ওটাকে, মুক্তোগুলোতে তোর আঙুলের ছাপ পড়েছে।"

বিরিঞ্চিদাও বলল, "এবার কে তোকে বাঁচায় দেখব। তোর পেছনে গোয়েন্দা লাগবে দেখিস। আর গোয়েন্দার হাত এড়ালেও ঐ লুঙ্গি-পরাটা রয়েছে। দেখিস ঐ মালা উদ্ধারের জন্য কত রক্তপাত—"

এই অবধি শুনেই শ্যামাদাসকাকা মালাটা পকেটে পুরে কোনো কথা না বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

দেখলাম ওর চেহারাটা কেমন বদলে গেছে। চোখ ছোট হয়ে গেছে; গায়ের রঙ, কানের শেপ সবই অন্যরকম লাগছে। মালাটা বোধ হয় ওর ছাড়বার ইচ্ছে নেই।

হঠাৎ বিরিঞ্চিদা বলে উঠল, "এই রে শ্যামদাস! পেছনে একটা গাড়ি লেগেছে!"

ব্যস্‌, আর বলা-কওয়া নেই, সটান শ্যামাদাসকাকা বড় রাস্তা ছেড়ে বনবাদাড়ে নেমে পড়ল। গাছ-গাছড়ার মধ্যে দিয়ে আঁকা-বাঁকা মেঠো পথ। তারই ওপর দিয়ে শ্যামাদাসকাকা দিব্যি গাড়ি চালিয়ে চলল।

কেউ কোনো আপত্তি করল না। যাক গে যেখানে খুশি, খিদের চোটে আমার কিছু ভালোও লাগছিল না। তবু দু-একবার বললাম, "তোমরা আজ খাবে না?"

কি জ্বালা! কেউ কোনো উত্তর দেয় না।

পেছন ফিরে বললাম, "তবে আমি খাই?"

খড়্‌খড়ে গলায় ঠান্‌দিদি বললেন, "সারাক্ষণ শুধু খাই—খাই! বলছি পেছনে হুলিয়া লেগেছে।"

"হুলিয়া আবার কি?"

বিরিঞ্চিদা বিরক্ত হয়ে বলল, "ন্যাকা! হুলিয়া আবার কি! ধরলে পর টেরটা পাবি।"

চার দিকে ঝোপ-ঝাপ, উঁচু-উঁচু গাছের শেকড়, মাঝে মাঝে একটুখানি খোলা জায়গা, বড়-বড় কালো পাথর; খানিকটা মাটি ভেঙে গেছে, পাথর আর ছিবড়ের মতো গাছের শেকড় বেরিয়ে রয়েছে। এ-সব জায়গায় হুণ্ডার থাকে। তারা ছোট পাঁঠা-টাঁঠা ধরে তো নিয়ে যায়ই, মানুষদেরও খায়-টায়। আমার দিককার দরজাটা আবার লগ্‌বগ্‌ করে, একটু একটু করে ঘষ্‌টে ঘষটে শ্যামাদাসকাকার দিকে এগুচ্ছি, সে আবার খেঁকিয়ে উঠল, "বলছি গিয়ার চিপ্‌কিও না। সরে বোসো।"

বললাম, "দরজাটা যদি খুলে যায়? এত আস্তে চালাচ্ছ কেন?

কিছুতে যদি লাফিয়ে পড়ে ?"

শ্যামাদাসকাকা বিরক্ত হয়ে তখুনি গাড়ি থামিয়ে বলল, "বেশ তো, আমার চালানো পছন্দ না হয়, তুমিই চালাও না। কি সুন্দর রাস্তা দেখছ না। তুমি এদিকে এসো, আমি ওধারে যাই।"

ততক্ষণে রাস্তাটা সরু হতে হতে একটা পায়ে-চলা পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গাছগুলোও ভিড় করে এসেছে। সত্যি বলছি ঝিঁঝিঁর ডাকে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছিল। ঝিঁঝিঁর ডাকে কিরকম মন খারাপ লাগে ; খিদেও পাচ্ছিল। পকেট থেকে টিনের ব্যাঙটা বের করে আবার কট্‌কট্‌ করতে লাগলাম।

আরো খানিক দূর যাওয়া গেল। শেষটা একটা বটগাছের তলায় শ্যামাদাসকাকা গাড়ি থামাল।

চার দিক থম্‌থমে চুপচাপ। ঝিঁঝির ডাক, পাতার শির্‌শির্‌ আর দূরে কোথায় জল পড়ার শব্দ। এই-সব জায়গাতেই বোধ হয় হুণ্ডাররা জল খেতে আসে। ছোট নদীর ধারে, বালির ওপর দিয়ে হেঁচড়ে কিছু নিয়ে গেলে, তার দাগ দেখা যায়। কিন্তু তখন আর কিছু করবার উপায় থাকে না। খিদে।

তখন শ্যামাদাসকাকা নিজে থেকেই বললে, "খিদেয় পেটের এদিক-ওদিক জুড়ে গেছে।"

যাক, বাঁচা গেল।

বিরিঞ্চিদা আমাকে বলল, "ওঠ না। আমার পায়ের কাছ থেকে টিফিনক্যারিয়ারটি নামিয়ে খোল দিকিনি। কুঁজোয় জল আছে, বের-টের কর। আমার এখনো হাত-পা কাঁপছে, পেটের ভিতর কেমন যেন করছে। নে, বের কর।"

টিফিনক্যারিয়ার খুলে দেখি লুচি, পটলভাজা, আলুরদম, মাংসের বড়া, জিবে-গজা। যদিও ডিমের ডেভিল, শোনপাপড়ি মোটেই নেই। দরজার খোপে পুরোনো খবরের কাগজ ছিল, তাতে করে যত্ন করে ওদের খাওয়ালাম। শ্যামাদাসকাকা কুড়িটা লুচি খেল ; বিরিঞ্চিদারও দেখলাম ভয়ের চোটে খিদে বেড়েছে। খালি ঠান্‌দিদি নাক সিঁটকে একটু দূরে বসে ফলমূল খেলেন।

কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ খুশি হল বলে মনে হল না। খাবার পর জল খেয়ে, পকেট থেকে একটি লোমওয়ালা ল্যাবেঞ্চুস বের করে

মুখে পুরে, যেই বলেছি, "আঃ! কি আরাম!"

অমনি ওরা সব রুখে উঠল, "আরাম? আরামটা কোথায় পেলি তাই বল! এখন কি উপায় হবে শুনি? সামনে অঘোর জঙ্গল, পেছনে শত্তুর, এখনি বিকেল হয়ে এসেছে, রাত হতে কতক্ষণ? কি উপায় হবে এবার বল!"

বললাম, "শ্যামাদাসকাকা যদি জঙ্গলের মধ্যে ইচ্ছে করে না ঢুকত, তা হলে এতক্ষণে আমরা—

এমনি সময় ঠান্‌দিদি হঠাৎ চেঁচিয়ে-মেচিয়ে এক লাফে গাড়িতে উঠে পড়ে বললেন, "ওরে বাবা রে! বাঘ!"

আমিও গাড়িতে উঠে, দরজা বন্ধ করে দিয়ে, তাকিয়ে দেখি একটি মোষ প্যাটার্নের জন্তু; ঝিরিঞ্চিদা তাড়া দিতেই চলে গেল। সত্যি, মেয়েরা যে কি দারুণ ভীতু হয়।

একটু পরেই একটা ব্যাঙ দেখলাম, থপ্ থপ্ করে কতকগুলো কালো পাথরের ফোকরের মধ্যে ঢুকে গেল। তার পর অনেকক্ষণ ধরে ফোকরের মধ্যে ব্যাঙের চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করছে দেখতে পাচ্ছিলাম। কিচ্ছু ভয় পাই নি। ঠান্‌দিদিকে কিছু বলি নি পর্যন্ত। কি জানি যদি শেষটা ওঁর হাত-পা এলিয়ে যায়। মেয়েদের কিছু বলা যায় না।

খানিক বাদে বিরিঞ্চিদা বলল, "কই, দেখি তো মালাটা। ই-স্! লাখ টাকার জিনিস রে শ্যামাদাস। ধরা না পড়িস যদি, রাতারাতি রাজা হয়ে যাবি। তবে যদি ধরা পড়িস—আর সেটারই চান্স বেশি তা হলে বাকি জীবনটা ঘানি টেনে কাটাবি।"

আমি বললাম, "হ্যাঁ, আমি দেখেছি, চোখে নারকোল মালার তৈরি চশমা বেঁধে দেয়। নইলে মাথা ঘোরে।"

অমনি শ্যামাদাসকাকা ঠাস্ করে আমার গালে একটা চড় কষিয়ে, মালাটাকে টেনে ঘাসের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল।

সবুজ ঘাসের ওপর মুক্তোগুলো জ্বলতে লাগল, যেন কে সারি সারি বাতি দিয়েছে।

বিরিঞ্চিদা গিয়ে কুড়িয়ে আনল।

দেখলাম মাঝখানে আবার একটা মস্ত হীরে ঝোলানো। শ্যামাদাসকাকাকে হুলিয়ায় ধরলে ঠিক হত! কিন্তু তা হলে গাড়ি কে চালাত?

তিন

চার দিকে চেয়ে দেখলাম। মাথার ওপর বটগাছটা মেঘের মতো অন্ধকার তৈরি করে রেখেছে। কতকগুলো ঝুরি মাটিতে নেমেছে, কতকগুলো শূন্যে ঝুলছে, বাতাস লেগে একটু একটু দুলছে, আর ডালের ভেতর দিয়ে, পাতার ফাঁক দিয়ে ছেঁড়া-ছেঁড়া সূর্যের আলো, কেমন একটা সবুজ রঙ ধরে আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। শির্‌শির্‌ বাতাস বইছে।

শ্যামাদাসকাকা বিরিঞ্চিদার হাত থেকে মালাটা ছিনিয়ে নিয়ে আবার পকেটে পুরে ফেলে বলল, "এ-সব সামান্য জিনিসে আমার কোনো লোভ নেই রে বিরিঞ্চি। ও মালা আর কি দেখাচ্ছিস? জানিস আমার ঠাকুমার গায়ে দুপুরে এক লাখ টাকার আর সন্ধেবেলায় তিন লাখ টাকার গয়না থাকত। এত গয়না ছিল যে নিজেই জানতেন না কি আছে না আছে। ওঁদের বাড়িতে বাইরে থেকে গয়না পরে কেউ যদি আসত, তো মনে করতেন বুঝি ওঁরই গয়না নিয়েছে। এমনি করে কত যে শত্তুর তৈরি করেছিলেন। শেষটা তাতেই ওঁর কাল হল।"

আমি বললাম, "কেন, কেন, কি হয়েছিল?"

শ্যামাদাসকাকা বললে, "আঃ, গল্প বলবার সময় হুড়ো দিতে হয় না। কি রূপ ছিল তাঁর তা জানিস? ওঁর পাশে যে দাঁড়াত তাকেই বাঁদরের মতো দেখাত। দুধের মতো রঙ, গোড়ালি পর্যন্ত কালো কোঁকড়া চুল, কান পর্যন্ত টানা চোখ, মুক্তোর সারির মতো দাঁত। তিন লাখ টাকার গয়না পরে শুতে যেতেন।"

আমি বললাম, "ই—স্‌। তার পর কি হল? নিশ্চয় খারাপ কিছু?"

শ্যামাদাসকাকা বকে যেতে লাগল, "একদিন সকালে উঠে দেখেন সব চুরি গেছে। শত্তুরের তো আর অভাব ছিল না। রাতারাতি কে এসে গা থেকে সমস্ত খুলে নিয়ে চলে গেছে। ঠাকুমা টেরও পান নি। সকালবেলা তাবিজ ঢিলে হয়ে গেছে মনে করে কনুই খামচাচ্ছেন; চেয়ে দেখেন কোথায় তাবিজ। সোনার তাবিজ নেই, হীরের রতন-চূড় হাওয়া, নীলকান্তমণি বসানো চরণ-পদ্ম, ফিরোজা দেওয়া মুক্তোর সাতনরি, কিচ্ছু নেই। নাকছাবিটা অবধি খুঁটে তুলে নিয়ে গেছে।"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শ্যামাদাসকাকা বলল, "আমার মন বলছে এই মালাটাও সেই চুরি-করা জিনিসেরই একটা। কিছুরই ফর্দ করা তো আর ছিল না। তবে এটার কতই-বা দাম হবে? বড় জোর বিশ-পঁচিশ হাজার!"

বিরিঞ্চিদা সামনের দিকে ঝুঁকে বলল, "দ্যাখ শ্যামাদাস, তোর মনে পাপ ঢুকেছে; তুই খুব ভালো করেই জানিস এটা সেই জমিদার-গিন্নির মালা। হয়তো ঐ লুঙ্গি-পরা লোকটার সঙ্গে তোর ষড় ছিল। দেখিস এর জন্য তোকে ঝুলতে হবে।"

দেখলাম হিংসায় বিরিঞ্চিদার মুখটা সবুজ হয়ে গেছে।

শ্যামাদাসকাকাও দেখলাম দারুণ রেগে গেছে, "আমি ঝুলব মানে? বাঃ বেশ বললি যা হোক! তুই আর পিসিমা—"

বিরিঞ্চিদা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে শ্যামাদাসকাকার মুখটা চেপে ধরে নাক দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললে, "স্-স্-স্-স্ চুপ কর ভাই! বলেছি তো তোকে চীনে হোটেলে চ্যাং-ব্যাং খাওয়াব। তা ছাড়া তোর নিজেরও তো—"

সবাই চুপ করল।

ঠান্‌দিদি মোম দেখার পর আর কথা বলেন নি। এখন হঠাৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "হরি হে, সবই তোমারি ইচ্ছে। নইলে আমারই-বা সেজোপিসিমার মুক্তোর মালা বাক্স থেকে বেমালুম অদৃশ্য হবে কেন। ভাবতে পারিস তোরা, খাটের তলায় বাক্স, বাক্সের ওপর সের পঁচিশেকের সাঁড়াশি বারকোশ, বাক্সের মুখ মোটা ছাগলদড়ি দিয়ে বাঁধা, খাটের ওপর অষ্টপ্রহর সেজোপিসিমা শুয়ে। আমার বিয়েতে ঐ দিয়ে আশীর্বাদ করবেন বলে না খেয়ে, না ঘুমিয়ে; বছরের পর বছর মালা আগলাচ্ছেন। কবে আমার বিয়ে হবে। এদিকে আমি তখনো জন্মাই নি পর্যন্ত! শেষটা একদিন দেখেন কিনা বাক্সের মুখ যেমন দড়ি দিয়ে তেমনি দড়ি দিয়েই বাঁধা; সাঁড়াশি বারকোশ যেমনকে তেমন; খালি বাক্সর মধ্যে লাল চেলির টুকরোয় বাঁধা মালাগাছি নেই। সেই শোকেই তো আমি জন্মাবার আগেই সেজোপিসিমা গেলেন! নইলে কি আর এমন বয়স হয়েছিল! মাত্র একাশি বচ্ছর। অথচ ওঁরই মা দিদিমারা হেসে খেলে সাতানব্বই-আটানব্বইটি বচ্ছর কাটিয়েছিলেন। হরি-নারায়ণ! এ মালাটা যেন অবিকল সেই। একরকম বলতে

গেলে এটা আমারই মালা।"

বিরিঞ্চিদাও কম যায় না। সে বললে, "আমার জীবনেও কি মুক্তোর মালা নেই নাকি? জানিস, যেবার আমি প্রথম বার বি. এ. পরীক্ষা দিই, শেষদিন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, দেখি সামনে এক সন্নিসী। কি করি ট্রাম ভাড়া ছাড়া হাতে একটি পয়সা নেই। তাই-ই দিয়ে দিলাম। সন্নিসী বললেন, 'ব্যাটা তোকে পাশ করানো কারো কম্ম নয়, তবে এই জিনিসটা নে, কিছুটা শান্তি পাবি।' বলে একটা ছোট পুঁটলি দিলেন। বিকেলে বাড়ি গিয়ে খুলে দেখি ঠিক এইরকম একটা মুক্তোর মালা।"

আমি বললাম, "অ্যাঁ। তার পর সেটার কি হল?"

বিরিঞ্চিদা বলল, "দুঃখের কথা আর বলিস কেন। ভুলে সেটা সুদ্ধুই জামাটা ধোপার বাড়ি দিয়েছিলাম। তা ধোপার বাড়ি থেকে একটা পেনসিল ফেরত পাওয়া যায় না, ও কি আর ফিরে আসে। ধোপা-টাও আবার পরদিন থেকে নিখোঁজ। হয়তো এ-সব বিশ্বাস করবি না।"

আমিও এ কথা শুনে বললাম, "ও হ্যাঁ, আমারও মনে পড়ছে—"

ওরা তিনজনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "চোপ্। ফের বানাচ্ছিস!"

ঠান্‌দিদি নিশ্বাস ফেলে বলে যেতে লাগলেন, "ইস্, ভাবতে গিয়েও আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে হাঁসের গায়ের মতো হয়ে গেছে। সেবার সেই যে মেমের পালক-দেওয়া টুপি দেখে ভয় পেয়ে, চিড়িয়াখানার খাঁচা ভেঙে বাঘ বেরিয়ে এসেছিল, তোদের কারো মনে নেই? তবে মনে থাকা শক্ত, কারণ তোরা কেউ ছিলি না। সেই যে সব একতলার দরজা জানলা বন্ধ করে দোতলায় বসে থাকতে হয়। উঃ! এখনো মনে করলে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদোয়। তার মধ্যেও সেজোপিসিমা মালাগাছি প্রাণ দিয়ে রক্ষা করেছিলেন! শেষে কিনা—" বলে ঠান্‌দিদি চোখে আঁচল দিলেন।

শ্যামাদাসকাকা একটু যেন রাগ-রাগ ভাব করে বলল, "থামো দিকিনি। মনের দুঃখুগুলো এখনকার মতো চেপে রেখে, কি করা যায় তাই ভাবা যাক।"

ঠান্‌দিদি বিরক্ত হয়ে বললেন, "তা শুনতে ভালো লাগবে কেন? মালাটা কি তুই সহজে হাতছাড়া করবি? বেশ, চল, যা হোক কোথাও একটা ব্যবস্থা করা যাক। ওঠ, চল।"

শ্যামাদাসকাকা বলল, "চল বললেই তো আর চলা যায় না। আসল কথা হল ও গাড়ি এখনকার মতো এক ইঞ্চিও চলবে না। ওর তেল ফুরিয়ে গেছে, ওর সব কটা টায়ার ফুটো হয়ে গেছে, তা ছাড়া কিছুক্ষণ ধরে ওর পেটের ভেতর থেকে কিরকম একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে, সে আমি একেবারেই ভালো বুঝছি না।"

বিরিঞ্চিদা বেজায় চটে গেল—"ইয়ে, টায়ার সব ফুটো করে দিয়েছ? ওর দাম কত তা জানো? আর গোঁ গোঁ শব্দও তো আগে ছিল না।"

শ্যামাদাসকাকা আরো বলল, "তা ছাড়া রাস্তাও তো এইখানে শেষ হয়ে গেছে. এখন উপায়টা কি হবে তাই বল।"

এই বলে তিনজনেই আমার দিকে চেয়ে রইল।

আমি বললাম, "কি আবার হবে? চল, হাঁটা দেওয়া যাক। হেঁটে গিয়ে আশ্রয় খুঁজে নেওয়া যাক। সেখানে মাথাও গোঁজা যাবে, ফন্দিও পাকানো যাবে।"

ঠান্‌দিদি চটে গেলেন।

"ফন্দি পাকানো আবার কি? কোথায় শিখিস এ-সব কথা? তা ছাড়া ঐ লাখ টাকার মালা হাতে নিয়ে, এই ভর সন্ধেবেলা, অঘোর বনের মধ্যে হেঁটে বেড়াব? বেঘোরে অচেনা আস্তানায় আশ্রয় নেব? তোর প্রাণে কি একটুও দয়ামায়া নেই রে?"

বললাম, "বেশ, তা হলে হেঁটো না, গাড়িতেই বসে থাকো, হুণ্ডারে খেয়ে নিলে আমাকে বোলো না! তোমাদের পেছনে না হুলিয়া লেগেছে?"

এই বলে আমার দিকের দরজাটা খুলে নেমে পড়লাম।

হুলিয়ার কথা শুনেই ওরাও এ ওর পা মাড়াতে মাড়াতে ঠেলাঠেলি করে নেমে পড়ল।

উঃ! বসে থেকে থেকে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছিল! খানিক হাত-পা সোজা-বাঁকা করে, বাবা যেমন বলেছিলেন, সেইরকম করে খিল ছাড়ালুম। ওরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। তার পর বিরিঞ্চিদা বলল, "যত ঢং! নে, নে, গাড়ির কাঁচটাঁচ তোল, দরজাগুলো এঁটে দে। আমারও যখন তখন হাতে-পায়ে খিল ধরে যায়।"

টিফিনক্যারিয়ারে দু-চারটে লুচি-টুচি যা পড়ে ছিল, পকেটে ভরে নিলাম, তার পর পেছনের জানলা দরজা বন্ধ করলাম।

তখন শ্যামাদাসকাকা বলল, "আর, হ্যাঁ, দ্যাখ, আমি যা ভুলো মানুষ, মালাটাও বরং তোর কাছেই রাখ, আমি আবার কোথায় হারিয়ে ফেলব।"

বলে মালাটা একরকম জোর করে আমার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। বেশ একটু হাসি পেল আমার।

মালা হাতে নিয়েই জানলা তুলতে লাগলাম। তারার আলোতে মুক্তোগুলো ঝিক্‌মিক্ করতে লাগল।

হঠাৎ আমার গা শিউরে উঠল, বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল! যা ঘটবার নয়, তাই ঘটে গেল।

কিন্তু কেউ কিচ্ছু খেয়াল করল না। তাই আমিও স্রেফ চেপে গেলাম।

চার

সে কি ঘন বন। চার দিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে। খোলা জায়গায় তবু চার পাশটা দেখতে পাচ্ছিলাম, এখানে তারার আলো পৌঁছয় না। হাজার হাজার বর্ষার জল খেয়ে খেয়ে গাছপালাগুলো অসম্ভব-রকম বেড়ে গিয়ে, মাথার ওপরেও আরেকটা জমাট অন্ধকার বানিয়েছে। তার ওপর বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। সেই বৃষ্টির জল পাতা থেকে পাতায় খসে, টুপ্‌টাপ্ করে আমাদের গায়ে মাথায় ঝরে পড়ছে। সে যে কি দারুণ ঠাণ্ডা ভাবা যায় না। পায়ের নীচে ঝরা পাতার গালচে পাতা, পায়ের শব্দ শোনা যায় না। শুধু একটা শুকনো ডালে কারো পা পড়লে, সেটা মটাৎ করে ভেঙে যাচ্ছে, আর সেই শব্দে চার দিকটা ঝন্‌ঝন্ করে উঠেছে। আর কোনো সাড়াশব্দ নেই।

সকলের মনে দারুণ দুশ্চিন্তা, বিশেষ করে আমার নিজের মনে। তার কারণ খানিক আগেই যে সর্বনাশটা হয়ে গেছে, সে বিষয় কাউকে কিছু বলবার সাহস নেই আমার।

যাই হোক, সরু বনপথ ধরে, একজনের পেছন একজন, কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে চলেছি। টর্চ-ফর্চের বালাই নেই।

বেশ শীত করছে, আবার খিদে-খিদেও পাচ্ছে। পকেটের লুচির ঘিগুলো অন্য জিনিসে লেগে গিয়ে, একটা জাবড়া মতো পাকিয়ে যাচ্ছে। ও বেশিক্ষণ রাখা ঠিক নয়।

এমনি সময় দূরে গাছের ফাঁক দিয়ে, ক্ষীণ একটু আলোর রেখা দেখা দিল। ব্যস্, আর কি ভাবনা! তার মানে বনের মধ্যে মানুষের বাস আছে; খাবার পাওয়া যাবে, আর শোবার জায়গা পাওয়া যাবে।

অন্ধকারে পকেটে হাত পুরে দিয়ে লুচির দলাটা বের করে ক্যাচর্-ম্যাচর্ করে খেয়ে ফেললাম। সে কি শব্দ রে বাবা। চার দিকের গাছপালাগুলো পর্যন্ত রী-রী করে উঠল। ওরা ব্যস্ত হয়ে বলল, "ওকি রে কি হল?"

ভাঙা গলায় বললাম, "ঐ দেখ আলো।"

তাই দেখে সবাই তো আহ্লাদে আটখানা! এতক্ষণ মুণ্ডু ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে, পা ঘষ্টাতে ঘষ্টাতে চলেছিল, এবার তাড়াতাড়ি হাঁটা দিল। আলোটা ক্রমে কাছে আসতে লাগল।

যখন খুব কাছে পৌঁছলাম, দেখলাম একটা ফাঁকা মতো জায়গা, তার মাঝখানে ছাই রঙের প্রকাণ্ড পুরোনো বাড়ি, তার চুনবালি খসে যাচ্ছে, দরজা জানালা ঝুলে পড়ছে, দেয়াল ফুঁড়ে বট-অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে। তবু একটা আশ্রয় তো বটে।

সদর দরজাটা বন্ধ! জানলার ভাঙা খড়খড়ির ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। সেই আলোটুকু লম্বা হয়ে কত দূর অবধি পড়েছে।

বিরিঞ্চিদা এগিয়ে গিয়ে আস্তে আস্তে দরজায় টোকা দিল। আমরা বাকিরা ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে দাঁড়িয়ে, এ ওর ঘাড়ে গরম নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম।

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

তখন শ্যামাদাসকাকাও আর থাকতে না পেরে, সাহস করে গিয়ে দরজাতে এমনি জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল যে আশেপাশের জানলাগুলোর ভাঙা খড়খড়িও খট্‌খট্ করতে শুরু করে দিল।

আমরা ওপর দিকেও তাকাচ্ছিলাম, মনে হল খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে কারা যেন আমাদের খুব নজর করে দেখছে। সিঁড়িটা থেকে নেমে একটু সরে দাঁড়ালাম।

অনেক ডাকাডাকি ধাক্কাধাক্কির পর শুনতে পেলাম ভারী পায়ের শব্দ। কেমন একটু ভয়-ভয় করতে লাগল। মনে হল কাজ কি আশ্রয়ে। গাড়ির মধ্যেই কোনোরকমে রাতটা কাটিয়ে সকালে যা হয় একটা কিছু করলেই হয়।

ঠিক সেই সময়ে খট্ করে দরজার মাঝখানে একটা ছোট্ট খোপ মতো খুলে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে একটা কালো বুনো ভুরুর নীচে থেকে একটা কালো জ্বল্‌জ্বলে চোখ আমাদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

ঠান্‌দিদি ডেকে বললেন, "আমরা চোর ডাকাত নই গো। ক্লান্ত পথিক, জলে ভিজে, খিদেয় কাতর হয়ে, একটু আশ্রয় চাইছি। খোলোই না বাপু।"

চোখটা আস্তে আস্তে সরে গেল। তার পর কত সব ছিটকিনি নামানোর, হুড়কো সরানোর, চেন খোলার, চাবি ঘোরানোর আওয়াজ। শেষটা দরজাটা ধীরে ধীরে ফাঁক হয়ে গেল।

অমনি আমরাও হুড়্‌মুড়্ করে ভেতরে ঢুকে পড়লাম।

মস্ত চারকোণা ঘর, ওবড়ো-খেবড়ো দেয়াল, অ-সমান টালি-ওঠা মেঝে, এক পাশে একটা তে-পায়া টুলের ওপর তেলের বাতি জ্বলছে, তার কাছ দিয়ে পুরোনো একটা কাঠের সিঁড়ি ওপরে উঠে অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গেছে।

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এই তাল-ঢ্যাঙা, ইয়া ষণ্ডামার্কা এক বুড়ি। মাথার ওপর তার ঝুঁটি করে চুল বাঁধা। ঘরময় ভুর্‌ভুর্ করছে খিচুড়ির গন্ধ।

আমরা এদিকে কাগ-ভেজা, গা বেয়ে জল ঝরছে, সেই জল ঘরের মেঝেতে জমা হয়ে, ছোট-ছোট পুকুর তৈরি হচ্ছে। বুড়ি হতাশভাবে সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

ভাবলাম বোধ করি বাঙালি নয়, কথা বোঝে নি। শ্যামাদাসকাকা বলতে লাগল, "হামলুগ দুষ্টু আদমি নেই। জলমে কাদামে হোঁচট খাকে খাকে—"

বুড়ি বললে, "ঢের হয়েছে বাছা। কিন্তু খোঁজ নেই খবর নেই, হঠাৎ এত লোকের ব্যবস্থা কেমন করে হয় বলতে পারো?"

শ্যামাদাসকাকা অনুনয় করে বলল, "কোনো ব্যবস্থা চাই না। শুধু শুকনো গামছা যদি দিতে পারেন ভালো হয়। নিদেন দুটো ছেঁড়া জামা দিলেও তাই দিয়ে গা মাথা মুছে নিতে পারব।"

ঠান্‌দিদি আবার জুড়ে দিলেন, "আমার বাছা তাও লাগবে না। ঐ যার তার জামা আমি মাথায় ঘষতে পারব না। কিচ্ছু দরকার নেই, আমার আঁচলই যথেষ্ট।"

ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এই তাল-ঢ্যাঙা, ইয়া ষণ্ডমার্কা এক বুড়ি।

বুড়ি ঝড়ের মতো মুখ করে আমাদের কথা শুনতে লাগল। মুখে কথা নেই।

ঠিক সেই সময় শুনতে পেলাম দূরে কড়া নাড়ার শব্দ। এরা তিনজন এমনি আঁৎকে উঠল যেন ভূত দেখেছে।

বুড়িও যেন এরই জন্য অপেক্ষা করছিল, টুপ্ করে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

আমরা চারজন যে যার পুকুরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম এই জলে ঝড়ে আঁধার রাতে কে আবার এল!

কিন্তু হুলিয়ারা কি এমনি জানান দিয়ে আসে? তার চাইতে ঝোপের পেছন থেকে হু—স্ করে—

কানে গেল দরজা খোলার শব্দ। কি বলব, ভাবতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম! কার সঙ্গে বুড়ি চাপা গলায় কথা কইছে। তার পর সে শব্দও দূরে মিলিয়ে গেল; একেবারে চুপচাপ, একটা প্রজাপতির মতো জানোয়ার বাতির চার দিকে উড়ে বেড়াচ্ছিল, তার ডানার ঝুপ্‌ঝাপ্ অবধি কানে আসতে লাগল।

হঠাৎ বুড়ি ফিরে এল। দেখলাম তার হাব-ভাব একদম বদলে গেছে। ই কি, হাতে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, 'গরিবের বাড়িতে এমন অতিথি পাওয়া সৌভাগ্য।' তার পর ইয়ে কি যেন বলল মনে পড়ছে না তো—ও হ্যাঁ, 'চলুন ওপরে চলুন। গরম জল দেব, গামছা দেব, চারজনকে চারখানা শুকনো কাপড় দেব, মাঠাকরুনকে সুদ্ধু কাপড়ই দেব, ভয় নেই। সামান্য যা রান্না হয়েছে, দয়া করে তাই দিয়ে কোনোরকমে ক্ষেমা-ঘেন্না করে চালিয়ে দেবেন, অপরাধ নেবেন না,' ইত্যাদি।

খালি খালি মনে হচ্ছিল এখানে না এলেই ছিল ভালো। তবু ওপরে গেলাম বুড়ির সঙ্গে।

ধুলোমাখা পুরোনো কাঠের সিঁড়ির ধাপে ধাপে নানারকমের আওয়াজ হয়। কত জায়গায় রেলিং নেই, কত জায়গায় কাঠে ঘুণ ধরে গেছে। ওপরে গিয়ে দেখি প্রকাণ্ড ঘর, তার দেয়ালময় কতরকম ছবি আঁকা, তার রঙ সব জ্বলে গেছে, হরিণ, মানুষ কত কি। বুড়ির হাতের তেলের বাতির আলোতে কিরকম মনে হতে লাগল তারা বুঝি নড়া-চড়া করে বেড়াচ্ছে। শীত করতে লাগল।

কাঠের মেঝেতে পুরু হয়ে ধুলো জমেছে, যেন কতকাল কেউ এ-সব ঘরে বাস করে নি। চলতে গেলে পায়ের চাপে মনে হয় ধোঁয়া উড়ছে।

তবে সামনের দিকের একটা মস্ত ঘর খানিকটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারটে বিশাল বিশাল তক্তাপোষ, সর্বাঙ্গে কারিকুরি করা, আর কোথাও কোনো আসবাব নেই। তার পাশেই স্নানের ঘর।

বুড়ি তেলের বাতিটি দেয়ালের কুলুঙ্গিতে রেখে নিজেই আমাদের জন্য বালতি করে গরম জল এনে দিল। সাবান দিয়ে কাচা, রোদের গন্ধ লাগা চারখানা কাপড় আর গামছাও এনে দিল। ঘন বনের মধ্যে খালি পুরোনো বাড়িতে, এত আয়োজন দেখে আমরা সবাই থ।

তার ওপর ঘণ্টাখানেক বাদে, চারখানা কানা-তোলা থালায় করে খিঁচুড়ি আর মাংস এল। চমৎকার রান্না। ঠান্‌দিদি অবিশ্যি কিছু ছুঁলেন না, আমরা তিনজনেই চার থালা মেরে দিলাম। ঠান্‌দিদির জন্য একটু দুঃখ লাগছিল, বললাম, "তা হলে কি একটু চুইং-গাম খাবে?"

চোখ বুজে বললেন, "না বাছা, ও-সব মুরগির ডিম লাগানো জিনিস আমি খাই নে জানোই তো।"

আসলে ব্যাপার দেখে আমরা যেমনি অবাক হচ্ছিলাম, তেমনি সন্দেহও হচ্ছিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বুড়ি তক্তাপোষে মাদুর বিছিয়ে, চারখানি ছোট বালিস দিয়ে গেল। আমরাও তখুনি যে যার শুয়ে পড়লাম। বাবা! সারাদিনটা যা গেছে!

কিন্তু কিছুতেই আর ঘুম আসে না। ওরা তিনজন দু-একটা কথা বলবার পর চুপ হয়ে গেল, আর আমি বহুক্ষণ জেগে থেকে থেকে কতরকম যে শব্দ শুনতে লাগলাম সে আর কি বলব!

বৃষ্টি তখনো পড়ছে, ঝুপ্ ঝুপ্, ঝম্ ঝম্ করে পুরোনো বাড়িটার ছাদে, কোথায় একটা টিনের চালে, চার দিকের বড়-বড় গাছপালার ওপর। নীচে বুড়ি বাসন-কোসন ধুচ্ছে মাজছে। গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে, ভাঙা খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, জলের ছাঁট ঘরে আসছে।

মনে হল থেকে থেকে গোরুর ডাকও শুনতে পাচ্ছি। শুয়ে থাকতে পাচ্ছিলাম না, ও ধারের জানলার ভাঙা খড়খড়ির ভেতর দিয়ে দেখলাম একটা টিনের সেডের নীচে একটা পিদিম জ্বলছে আর একজন নিরীহ মতো বুড়ো একটা বিষম হিংস্র আমিষখোর চেহারার গোরু দুইছে।

এত রাতে গোরু দোয়ানো কিসের জন্য ভেবে পেলাম না।

যাই হোক, বাড়িতে তা হলে অন্য লোকও আছে। কেমন যেন ভয়টা খানিকটা কেটে গেল।

জানলা থেকে যেই ফিরেছি, অমনি মনে হল আমাদের ঘরের দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে গেল।

আমার গায়ের রক্তও জল হয়ে গেল।

পাঁচ

একটুক্ষণ ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম, কানের মধ্যে কি একটা ঝিম্‌ঝিম্ শব্দ, ওগুলো ঝিঁঝি পোকা নয়, রক্ত চলাচলের শব্দ। ঘরে কোনো সাড়াশব্দ নেই, কে জানে ওরা বোধ হয় সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছে। বাইরে গাছপালার মধ্যে তখনো একটু একটু বাতাস বইছে আর অনবরত ঝির্‌ঝির্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

মুক্তোর মালাটার কথা ভাবতেও ইচ্ছে করছিল না। যাক গে, গুটি গুটি গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তাইতেই কিন্তু অত বড় খাটটা মড়্ মড়্ মচ্ মচ্ করে উঠল।

আশ্চর্য যে মালাটার কথা এরা একবার জিগ্‌গেসও করল না। একটু আগেই ভয়ে ভাবনায় মুখে কথা সরছিল না, আর এখন সব দিব্যি ঘুমুচ্ছে। আশ্চর্য।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম কি অদ্ভুত লোক এরা। কলকাতা ছেড়ে তো সহজে এক পা নড়তে চায় না, আর আজ কেমন সাত সকালে রওনা।

আস্তে আস্তে পকেট থেকে একটু চুইং-গাম বের করলাম। অমনি মোড়কের কাগজটা এমনি সাংঘাতিক জোরে খড়্‌মড়্ করে উঠল যে নিজেই দারুণ চমকে গেলাম। এক টুকরো মুখে দিয়ে বাকিটা খুব সাবধানে পকেটে পুরলাম। ইস্, লুচিগুলোর ঘিতে পকেটটা কি বিশ্রী হয়ে আছে। হাতটি বের করে মাথায় মুছে ফেললাম।

হঠাৎ মনে হল হুলিয়ার কথা। ঝেড়ে ফেলা গেছে তো? নাকি শুঁকে শুঁকে হালুম-হুলুম করতে করতে এখানেও হানা দেবে। ভয়ের চোটে চুইং-গামটা প্রায় গিলেই ফেলছিলাম, অনেক কষ্টে জিব দিয়ে

একজন নিরীহ মতো বুড়ো একটা বিষম হিংস্র আমিষখোর
চেহারার গোরু দুইছে।

চিপ্‌কে ধরে, দাঁতের পেছনে গুঁজে দিলাম। বাবা, আমার সারা রাতের আহার। একটু বাদেই চিনিটা উঠে যাবে, তখন বেশ টেনে টেনে লম্বা করা যাবে। গিলে ফেললেই হয়েছিল আর কি।

আচ্ছা, হুলিয়া ওদের সন্ধান পেল কি করে? বিরিঞ্চিদা নাহয় পাশের বাড়িতে থাকে, কিন্তু শ্যামাদাসকাকাদের বাড়ি তো শ্যামবাজারে।

আশ্চর্য! মেলা টাকা বিরিঞ্চিদার, এই বড় বাড়ি, এই গাড়িটা, আর কি চাল! ওর চাকর নাকি ওর জুতো খুলে দেয়! কিন্তু গাড়ি চালাতে পারে না। কবে একবার নাকি পুলিশ চাপা দিয়ে থানায়-টানায় গিয়ে একাকার! শ্যামাদাসকাকা দারুণ ভালো গাড়ি চালায়, ভেতরকার সব কলকব্জা জানে।

তবে ছেলেবেলা থেকেই আমার সঙ্গে তেমন সদ্ভাব নেই।

এই-সব ভাবতে ভাবতে ঘুম এসে গেল, চোখ বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, কানের মধ্যে রক্তচলাচলের শব্দ, বৃষ্টির শব্দ, জঙ্গলের শব্দ সব দূরে সরে যেতে লাগল; প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম।

এমন সময় কাঠের সিঁড়ি আস্তে আস্তে ক্যাঁচ্-কোঁচ্ মট্‌মট্ করে উঠল। তক্ষুনি আমার ঘুম একেবারে ছুটে গেল! একদম সজাগ হয়ে গেলাম। ছোটবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যত চোর ডাকাতের গল্প পড়েছি, মনের মধ্যে দিয়ে একের পর এক সব পাস্ করে গেল। চোখটা একটু ফাঁক করে দরজার দিকে চেয়ে রইলাম।

ঠান্‌দিদি আর বিরিঞ্চিদা যেমন চুপ করে শুয়েছিল, তেমনি রইল। শুধু শ্যামাদাসকাকা দেওয়ালের দিকে ফিরে ঘড়র্ ঘড়র্ করে নাক ডাকাতে লাগল। তাইতে বুঝলাম সে জেগে আছে।

পায়ের শব্দ সিঁড়ির ওপরে এসে থেমে গেল। দরজাটা আস্তে আস্তে একটুখানি খুলে গেল, অল্প একটু আলো লম্বা কাঠির মতো হয়ে ঘরে এসে পড়ল। আপনা থেকেই আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ক্ষীণ আলোতে পরিষ্কার দেখতে পেলাম দাড়িওয়ালা গোরু দোয়ানো শেষ করে মুখে রুমাল বেঁধে ছদ্মবেশ ধরেছে। হাতে একটা কালো কাগজ জড়ানো লণ্ঠন উঁচু করে ধরেছে। তার সঙ্গে লেপ্টে দাঁড়িয়ে আছে সেই মাকড়ি-পরা লোকটা, তারও মুখে রুমাল বাঁধা! এক হাতে ঝিক্‌মিকে ছোরামতন কিছু নিয়ে, একদৃষ্টিতে আমাদের চারজনের মুখ দেখছে।

আই বাপ্!

অনেকক্ষণ দেখে নিশ্চয় মনে করল সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন আস্তে আস্তে ঢুকে শ্যামাদাসকাকার পাশে দাঁড়াল। ভাবলাম, তা হলে শ্যামাদাসকাকার এইখানেই শেষ! ছোটবেলা থেকে আজ অবধি শ্যামাদাসকাকা আমাকে কত বকুনি খাইয়েছে, অপমান অপদস্থ করেছে, বোকা বানিয়েছে, ঠেঙিয়েছে পর্যন্ত—সব ক্ষমা করে দিলাম।

শ্যামাদাসকাকা তখনো এক মনে নাক ডাকাচ্ছে। মাকড়ি-পরা লোকটা তাকে মাথা থেকে পা পর্যন্ত সার্চ করল। মালা পেল না! পায় কখনো? তার পর ওকে ছেড়ে বিরিঞ্চিদার কাছে গেল। অমনি শ্যামাদাসকাকার নাক ডাকানি বন্ধ হয়ে, বিরিঞ্চিদার নাকডাকা শুরু হল। তাকেও সার্চ করা হল। মালা পাওয়া গেল না। কি করে পাবে?

তখন দাড়িওয়ালা গিয়ে বুড়িকে ডেকে এনে, ঠান্‌দিদিকে সার্চ করাল। মালা পেল না। মনে হয় ঠান্‌দিদি সত্যি মুচ্ছো গেলেন। ততক্ষণে মাকড়ি-পরা আমাকে সার্চ করেছে, আমিও সমানে নাক ডেকেছি। কোথায় পাবে মালা? হতাশ হয়ে এ ওর মুখের দিকে চাইতে চাইতে তখন গেল সব দরজা দিয়ে বেরিয়ে। আলোর রেখা মিলিয়ে গেল। সিঁড়িটা একবার ক্যাঁচকোঁচ্ করে উঠল। তার পর সব চুপচাপ।

বাইরে তখন বৃষ্টি থেমে গেছে। ছাদ থেকে, গাছের পাতা থেকে টুপ্‌টাপ্ জল ঝরছে; এমন-কি, একটা ভিজে হুতুমপ্যাঁচা পর্যন্ত ডাকতে শুরু করে দিয়েছে। আমার তখনো বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করছে; চোখ থেকে ঘুম বিদায় নিয়েছে।

অনেকক্ষণ বাদে বিরিঞ্চিদা ফিস্‌ফিস্ করে শ্যামাদাসকাকাকে বলল, "নিমেষের মধ্যে কোথায় লুকুলি?"

শ্যামাদাসকাকা চমকে উঠে বলল, "লুকুই নি তো, গুপীকে রাখতে দিয়েছি। এই গুপে, কোথায় রেখেছিস?"

আমি চুপ করে রইলাম। কি আর বলব?

শ্যামাদাসকাকা তো দারুণ বিরক্ত।

"বড় যে চুপ করে আছিস? মালা যখন আমাকেই দিয়েছিল ওটা তখন আমারই। দে বলছি মালা। যাক, এখন আর আমার কোনো ভাবনাই রইল না। যেই-না সকাল হবে, মালা নিয়ে হেঁটে রেলস্টেশনে চলে যাব। তার পর সটান কলকাতা। মালা দে, গুপে।"

ঠান্‌দিদি বললেন, "তোর মালা মানে? জমিদার-গিন্নির মালা বল।"

চোরাই মাল বল। যা না কলকাতা, তাপর আমি তোর কি করি দেখিস।"

শ্যামাদাসকাকা কোনো উত্তর না দিয়ে আমাকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, "এই গুপে, মালা বের কর বলছি।"

আমি বললাম, "মালা আমার কাছে নেই, দেব কোত্থেকে?"

বিরিঞ্চিদা বললে, "নেই মানে? ভালো চাস তো দিয়ে দে।"

ফের বললাম, "বলছি আমার কাছে নেই। খুঁজে দেখতে পারো।"

তখন ওরা করল কি, রেগে-মেগে উঠে এসে সত্যি সত্যি আমাকে আরেকবার সার্চ করল। তার পর দেশলাই জ্বেলে সারা ঘরময় খুঁজে বেড়াল।

যখন বিরিঞ্চিদার দেশলাই বাক্স খালি হয়ে গেল, তখন শ্যামাদাসকাকা পকেটে হাত দিল নিজেরটা বের করবার জন্য।

পকেটে হাত দিয়েই দারুণ আঁৎকে উঠে বলল, "বিরিঞ্চি আমার পকেটে একবার হাত দিয়ে দেখ তো, যা মনে হল তা সত্যি কি না।"

বিরিঞ্চিদা তখুনি শ্যামাদাসকাকার পকেটে হাত পুরে টেনে বের করে আনল এক ছড়া মুক্তোর মালা। দেশলাইএর ক্ষীণ আলোতে অন্ধকারের মধ্যে সেটা তারার মতো জ্বলতে লাগল।

আমি ভাবলাম, আমি কি জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি। ওখানে কেমন করে মালা থাকা সম্ভব হয়? হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শুকনো গলায় বললাম, "দেখি দেখি।"

ততক্ষণে মেঘ কেটে গিয়ে ঘরের মধ্যে চাঁদের আলো এসেছে। সেই আলোতে বিরিঞ্চিদা মালাখানি তুলে ধরল। ইস্, সত্যি চোখ ঝল্সে যায়।

আমি তো জানি শ্যামাদাসকাকার পকেটে মালা থাকতে পারে না, নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। উঠে কাছে গিয়ে দেখলাম সেইরকমই মালা বটে। কিন্তু যেন ঠিক সেই মালা নয়। তার মাঝখানকার খামিতে যেন মস্ত হীরে ছিল, এর মাঝে একটা ফিকে নীল পাথর বসানো।

বার বার বলতে লাগলাম, এ সে মালা নয়। সে মালা এ হতেই পারে না।

শ্যামাদাসকাকা শেষপর্যন্ত বিরক্ত হয়ে গেল—"বেশ তো। তা হলে সেটাও বের করে দে। ভালোই তো, আমার দু দুটো মালা হল। দে শিগ্গির সেটা।"

কি আর করা, চুপ করে রইলাম। একটু চুইং-গাম ছিঁড়ে মুখে দিলাম।

ঠান্‌দিদি তখন বললেন, "পুজো-আচ্ছা তো আর করবি নে তোরা, হবেই এরকম। বিরিঞ্চিটার তো এতদূর সাহস যে বলে ঠাকুর দেবতা—"

বিরিঞ্চিদা বাধা দিয়ে বলল, "আহা এর মধ্যে আর ও-সব টেনে আনা কেন ?"

ঠান্‌দিদি তবু বলতে লাগলেন, "কিছুতে যে আমাদের পাছু নিয়েছে, এটা তো ঠিক। তাই সমস্ত ব্যবস্থা করেও পৌঁছুতে পারলাম না। এখন কি হয় কে জানে।"

শ্যামাদাসকাকা আর বিরিঞ্চিদা ব্যস্ত হয়ে উঠল।

"কি হয় কে জানে আবার কি কথা। আরো বহুদূর যেতে হবে। নইলে পার পাওয়া নেই। মোটরে না হোক ট্রেনে। ট্রেনে না হোক গোরুর গাড়িতে। নয় তো হেঁটে। যেমন করেই হোক অনেক দূরে চলে যেতেই হবে।"

শিউরে উঠে দুজনেই বার বার বলতে লাগল। ঢের দূরে। আরো ঢের ঢের দূরে।

অবাক হয়ে ভাবলাম হুলিয়াটা কি সাংঘাতিক রে বাবা! শুঁকে শুঁকে এখানেও! আস্তে আস্তে চাঁদ ডুবে গেল। আবছা অন্ধকারে ঘর ভরে থাকল। তারো অনেক পরে কাগরা ডাকল।

ছয়

সকাল হয়েছে বলে জীবনে এই বোধ হয় প্রথম খুশি হলাম। নইলে অন্য দিন তো প্রায় রোজই আমাকে ঠ্যাং ধরে টেনে খাট থেকে নামাতে হয়। শুধু যে মাজন-টাজন নেই বলে দাঁত মাজতে হবে না তা নয়, উঠে দেখি রাত্রের ভয়-ভাবনাগুলো দিনের আলোতে দিব্যি মেঘের মতো কেটে গেছে। তবে থেকে থেকে খালি খালি মনে হতে লাগল, তবে কি শ্যামাদাসকাকা ভেলকি জানে? মালা এল কোত্থেকে? এটা যে সে মালা হতেই পারে না, সে কথা আর কেউ না জানুক আমি তো জানি।

জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি শেষটি সত্যি সত্যি সূর্য উঠেছে। বৃষ্টির জলে ধোয়া গাছের পাতায় পাতায় আলো লেগেছে। গাছের মাঝে মাঝে ঝোলানো বিশাল আটকোনা সব মাকড়সার জাল রোদ লেগে ঝিক্‌মিক্‌ করছে।

নীচে থেকে শুনলাম গোরুটা যেন খুশি হয়ে ডাকছে, কিছু পেয়েছে-টেয়েছে হয়তো। ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখি রাত জাগার পর ওরা তিনজনেই অঘোরে ঘুমুচ্ছে।

কি নিয়ে যে ওদের এত ভাবনা ভেবেই পেলাম না। অন্য সময় তো বিরিঞ্চিদার মুখ দেখলেই ঠান্‌দিদির পিত্তি জ্বলে যায়, যা খুশি তাই বলেন। আর শ্যামাদাসকাকাকে পেলে বিরিঞ্চিদাকে ছেড়ে ওকে আগে ধরেন। আর এখন সারাদিন এক গাড়িতে, সারারাত এক ঘরে, অথচ একটা রাগের কথা নেই। এ ভাবা যায় না।

দেখতে দেখতে রোদে ঘর ভরে গেল, ওদের মুখে রোদ পড়ল। বাইরের পাখিরাও মহা গোলমাল শুরু করে দিল। একে একে ওরা সব উঠে বসল। চোখের নীচে কালি, বড়রা যেমন সকালবেলা চা না পেলে বিরক্ত হয়ে যায়, তেমনি মুখ করে সব কিছুক্ষণ বসে রইল। তার পর উঠে মুখ-টুক ধুয়ে তবে কথা বলতে লাগল।

যতই কথা বলে, মনের ফুর্তিও দেখি ততই বেড়ে যায়। ঠান্‌দিদি বিরিঞ্চিদাকে বললেন, "যাক, তা হলে বোধ হয় তোর আর কোনো ভাবনা—"

বিরিঞ্চিদা আমার দিকে চেয়ে বলল, "স্‌-স্‌-স্‌।"

আবার একটু বাদেই বিরিঞ্চিদা খুশি হয়ে শ্যামাদাসকাকাকে বলল, "কে জানে, বোধ হয় মরে নি, এমনও তো হতে পারে।"

শ্যামাদাসকাকা ভীষণ চমকে উঠে বলল, "চোপ্‌, ইডিয়ট্‌।"

মনে হল রাতের বিপদ কেটে যাওয়াতে ওরা সব অসাবধান হয়ে পড়েছে। হাসি পেল। এমনি সময় জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মনে হল মেলা লোকজন আসছে।

জানলার কাছে গিয়ে বাইরে চেয়ে দেখে বললাম, "যাক, আর আমাদের কোনো ভয় নেই। পাঁচ সাতজন পুলিশ-টুলিশ এসে পড়েছে।

যেই-না বলা অমনি ঠান্‌দিদি আর শ্যামাদাসকাকা হুড়্‌মুড়্‌ করে গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল।

আমি আরো ভালো করে তাকিয়ে দেখে, ওদের সাহস দেবার জন্য ডেকে বললাম, "কোথায় যাচ্ছ? বলছি না কোনো ভয় নেই। ঐ তো ওদের সঙ্গে সেজদাদামশাই, বিরিঞ্চিদার পিসেমশাই সবাই রয়েছেন।"

ওমা, অমনি বিরিঞ্চিদাও পড়িমরি করে ছুটে স্নানের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকিনি তুলে দিল।

আমি তো প্রায় মুচ্ছো যাই আর কি! মনে হল তবে নিশ্চয় আমারও গা ঢাকা দেওয়া উচিত। স্নানের ঘরের দরজায় কত ধাক্কাধাক্কি পেড়াপীড়ি করলাম, কোনো ফল হল না।

শেষ অবধি আর কিছু ভেবে না পেয়ে, জুতো পায়ে দিয়ে খাটের তলায় গিয়ে ঢুকলাম। আমার নতুন জুতো রে বাবা, কি দরকার ফেলে রেখে।

ততক্ষণে ওরাও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে। আধ মিনিট বাদে দরজায় টোকা।

আমি একেবারে চুপ।

হেঁড়ে গলায় কে ডেকে বললে, "ভবিষ্যতে যদি ভালো চান তো বন্দুক-টন্দুক যা সঙ্গে আছে দরজার বাইরে ফেলে দিন। আর নিজেরা মাথার উপরে হাত তুলে, দরজার দিকে মুখ করে সারি সারি দাঁড়িয়ে যান।"

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে চুপচাপ পড়ে থাকলাম। তার পর আরো মোটা গলায় কে বললে, "দেখুন, যা হবার তা হয়ে গেছে, আর কেন অপরাধ বাড়াচ্ছেন? নিজেদের ভালোর জন্য বেরিয়ে আসুন।"

আমি যেমন শুয়েছিলাম তেমনি রইলাম।

এবার বিরিঞ্চিদার পিসেমশাই নিজেই রেগে-মেগে চেঁচিয়ে বললেন, কি বললেন সবটা বোঝা গেল না, বেশ ইয়ে-টিয়েই বললেন, তার মোটামুটি মানে দাঁড়ায়—দ্যাখ বিরিঞ্চি, কি ভেবেছিস তুই? যা ইচ্ছে তাই করবি আর পার পেয়ে যাবি? ভালো চাস তো দরজা খোল।

কে জানি আবার একটু দূর থেকে বলল, "দরজাটা ভেঙে ফেলুন না, মশাই!"

পিসেমশাই বললেন, "হ্যাঁ, তাই করি আর গোলা খেয়ে আমার মুণ্ডুটাই উড়ে যাক আর কি!"

পেছন থেকে সেজদাদামশাই বললেন, "কেন বাবা, তোমরাই সরকারের মাইনে খাও, তোমরাই দরজা ভাঙ-না কেন! তা ছাড়া তোমরা মরে-টরে গেলে তো পেনসিল পাবে, তোমাদের আবার অত ভয় কিসের?"

এমন কথা শুনে পুলিশরা প্রথমটা চুপ। তার পর পাঁচসাত জনা মিলে গলা খাঁকরে, বুট ঘষে, লাঠি ঠুকে, খুব আওয়াজ-টাওয়াজ করে, ভয় দেখাবার চেষ্টা করতে লাগল। এমনি সময় একতলা থেকে বুড়ি এসে হাজির। আধ সিঁড়ি উঠেই, হাঁপাতে হাঁপাতে চেঁচিয়ে বলল, "ওমা, কি সব বীরপুরুষ গো! দরজার তো ভেতরকার ছিটকিনিই লাগে না।"

আর কি, হুড়্মুড়িয়ে সব ভেতরে এল। এসে দেখে ভোঁ ভাঁ, কেউ কোথাও নেই! একি সত্যি ভেল্কি নাকি? অতগুলো লোক গেল কোথায়?

ঠ্যাং দেখে বুঝলাম, দাঁড়িওয়ালা লোকটা, কানে মাকড়ি ছেলে, বুড়ি সব আছে। স্নানের ঘরের দরজার দিকে চোখ পড়তে সবাই মিলে মহা গোলমাল শুরু করে দিয়েছে। এবার দরজা যে সত্যি বন্ধ সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

আমারও হাত-পা পেটে সেঁদিয়েছে। দরজা খুললেই কি কাণ্ডটা না জানি হবে।

এ ঘরটা খালি দেখে ভারি সাহস বেড়ে গেছে ওদের, দু-চারটে ষণ্ডা লোক দু-চারবার ধাক্কা দিতেই মরচে ধরা কব্জা ভেঙে দরজা গেল খুলে।

আমার বুক ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগল। এবার ঠান্‌দিদি টেরটা পাবেন। ভেবে খুব খারাপ লাগল না। কিন্তু এমন অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ কেন?

নিজের বিপদের কথা ভুলে গিয়ে, খাটের তলা থেকে মুণ্ডু বের করে দেখতে চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা কি।

গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। স্নানের ঘরে কেউ নেই! এইমাত্র তিন তিনটে ধেড়ে লোককে ঢুকতে দেখলাম আর এখন দেখি কেউ কোথাও নেই! ওদিকে ঘরে আরেকটা দরজা নেই যে পালাবে। একটা ছোট্ট জানলা আছে বটে, তাও মাটি থেকে দশ ফুট উঁচুতে, আবার মোটা-মোটা গরাদ লাগানো। তা ছাড়া সে-সব খুলে ফেললেও বেড়াল-টেড়াল ছাড়া অন্য কিছু গলবে না সেখান দিয়ে।

এমনি আশ্চর্য হয়ে গেছলাম যে মুণ্ডুটা টেনে খাটের তলায় নিয়ে যেতে ভুলেই গেছলাম!

আর যায় কোথায়! একটা এই মোটা পুলিশ, কথা নেই বার্তা নেই, অমনি আমার দু কান হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে বাইরে নিয়ে এল। আমি প্রাণপণে খাটের পায়া আঁকড়ে ধরলাম, কিন্তু তাতে কোনো সুবিধে হল না।

তখন সবাই মিলে আমাকে নিয়ে সে যে কি লাগিয়ে দিল সে আর বলার নয়। আমি তো ভেবেছিলাম টানাটানির চোটে এই ছিঁড়েই গেলাম আর কি! এত করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করলাম, তা কে কার কথা শোনে! বিরিঞ্চিদার পিসেমশায় আর সেজদাদামশায় যে কি খারাপ কথা বলতে পারেন!

বার বার বললাম, "আমি কি জানি! স্পষ্ট দেখলাম তিনজনে হুড়্‌মুড়্‌ করে গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা এঁটে দিল, এখন নেই বললে তো আর হবে না। নিশ্চয়ই আছে ঐখানেই কোথাও, ভালো করে খুঁজলেই বেরিয়ে পড়বে। আর না-ই যদি থাকে, সেও কি আমার দোষ? যাবে আবার কোথায়, খুঁজে দেখ না, নিশ্চয় পাবে।"

সেজদাদামশায়ের সে কি রাগ! বাবার বিষয় পর্যন্ত কি সব বলতে লাগলেন। শেষ অবধি একটা পুলিশের কাছে আমাকে জিম্মা করে দিয়ে সবাই মিলে বিষম খোঁজাখুজি শুরু করে দিল।

প্রথমটা তো সেখান থেকে ওরা নড়তেই চায় না, বারে বারে আমাকে জিগ্‌গেস করে লোক তিনটেকে কি করেছি।

শেষে বললাম, "খায়ো—"

রাগের সময় আমার কিরকম হিন্দী বেরিয়ে যায়—বললাম, "যদি গিলেই ফেলে থাকি, তবু স্নানের ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে কেমন করে বন্ধ করলাম বলতে পার?"

তাই শুনে ওরা খানিকটা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে নিয়ে শেষটা খানা-তল্লাসি আরম্ভ করে দিল। সেজদাদামশাই আর পিসেমশাইও ওদের সঙ্গে চললেন; সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে আমার সঙ্গে কথা বললেন না। আমার তো তাতে কলাও হল না।

সাত

চুপ করে তক্তাপোষের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে থাকলাম। একটু বাদেই একটা খোট্টা পুলিশ মহা চেঁচামেচি লাগাল।

"আরে একঠো কো তো মিল গিয়া। কিন্তু বাকি সব কাঁহা গিয়া কুছ পাত্তা ভি তো পাই না রে বাবা।"

কাকে পেল দেখবার জন্য দরজার কাছে গেলাম, পুলিশটাও সঙ্গে গেল। দেখি কিনা কোত্থেকে রোগা চিম্‌ড়ে একটা লোককে, সার্টের কলার ধরে ঝোলাতে ঝোলাতে ওপরে নিয়ে এল। এ আবার কে রে বাবা।

লোকটাকে তক্তাপোষের ওপর ফেলে, হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "পিছু কা সিঁড়ি থেকে ভাগনে লাগা। ঔর হাম ভি বাঘকা মাফিক উস্‌কো ঘাড়মে লাফায়া।"

লোকটার দেখলাম চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, এক পাটি চটি কোথায় খুলে পড়ে গেছে তার ঠিকানা নেই, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি গোঁফ মুখ ভর্তি, উস্কোখুস্কো চুল।

ব্যস্ত হয়ে বললাম "আরে, এ আবার কিস্‌কো আনলি রে? ই তো ভুল আদমি হ্যায়।"

তাই শুনে পুলিশ দুটোই রেগে বললে, "হ্যাঁ, ভুল আদমি হ্যায় না তোমরা মুণ্ডু হ্যায়। নিশ্চয়ই তোমরা দল কা আদমি হ্যায়, তুম গোপন করতা।"

বললাম, "নিজেই যখন ধরা পড়েছি, ওদের গোপন করে আর কি লাভ হবে?"

কিছুতেই বুঝতে চায় না, শেষে বলে কিনা, "দাড়ি গোঁফ লাগাকে ছদ্মবেশ পাকড়া কিনা, ঐ আস্তে তুমি চিনতে নেই পারতা।"

ভালো রে মজা।

এতক্ষণ লোকটার মুখে একটি কথা নেই। নিমেষের মধ্যে পুলিশ দুটো ওর ঠ্যাং-ট্যাং দড়ি দিয়ে তক্তাপোষের পায়ার সঙ্গে বেঁধে, বেচারাকে তক্তাপোষের একেবারে ধারে বসিয়ে, হাত দুটোকেও আবার পাছমোড়া করে কষে বেঁধে দিল। দেখলাম লোকটা বার বার কি যেন বলবার

কোথেকে রোগা চিম্‌ড়ে একটা লোককে, সার্টের কলার ধরে
ঝোলাতে ঝোলাতে ওপরে নিয়ে এল।

চেষ্টা করছে, তাতেই আবার ওর মুখের মধ্যে ওদের একজনের পাগড়ি থেকে এক টুকরো ছিঁড়ে নিয়ে, ঠুসে দিল।

তার পর নিজেদের হাত-পা ঝেড়ে, কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, "আই বাপস্! কি দারুণ গুণ্ডা হ্যায়! কোই দাগী বদমাস হোগা জরুর। উঃফ্ আলজিবভি শুকিয়ে খট্‌খটে হো গিয়া!" বলে, বিড়ি খাবার জন্য বাইরে চলে গেল।

আমি তখন উঠে লোকটাকে ভালো করে দেখবার জন্য কাছে গেলাম। লিক্‌পিকে হাত-পা, পঞ্চাশ-টঞ্চাশ বয়স হবে মনে হল, নিদেন চল্লিশ-টল্লিশ তো নিশ্চয়, কানে খুব লম্বা-লম্বা চুল। বড্ড মায়া লাগল।

আমাকে কাছে আসতে দেখে হাত-পা নিয়ে কিল্‌বিল্ করে সে বলল, "এ-গ্‌-গ্‌-প্‌-গ্‌-প্‌!"

ভারি অসোয়াস্তি বোধ করতে লাগলাম। ততক্ষণে লোকটার মুখ-টুখ লাল হয়ে উঠেছে, সে আবার অনুনয়-বিনয় করে বলল, "প্‌-গ্‌-গ্‌-গ্‌-প্‌-ব্‌-গ্‌-গ্‌!"

আমি তো অপ্রস্তুতের একশেষ! দরজার কাছে গেছি পুলিশ দুটোকে ডাকতে, যদি তারা কিছু করতে পারে। লোকটা কিন্তু তাই দেখে, মাটিতে পায়ের গোড়ালি ঘষে রেগে রেগে বলল, "শ্‌-শ্‌-শ্‌-শ্‌-শ্‌!"

যাক গে, ঠিক সেই সময় পুলিশরা ফিরে আসতে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

ওদিকে যারা খানাতল্লাশি করছিল, তাদের একটু-আধটু শব্দও আমার কানে আসছিল। বোধ হয় কেউ কেউ খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরেও গিয়ে থাকবে। কিন্তু তারা তক্ষুনি রান্নাঘর থেকে বেরিয়েও এল শুনলাম, বুড়ির গলাও শুনলাম, মনে হল খুব খুশি হয় নি।

দুড়দাড় করে তিন-চারজন সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাদেরই ঘরে আশ্রয় খুঁজল, পেছন পেছন বুড়িও একটা গরম খুন্তি নিয়ে বকবক করতে করতে ছুটে এল।

ঘরে ঢুকে হাত-পা বাঁধা আধাবয়সী লোকটাকে দেখে বুড়ি তো একেবারে থ! হাত থেকে খুন্তিটা ঝন্‌ঝন্ করে মাটিতে পড়ে গেল। আর অমনি পুলিশদের মধ্যে একজন সেটাকে কুড়িয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে গলিয়ে একতলায় ফেলে দিল। এইরকম উপস্থিত বুদ্ধি দিয়েই ওরা চোর ধরে।

বুড়ির হাত-পা কাঁপছে, মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। লোকটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তো চেয়েই আছে!—লোকটাও ঢোক গিলতে গিয়ে, খানিকটা পাগড়ি গিলে কেশে-টেশে একাকার!

পুলিশরা এগিয়ে এসে বুড়িকে সাবধান করে দিল, "আরে, মাইজি, বেশি কাছে মৎ যাইয়ে, বড়া বদমাস হ্যায়।"

বুড়ি চোখ লাল করে, চাপা গলায় বললে, "সে কি তোমাদের কাছে শিখতে হবে নাকি। এতকাল ঘর করছি আমি জানি না!"

বলে কাছে গিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, বললে, "বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে, উচিত সাজা হয়েছে। খুব খুশি হয়েছি।"

লোকটা নরম সুরে ইনিয়ে-বিনিয়ে বললে, "ল্-ল্-ল্-ম্-ম্!"

বুড়ি দাঁতে দাঁতে ঘষে, কোনো কথা না বলে আবার নীচে চলে গেল।

পুলিশরা হাঁ করে পরস্পরের দিকে চাওয়া-চাওয়ি করে, বলাবলি করতে লাগল, "আরে বাপ্পা! ই তো ভীষণ মাইজি হো!"

তার পর বোকার মতো এ ওর দিকে তাকাতে লাগল, লোকটাকে নিয়ে কি যে করা উচিত ভেবে পেল না।

এই-সব ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকাতে এতক্ষণ নিজের বিপদের কথা ভুলেই গেছলাম। এইবার ভাবনা-চিন্তায় মনটা আবার ভারী হয়ে উঠল। খিদেও পেয়েছিল দারুণ। বুড়ির হাতের গরম খুন্তিটা দেখে অবধি জিবে জল আসছিল! তবে খাবার-দাবার সম্বন্ধে আমি কাউকে বিশ্বাস করি না, নিজের কাছে সর্বদা একটা স্টক রাখি। কালকের সব জামাটামা এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে, তার পকেট থেকে একটু চুইং-গাম বের করতে যাব, ওমা, পুলিশগুলো অমনি হাঁই হাঁই করে ছুটে এসে বলে কি না, "খবরদার! ছুরি-ছোরা বার করেগা তো ডাণ্ডা দেকে মুণ্ডু উড়ায়ে দেগা!"

সাহস দেখে হাসি পেল। বুঝিয়ে বললাম, "আরে বাবা, ছুরি-ছোরা সঙ্গে থাকলে কি আর এতক্ষণ এখানে বসে থাকি! ওটা আমার খাবার।"

কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না। শেষপর্যন্ত সবাইকে একটু একটু দিয়ে তবে রেহাই পেলাম। পকেট তো প্রায় গড়ের মাঠ! ওরা দেখলাম কচ্ কচ্ করে চিবিয়ে, রবার-টবার সব গিলে ফেলে, বিরস বদন করে বসে থাকল!

এদিকে সময় আর কাটতে চায় না। বাইরে চনচনে রোদ, মনে হচ্ছে বেলা এগারোটাও হতে পারে, বারোটাও হতে পারে। স্কুলের দিনে এর কত আগে আমি খাই।

অথচ এখন অবধি অন্য লোকগুলোর কোনো সাড়াশব্দই নেই। বাড়ি ছেড়ে তারা যে জঙ্গলের মধ্যে তোলপাড় করছে, সে বিষয় কোনো সন্দেহ নেই।

ভেবে অবাক হচ্ছি বিরিঞ্চিদারা তা হলে গেল কোথায়। শেষটা হুলিয়াতে খেয়ে নেয় নি তো।

এমনি সময় পুলিশের একজন আমার কাছে এসে, পিঠে হাত-টাত বুলিয়ে হাসি-হাসি মুখ করে বলতে লাগল, "আরে ভাই, বোলো না ওলোককো কাঁহা গুম্ কিয়া। তোমকো লজেঞ্চুষ দেগা, লাঠি দেগা, লাট্টু দেগা—"

এত এত ঘুষ দেখাতে লাগল, এমনি খারাপ!

হঠাৎ ঝড়ের মতো দাড়িওয়ালা বুড়োটা এসে ঘরে ঢুকল। হাত-পা বাঁধা লোকটাকে দেখে রেগে-মেগে পুলিশদের বলল, "স্টুপিড্ কাঁহিকা; চোর ধরতে সব দেখছি সমান ওস্তাদ। আবার আমাদের কর্তাবাবুকে ধরে এনে বেঁধে রাখা হয়েছে। এরজন্যে এক-একটাকে যদি কুড়ি বছর করে জেলে যেতে না হয় তো কি বলেছি। আর কর্তামশাইকেই জেলে দিবি তো আমার বাকি মাইনেটা কি তোরা দিবি না কে দেবে শুনি!"

পুলিশদের আর মুখে কথাটি নেই। বুড়োও কারো অপেক্ষা না রেখে, দড়ি-দড়া খুলতে লেগে গেল। দড়ি খোলা হয়ে গেলে বললাম, "ওর মুখ থেকে পাগড়ি বের করে দাও, নইলে কথা বলবে কি করে?"

কিন্তু লোকটাকে হাঁ করিয়ে দেখা গেল, মুখে পাগড়ি-টাগড়ি কিছু নেই, কখন সেটা চিবিয়ে গিলে-টিলে বসে আছে!

পাগড়ি গেলার কথা শুনে পুলিশরা বেজায় রেগে গেল। একজন তো বার বার বলতে লাগল গিলে ফেলেছে আবার কি! ওতে নাকি তার ধোবির হিস্‌সে লেখা ছিল, এখন কি হবে।

ততক্ষণে রোগা লোকটার মুখে কথা ফিরে এসেছে, সেও রেগে বলল, "গিলেছি মানে আবার কি? গলা দিয়ে নেমে গেলে আমি আর কি

করতে পারি বল ? অবশ্যি খেতে যে খুব খারাপ লেগেছে তা বলছি না। বেশ টক-টক নোনতা-নোনতা।"

এই বলে সে ঠোঁট চেটে, পাগড়ির যে দুটো-একটা সুতো লেগে ছিল সেগুলোকেও খেয়ে ফেলল।

তাই দেখে আমারও এমনি খিদে পেতে লাগল সে আর কি বলব।

দূরে সেজদাদামশায়ের, বিরিঞ্চিদার পিসেমশাইয়ের গলার আওয়াজ শুনে বোঝা গেল ঠানদিদিদের কাউকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায় নি। সত্যি, গেল কোথায় সব, কে জানে হয়তো কিছুতে—

শুনলাম পুলিশ ইন্সপেক্টর বলছেন, "দেখতে ছোট হলে কি হবে, একেবারে কেউটে সাপের বাচ্চা। ও-ই যে এ-সমস্তর গোড়ায় তার কোনোই সন্দেহ নেই, নইলে ওদের এত বুদ্ধি আসে কোত্থেকে।"

পিসেমশাইও তক্ষুনি সায় দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমাদের বিরিঞ্চি তো আগে এমন ছিল না। ঐ অতটুকু ছেলে দেখে, তাকে বিশ্বাস করে, দেখুন তো মশাই, শেষটা এই অঘোর জঙ্গলে প্রাণটা খোয়ালে।"

তাই শুনে সেজদাদামশাই বিরক্ত হয়ে বললেন, "রেখে দিন, মশাই। আপনাদের বিরিঞ্চিটি কিছু কম যায় না। বৌঠানের মাথায় হাত বুলিয়ে—"

পুলিশ ইন্সপেক্টর বললেন, "দেখুন, আপনাদের এই-সব পারিবারিক ব্যাপারগুলো অতি ছোট জিনিস। ঐ বিরিঞ্চি কি শ্যামাদাস মল' কি না মল', তাই দিয়ে দেশের কিই-বা এসে যায় বলুন। আসল কথা হল জমিদারমশায়ের মুক্তোর মালাটা গেল কোথায় ? বড়-সায়েব আর আমায় আস্ত রাখবে না। আর মালা খুঁজে দিতে না পারলে আমার প্রমোশনেরই-বা কি হবে, তাই বলুন ?"

আট

তার পর ঘরের মধ্যে ঢুকে তো সব যে যার ধুপ্‌ধাপ্‌ তক্তাপোষের ওপর শুয়ে পড়ে, আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একসঙ্গে বলতে লাগলেন, "ইস্‌। গাল টিপলে এখনো দুধ বেরোয়, অথচ এত বড় আরেকটা খুনে বদমায়েস দুনিয়াতে আছে কি না সন্দেহ। তিন-তিনটে লোককে রাতারাতি একেবারে হাওয়া করে দিল মশায়।"

বিরিঞ্চিদার পিসেমশাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "সব থেকে খারাপ হচ্ছে যে বিরিঞ্চি হতভাগা আমার সিল্কের জামাটা গায়ে দিয়েই—"

সেজদাদামশাই বললেন, "স্-স্-স্—ওঁদের বিষয় অমন করে বলতে নেই। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন ইন্সপেক্টর সায়েবের কর্তব্য হল এই ছোকরাকে জেরা করে সব কথা বের করে নেওয়া।"

এতক্ষণ রোগা ভদ্রলোক, পুলিশরা আর আমি হাঁ করে তাঁদের কথাবার্তা শুনছিলাম, কিন্তু কিছুতে যোগ দিচ্ছিলাম না। এবার সবাই মিলে একসঙ্গে কথা বলতে লাগলাম।

ইন্সপেক্টর আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বলল, "বল্-না বাবা কি করেছিস? মালার কথা নিশ্চয় তোর অজানা নেই, বল্-না, নিদেন মালাটাই বের করে দে না। কথা দিচ্ছি তোকে ছেড়ে দেব, কেউ তোকে কিছু করবে না, দে দিকি বাপ্ মালাটা বের করে।"

মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম। আমি বেচারা ছেলেমানুষ, কিছুই জানি নে, অথচ কে কাকে বোঝায়! ভাবলাম দেখাই যাক একবার স্নানের ঘরে গিয়ে।

আমাকে উঠতে দেখে ওরাও উঠে পড়ল। স্নানের ঘরে ঢুকে ঈগল পাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ঘরের প্রত্যেকটা ইঞ্চি পরীক্ষা করলাম। দেখলাম ঐ একটিমাত্র দরজা, উঁচুতে ঐ একটিমাত্র শিক দেওয়া জানলা। তাই তো, ঠানদিদিদের হল কি?

অন্যরা সবাই এগিয়ে এসে, দরজার কাছটিতে ভিড় করে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। নীচের তলা থেকে রাঁধাবাড়া ফেলে বুড়িও ততক্ষণে এসে ওদের সঙ্গে জুটেছে দেখলাম।

ওরা তাকে খুব জোরে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "চুপ! এ এবার মালা বের করে দেবে, সেই তাদের যা বাকি আছে বের করে দেবে।"

তাই শুনে বুড়িও চোখ গোল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল।

হঠাৎ দেখলাম ঘরের কোণে, বালতির পিছনে একটা জিনিস চিক্-চিক্ করছে। অবাক হয়ে দেখলাম ছোট্ট একটা সোনার আংটি! আমাকে সেদিকে চাইতে দেখে ওরাও সবাই ঘরের কোণে, বালতির পেছনে, সোনার আংটি দেখতে পেল।

সেজদাদামশাইও চিৎকার করে উঠলেন, "চিনেছি, চিনেছি! তবু বলছিস কিছু জানি নে! লক্ষ্মীছাড়া মিথ্যেবাদী। এমনি করেই পাপের গন্ধমাদন চাপা পড়ে মানুষেরা মরে চ্যাপ্টা হয়ে যায়!"

ইন্সপেক্টরবাবু হঠাৎ আমার দিকে ফিরতেই আমি এক ছুটে স্নানের ঘরের ঠিক মাঝখানে চলে গেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল আমার পায়ের তলা থেকে মাটিটা সরে গেল, আমি অতল গভীর অন্ধকারে পড়ে গেলাম।

ওপর থেকে হো-হো করে চিৎকার আমার কানে এল।

কি আর বলব আমার মনের অবস্থা। পড়তে আর কতটুকুই-বা সময় লাগল, তবু মনে হল পড়ছি তো পড়ছিই।

ছেলেবেলা থেকে আজ অবধি যত অন্যায় করেছি, একটার পর একটা করে সব মনে পড়তে লাগল। যেগুলোর কথা একদম ভুলে গেছলাম, এমন-কি, যে-সব ঘটনা কোনোকালে ঘটেই নি, সেরকমও রাশি রাশি মনে পড়ে গেল!

হঠাৎ ধপাস্ করে মাটি ছুঁলাম।

বুঝলাম কতকগুলো খড়কুটোর ওপর পড়েছি তাই যতটা লাগতে পারত, পেছনে ততটা লাগে নি।

তবু খানিকক্ষণ চোখ বুজে চুপচাপ বসে থাকলাম। তার পর যখন টের পেলাম যে সত্যি বেঁচে আছি, তখন আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখলাম যে যতটা অন্ধকার ভেবেছিলাম, আসলে ততটা নয়।

দেখলাম যেন একটা শুকনো কুয়োর মতনের নীচে পড়ে আছি। পকেট চাপড়ে দেখলাম চিরুনি-টিরুনি ঠিকই আছে। বাঁচা গেল।

ওপর দিকে চেয়ে দেখলাম অন্ধকার সুড়ঙ্গ, চারি দিকে ঘিরে আছে মাকড়সার জালে ঢাকা পাথরের দেয়াল, নাকে এল সোঁদা সোঁদা একটা গন্ধ আর দেখলাম দেওয়ালের এক দিক দিয়ে একটু আলোর রেখা আসছে।

সেই আলোতেই দেখতে পেলাম খড়ের ওপর জ্বল্‌জ্বল্ করছে বিরিঞ্চিদার মুক্তোর মালা। মালাগাছি তুলে নিলাম, মাঝখানের রঙিন পাথরটি মিট্‌মিট্ করে জ্বলতে লাগল।

বসে বসে ভাবলাম কি মালা, কার মালা কে জানে। এই কি তবে জমিদার-গিন্নির হারানো মালা? তবে আগেকার সেই আরেকটা মালা

সেটি কোত্থেকে এল ? এ তো সে মালা হতেই পারে না। কারণ সেটাকে আমি ছাড়া আর কেউ তো বের করতে পারবেই না, আমিও পারব কি না সন্দেহ।

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। মালাটা পকেটে পুরে ফেললাম। বিরিঞ্চিদাদের নিশ্চয় সাংঘাতিক কোনো বিপদ হয়েছে, নইলে কি আর মালা ফেলে অমনি অমনি চলে যায়।

ভাবলাম এই সুড়ঙ্গ দিয়ে ধুপ্‌ধাপ্ করে, একজনের উপর একজন ওরাও নিশ্চয় পড়েছিল। ওরা যখন বেরুবার পথ পেয়েছে আমিও পাব।

ভালো করে চেয়ে দেখলাম কোথা দিয়ে আলোর রেখা আসছে। মনে হল সেদিকে যেন সরু পথ রয়েছে।

কত কালের পুরানো বাড়ি, কে জানে কেন এই গোপন সুড়ঙ্গ বানিয়েছিল, হয়তো কোনো চোরা-কারবার চালাত কেউ, তাই এই-সব গলিঘুঁচি তৈরি করে রেখেছিল। হয়তো শত্তুরদের ধরে এনে এখানে শেকল দিয়ে বেঁধে রেখে দিত। গা শিরশির্ করতে লাগল।

অদ্ভুত সেই গলিটা। কে জানে কারা এখান দিয়ে ভারী ভারী বাক্স প্যাঁটরাতে লাখ লাখ টাকার মোহর বোঝাই করে আনাগোনা করত। ইস্, একটা বাক্সও যদি পেতাম, তবে আর আমাকে এত কষ্ট করে লেখাপড়া শিখতে হত না।

দেখলাম দু পাশে তাক আছে, জিনিস ঝোলাবার আংটা কড়া আছে। মনে হল হঠাৎ যদি দেখি একটা কঙ্কাল ঝুলে আছে। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

অবিশ্যি এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে, ওপরকার ঐ ঘরের চাইতে আমার পক্ষে এই অন্ধকার ঘুপ্‌চিই অনেক বেশি নিরাপদ, তবু যদি হঠাৎ মাথার ওপর থেকে দড়ি ছিঁড়ে ঘাড়ের ওপর কিছু পড়ে।

তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। মনে হল ওপরে যেন ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কিসের যেন হাওয়া মুখে লাগল, অদ্ভুত একটা গন্ধ নাকে এল। মনে মনে বললাম, ও কিছু না, বাদুড়। আরো তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম।

এখানে পথটা খানিক ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। পায়ের তলার মাটি এত নরম যে কিছুমাত্র শব্দ হয় না।

ওপর থেকে টপ্ টপ্ করে ফোঁটা ফোঁটা কি যেন আমার মাথায় পড়ল। সে সাদা কি লাল তা আর দেখবার উপায় ছিল না ঐ অন্ধকারে।

খানিক আগেই এই পথ দিয়ে বিরিঞ্চিদা, শ্যামদাসকাকা আর ঠান্‌দিদি নিশ্চয় ভয়ে আধ মরা হয়ে, একজনের পেছনে একজন হেঁটে গেছেন। কোথাও যখন কেউ পড়ে-টড়ে নেই, তখন নিশ্চয় কোনো ভয়ের কারণও নেই।

বলতে না বলতে নরম কিসে হোঁচট খেয়ে উবু হয়ে পড়ে গেলাম। অন্ধকারটা যেন আরো কালো হয়ে ঘনিয়ে এল। তখনো মনে হচ্ছিল দূরে একটা হো-হো শব্দ।

নড়ছি চড়ছি না, কাঠ হয়ে নরম জিনিসটার ওপর পড়ে আছি। কান খাড়া করে রেখেছি সেটার নিশ্বাস ফেলার শব্দের জন্য। কিন্তু যদি নিশ্বাস না-ই ফেলে?

উঠে বসলাম। কানে একটা থুপ্-থুপ্ পায়ের শব্দ। ঘন ঘন নিশ্বাস। তবে কি শেষপর্যন্ত ওদের নাগাল পেয়ে গেলাম নাকি?

কিন্তু শব্দটাকে যেন একটু অস্বাভাবিক ঠেকল। যেন ভারী কিছু সাবধানে এগুচ্ছে। বুকের ভেতরটা আবার ছ্যাঁৎ করে উঠল।

উঠে বসে অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চেষ্টা করলাম। খানিকক্ষণ কিছু বুঝতে পারলাম না। তার পর দূরে দেখলাম দুটো লাল চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করছে, আর নাকে এল কেমন একটা চেনা-চেনা অদ্ভুত গন্ধ।

আমি আর সেখানে বসে থাকবার ছেলেই নই। উঠেই দিলাম টেনে দৌড়।

নয়

দেখি ঢালু পথটা হঠাৎ ডান দিকে বেঁকে শেষ হয়ে গেছে। সামনে একটা দরজা, ঠেলা দিতেই সেটা গেল খুলে। ভেতরে ঢুকে হাতড়ে হাতড়ে প্রকাণ্ড হুড়কোটাকে লাগিয়ে দিলাম। ব্যস্।

কোথা থেকে যেন অল্প একটু আলোও আসছে, মনে হল হাতের কাছে প্রকাণ্ড এক বাক্সের ওপর দেশলাই আর মোমবাতি।

দেখলাম আলাদীনের সেই গুহায় এসে পড়েছি। ছাদ থেকে ঝুলছে বিশাল বিশাল গালচে। দেওয়ালের সামনে সারি দিয়ে রয়েছে পেতল-কাঁসার বাসন আর ফুলদানির পাহাড়। ঘরের মাঝখানটা কাঠ-খোদাইয়ের টেবিল, হার্মোনিয়ম আর বাক্স-প্যাঁটরা দিয়ে বোঝাই করা।

দুটো-একটা বাক্সের ঢাকনা খুলে আমি তো থ। কোনোটা বা রেশমি শাড়িতে ভর্তি, কোনোটাতে হাতঘড়ি, রুপোর বাসন, ফাউন্টেন-পেনের গাদা। আর একটাতে—বিশ্বাস করবে না হয়তো—সোনার গয়নায় ঠাসা।

কি যে করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। শ্যামাদাসকাকা সামান্য একটা মুক্তোর মালা পেয়েই আহ্লাদে আটখানা হচ্ছিল, আর আমার দেখ কত জিনিস। তা ছাড়া একটা মুক্তোর মালা।

মালাটাকে পকেট থেকে বের করে বড় বাক্সটার ওপর রাখলাম।

এখন মুস্কিল হচ্ছে এই এতগুলো জিনিস যে পেলাম, এগুলোকে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায় কি করে?

একটা হার্মোনিয়ম একটু বাজিয়ে দেখলাম, দিব্যি প্যাঁ-প্যাঁ করে উঠল। বন্ধ ঘরে দারুণ জোরে বাজছে মনে হল। ভাবছিলাম সেবার বিরিঞ্চিদার হার্মোনিয়মে একটু সামান্য জল ফেলেছিলাম বলে আমাকে কি না বলেছিল। এখন আমার নিজেরই চারটে আস্ত আর একটা ভাঙা হার্মোনিয়ম।

কিন্তু কতক্ষণ আর এই-সব ভেবে আনন্দ করা যায়? খিদেয় পেট তো এদিকে ঢাক।

দেয়ালে সব চমৎকার ছবি ঝুলোনো। একটাতে দেখলাম একজন বুড়ি মেম মাছ ভাজা খাবে, তাই হাত জোড় করে কাকে ধন্যবাদ দিচ্ছে, আর-একটা বেড়ালও মাছ ভাজা খাবার জন্য আঁকু-পাঁকু করছে।

আরেকটাতে দেখলাম হয়তো ঐ বেড়ালটাই হবে, মুখে করে একটা বিরাট চিংড়ি মাছ নিয়ে যাচ্ছে। মুখের এক দিকে চিংড়ি মাছের মুণ্ডু আর অন্য দিক দিয়ে ল্যাজ বেরিয়ে রয়েছে। আমি সকাল থেকে কিছু খাই নি এ ভাবা যায় না।

আর টিকতে না পেরে, দড়াম করে দরজাটাকে খুলেই দিলাম।

কাষ্ঠ হেসে দাড়িওয়ালা বুড়োটা ভেতরে ঢুকল। কোমরে হাত দিয়ে

এক টিন বিস্কুট, এক টিন সার্ডিন মাছ, এক বোতল কমলালেবুর রস
আর-এক টিন-খোলার যন্ত্র বের করল।

মাথা থেকে পা পর্যন্ত দেখতে লাগল। আমার গা শিরশির করে উঠল। বললাম, "আর দেরি করছ কেন? সাহস থাকে তো আমাকে মেরে ফেল না। আমার গলা কেটে ফেল, গুলি কর, বুকে ছোরা বসাও, ফাঁসি দাও। আমি আর কিছুকে ভয় করি না। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।"

বুড়ো বলল, "সে কথা বললেই হয়।"

বলে সামনের একটা বাক্স থেকে কতকগুলো কাপড়-চোপড় বের করে ফেলে, তলা থেকে এক টিন বিস্কুট, এক টিন সার্ডিন মাছ, এক বোতল কমলালেবুর রস আর এক টিন-খোলার যন্ত্র বের করল।

তার পর মুক্তোর মালাটাকে দেখে ভারি খুশি হয়ে, সেটাকে ঐ বাক্সে পুরে, ঘরের দরজাটা ভেতর থেকে আবার বন্ধ করে দিয়ে, আমার কাছে ফিরে এল।

তার পর বাক্সের ওপর চেপে বসে মহা ভোজ হল।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে, পকেট থেকে বেজায় একটা ময়লা রুমাল বের করে, মুখ মুছে, বুড়ো সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল। আমার ও-সব কিছুরই দরকার করে না। আমি সর্বদা হয় প্যান্টে নয় মাথায় হাত মুছি।

তখন বুড়ো বলল, "দেখতে তুমি এত খুদে অথচ চালাক তো কম নও। আমাদের দলে যোগ দেবে? পরে হয়তো দলপতিও হতে পারো।"

আমি বললাম, "এখন দলপতি কে?"

সে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললে, "ইয়ে, আপাতত আমিই।"

আমি বললাম, "তুমি তো বুড়ো। কদিনই-বা দলপতি থাকবে। তা হলে আরেকটু কমলালেবুর রস খাই?"

বেশ ভালোই লাগছিল।

এমন সময় কে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। আমরা দুজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। মোমবাতিটাও ঠিক সেই সময় ছোট থেকে ছোট হয়ে গিয়ে শেষ অবধি নিবেই গেল।

নিঃশব্দে আমরা টিন, বোতল, টিন-কাটা সব বাক্সের পিছনে লুকিয়ে ফেলে, চুপচাপ বসে রইলাম।

বুড়োর কানে কানে বললাম, যদি দরজা ভেঙে ঢোকে?

বুড়ো বলল, "ইস্, দরজা ভেঙে ঢুকবে। তা হলেই হয়েছিল। এরা নিজেদের পোষা গোরুকে নিজেরা ভয় পায়, তা জানো?"

আবার কানে কানে বললাম, "কিন্তু যদি সঙ্গে পুলিশরা এসে থাকে?

সে বলল, "তাই তো দোর খুলছি না।"

বাইরে থেকে ওরা মহা ধাক্কাধাক্কি করল, কত কি বলে শাসাল, "আগুন লাগিয়ে দেব। বাইরে থেকে তালা দেব। ভূতের ভয় দেখাব।" এই-সব।

সত্যি বলছি আমার একটু একটু ভয়-ভয় করছিল। বুড়ো কিন্তু পা ছড়িয়ে বসে, একটু একটু হাসতে আর দাড়িতে হাত বুলুতে লাগল।

হঠাৎ বুড়ির গলা শোনা গেল।

"ভালো চাও তো বেরিয়ে এসো। নইলে এই আমি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভাঙলাম। গত বছরের আগের বছরের সেই ছাগলদের কথা জানাজানি হয়ে গেলে তখন কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পাবে না বলে রাখলাম।"

তাই শুনে বুড়ো ভারি ব্যস্ত হয়ে, ঘরময় পায়চারি করে বেড়াতে লাগল। আমাকে বলল, "মেয়েদের কখনো বিশ্বাস করতে হয় না। ঠগ, জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ।"

বুড়ি বলে যেতে লাগল, "সেই যে মাঘমাসের শেষের দিকে, তোরে উঠে?"

বুড়ো চিৎকার করে বলল, "এই চোপ্ খবরদার।"

বলে দরজা খুলে একেবারে বাইরে এসে দাঁড়াল। আমিও কি কার, সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এসে, ওর পেছনে যতটা পারি গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম।

বুড়োর বগলের তলা দিয়ে উঁকি মেরে, আশ্চর্য হয়ে দেখলাম পুলিশ-টুলিশ কেউ কোথাও নেই, শুধু বুড়ি এক হাতে একটা খুদে লণ্ঠন, অন্য হাতে একটা খুন্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ির চালাকি দেখে বুড়ো রেগে কাঁই। "পুলিশরা কই?"

বুড়ি বললে, "সে আমি কি জানি? আমি কি তাদের বটিগাট? তাদের কত কাজ। এখন তারা খানাতল্লাসি করতে করতে, তোমার ঘর অবধি পৌঁচেছে। দেখে এলাম তোমার বাক্স খুলে তোমার বিড়ি খাচ্ছে আর তোমার খাটে বুট-পরা ঠ্যাং তুলে, তোমার ডাইরি পড়ছে।

কি সব লিখেছ বানান ভুল।"

বুড়ো তো দারুণ রেগে গেল।

"বেশ করেছি বানান ভুল করেছি। তোমার দাদা হই না আমি? তুমি এখানে কেন?"

"আহা, আমি তোমার ডাইরি পড়া শুনি, আর তুমি এদিকে আমাদের সঙ্কলের চোখে ধুলো দিয়ে, জিনিসপত্রগুলো নিয়ে ভেগে পড় আর কি। উনি আর খোকা আর আমি পথে দাঁড়াই, তোমার তো তাই ইচ্ছে।"

তার পর আমার ঠ্যাং দেখতে পেয়ে বললে, "বাঃ! এরই মধ্যে সাকরেদও পাকড়ে ফেলেছ দেখছি।"

বুড়ো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমনি সময় শোনা গেল মেলা লোকের জুতো-পরা পায়ের মচ্‌মচ্‌ শব্দ।

অমনি এদের দুজনারই মুখ একেবারে পাংশুপানা! নিঃশব্দে ঘরের ভেতর আমাকে সুদ্ধু টেনে নিয়ে, দরজা বন্ধ করে আগল দিয়ে দিল।

কারো মুখে কথাটি নেই, বুক ঢিপ্‌ঢিপ্‌! বাইরে এবার সত্যি সত্যি মেলা লোকের পায়ের শব্দ শোনা গেল।

দশ

এবার যারা এল কে জানে তারা বন্ধু না শত্রু। তবু মনে হল ঘরের এরা দুজন ওদের চাইতে ঢের ভালো। বুড়ি কি ভালো রান্না করে।

বাইরে থেকে ধাক্কাধাক্কি, আর সে কি চ্যাঁচামেচি! কিন্তু ঐ বিশাল দরজা, তার এমনি ভারী পাল্লা, ভাঙে কার সাধ্যি!

এমনি সময় ঘরের ভেতর থেকেই কানে এল ঘড়্‌-ঘড়্‌ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ! পিলে চমকে উঠল। ই-কি-রে-বাবা। বুড়ি গিয়ে অমনি দাড়িওয়ালার পেছনে লুকিয়ে পড়ল।

আমি কি করি? বড় একটা বাক্সের ঢাকনি খুলে তার ভেতরেই লুকোতে গেলাম। কি সর্বনাশ! বাক্সে ঠ্যাং গলিয়ে চিৎকার দিয়ে উঠলাম—

বাক্সে একটা মড়া নাকি! বুড়োবুড়ি তো প্রায় অজ্ঞান!

এমনি সময় মড়াটা আস্তে আস্তে উঠে বসল। আমিও তাড়াতাড়ি

ঠ্যাংটা টেনে নিলাম।

মড়াটা একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রইল। আস্তে আস্তে আমার বুদ্ধিসুদ্ধি ফিরে এল। বুড়ো একটা দেশলাই জ্বালাতেই চিনলাম সে বিরিঞ্চিদা। উঃফ্‌, বাঁচা গেল। আরেকটু হলে ভয়ের চোটে মরে গেছলাম।

বিরিঞ্চিদা বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে প্রথমে বেড়ালের মতো গা মোড়ামুড়ি দিল, তার পর জামাকাপড় ঝেড়েঝুড়ে কাষ্ঠ হাসি হাসল।

তখনো কিন্তু সামনে ঘড়্‌-ঘড়্‌ ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে আমার সাহস বেড়ে গেছিল, চক্‌-চক্‌ করে আর দুটো বাক্সের ঢাকনা খুলে দিলাম।

দেখি একটার মধ্যে ঠান্‌দিদি মুচ্ছো গেছেন, আরেকটিতে শ্যামাদাস-কাকা দিব্যি কুণ্ডলী পাকিয়ে নাক ডাকাচ্ছে। মনে হল সত্যি সত্যি ঘুমুচ্ছে।

বিরিঞ্চিদা খোঁচা মারতেই সে উঠে বসে, চোখ না খুলেই বলল, "মালা পাওয়া গেছে?"

"মালা দিয়ে কি হবে? সে তো তোমাদের নয়।"

শ্যামাদাসকাকা চোখ খুলে বললে, "তোমাদেরও নয়।"

আমি বললাম, "বাইরে কিন্তু বিরিঞ্চিদার পিসেমশাই, সেজদাদা-মশাই, পুলিশ পেয়াদা। তার কি হবে?"

তাই শুনে যে যেখানে পারল একেবারে বসে পড়ল।

বিরিঞ্চিদা ব্যস্ত হয়ে জিগ্‌গেস করল, "পিসেমশাই কি একাই এসেছেন?"

বললাম, "বলছি সঙ্গে সেজদাদামশাই, পুলিশ-টুলিশ মেলা লোক খাপেঝাঁপে।"

বিরিঞ্চিদা একটু আম্‌তা আম্‌তা করে বলল, "সবাই কি পুরুষ মানুষ?"

দুঃখ কষ্ট সহ্য করে বিরিঞ্চিদা কি পাগল হয়ে গেল শেষটা?

বুড়ি বললে, "মালাটা কোথায়? ওর তো একটা ব্যবস্থা করা দরকার।"

দাড়িওয়ালা বিরক্ত হয়ে উঠল, "মালা তো আর তোমাদের নয়।"

এই বলে যে বাক্সে মালা ছিল, তার ওপর চেপে আরাম করে পা

উঠিয়ে বসে পড়ল।

আমি বললাম, "ঠান্‌দিদির মুচ্ছো ভাঙানোর কিছু হবে না?"

শ্যামাদাসকাকা বললে, থাক না, কি দরকার। উঠলেই তো বাজে বকবেন।"

বলবামাত্র ঠান্‌দিদি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বাক্স থেকে বেরিয়ে বললেন, "ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়া, তোমার সব কথা যদি বলে না দিই—"

শ্যামাদাসকাকা বলল, "সাবধান, শেষটা নিজে সুদ্ধু না জড়িয়ে পড়।"

তখন কি রাগ সকলের! দেখতে দেখতে ঘরের মধ্যে দুটো দল হয়ে গেল। এক দিকে বিরিঞ্চিদা, শ্যামাদাসকাকা, ঠান্‌দিদি; অন্য-দিকে বুড়ি আর দাড়িওয়ালা; মাঝখানে আমি।

বিরিঞ্চিদা আবার জিগ্‌গেস করল, "সেজদাদামশাইকে কি একলা দেখলি নাকি? সঙ্গে বামুন-টামুন কিম্বা লাল শাড়ি পরা মেয়ে-টেয়ে নেই তো?"

বললাম, "কই না তো। তবে পুলিশরা সব আছে।"

বুড়ি খানিক এধার-ওধার খুঁজে বলল, "বল না মালাটা কোথায়?"

বুড়ো আবার বললে, "বলছি মালা তোমার নয়।"

বুড়ি বসে পড়ে বলতে লাগল, "নয়ই-বা কেন বল? জমিদার-গিন্নিরই-বা হবে কেন? কতবার দেখেছি তাঁর ফরসা মোটা গলায় ছোট-ছোট পায়রার ডিমের মতো শোভা পাচ্ছে। মাঝখানে একটা এই বড় সাদা পাথর ধুক্‌ধুক্ করছে।—আচ্ছা তুমিই বল, রঙটাই যা ফরসা, নইলে আমার চাইতে কোন বিষয়ে উনি ভালোটা তাই বল।"

বুড়ো কাষ্ঠ হাসি হাসল।

"তোমার যা বুদ্ধি। ইয়ে তা ছাড়া মাঝখানের পাথরটা মোটেই সাদা রঙ নয়, সেটা নীল।"

বুড়ি তো অবাক।

"বল কি? আমি জানি না কি রঙের? কতবার দেখেছি পুজোর সময় ঠাকুরবাড়িতে। যতবার দেখেছি ততবার মনে হয়েছে আমিও ঐরকম চওড়া লাল পাড়ের গরদ পরে, কপালে এই বড় সিঁদুরের ফোঁটা এঁকে, পায়রার ডিমের মতো বড়-বড় মুক্তোর ঐ মালা গলায় ঝুলিয়ে, ঠাকুরবাড়ির সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসি, আর সবাই দেখতে থাকুক আর হিংসেয় ফুলে ফুলে উঠুক।"

দাড়িওয়ালা চেঁচিয়ে বলল, "যা খুশি বললেই তো আর হল না। মালার রঙই তো জানো না। বিশ্বাস না হয় এই দেখ।"

বলে বাক্সের ডালাটা খুলে ফেলে দিয়ে মালা বের করে তুলে ধরল।

আধ অন্ধকার ঘরে মুক্তোর ছড়া জ্বল্‌জ্বল্‌ করতে লাগল।

বুড়ো আবার একটা ছোট মোমবাতি জ্বালতেই বুড়ি অবাক হয়ে দেখল মধ্যিখানের পাথরটা সত্যিই নীল।

অনেকক্ষণ তার কথা বলবার শক্তিই ছিল না, তার পর বলে উঠল, "না না, এ সে মালা নয়। এর জন্য আমি সারা রাত জেগে কাটাই নি। তোমরা ভুল মালা এনেছ।"

ঠিক এই সময় ঘরের ছাদে কি যেন মড়্‌মড়্‌ করে উঠল। ছোট মোমবাতি, তার আলো ছাদ অবধি পৌঁছয় না। দারুণ ঘাবড়ে গেলুম সবাই।

ঠিক সেই সময় ঘরের ছাদ থেকে কি সব ভেঙে-টেঙে, ঝুপ্‌ করে একটা জিনিস মাটিতে পড়ল।

অবাক হয়ে দেখলাম সেই খোঁচা-দাড়ি রোগা ভদ্রলোক, যাকে পুলিশরা ভুল করে ধরেছিল।

চিঁ চিঁ করে বললেন, "বাবা। ঝুলে ঝুলে হাতের মাসিলগুলো সব টেনে লম্বা হয়ে গেছে। ভাগ্যিস হাসতে হাসতে পড়েই গেলাম।"

মনে হল ঘরের ভিতরটা বেশ গরম হয়ে উঠেছে, বোধ করি লোকের ভিড়ে।

বুড়ি বিরক্ত হয়ে জিগ্‌গেস করল, "অত হাসির কারণটা কি, শুনতে পারি?"

ভদ্রলোক বললেন, "তুমি গো গিন্নি, তুমি। লাল পাড় গরদ পরে, মুক্তোর মালা গলায় ঝুলিয়ে, তোমার কেমন ধারা রূপ খুলবে ভেবে, হাসতে হাসতে প্রায় মরেই গেছলাম।"

আমি কান খাড়া করে ছিলাম, এবার না জানি কি হবে।

বুড়ি কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। মালার দিকে চেয়ে ঘুম ঘুম সুরে বলতে লাগল, "সমুদ্রের তলায় বালির ওপর ঝিনুক পোকা পড়ে থাকে। খোলার ভেতরে সমুদ্রের বালির কণা ঢুকে যায়। ওর গা কুটকুট্‌ করে, তাই সাদা চক্‌চকে রস বের করে, তাই দিয়ে বালির গা ঢেকে দেয়, বালির গা মোলায়েম হয়ে যায়। ঝিনুক পোকার আরাম

লাগে। তার পর একদিন, মাথার ওপর কাচ লাগানো বালটি-মুখোশ পরে, বাতাসের নল নাকে লাগিয়ে, জলের তলায় নেমে গিয়ে, ডুবুরিরা ঐ মুক্তো তুলে আনে। তাই দিয়ে মালা গাঁথিয়ে, জমিদার-গিন্নি পরেন। কিন্তু এ মালা সে মালা নয়।

কেন যেন বাইরের গোলমাল থেমে গিয়েছিল। সবাই একটু আশ্বস্ত হল, মালাটা বুড়োর হাতে রইল।

বিরিঞ্চিদা ব্যাপারটাকে বুঝিয়ে বললে, "অন্ধকার গর্ত দিয়ে যখনি পড়ে গেলাম, তখনি জানি আমাদের কপালে দুঃখ আছে। তার ওপর ঠান্‌দিদি পড়লেন আমার ঠিক পেটের ওপর। উঃ, নাড়িভুঁড়ি যে এলিয়ে যায় নি সেই যথেষ্ট। দেখতে রোগা হলে কি হবে, কম ওজন ওঁর!—যাক গে, গলি দিয়ে হাঁটছি, তো হাঁটছি, আবার পেছনে শুনি কিসের পায়ের শব্দ। পাঁই পাঁই করে ছুটে, এ ঘরে ঢুকে, যে যেখানে পারলাম সেঁধোলাম। ঐ গলিতে ডালকুত্তা ছাড়া আছে। তার চোখ জ্বলছে দেখলাম। আর তোরা এখানে খাওয়া-দাওয়া করলি।"

বুড়ো বললে, "ধেৎ, কী সব বীরপুরুষ। ও ডালকুত্তো হতে যাবে কেন, ও তো টেঁপির বাচ্চা।"

"টেঁপি আবার কে?"

"কেন আমাদের গোরু।"

তাই শুনে সবাই খানিক চুপ করে রইল।

তখন শ্যামাদাসকাকা বলতে লাগল, "আচ্ছা, এত জিনিস এরা পেল কোত্থেকে?"

কারো মুখে রা নেই। আমরা মোমবাতি নিয়ে ঘরময় ঘুরে ঘুরে সব দেখতে লাগলাম। একসঙ্গে এত ভালো ভালো জিনিস আমি কখনো দেখি নি।

হঠাৎ বাইরে বিকট চিৎকার। "বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেললে রে। ওরে বাবা রে। মরে গেলাম রে।"

এ আবার কি? বুড়ির দয়া হল, ঠান্‌দিদির বার-বার মানা সত্ত্বেও দিল দরজা খুলে। হুড়মুড় করে এসে ঢুকলেন ফরসা, মোটা, কোঁকড়া-চুল, সম্পূর্ণ এক অচেনা ভদ্রলোক। মিহি ধুতি পরা, কোঁচা দোলানো, হাতে হীরের আংটি, সামনের চুল বেজায় লম্বা, এলোমেলো হয়ে

কপালের ওপর পড়েছে, ভয়ে সারা গা বেয়ে ঘাম ঝরছে, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে, হাত-পা কাঁপছে।

ধপ্ করে একটি বাক্সের ওপর বসে পড়তেই, ইনি আবার কোনো নতুন বিপদের কথা বলেন, তাই শোনবার জন্য, আমরা সব ঘিরে দাঁড়ালাম।

ফোঁস্ করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, "ভাগ্যিস প্রাণটা রক্ষা করলেন! আরেকটু হলেই যে গোরুতে খেয়ে ফেলেছিল আমাকে। এতকাল মা কালীকে কি বছর জোড়া পাঁঠা দেওয়া সত্ত্বেও আরেকটু হলেই গোরুর পেটে গেছিলাম।"

বুড়ি তখন দাড়িওয়ালাকে সে কি ধমক। আবার টেঁপিকে ছেড়ে দিয়েছ? এখন বাচ্চা যদি সব দুধ খেয়ে ফেলে, কাল সকালে কি করে চা হবে শুনি?"

মোটা ভদ্রলোক কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, "কাল সকাল অবধি বাঁচলে পর তবে তো চা খাওয়া হবে।"

এগারো

ঐ কথা বলে যেই-না ঘাড় ফিরিয়েছেন মুক্তোর মালার ওপর চোখ পড়েছে। ভীষণ চমকে উঠলেন, সাপ দেখলে মানুষেরা যেমন চমকায়।

"ও কি, ওটা কোথায় পেলেন?"

তার পর ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখে বললেন, "নাঃ, সেটা নয়, এটা অন্য মালা। তাতে অন্য পাথর।"

তখন বিরিঞ্চিদারা সবাই মিলে তাঁকে চেপে ধরল, "কি মালা, কেমন মালা, খুলে বলতেই হবে। সবাই মিলে হয়তো-বা সাহায্যও করা যেতে পারে।"

বিরিঞ্চিদারা সাহায্য করবে শুনে আমার দারুণ হাসি পেল।

ভদ্রলোক বললেন, "আমি হলাম সেই জমিদার, যার গিন্নির মুক্তোর মালা চুরি গেছে। বুঝলেন, বেশ একটা মোটা টাকার ইন্সিওর ছিল, খোয়া গেলে সেটি পাওয়া যায়, তা গিন্নি দিনরাত মালা আগলে রাখবেন। শেষপর্যন্ত গেল তো গেল, অত একটা হাঁকডাক করবার মতোও কিছু নয়

কিন্তু গিন্নির সে কি চ্যাঁচামেচি।

"বার বার বললাম, 'বাড়িতে পুলিশ ঢুকিয়ো না, ওতে দেশের অমঙ্গল হয়। তার ওপর আমার পেট কামড়াচ্ছে, আমি কাউকে ডাকতে-টাকতে পারব না।' কিন্তু কে শোনে! ভাইকে পাঠিয়ে গোটা থানাটাকে বাড়িতে তুলে আনলেন, মশায়।"

"তার পর ধরপাকড় খানাতল্লাশি। মালা তো পাওয়া গেলই না, উপরন্তু আমার অমন ভালো বামুন ঠাকুরটা রাগ করে দেশে চলে গেল, এখন সে ফিরলে হয়—হঠাৎ এ মালাটাকে দেখে চমকে উঠেছিলাম, বুঝলেন? ভয় ঢুকে গেছিল, মালাটা বুঝি পাওয়াই গেল আর টাকা-গুলো হাতছাড়া হল।—না, না ব্যস্ত হবেন না, এটা মোটেই গিন্নির মালা নয়।"

আমি চুপ করে থাকতে না পেরে বললাম, "তা হলে শেষপর্যন্ত চুরি হয়েছিল কি করে?"

"আরে সেই তো হল সমস্যা। কেমন করে চুরি হল জানা থাকলে কে চুরি করল জানতে আর কতক্ষণ? মোট কথা, সেটিও সিন্দুকে নেই, আর গিন্নিও এমনি কাণ্ড লাগিয়েছেন যে বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হয়েছি। এতটা ভাবি নি।"

বিন্নিঝিদা তখন গায়ে পড়ে বলল, "মালা হয়তো আমরা খুঁজে দিতে পারি।"

কোথায় খুশি হবেন, না, তাই শুনে জমিদার বিরক্ত হয়ে বললেন, "থাক্ মশাই, আপনাদের আর পরোপকার করতে হবে না।"

বুড়ো বুড়ি আর রোগা ভদ্রলোক এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। হঠাৎ তাদের দিকে ফিরে জমিদারবাবু বললেন, "আচ্ছা, মাকড়ি-পরা, বাবরি-চুল, ছোকরা কাউকে চেনেন আপনারা?"

শুনে আমরা চারজন তো চমকে উঠলামই, ওরা তিনজনও কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল।

জমিদারবাবু আশ্চর্য হয়ে বললেন, "চেনেন নাকি তাকে?"

বুড়ি সাদা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ফিস্ফিস্ করে বলল, "কেন? তাকে দিয়ে আপনার কি দরকার?"

"মানে তার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কাজ ছিল। সে যে আমাকে কি বিপদেই ফেলেছে, পেলে একবার দেখে নিতুম।"

বুড়ি কিছু বলবার আগেই রোগা ভদ্রলোক বাক্সের পেছন থেকে বেরিয়ে এসে বিষম রেগে বললেন, আচ্ছা, কে কাকে দেখে নেবে দেখা যাবে। তার ডান হাতের একটি থাপ্পড় খেলে, আপনার ঐ-সব জমিদারি চাল ঘুচে যাবে।"

"ও হো! তা হলে তাকে চেনেন দেখছি।"

ভদ্রলোক একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

"না, মশায়। বলছি তাকে আমরা চিনিও না, শুনিও না, চোখেও দেখি নি, সে এখানে থাকেও না।"

বুড়িও হঠাৎ ফোঁৎ-ফোঁৎ করে কেঁদে ফেলে বললে, "সে তো আপনার কোনো অনিষ্ট করে নি। এ-সমস্ত কেবল তাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা। মোটেই আমরা তাকে চিনি না, আর মোটেই সে কাল সন্ধে থেকে এখানে নেই। উঃ! আপনারা কি পশু না পাষণ্ড?"

জমিদারবাবু তো এত কথা শুনে ভারি অপ্রস্তুত। ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "আহা, আপনি কেন ওরকম কচ্ছেন বলুন তো। আমিও তো তাকে ভালো লোকই ঠাউরেছিলাম, কিন্তু কি যে বিপদে ফেলে দিল আমাকে। সামনে জেলখানার লোহার দরজা আর পিছনে গিন্নি।"

তার পর মালাটার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, "এ মালাটার সঙ্গে যে সাদৃশ্য আছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এ সে নয়। সে মালা কি আর আমি চিনি নে? আগে ঠাকুমা পরে থাকতেন আর আমার মা হাঁ করে চেয়ে থাকতেন। তার পর ঠাকুমা বুড়ি হলে, মা পরে থাকতেন আর গিন্নি হাঁ করে তাকিয়ে থাকতেন। এখন মা বুড়ি হয়েছেন, গিন্নি ওটাকে পরে থাকেন। লাখ টাকা দিয়ে ইন্সিওর করা, কিন্তু আজকালকার চোরগুলো পর্যন্ত এমনি ওয়ার্থলেস যে সামান্য একটা লোহার সিন্দুক খুলতে পারে না। আরে ছো, ছো, আজকালকার চোরদের ওপর পর্যন্ত নির্ভর করা যায় না, মশায়।

"ভাবতে পারেন শাশুড়ির আগে তার শাশুড়ি, তার আগে তার শাশুড়ি - এমনি করে মুক্তোর মালা গলায় ঝুলিয়ে, শাশুড়ির লাইন চলে গেছে সেই মান্ধাতার আমল পর্যন্ত। কিন্তু এবার বাছাধনরা জব্দ! গিন্নি হলেন লাস্ট ম্যান। ঐ ছেলেটার সঙ্গে যদি কেউ আমার দেখা করিয়ে দেয়, তাকে এখুনি দশ টাকা দিই।"

এ কথা বলবামাত্র দাড়িওয়ালা এক গাল হেসে এগিয়ে এসে বলল,

"কই দশ টাকা? দেখি।"

বুড়ি আর রোগা ভদ্রলোক তার কোমর জাপ্টে ধরে তাকে আটকে রেখে চ্যাঁচাতে লাগল, "না, না, সে এখানে থাকে না, তাকে আমরা চিনি না। এ লোকটা ভারি মিথ্যাবাদী, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।"

বুড়ো ওদের হাতের মুঠোর মধ্যে থেকে দাড়ি ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, "কে মিথ্যাবাদী? কাল রাত্রে কে খেয়েছিল দুধের সর? আমি সাক্ষাৎ বড় ভাই হয়ে, সারা দিন খেটে মরি, আর কে এলেই মাছের মুড়ো পায়? নিজেদের গোরুর ভয়ে জুজু, আবার সে-ই খায় ক্ষীরের চাঁচি? কই, দেখি তো আপনার কাছে সত্যি দশ টাকা আছে কি না, দেখি আপনার মনিব্যাগটা।"

তখন জমিদার মাথা-টাথা চুলকিয়ে বললেন, "ইয়ে—মানে—আমার মনিব্যাগে সত্যিই দশ টাকা আছে, কিন্তু সেটা আমার সঙ্গে নেই। আসবার সময় তাড়াতাড়িতে ইয়ে—"

বুড়ো তো রেগে আগুন।

"বেশ, মশায়, বেশ। কাজ বাগাবার ফন্দিটে তো মন্দ নয়। যান, ওকে আমরা কেউ চিনি না। আগে দশ টাকা ফেলুন, তার পর ভেবে দেখা যাবে। কত কথা তো আগে ভুলে যাই, আবার পরে মনে—উঃ।"

বুড়ির হাতের প্রচণ্ড চিমটি খেয়ে তবে তার মুখ বন্ধ হল।

ঠিক এই সময় ওপর থেকে খচমচ্ করে কতকগুলো কাঠ-কুটো নীচে পড়ল।

সবাই অবাক হয়ে ওপর দিকে তাকাতেই, রোগা ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, "ও কিছু নয়, আমি এতক্ষণ মাচাটার ওপর বসেছিলুম কিনা, তাই ওটা দুলছে আর কাঠ-কুটো ভেঙে পড়ছে। কি মুশকিল। সবাই ওপরে তাকাচ্ছেন কেন? নীচের দিকে চেয়ে দেখুন, একটা বালিশও আমার সঙ্গে পড়েছে—কি জ্বালা, তবু চোখ নামায় না।"

কিন্তু কে শোনে। সবাই একদৃষ্টে মাচার পানে তাকিয়ে, কারণ মাচাবাঁধা পুরোনো দড়ি, চোখের সামনে আস্তে আস্তে ছিঁড়ে দু টুকরো হয়ে গেল, এক রাশি বিছানা বালিশ ঝুপ্‌ঝাপ্ নীচে পড়ল, তার সঙ্গে এক পাটি লাল বিদ্যাসাগরী চটিও পড়ল।

আশ্চর্য হয়ে ওপর দিকে চেয়ে দেখি যে ঝাঁকড়া-চুল ছোকরা, কানে মাকড়ি ও এক পায়ে চটি পরে মাচার বাঁশ ধরে ঝুলছে। আস্তে আস্তে

বাঁশটিও খুলে এল আর সে-ও নেমে পড়ল।

নেমেই জমিদারবাবুকে বলল, "এই তো দেখা হল, তা হলে দিন দশ টাকা।"

আমরা সবাই তো হাঁ!

তার পর বুড়ি চাপা গলায় বললে, "এই খোকা, পালিয়ে যা বলছি। এখানে থাকলে তোকে এরা বিপদে ফেলবে। ভালো চাস তো পালা।"

খোকার কিন্তু সেদিকে কানই নেই। জমিদারবাবুকে আবার বলল, "কই, বের করুন টাকা। এই তো আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিলাম।"

ঠান্‌দিদির এতক্ষণ কথা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, এবার বুড়িকে জিগ্‌গেস করলেন, "উনি কে? ঐ যে কানে মাকড়ি?"

বুড়ি তেড়িয়া হয়ে উঠল, "উটি আমার ছেলে আর ঐ রোগা মানুষটি আমার স্বামী। কেন, আপনার কোনো আপত্তি আছে? না কি আর কিছু জিগ্‌গেস করবার আছে?"

ঠান্‌দিদি বললেন, "তা বাছা, আছে বৈকি। তোমাদের এখানে ব্যাপারখানা কি বল তো? রাত্তিরে লণ্ঠন নিয়ে আনাগোনা। চানের ঘরে চোরা দরজা, মাটির নীচে গলিঘুঁজি, গোপন ঘরে বাক্স-প্যাঁটরা— এ-সব চোরাই মাল নাকি?"

ঘরে এমনি চুপচাপ যে একটা আলপিন ফেললে শোনা যায়।

বুড়ি বললে, "কেন, তাতে যদি আপনার আপত্তি থাকে তো দিন না ধরিয়ে। বাইরেই তো পুলিশের সঙ্গে আপনাদের আত্মীয়-স্বজনরা ঘোরাফেরা করছে, ডাকুন না ওদের।"

শ্যামাদাসকাকা আর বিরিঞ্চিদা ঠান্‌দিদিকে বলতে লাগল, "কি দরকার ছিল তোমার এ-সবের মধ্যে নাক গলাবার? এখন আসুক পুলিশ, আসুন সেজদাদামশাই, আসুন পিসেমশাই, তুমি ঝোলো, আমরাও ঝুলি।"

পকেটে এক কুচি চুইং-গাম সেঁটে ছিল, সেটিকে বের করে, রোম ছাড়িয়ে মুখে পুরতে যাব, অমনি বন্ধ দরজায় আবার ঠেলা। বাইরে থেকে মোটা গলার ডাক শোনা গেল, "দরজা খুলুন মশাই, আমরা পুলিশের লোক। না খুললে বোমা দিয়ে দরজা ভেঙে ঢুকব।"

ঘরময় চুপচাপ। বাক্সের ভেতরে, বাক্সের পিছনে, হার্মোনিয়মের পাশে, পর্দার আড়ালে, যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল। রোগা ভদ্র-

লোক আর তাঁর ঝাঁকড়া-চুল ছেলে তর্‌তর্‌ করে অন্য একটা মাচায় চড়ে বসল।

বাইরে থেকে বোধ হয় ইন্সপেক্টরবাবুই হবেন, হাঁক দিয়ে বললেন, "যে দরজা খুলবে তাকে পাঁচ টাকা দেব।"

তার পরই একটা অদ্ভুত গাঁক্‌-গাঁক্‌ শব্দ, "ওরে বাবা রে! মেরে ফেললে রে! খেয়ে ফেললে রে! ওরে হারান হতভাগা, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস যে, শুট্‌ কর—উ হু হু হু! কামড়ে দিয়েছে রে! এই শুট্‌ কর, শুট্‌ কর!"

দাড়িওয়ালা এক দৌড়ে দরজা খুলে হাট করে দিল। ব্যস্ত হয়ে ডাকতে লাগল, "আ-আ-আ, টেপি-টেপি-টেপি, কিত্‌-কিত্‌-কিত্‌, আয় টেঁপি-টেপি তি-তি-তি।"

আর দেখতে দেখতে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল লাল চোখওয়ালা, ভীষণ হিংস্র চেহারার সেই গোরুটা, সঙ্গে আবার ঠিক তারই মতন দেখতে একটি বাচ্চা।

দাড়িওয়ালা তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল, "ওরে আমার সোনামুখো বেচারারা। তোদের সঙ্গে দুষ্ট লোকেরা কত খারাপ ব্যবহারই-না করেছে। আহা বাছা রে, একেবারে মুখগুলো শুকিয়ে গেছে।"

পুলিশরা যে গোরুর ভয়ে কে কোথায় ভেগেছে তার পাত্তা নেই।

এদিকে টেঁপি আর টেঁপির বাচ্চা, খিদের চোটে, বুড়োর পেন্টেলুন-টাই খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

"এই টেঁপি কি হচ্ছে কি। টেঁপি সাবধান। নাঃ, এ তো ছাড়ে না দেখি—দাঁড়া, তোদের খাবার ব্যবস্থা কচ্ছি।"

এই বলে বুড়ো ভাঙা মাচায় দড়ি খুলে, তাই দিয়ে গোরু-দুটাকে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে চলে গেল।

আমরাও দারুণ একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ছেড়ে, যে যার জায়গা থেকে বেরিয়ে এলাম। এতক্ষণ বাদে আমিও চুইং-গামটাকে আঙুল থেকে ছাড়িয়ে মুখে পুরলাম।

অমনি একটু কাষ্ঠ হেসে ইন্সপেক্টরবাবু, গোটা দশ পুলিশ, সেজ-দাদামশাই আর বিরিঞ্চিদার পিসেমশাই ঘরে এসে ঢুকলেন।

চমকে গিয়ে চুইং-গামটা চেবাবার আগেই গিলে ফেললাম। ধেৎ!

বারো

সারি সারি তো সব এসে ঢুকল। এদের হাত থেকেই পালাবার জন্যে কাল থেকে কি না করা হয়েছে। যাক গে, ঘরের মধ্যে যারা ছিল, তারা ঝগড়াঝাঁটি ভুলে দল বেঁধে, তৈরি হয়ে নিল। প্রথমে দাঁড়ালেন জমিদারবাবু, তার পাশে ঠানদিদি, তার পর শ্যামাদাসকাকা, তার পর বিরিঞ্চিদা, তার পর বুড়ি, তার পর ঝাঁকড়া-চুল, তার পর রোগা বেচারা আর সব শেষে, একটু পেছনের দিকে সরে, আমি।

ঘরের মধ্যে দেখলাম এ ছাড়াও বারো চোদ্দোজন লোক।

ইন্সপেক্টরবাবু পকেট থেকে একটা ছোট কালো খাতা আর লাল পেন্সিল বের করে বললেন, "কোথা থেকে যে শুরু করব ভেবে পাচ্ছি নে। ভুবনডাঙার ঠ্যাঙাড়েরা ধরা পড়বার পর একসঙ্গে এতগুলো ক্রিমিনাল দেখা গেছে কি না সন্দেহ।"

পাশে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল, সে দেখলাম খোসামুদের একশেষ, এক-গাল হেসে বললে, "হাঁ স্যার, দেখবেন এবার খবরের কাগজে আপনার নাম বেরুবে। একটা চক্র-টক্রও পেয়ে যেতে পারেন, বলা যায় না, হয়তো তিসরা বিভাগ।"

"ঐ ছোট ছেলেটাকে দিয়ে শুরু করে দিন স্যার, কচি আছে, ধমক-ধামক করলে হয়তো একটু-আধটু সত্যি কথা বললেও বলতে পারে।"

তাই শুনে বিরিঞ্চিদার পিসেমশাই এমনি অদ্ভুত চেঁচিয়ে উঠলেন, "ও কাজও করবেন না মশাই, ওর কচিপানা মুখ দেখে বিচার-বুদ্ধি হারাবেন না। ঐ হল গিয়ে পালের গোদা, মশাই, ঐ হল সর্দার।"

সেজদাদামশাই কি বিরক্ত।

'আরে রাখো। তোমাদের বিরিঞ্চিটিও কম পাজি নয়।'

ইন্সপেক্টরবাবু হকচকিয়ে গেলেন মনে হল, একবার এর মুখ দেখেন, একবার ওর মুখ। শেষটা আমি নিজেই এগিয়ে এসে বললাম, আমার নাম গুপী চক্রবর্তী, বয়স এগারো, ক্লাস সেভেনে পড়ি, মাথায় সাড়ে চার ফুট, ওজন—"

ইন্সপেক্টরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "থামো ছোকরা। বড় বেশি কথা বল।"

দেখলে তো মজা? আবার ঠান্‌দিদিকে জিগগেস করলেন, "আপনার নাম আর ঠিকানা?"

ঠান্‌দিদি মাথায় কাপড় আরো টেনে দিয়ে ইন্সপেক্টরবাবুর দিকে পিঠ ফিরিয়ে বললেন, "ও মাগো!"

সেজদাদামশাই বললেন, "লিখুন, নিস্তারিণী দেবী। ৪৩ হরিশঙ্কর লেন, কলিকাতা।"

ইন্সপেক্টর এ-সবই খাতায় টুকে বললেন, "এখানে আসার অভিপ্রায়—?'

বিরিঞ্চিদা ঝুঁকে পড়ে বললে, "গয়ার কথাটা বলবে।"

সেই খোসামুদে লোকটা বললে, "উঁহু! সাক্ষীকে হামলা করবেন না।"

ঠান্‌দিদি ভারি খুশি হয়ে বললেন, "গয়ায় যাচ্ছিলুম, পথ হারিয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছি, তাতে দোষটা কি হয়েছে গা?"

ইন্সপেক্টরবাবু তাই টুকতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সেজদাদামশাই ছুটে এসে রেগে-মেগে বললেন, "কি মিছে কথা! পাছে আমার গুরুদেবকে—এদের সামনে তাঁর ✓ নাম করাও পাপ—পাছে তাঁর চরণে আমার মার গয়নাগাটিগুলো দিয়ে ফেলি, তাই তুমি সে-সব নিয়ে সরে পড় নি বলতে চাও, বৌঠান? ঐ গয়নার তিন ভাগের এক ভাগ তোমার, বাকি আমার আর ইয়ে গুপীর বাবার। ওদিকে গুরুদেব সোনার গাড়ুর অভাবে কি কষ্টই না পাচ্ছেন?

ইন্সপেক্টর খচ্‌খচ্‌ লিখতে লিখতে, একবার থেমে সেজদাদামশাইয়ের জামা ধরে টেনে জিগ্‌গেস করলেন, "গুরুদেব কার সোনার গাড়ু নিয়েছেন না কি যেন বললেন, ভালো করে শুনতে পেলাম না। আরেকবার কথা-গুলি বলবেন স্যার?"

শুনে তো আমার দারুণ হাসি পেল। সেজদাদামশাই কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। ইন্সপেক্টর একটু অপেক্ষা করে বুড়িকে বললেন, "আপনার নাম ও পেশা?"

বুড়ি বললেন, "আমার নাম স্বভাবসুন্দরী দাসী। আর পেশার কথা আমি কিছু বলতে পারব না, সে আমার অনেক উপকার করেছে।"

খোসামুদে লোকটি বললে, "কি আপদ। পেশার কথা কে শুনতে চায়? আপনার কি করা হয় তাই বলুন।"

"আর কি করা হবে? রান্না করা হয়। আমার খোকা কিন্তু জমিদারবাবুকে চেনে না।"

খোকা বুড়ির হাত ছাড়িয়ে হাঁড়ি-মুখ করে বললে, "এতদিন চিনি নি, এবার খুব চেনা গেছে। দিন, মশাই, আমার একশো টাকা।"

জমিদারবাবু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "আহা, থামো থামো, বলেছি তো দেব।"

ইন্সপেক্টরবাবু হতাশ হয়ে পাশের লোকটিকে বললেন, "আমি তো কিছু বুঝে উঠলাম না, শম্ভু, তুমি একটু দেখ তো।"

শম্ভু তখন তড়্‌বড়্‌ করে এগিয়ে এসে বিরিঞ্চিদা আর শ্যামাদাস-কাকাকে লাইন থেকে টেনে বের করে এনে, ধমক দিয়ে বলল, "আপনারাই যে রিংলিডার সে কথা অস্বীকার করে কোনো ফল হবে না মশাই, আপনাদের কপালে লেখা রয়েছে বদমায়েস, ধড়িবাজ। বিলেতে ঐ যে সব চোরাকারবার ধরা পড়েছে, তার গোড়াতেও যদি আপনারা থাকেন তো কিছুই আশ্চর্য হব না। নিন, এখন ভালো চান তো বলে ফেলুন আগাগোড়া সব ব্যাপারটা।"

তখন বিরিঞ্চিদা আর শ্যামাদাসকাকা ঢোক গিলে, জিব কামড়ে, আম্‌তা আম্‌তা করে, একজন থেমে, একজন জোরে, আমাদের কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার পর থেকে সব কথা মোটামুটি বলল।

শুনে ইন্সপেক্টরবাবু বললেন, "বটে।"

তার পর বিরিঞ্চিদার পিসেমশাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, "কি যেন বলছিলেন আপনি?"

পিসেমশাই বললেন, "কি আর বলব মশাই, আমার বন্ধু ঘেঁটুর মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ে-টিয়ে ঠিক। টোপর কেনা, পুরুতঠাকুরকে বায়না, বর-পণের টাকা হাফ ও নেবে আর হাফ আমি নেব সব ঠিক, আর মাঝখান থেকে একেবারে ভাগলুয়া। বল, হতভাগা পালালি কেন?"

বিরিঞ্চিদা মুখ লাল করে বললে, "শ্যামাদাস যে বললে, ঐ মেয়ে ভীষণ রাগী, নাকি চটে গেলে নাক দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়?"

"কি? শ্যামাদাস বললে। বাঃ চমৎকার কথা, শ্যামদাস বললে। আর শ্যামদাস কি করেছে তা জানিস? নিজের মামাকে বেদম পিটে বাড়ি থেকে পালিয়েছে। কেন তা জানিস? কারণ মামা বলেছিল বলাই চাটুয্যেই-বা কি, আর গোষ্ঠ পালই-বা কি, ছিল শুধু একজন—ব্যস্‌ ঐ

পর্যন্ত তার নামটুকুও বলবার আগেই মামাকে একেবারে ফ্ল্যাট, একেবারে মাটিতে বিছিয়ে দিয়েছে এত বড় পাজি। কেমন ঠ্যাঙাড়ে সব সঙ্গী জুটিয়েছ, এবার বুঝতে পারছ আশা করি?"

বুড়ি এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিল, এবার বললে, "ওমা! কোথায় যাব গো! একটা চোর, একটা ফেরারি, একটা খুনে। ঐ ছোকরাটার কথা তো জিগ্‌গেস করতেও ভয়ে হাত-পা পেটে সেঁদোচ্ছে। এই চার-চারটে লোক আমাদের বাড়িতে রাত কাটাল তবু যে বেঁচে আছি তাই রক্ষে।"

ইন্‌সপেক্টরবাবু একটু হাসলেন।

"যা বলেছেন মা-ঠাকরুন। এবার আসুন, এই-সব চোরাই মালের পাদার একটা হিসেব দিন।"

বুড়ি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

"ওমা বলে কি। আমার বিয়ের যৌতুক বাবা কত কষ্ট করে দিয়েছিল পঁচিশ বছর ধরে আগলেছি না। যাতে উই না ধরে, যাতে ডাকাতে না নেয়, তাকে বলে কিনা চোরাই মাল।"

বলে একটা ভাঙা হার্মোনিয়মের পিঠে হাত বুলতে লাগল।

এমনি সময় দাড়িওয়ালা ফিরে এসে ঘরে ঢুকতেই ইন্‌সপেক্টরবাবু মনিব্যাগ বের করলেন, "ক মাসের মাইনে দেয় নি?"

বুড়ো তো আহ্লাদে আটখানা।

"ছটি মাস দেয় নি স্যার। সম্পর্কে দাদা হই, সব কাজ করিয়ে নেয়, নিজেদের গোরুকে নিজেরা ভয় পায়। ছ মাস মাইনে দেয় নি, ছ ষোলোং চৌষট্টি।"

ইন্‌সপেক্টরবাবু ওর হাতে একটা দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, "আপাতত এইটে নাও তো! আচ্ছা এ-সব জিনিস চুরি করে আনে কারা? চালানই-বা করে কারা?"

বুড়ো খুশি হয়ে বললে, "সে আমাদের লোক আছে স্যার, নিজের হাতে সব ট্রেনিং দিয়েছি। কম সে কম পনেরো-কুড়িজন ভাড়া খাটে। সব চেয়ে চালাক কে জানেন?— ঐ ঝাঁকড়া-চুল— উম্‌মা—"

বুড়ি আর রোগা বেচারা ওর মুখ চেপে ধরে বলল, "না দেখুন ভীষণ মিথ্যেবাদী, দেখুন।"

ইন্‌সপেক্টর সব কথা খাতায় টুকে নিয়ে বললেন, "ব্যস্‌, মালার

ব্যাপার ছাড়া আর সব পরিষ্কার হয়ে গেল। কিচ্ছু ভাববেন না আপনারা, ফাঁসি বন্ধ করে দেব। চাই কি এক আধজনকে জেলে না-ও দিতে পারি। —কিন্তু মালাটাই যে ভাবিয়ে দিলে মশাই। ওটি না পেলে কি মাইনে বাড়বে? দেখুন জমিদারবাবু, এতক্ষণ কিচ্ছু বলি নি এবার কিন্তু রেগে গেছি। আপনি নাহয় বড়লোক কিন্তু তাই বলে আমার উন্নতি বন্ধ করে দিতে পারবেন তা ভাববেন না। ঠিক বলছেন এটা আপনার মালা নয়?"

জমিদারবাবু মাথা নাড়লেন। ইন্সপেক্টরবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "নয় কেন বলুন? এটা কিসে মন্দ?"

জমিদারবাবু মহা ফাঁপরে পড়ে গেলেন, "ইয়ে—মানে এটা আমার গিন্নি পরতেন না— ঐ ঝাঁকড়া-চুল—" এইটুকু বলেই জমিদারবাবু থামলেন।

"আহা থামলেন কেন? ঐ ঝাঁকড়া-চুল কি?"

জমিদারবাবু কিছু বলবার আগে সে ছোকরাই এগিয়ে এসে বলল, "আমি বলব স্যার?—"

জমিদারবাবু ব্যস্ত হয়ে তার কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, "আরে চুপ চুপ, দেব রে একশো টাকা নিশ্চয় দেব। এ তো দেখি আচ্ছা গেরো।"

ইন্সপেক্টর বললেন, "দেখুন বাজে কথা রেখে আগাগোড়া খুলে বলুন।"

জমিদারবাবু কোঁচা দিয়ে মুখ মুছলেন।

"একটুও বাদ দিতে পাব না?"

"না সব শুনব।"

"কিন্তু—কিন্তু—গিন্নি যে রেগেমেগে পুলিশের সম্বন্ধে—"

"আচ্ছা আচ্ছা সেইটুকু নাহয় ছেড়েই দিলেন।"

জমিদারবাবু তখন একটা নিচু দেখে বাক্সের ওপর বসে পড়ে বললেন, "বেশ তবে সব কথাই শুনুন। আমাদের সাত পুরুষের জিনিস ঐ মালা। লাখ টাকা ওর দাম। লাখ টাকা দিয়ে ইন্সিওর করা। হারালে লাখ টাকা পাওয়া যায়। গিন্নি প্রাণ দিয়ে সেটি আগলান। সারাদিন গলায় ঝোলে, সারারাত বালিশের নীচে থাকে। সেই মালা বালিশের তলা থেকে উধাও। কেউ কোথাও নেই, ঘর ভেতর থেকে বন্ধ, শুধু বালিশের নীচে মালাগাছি নেই।

"তাই নিয়ে গিন্নি যে অতটা রসাতল করবেন এ আমার ভাবনার

বাইরে ছিল মশাই। আর ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানিকে বছরে বছরে টাকা গুনে দেওয়া হয়েছে, তাদের বাঙালি সায়েবেরও যে কি সন্দেহবাতিক সে আর কি বলব। কেমন করে গেল, কোথা দিয়ে গেল, বললেই হল কিনা চুরি, দেব না টাকা, আগে প্রমাণ করুন সত্যি চুরি গেছে। এই-রকম বলে। তখন কি আর করা যায়, এই ছোকরার পায়ের ছাপটা দেখাতে হল।"

শুনে সবাই অবাক, "ওমা সে কি? ছোকরার পায়ের ছাপ আবার কি?"

জমিদারবাবু তখন অপ্রস্তুত মুখ করে জিগ্‌গেস করলেন, "সত্যিই কি সবটা বলতে হবে, গিন্নি শুনলে—"

"আহা কি জ্বালা, বলুন বলুন, গিন্নিকে আবার কে বলতে যাচ্ছে?"

"তবে শুনুন। ইয়ে মানে ছোকরাকে বললাম তোকে কিচ্ছু করতে হবে না, জানলার বাইরে দাঁড়াবি আমি গরাদের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দেব, তুই উধাও হবি। পরে রেলের ক্রসিং-এ আমার হাতে দিয়ে দিবি। তা হলে তোকে একশো টাকা দেব। তোর কোনো বিপদ নেই। বলুন মশাই, ছিল ওর কোনো বিপদ যে এখন ওরকম তেড়িয়া হয়ে থাকবে?"

"না, না, সে তো বটেই।"

"সে তো বটেই আবার কি? ব্যাটা মালা নিয়ে বেমালুম উধাও। রেলের ধারে তার দেখা নেই। এদিকে গিন্নির জ্বালায় আমি যেখানে যাই পুলিশও সঙ্গে-সঙ্গে হাঁটা দেয়। সেই থেকে আপনারা যে আমার পেছনে ছিনেজোঁকের মতো এক নাগাড়ে লেগে রয়েছেন মশাই। দে রে বাপ মালাটি, ইন্‌সিওরের টাকায় আমার কাজ নেই, মালাটা এখন গিন্নিকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই বাঁচি।"

ছোকরা অমনি শ্যামাদাসকাকাকে দেখিয়ে দিলে।

"আপনার কথায় বিশ্বাস করেই মালা নিয়ে সরে পড়েছিলাম, আপনারাই যে পেছনে পুলিশ লাগাবেন তা কি আর ভেবেছিলাম। রেলের ধারে গিয়ে দেখি ধরপাকড় চলছে, তখন বেগতিক বুঝে ঐ ভদ্রলোকের পকেটে মালা চালান করে দিলাম। ওকে জিগ্‌গেস করে দেখতে পারেন। আমি নাকে-কানে খৎ দিয়েছি সোনাদানা আর ছোঁব না। ইস্কুলে ভর্তি হব। যদি মন্টু পটলাদের ক্লাসে নেয় অবিশ্যি।"

তাই শুনে বুড়ি আর বেচারা ভদ্রলোক হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে ওকে সে কত আদর! ঐ বুড়ো ধাড়ি ছেলেকে ভাব একবার!

তেরো

এদিকে সবাই তো শ্যামাদাসকাকার দিকে তাকিয়ে আছে। সে তখন দুই পকেট উলটে দিয়ে, দুই হাত শূন্যে তুলে বললে, "প্রমিস্, আমার কাছে নেই। দেখতে পারেন ঝেড়ে-ঝুড়ে। মালা কোন্ কালে ঐ গুপে লক্ষ্মীছাড়াকে দিয়ে দিয়েছি। কি দরকার রে বাবা পরের জিনিসে, বিশেষ করে যখন তার মধ্যে এত বিপদ! গুপে, মালা দিয়ে দে, ভালো চাস তো।"

আমিও তখুনি সার্ট খুলে ফেলে দিয়ে, প্যান্টেলুন ঝেড়ে-ঝুড়ে সবার সামনে দেখিয়ে দিলাম যে আমার কাছে মালাটালা তো নেই-ই, অনেক-গুলো বোতামও নেই।

ইন্সপেক্টরবাবু অবাক হয়ে গেলেন।

"তা হলে সেটাই-বা গেল কোথায় আর এটাই-বা কার?"

ঝাঁকড়া-চুল আবার এগিয়ে এসে মাথা চুলকে বললে, "আজ্ঞে স্যার, ওটা আমার। বাবার মনোহারি দোকান থেকে নিয়েছিলুম।"

বেচারা ভদ্রলোক অনেক সয়ে ছিলেন, এবার কিন্তু দারুণ রেগে, ছেলের দুই কান মলে দিয়ে বললেন, "কেন নিয়েছিলি হতভাগা, বল নিয়েছিলি কেন? তাই চেনা-চেনা লাগছিল।"

ছেলে বললে, "পরে প্রাইভেটলি বললে চলত না? আহা, অত চটো কেন বল তো? দুজনারই লাভ হত।"

ইন্সপেক্টরবাবু আবার নোট বই খুলে বললেন, "ধীরে ধীরে বল, নইলে টোকা যায় না।"

ঝাঁকড়া-চুল বললে, "বলে-টলে শেষটা ফ্যাসাদে পড়ব না তো?"

"আরে না না। তা ছাড়া, পুরুষ-বাচ্চা, পড়লেই-বা অত ভয় করলে চলবে কেন?"

"না, তবে জেলে দিলে তো আর চন্দননগরে খেলতে যাওয়া যাবে না।—আচ্ছা, দশ টাকা দেন তো বলতে পারি।"

ইন্সপেক্টর হতাশ হয়ে শম্ভুকে বললেন, "তাই দাও তো ওকে।"

ছোকরা ভারি খুশি হল।

"বুঝলেন স্যার, ভেবেছিলাম জমিদারবাবুর কাছে এইটে চালিয়ে দিয়ে, আসলটা বেচে সারাটা জীবন সুখে থাকব।"

জমিদারবাবু হতভম্ব।

"ইস্! কি সাংঘাতিক বিশ্বাসঘাতক!"

বুড়ি দারুণ চটে গেল।

"দেখুন, সাবধানে কথা বলবেন। খোকার একটা মান-সম্মান আছে তো। তা ছাড়া যে নিজের স্ত্রীর মালা নিজে চুরি না করে লোক ভাড়া করে করায়, তার মুখে অত কথা শোভা পায় না।"

বিরিঞ্চিদা, শ্যামাদাসকাকা আর আমি বলতে লাগলাম, "তার পর? তার পর কি হল?"

ঝাঁকড়া-চুল বিরক্ত হয়ে বললে, "হবে আবার কি ছাই! তোমরা আসল মালা নিয়ে হাওয়া। আমি নকল মালা নিয়ে বাড়ি এসে দেখি, মার দিয়া কেল্লা—শিকার ঘরের মধ্যে। কিন্তু হবে কি গোরু-খোঁজা করেও তো মালাটা পেলুম না। কি করলে বল দিকিনি? ভুল করে আমার মালাটাও কার যেন পকেটে ফেলে রাখলাম। ওদিকে আসলটা কোথাও পেলাম না।"

ইন্সপেক্টরবাবু আমার দিকে তাকালেন।

"কচি মুখ দেখে বোঝা যায় না তুমি কত বড় শয়তান। মালা বের করে দাও।"

সেজদাদামশাইও ধমক দিতে লাগলেন। "ভালো চাস তো এখুনি দিয়ে দে হতভাগা। আগে থেকেই জানি শেষটা এমনি হবে। তোর বাবাকে তখুনি বলেছিলাম, দিস্ না ওকে হাতঘড়ি কিনে, ওতেই ওর কাল হবে। তা কে শোনে বুড়োর কথা। দে শিগ্গির মালা। কি করবি ও দিয়ে তুই? তোকে—ইয়ে—তোঁকে এতগুলো চুইং-গাম দেব।"

বিরিঞ্চিদার পিসেমশাই আবার বললেন, "বাস্তবিক এতগুলো ধড়িবাজ একসঙ্গে একটা ফ্যামিলির মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না।"

ঘরের মধ্যে আর বাকি যারা ছিল তারাও মহা ক্যাঁওম্যাও লাগিয়ে দিলে, "দিয়ে দে রে ব্যাটা, দিয়েই দে না।"

"আরে দে দেও রে, আউর কেয়া," ইত্যাদি।

শেষে জমিদারবাবু আমার কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন,

"আমার অবস্থাটা একবার ভেবে দ্যাখ বাবা, মালা না পেলে গিন্নি আমার একখানা হাড়ও আস্ত রাখবেন না। দে বাপ্ মালাটা, আমিও তোকে এক ডজন চুইং-গাম দেব।"

কি আর করা। দাড়িওয়ালাকে বললাম, "সর্দার, তুমি পথ দেখিয়ে আগে আগে চলো।"

দাড়িওয়ালা তখুনি রওনা দিল, আমরা একের পর এক তার পেছন-পেছন চললুম।

নিমেষের মধ্যে ঘর ফাঁকা হয়ে গেল। কে যেন মোমবাতির টুকরোটাও তুলে নিল। আমাদের পেছনের চোরা-কুঠুরি অন্ধকারে মিশে গেল।

ঘরের বাইরে সরু গলি এঁকে-বেঁকে শেষে কয়েকটা ধাপ বেয়ে একেবারে রান্নাঘরে গিয়ে শেষ হল।

রান্নাঘরের দরজার বাইরে মোটা খুঁটিতে শেকল দিয়ে টেঁপি আর তার বাচ্চা বাঁধা রয়েছে দেখলাম। আমাদের দেখে তারা দুজন সামনের পা মাটিতে ঠুকে জিব দিয়ে ঠোঁট চাটতে লাগল।

আমরা খানিকটা তফাত রেখে পেরোলাম। দাড়িওয়ালা বললে, "আহা আমার টেঁপু-সোনার বুঝি আবার খিদে পেল।"

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, এর মধ্যে এত কাণ্ড হয়ে গেল; কিন্তু বাড়ির বাইরেটা ঠিক তেমনি আছে। বনের গাছপালাও এতটুকু বদলায় নি। শুধু রাতটা কেটে গিয়ে কখন দিন হয়ে গেছে। আকাশের মাঝখানটা ঘন-নীল, গাছের ডালপালা রোদে ঝল্মল্ করছে আর অনেক ওপরে একটা চিল ছোট্ট একটা কালো দাগের মতো কেবলই ঘুরছে।

বাড়ি ছেড়ে যেই জঙ্গলের পথ ধরলাম, কোত্থেকে আরো গোটা কতক লোক এসে জুটল। আমার মনে হচ্ছিল প্রায় সিকি মাইল লম্বা একটা লাইন হয়ে আমরা চলেছি।

শুনলাম ওরা জমিদারবাবুর সেই ইন্সিওরেন্স কোম্পানির লোক।

চলতে চলতে বিরিঞ্চিদা পিসেমশাইয়ের কাছে গিয়ে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, "তা হলে বিয়েটা—"

পিসেমশাই বললেন, "থাক্, তোর আর অত ভাবতে হবে না, আমার ভাগনে বটার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। সে তোর চেয়ে ঢের ঢের ভালো।"

শ্যামাদাসকাকা এবার সাহস পেয়ে বলল, "তা হলে আমার ইয়ে—"

পিসেমশাই বললেন, "আরে সে ব্যাটা কি অত সহজে মরে? আমি যে ওর কাছে টাকা ধারি। দিব্যি চাঙা হয়ে উঠেছে। মারলিই যখন আরেকটু ভালো করে মারলি না কেন?"

সেজদাদামশাই ঠান্‌দিদিকে বললেন, "কি বৌঠান, স্যাঙাৎরা তো যে যারটা গুছিয়ে নিচ্ছে তোমার কিছু বলবার নেই?"

ঠান্‌দিদি কোনো কথা না বলে কাপড়ের মধ্যে থেকে একটা বড় লাল বটুয়া বের করলেন। চলতে চলতে তার মুখ খুলে দু-চারটে জিনিস বেছে নিয়ে বটুয়াটা সেজদাদামশায়ের পায়ের কাছে ফেলে দিলেন।

সেজদাদামশাই যেমনি সেটি তুলে নিলেন ঠান্‌দিদি বললেন, "গুপী, বাবাকে বলিস অর্ধেক যেন চেয়ে নেয়।"

ততক্ষণে আমরা গাছতলার বিরিঞ্চিদার গাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি। সেখানে এসেই সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল, মাঝখানে রইলাম আমি; বললাম, "একটা খোঁচা-মতন জিনিস চাই। সোয়েটার বোনার একটা কাঁটা দাও ঠান্‌দিদি।"

ঠান্‌দিদি হাঁড়িমুখ করে বললেন, "এ বেঘোরে সে আমি কোথায় পাব?"

মেয়েদের যা কাণ্ড সঙ্গে একটা দরকারি জিনিস অবধি রাখে না। বললাম, "তা হলে একটা লাইন-টানা রুলার হলেও চলবে।"

সবাই চুপচাপ। বললাম, "তা হলে কি জিনিসের অভাবে সব পণ্ড হয়ে যাবে?"

তখন শ্যামাদাসকাকা গাড়ির ভেতরের খোপ থেকে একটা লম্বা শক্ত তার বের করে দিল। আমি সেটি নিয়ে সামনের বাঁ দিকের জানলার ভেতরে গুঁজে দিয়ে অনেক কসরৎ করে মালাটা বের করলাম।

কাল জানলার কাঁচ তোলবার সময়, হাত থেকে ফস্‌কে কাঁচের পাশ দিয়ে, খাঁজের ভেতর পড়ে গেছল।

মালাটাকে পেন্টেলুনে ঘষে তুলে দেখালাম। মাঝখানকার হীরেটা ধুক্‌ধুক্ করতে লাগল। জমিদারবাবু ছুটে এসে বললেন, "আরে এই তো আমার হারানিধি। এরই জন্যে তো আমি ঘরছাড়া। দে রে বাপ্, একটু বুকে করি।"

সঙ্গে-সঙ্গে ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানির লোকেরাও এগিয়ে এল। তাদের মধ্যে একজনের চোখ হঠাৎ ছোট হয়ে উঠল।

মালাটাকে তুলে দেখালাম। মাঝখানকার হীরেটা
ধুক্ ধুক্ করতে লাগল।

"সে কি মশাই। এটাও যে মেকি।"

আমরা ধমক দিয়ে উঠলাম, "বললেই হল মেকি। এইটেই জমিদারবাবুর গিন্নির আদৎ মালা। মেকি হবে কেন।"

সে লোকটা কিছুতেই থামবে না। "আরে মণি চেনাই আমার পেশা। তার জন্য এরা আমাকে তিনশো টাকা মাইনে দেয়, আমি নকল মুক্ত চিনব না? কি যে বলেন। এ যদি সাঁচ্চা হয় তো আমি—"

জমিদারবাবু বললেন, "স্-স্-স্—চুপ চুপ, ও কথা মুখে আনবেন না, গত-বছর নেহাত ঠেকায় পড়ে সেটি বেচতে বাধ্য হয়েছিলাম। তা এটাই-বা মন্দ কিসের? পঁচিশ টাকার পক্ষে কি এমন খারাপ বলুন? গিন্নিই যখন টের পান নি, আপনাদের আর কি আপত্তি থাকতে পারে?"

তারা বললে, "আপত্তি কিছুই নয় তবে কোম্পানিতে রিপোর্ট করে দিতে বাধ্য আমরা।"

"তা করুন গে রিপোর্ট, করুন পাসপোর্ট, খালি আমার গিন্নি যেন না শোনেন। চেপে যান মশাই, পাঁচ টাকা খাইয়ে দেব সবাইকে।"

দাড়িওয়ালা বলল, "পাঁচ টাকাই নেই আপনার, খাওয়াবেন কি দিয়ে?"

ইন্সপেক্টর বললেন, "সবই বুঝলাম বাড়ির তলার গোলকধাঁধা ছাড়া।

বুড়ি বললে, "বলুন আমাদের সবাইকেই ছেড়ে দেবেন, তা হলে বলি। খোকা ইস্কুলে পড়বে, আমরাও রিটায়ার করব।"

ইন্সপেক্টর হাসলেন, "কাজটা আপনারা যে খুব ভালো করেছেন বলছি নে; তবে কি না আপনাদের নামে তো আর কেস হচ্ছে না ঠাকরুন। জমিদারবাবুর গিন্নির মালা খুঁজে দেবার কথা, সে তো দিয়েইছি। গিন্নিমাই আমাকে পুরস্কার দেবেন। আপনাদের নামে কেস যখন হবে তখন হবে। আপাতত জিনিসগুলো সব জমা দিয়ে দেবেন।"

বুড়ি বললে, "আর আমার খোকা?"

শম্ভু বলল, "ঘুষ খায়, আবার খোকা!"

খোকা রেগে গেল। "এক পয়সা পেলাম না মশাই, আবার ঘুষ খাই, মানে?"

জমিদারবাবু দাড়িওয়ালার দিকে তাকালেন। সে বললে, "নেই বলছি ওঁর টাকা।"

বুড়ি বলল, "শুনুন তা হলে। সেকালে বাড়িটা ছিল এক সাহেবের। সে জুতো পচিয়ে এখানে মদ তৈরি করত। দেখতে দেখতে বড়লোক হয়ে গিয়ে দেশে চলে গেল। পরে সে লাটসাহেব না বড় ডাক্তার না কি যেন হয়ে আবার এসেছিল। খুব সস্তায় বাড়ি বেচে দিয়ে গেল। ঠাকুরদা কিনে রাখলেন, বাবা আমাকে যৌতুক দিলেন। অমন ভালো সুড়ঙ্গ পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে দেখে, আমরা ওগুলোকে একটু কাজে লাগালাম। দোষ তো আমাদের এইটুকু।"

ইন্সপেক্টরবাবু খাতা-পেন্সিল পকেটে পুরে জমিদার-গিন্নির মালা হাতে নিয়ে জমিদারবাবুকে বললেন, "চলুন।"

বুড়ি আর বেচারা ভদ্রলোক ওঁদের সঙ্গে-সঙ্গে অনুনয়-বিনয় করতে করতে চললেন।

অমনি কর্পূরের মতো সবাই যার যেখানে মিলিয়ে গেল। পিসেমশাই, সেজদাদামশাই পর্যন্ত চলে গেলেন। বাকি রইলাম আমি ঠানদিদি, বিরিঞ্চিদা আর শ্যামাদাসকাকা।

আমরা ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে এ ওর দিকে চেয়ে রইলাম। খানিক বাদে আমি বললাম, "এক ডজন চুইং-গাম কি সত্যি কেউ কাউকে দেয়!"

বিরিঞ্চিদা আর শ্যামাদাসকাকা একসঙ্গে বলে উঠল, "কক্ষনো দেয় না। বরাবর তোকে বলছি না জীবনটা হচ্ছে খানিকটা রাবিশ, একটা ডাস্টবিন। এখন চল, একটা কারখানার চেষ্টা করা যাক।"

ভারি খুশি লাগল, ভাবলাম বগাই নিশ্চয় আমাকে কাল সারা দিন-রাত খুঁজেছে।

লঙ্কাদহন পালা

লঙ্কাদহন পালা

প্রথম দৃশ্য

ঘোষক. হনুমান, লঙ্কাদেবী, প্রহরী

লঙ্কানগরের মেন গেট

জুড়ির গান

রামায়ণের বাহাদুর রামচন্দ্র নয়,
বদন তুলে কহ সবে হনুমানের জয় ॥
কর হনু গুণ-গান,
হনুমান কথা শোন,
সোটালেমেড্ সমান ॥
তাঁব্যপানা পোড়া-মুখ
দেখে ভুঞ্জি স্বর্গসুখ,
গাহ হনুমানের জয় ॥
উট্‌কপালের দু-পাশেতে
হের বাঁধাকপি কান,
কর হনু গুণ-গান ॥
লালচে রঙ নাকের ফুটোর,
বাবা! দেখেই লাগে ভয়,
গাহ হনুমানের জয় ॥

ঘোষক বাঁদরের প্রবেশ ও ঢোলক বাজিয়ে অঙ্গ-ভঙ্গি সহকারে প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা

মহেন্দ্র পর্বতে চড়ি বীর হনুমান
লঙ্কাদ্বীপ অভিমুখে করে লম্ফ দান ॥
পায়ের দাপটে শিলা হয় চুরমার,
ফোকর ফাটল দিয়া বহে জলধার
জীবজন্তু ভয় পেয়ে করে হু-হুংকার,
যত যক্ষ মজা দেখে ছাড়ি পানাহার ॥
গাছপালা উপাড়িয়া আকাশেতে ওড়ে,
বাসা ছাড়ি কাগ চিল মহাশূন্যে ঘোরে ॥
নীলাভ মেঘের মতো হনু শূন্যে ধায়,
সাগর লঙ্ঘন করি যদি সীতা পায় ॥
মৈনাক পাহাড় কহে তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
না থামি তাহারে ছুঁয়ে হনু দেয় ফাল ॥
সুরসা সাপিনী এবে চাহে গিলিবারে,
তিল সম তনু ধরি ফাঁকি দেয় তারে ॥
সিংহিকা রাক্ষসী সে জলতলে রয়,
ছায়া ধরি হনুমানে মুখে টানি লয় ॥
চাতুরি করিয়া হনু বাঁচাইলা পরাণ,
সুরাসুর সবে তার করে গুণ-গান ॥
এমতে উতরি শেষে লঙ্ক শৈল পরে,
বাঁদুরে প্রথাতে হনু নাচ গান করে ॥

বুকে চপেটাঘাত করত ঘোষকের ন্যাজ দুলিয়ে সরে দাঁড়ানো
এবং হনুমানের লাফ দিয়ে প্রবেশ

হনু। উঃফ্! আরেকটু হলেই পৈত্রিক ন্যাজটা গেছিল গো! কি বাঁচান বেঁচেছি, আরি বাপ্! নাক মুখ সিঁট্‌কে, একটা নীল রঙের মেঘের মতো সমুদ্দুরের ওপর দিয়ে চলেছি তো চলেইছি। কেরামতি দেখে দেবতাদের দাঁত ছিরকুটে গেছে, তাঁরা সব ধন্যি ধন্যি করছেন। যক্ষ-যক্ষিণীরা পুষ্পবৃষ্টি করছেন। সমুদ্দুরের ঢেউ খেলানো জলের

এতটুকু বড়িটার মতো হয়ে তোর
মুখে সেঁদিয়ে···

ওপর দশগুণো হয়ে আমার ছায়াটা পড়েছে, ল্যাজটা কেমন সুন্দর এলিয়ে রয়েছে। এমনি সময় কোথাকার তুই কেরে, ল্যাজ ধরে টেনে নামিয়ে আমাকে জলখাবার করতে চাস্? অ্যাঁ। তেমনি সাজাটাও পেলি কি না বল্? এতটুকু বড়িটার মতো হয়ে মুখ দিয়ে সেঁদিয়ে—এই পেল্লকাণ্ড বিকট রূপ ধরে তোকে চিরে কুটিকুটি করে কেমন বেরিয়ে এলাম! প্রাণটা বড় ভালো জিনিস রে বাপ্!

হনুর নৃত্য ও গান

উঃফ্! বড্ড বাঁচা বেঁচেছিস্ রে প্রাণ
ছায়া ধরে ক্যায়সা জোরে লাগিয়েছিল টান!
চন্দ্রবিন্দু পড়ে যেত নামের আগায়,
ঘুচে যেত কলা খাওয়া, মরি হায় হায়!
বাঁদুরে বুদ্ধির ক্ষুরে শত শত গড়,
চাচা আপনা বাঁচা বলে পেঁপেগাছে চড়!

ঘোমটা দিয়ে লঙ্কাদেবীর প্রবেশ

লঙ্কা। আ সব্বনাশ! তোর সাহস তো কম নয়! বেড়াল হয়ে আমার পেয়ারের পেঁপেগাছে চাপছিস্, অ্যাঁ? যদি নখের খাম্‌চি লেগে যায়? ভাগ্ বলছি! আ মোলো যা, তবু যায় না যে! হেই, হ্যাশ্, হুশ্! জানিস্ আমি লঙ্কাদেবী, রাক্ষসরা রোজ আমার পুজো দেয়, হ্যাঁ! হাঁড়ি হাঁড়ি মোষের মাংস, টক দই—

(হনুর পিঠ ফেরা) ইকি! দেখেছ, বেড়ালটা কি খারাপ,

আমাকে ল্যাজ দেখাচ্ছে! এই খবরদার! নইলে এমনি দাঁত চিরকুটি করব যে ভয়ে পেলিয়ে যাবি!

হনুর দু পা এগোনো

ও কি! এগিয়ে আসে যে! ওরে বাবা, কামড়াবে-টামড়াবে না তো? ওরে রাগিস্ নে বাছা, তোকে দুধ-ভাত খেতে দোব, আ, আ, আ, পুস্, পুস্, পুস্!

হনু। ছিচরণে পেন্নাম করে বলি মা-ঠাকরুন, চক্ষুর কি মাথা খেয়েছ? কে বেড়াল, কে বাঁদর, তাও জান না? আমি একজন বাঁদর, তোমাদের দেশ দেখতে এইচি!

আমি একজন বাঁদর, তোমাদের দেশ দেখতে এইচি!

লঙ্কা। ওঃ, তা হলে বেড়াল নয়? আঃ, বাঁচা গেল—এই—চোপ্! বেড়ালেতে বাঁদরেতে কি তফাতটা হল শুনি? বলি, কি চাস্ তুই?

হনু। শুনেছি লঙ্কা শহরের পথঘাট সোনা দিয়ে বাঁধানো, তাই দেখতে এইচি, তা কি এমন অন্যায়টা করেছি শুনি? কিচ্ছু নিচ্ছি না, ভাঙছি না, চিবুচ্ছি না, শুধু একটু তাকিয়ে দেখব, তাতে অত রাগের কি হল, ঠাকরুন? দেখ, মেয়েরা থাকবে রান্নাঘরে, কাটবে, রাঁধবে, বাড়বে, তাদের মুখে অত গলাবাজি কি শোভা পায়?

লঙ্কা। নাঃ, আজ আমার হাতে তোর নির্ঘাৎ মরণ দেখতে পাচ্ছি! পই-পই করে বলছি এখান থেকে পালা, তা কানে তোলে না! লঙ্কা-নগর রক্ষা করা আমার কাজ। তোকে আমি ঢুকতে দোব না, পালা বলছি—

হনু। ঐ যাঃ! ও মা-ঠাকরুন, তোমার খোঁপা খুলে গেছে!

লঙ্কা। তবে রে! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! একটা চড় না খেলে মন উঠবে না দেখছি!

ছুটে গিয়ে হনুর গালে প্রচণ্ড চপেটাঘাত

হনু। উ-হু-হু। গিছি গিছি! কিঁ যেঁ কঁর! আঁমার লাঁগে না বুঝি! নেহাত আমি মেয়েছেলের সঙ্গে নড়াই করি না, নইলে তোমাকে আজ আমি মেরে মাদুর বানিয়ে দিতাম না, হ্যাঁ!

লঙ্কা। ইল্লি? তাই দিতিস্ নাকি রে? তবে দিচ্ছিস্ না কেন?

হনু। এই যে দিচ্ছি। আমার বাঁ হাতের আস্তে একটা কিল খেয়ে দ্যাখ দিকিনি কেমন মজা।

বাম হস্তে কিল মারন

লঙ্কা। (ডুকরে কেঁদে উঠে) উরি বাবা রে, মা রে, ও পিসিমা গো—ও! গেলুম গো! শেষটা একটা বাঁদরের হাতে পিটুনি খেয়ে অক্কা পেতে হবে নাকি গো! —নাঃ, তোকে আমি আর কিচ্ছু বলব না। যা, ভিতরে গিয়ে দেখে আয় গে। লঙ্কারও দিন ঘনিয়ে এসেছে। হা হতোস্মি!

পতন ও মূর্ছা

হনু। ন্যাকা! একটু ছুঁয়েছি কি না ছুঁয়েছি, অমনি উনি মুচ্ছো গেলেন! যাই, নগরটা দেখেই আসি, সীতা-মা কোথায় আছেন দেখতে হবে তো। ওটা থাক গে পড়ে, ছাগলে খেয়ে যাক।

হনুর প্রস্থান ও লঙ্কাদেবীর মিট্‌মিট্ চাওন

লঙ্কা। (উঠে বসে) শুনলে, হতভাগাটার কথা শুনলে? আচ্ছা, এক মাঘে শীত যায় না। যাও না, বাছাধন, লঙ্কানগরে, নাক্কসরা কেউ ছেড়ে কথা কইবে না। আমি ততক্ষণ এখানে বসে বসে জিরিয়ে নিই।

প্রহরীর প্রবেশ

প্রহরী। অ্যাঁ! বড় যে ডিউটির মধ্যিখানে শুয়ে আছ বড়দিদি!

এবার আমাকে বকুনি খাওয়ানোর মজা বের কচ্ছি দাঁড়াও। জম্বু-মালীকে বলে দিচ্ছি। (প্রস্থানোদ্যত)

লঙ্কা। ওরে থাম, থাম! যাস্ নি বলছি, তা হলে তোকে একটা জিনিস দোব।

প্রহরী। ঠিক দেবে তো দিদি? সেবারের মতো করবে না তো?

লঙ্কা। আরে না, না, ঠিকই দোব। সেবার—সেবার—ওরে সেবার যে আমার পেটব্যথা করেছিল।

প্রহরী। আচ্ছা তা হলে নাহয় জম্বুমালীকে বলব না। কিন্তু প্রহস্ত—ওরে বাবা রে, ওটা কি আসছে রে! না, দিদি, আমি চলি। আমার আবার ওদিকটাও পাহারা দিতে হবে [বেগে প্রস্থান

ঝড়ের মতন হনুমানের পুনঃপ্রবেশ ও হতাশভাবে বসে পড়ে কপালের ঘাম মুছন

লঙ্কা। কি? কি হল? রাবণের কিছু হয় নি তো? তার কাছে আমার অনেক টাকাকড়ি গচ্ছিত আছে যে! আহা, বসে বসে মুণ্ডু নাড়ছ কেন? কি দেখে এলে তাই বল।

হনু। আরি বাপ্! সে যে কি না দেখলাম, সে আর কি বলব! সোনার দ্যাল! হীরের ঝাড়লণ্ঠন! ফটিকের বাসন। তাতে এই বড়-বড় মাংসের বড়া, মাছের কালিয়া, ক্ষীরের সমুদ্দুর, ই—ই—ইস্! (জিব চাটন)

লঙ্কা। খুব সাঁটিয়ে এলি বুঝি!

হনু। (জিব কেটে) ও মা, ছ্যা ছ্যা, কি যে বল ঠাকরুন! আমি—আমি যে আহ্নিক না করে জলস্পর্শ করি না। কিন্তু কি যে তার সুবাস গো! তার পর দেখলাম একটা হাতির দাঁতের পালঙ্ক বেনিয়েছে, তার ওপরে মানিকের তৈরি প্রদীপ জ্বলছে, তার সুগন্ধে ভুর্-ভুর্ করছে। আর বাতির নীচে কালো মেঘের মতো কে একটা শুয়ে রয়েছে, সারা গায়ে রক্ত-চন্দন মাখা, গা ভরা গয়নাগাটি, এই বিরাট হাঁ করে নাক ডাকাচ্ছে আর একটা মশা একবার ভেতরে সেঁদুচ্ছে একবার বেরিয়ে আসছে! চার দিকে দেখলাম সব্বাই ঘুমুচ্ছে। একজনকে দেখে সীতা মা ভেবে খুব খানিকটা তাল ঠুকে নেচে নিলাম। কিন্তু দুঃখের কথা

আর কি বলব, রামচন্দ্রের কাছে তাঁর গয়নার লিস্টি মুখস্থ করেছিলাম। সে গয়না মিলল না, কাজেই উনি সীতা নন।

লঙ্কা। ও মা, সে কি! তুমি গয়না দিয়ে মানুষ চেনো নাকি?

হনু। তা নয়তো কি। মানুষদের মেয়েদের নাক চোখ মুখ বুঝি আবার আলাদা রকমের হয়? আর যদি হয়-ও, তবু পদ্মরেণু মেখে তাম্বুল চিবিয়ে, কাজল পরে, সবাই একরকম হয়ে যায়। চিনতে হয় গয়না দিয়ে। নাঃ, উঠি এখন।

এদিকে তন্ন-তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, তিনি নেই। ঐ যে দূরে বন-বাদাড় দেখছি; যাই, ওখানেই যাই, যদি পাই।

[প্রস্থান

লঙ্কা। এই রে! ঐখানেই তো সে আছে! এইবার নিশ্চয় মজা শুরু হবে। যাই, আমিও যাই, মজা দেখে আসি গে।

[প্রস্থান

ঘোষক। (বেরিয়ে এসে) উঃ! বাবা! এতক্ষণ পরে পরানটা হাতে করে বেরিয়ে পালাবার সুযোগ পেলাম। ঈস্! একটা পোড়া হাঁড়ির মতো কালামুখো বাঁদর, একটা রাক্ষসী! ভয়ে আমার হাত-পা পেটে সেঁদিয়েছিল! আরি বাপ্!

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

হনুমান, খুদে রাক্ষস, সীতা, চেড়ীবৃন্দ, রাবণ

অশোকবন

হনুমানের প্রবেশ

হনু। আরি বাপ্! আর তো পা চলে না রে! এবার একটু না বসলেই নয়। উঃফ্! ঐ শিংশপা গাছটির আড়ালে বসে আগে বাঁদুরে বিস্কুটগুলোর সদ্ব্যবহার করা যাক। তাপ্পর দেখা যাবে। বাবা! কত কষ্ট করে লুকিয়ে-চুরিয়ে জোগাড় করতে হয়েছে গো! কেউ না আবার দেখতে পেয়ে ভাগ বসাতে চায়।

গাছের আড়ালে বসে বিস্কুট-ভোজন। খুদে রাক্ষসের প্রবেশ

খুদে। (শূন্যে নাক তুলে জোরে জোরে শুঁকে)

উঁ হুঁ হুঁ! বেড়ে গন্ধটি তো! ও পিসেমশাই, আমাকে দাও!

হনু। (বিস্কুট ঢেকে) কে রে তুই? ভাগ্ বলছি। আমি তোর পিসেমশাই নই। তোর পিসেমশাই রাবণের বাড়ি গেছে। যা, যা! তুইও যা, সেখানে বড়-বড় বড়া ভেজেছে দেখে এলাম। এখানে কিছু হবে-টবে না।

খুদে। তবে আমি চ্যাঁচাই! হা—আ—আ!

হনু। (খুদের মুখ চেপে ধরে) আ সব্বনাশ! এই চুপ চুপ! এই নে ধর বিস্কুট! এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেল। কি যে করি এখন। কোথায় না তাঁকে খুঁজেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত টিকির ডগাটুকু দেখলাম না। পা ব্যথাটা সারলে, এই বনটাকে সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়াব। কিন্তু তবু যদি না পাই---?

খুদে। খাটের তলায় দেখেছ?

হনু। তুই থাম দিকিনি! খাটের তলায় দেখব আবার কি? খাট তো সব রথের চুড়োর চেয়ে উঁচু।

দূরে মলিনবেশে, দুঃখী মুখে, সীতার প্রবেশ। গায়ে সামান্য অলংকার

হনু। এই খেয়েছে! খিদে খিদে মুখ করে উটি কে আসছে? আবার না ভাগ বসাতে চায়! এ তো মহা গেরো দেখছি!

খুদে। উটি তোমার বিস্কুট খাবে না। উটি খায় না, চুল বাঁধে না। উটি সীতে। আমাকে আরেকটু দাও বলছি, নইলে—

হনু। (আঁতকে উঠে) অ্যাঁ! সীতে কি রে! ঐ কি সীতা নাকি? হ্যাঁ, তাই তো! গলার কণ্ঠিটা রামচন্দ্র যেমন বলেছিল ঠিক তেমনি দেখা যাচ্ছে তো!

উটি খায় না, চুল বাঁধে না, উটি সীতে।

খুদে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ সীতে। আমার মা ওর চেড়ি। কই, দিলে না বিস্কুট? তা হলে আমি—

হনু। (সব বিস্কুট খুদেকে দিয়ে) এই নে, নে, সবগুলো খা! আমার খিদে চলে গেছে। ঐ নাকি সীতে, অ্যাঁ! এরই জন্যে রাম-লক্ষ্মণ ইত্যাদি হেদিয়ে গেলেন? আরে, ছ্যা, ছ্যা, এর চাইতে কত সুন্দরী কিষ্কিন্ধ্যার পথে-ঘাটে গড়াগড়ি খাচ্ছে—ব্যাটা, তুই এখান থেকে যাবি কি না বল্!

খুদে। না, যাব না তো। মা বলেছে একটু নুন-লঙ্কা মেখে—এই রে! ও বাঁবা! ঐ বোঁধ হঁয় রাঁবণ এঁল!

হনু। ওরে বাবা রে! ওগুলো কি সীতাকে ঘিরে দাঁড়াল! দেখেই যে আমার পিলে চম্‌কাচ্ছে! কি ওগুলো? কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, ভাঁটার মতো চোখ? অ্যাঁ, সত্যিকার রাক্ষস নয় তো? শেষটা আমাকেই যদি চেটে খায়! কাজ কি বাপু ঘাঁটিয়ে এই শিংশপাটার মগডালেতে চড়ে বসাই যেন ভালো মনে হচ্ছে।

মগডালেতে চড়ন—সঙ্গে খুদে রাক্ষস

খুদে। অ্যাঃ, সরো না, আমি কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।

হনু। আরে বাবা! চুপ কর, এই সরে গেলাম।

খুদে। তোমার ল্যাজটা দিয়ে তা হলে আমাকে জড়িয়ে রেখে দাও, নইলে যদি ভয়ের চোটে পড়ে যাই।

অনুচরবৃন্দ সহ রাবণের প্রবেশ

সীতা। ফের এসেছিস! যা বলছি, পালা এখান থেকে, নইলে—

রাবণ। নইলে কি, রাজকন্যে? তোমার সাহস তো কম নয়! আমি একটা রাজা, আমার দোর্দণ্ডপ্রতাপ দেখে কি বলে ইয়ে—

নইলে কি, রাজকন্যে? তোমার সাহস তো কম নয়।

সীতা। আবালবৃদ্ধবনিতা—

রাবণ। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক তাই। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই ভয় পায়, সবাই আমাকে ভালোবাসে, আমার গুণ-কীর্তন করে, আর তুমি কিনা আমাকে দেখলেই দাঁত খিঁচুতে শুরু কর!

সীতা। তোকে আমি থোড়াই কেয়ার করি। জানিস, ইচ্ছে করলে আমি নিজেই তোকে ভস্ম করে এক দলা ছাই বানিয়ে দিতে পারি! নেহাত শ্রীরামের অনুমতি পাই নি বলে বেঁচে গেলি। ভালো চাস তো ভাগ এখান থেকে!

রাবণ। হাঁ, হ্যাঁ, তাই যাচ্ছি বাবা। ঠিক যেন একটা আস্ত কেউটে সাপ! এখন যাচ্ছি বটে, কিন্তু এ-ও বলে যাচ্ছি যে আর দুই

মাস দেখব, তার পর সরষে বাটা কাঁচালঙ্কা দিয়ে ঝোল সপ্সপে ঝাল রাঁধিয়ে—

চেড়িবৃন্দ। (জিবের ঝোল টেনে) চাট্টিখানি ঝরঝরে ভাত দিয়ে না মেখে—

তোকে আমি থোড়াই কেয়ার করি।

রাবণ। চোপ্! যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা! ঝোল রাঁধা হলেও তোরা কিচ্ছু পাবি নে। ভালো চাস্ তো সীতাকে পোষ মানা, তার পর না হয় দেখা যাবে।

[অনুচর সহ রাবণের প্রস্থান

দুর্মুখী। এই সীতে, শুনলি তো, বেশি তেজ দেখালে শুঁটকি মাছ হয়ে যাবি।

বিনতা। ওঃ! রাবণের রানী হতে ওঁর আপত্তি! একটা চ্যাং মাছের মতো তো রূপের ছিরি! রাবণটার পছন্দও বলিহারি! বলি, রানী হবার তোর যোগ্যতাটা কোথায় যে এত দেমাক করিস?

বিকটা। হাঁউ-মাউ-খাঁউ!

অজামুখী। অত কথায় কাজ কি ভাই, আয় জলখাবার করি।

শূর্পনখা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাই হক। বাঁবা, এখনো নাঁকের জ্বালায় মঁলুম!

ত্রিজটা। ওরে, তোরা অমন করিস নে, বরং নিজেদের খেয়ে ফেল্। এতক্ষণ ঘুমুতে ঘুমুতে সে যা স্বপ্ন দেখলুম, ভেবেও আমার গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠছে।

চেড়িবৃন্দ। কি দেখলে, কি দেখলে, দিদি?

ত্রিজটা। দেখলুম রাবণ ন্যাড়া মাথায় তেল মেখে, লাল কাপড় পরে, গলায় করবীফুলের মালা ঝুলিয়ে, পুষ্পক-রথ থেকে ধপাস্!

চেড়িবৃন্দ। এ মা, ছি, ছি!

ত্রিজটা। আরো দেখলুম, রাবণ গাধায় চেপে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে, গাধা থেকে পিছলে যেই-না কাদায় পড়া, অমনি একটা কালো কুচ্‌কুচে মেয়ে এসে, তার গলায় দড়ি দিয়ে হিড়্ হিড়্ করে টেনে নিয়ে চলল—

চেড়িবৃন্দ। এ রাম! রাবণটার যদি কোনো, আক্কেল থাকে!

ত্রিজটা। আরো দেখলুম রাম-লক্ষ্মণ এলেন, সীতা চার দাঁতওয়ালা হাতির পিঠে উঠে চাঁদ-সূর্য ছুঁলেন—ওরে তোরা সীতার পা ধরে ক্ষমা চা, রক্ষে চা, তাপ্পর এখান থেকে পালা!

চেড়িরা। পালা পালা পালা পালা!

[সকলের প্রস্থান

সীতা। হায়, হায়, আমি কি পাথর দিয়ে তৈরি যে তবুও বেঁচে আছি!

হনু। ছি, মা, অমন কথা বলতে হয় না। তুমি না জনকরাজার মেয়ে, সেই সীতা, রামচন্দ্র যাকে খুঁজতে এসে সুগ্রীবের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছেন। সেই সুগ্রীব আমাকে পাঠিয়েছেন। কত দেশে, কত বনে-উপবনে ঘুরে, শেষে সম্পাতি পাখির কথায়, সাগর পেরিয়ে, আজ সত্যি বুঝি সীতা মায়ের দেখা পেলাম।

সীতা। কে তুমি? এ-সব কথা কেন বলছ? তুমি নিশ্চয় রাবণ, আমার সঙ্গে ছলনা করছ।

হনুমানের নীচের ডালে অবতরণ, খুদে রাক্ষস তখনো সঙ্গে

সীতা। আরে, এ যে একটা সত্যিকার বাঁদর। কিন্তু চেহারাটি কি আশ্চর্য! অশোকফুলের মতো লাল গায়ের রঙ, সোনার মতো চোখ—আহা, তাই যেন হয়, বাছা, তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

হনু। রামচন্দ্র এই আংটি আপনাকে দেখাতে বলেছেন। এবার চলো, মা। আমার পিঠে চাপো। তোমাকে নিয়ে আমি সাগর পার হয়ে শ্রীরামের কাছে চলে যাই।

সীতা। ও মা, সে কি! আমার ভারে যে তুমি চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

হনু। ইচ্ছা করলেই আমি এর শতগুণ বড় হতে পারি, দেখবে?

খুদে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও দেখব! আমার মায়ের মুখটি কি বড়!

ঠিক ছাগলের মতো সুন্দর।

হনু। তুই থাম দিকিনি। বড়দের কথার মধ্যে কথা বলতে হয় না, তাও জানিস না? মা সীতা, আর বিলম্বে কাজ কি, তুমি আমার পিঠে উঠে বসো। আর আমিও সাঁ করে উড়ে পড়ি।

খুদে। ধেৎ! কি যে বল! বাঁদর আবার ওড়ে নাকি?

সীতা। না বাছা হনুমান, ও আমি পারব না। সমুদ্রের ওপর দিয়ে যাবার সময়, নির্ঘাৎ আমি মাথা ঘুরে ধপ্ করে পড়ে যাব।

খুদে। তা হলে সুরসা সাপিনী খপ্ করে তোমাকে গিলে খাবে। আর তা হলে আমার মায়ের জ্ঁলখাঁবারের কিঁ হঁবে? ও মা মা—গো—ও—ও!

হনু। এই! এই কি হচ্ছে! চোপ্ নইলে এক চড়ে তোকে তাল-গোল পাকিয়ে দেব। এই নে ধর, সুপুরি খা।

খুদে। (এক গাল হেসে) কি মজা, না?

হনু। তা হলে কি হবে, মা? এই বিকট রাক্ষুসীদের মধ্যে কি করে তোমাকে ছেড়ে যাই? সত্যি যদি খেয়ে ফেলে?

সীতা। না বাছা, সে ভয় নেই। রাবণ তা হলে ওদের আস্ত রাখবে না। তুমি নির্ভয়ে গিয়ে শ্রীরামকে আমার প্রণাম দাও, শ্রীলক্ষ্মণ-কে আশীর্বাদ দাও। আর দেখ, এই আমার মাথা থেকে চূড়ামণি রত্নটি খুলে দিলাম। এটি আমার বিয়ের সময় আমার বাবা জনকরাজা, আমার শ্বশুরের হাতে দিয়েছিলেন। এটি দেখলেই শ্রীরামের সে-সব কথা মনে পড়বে। যাও বাছা, নিরাপদে। তাঁদের শিগ্‌গির নিয়ে এসো, আমাকে তাঁরা উদ্ধার করুন।

হনু। আপনার চরণে শতকোটি প্রণাম করি, মা।

[সীতার প্রস্থান

হনু। এই আমি গেলাম বলে। কিন্তু তার আগে এই বনটাকে তছ্‌নছ্ করে দিয়ে যাব। হেই, হুপ্, হাপ্! ঝননন, রননন! মার্, মার্, মার্, কাট্, কাট্, কাট্। গাছের ডাল ভাঙ্ ভাঙ্, ভাঙ মড়্-মড়্-মড়াৎ!

খুদে। আমিও ডাল ভাঙব! ওঁ পিঁসেমশাই গোঁ, আমাকে ফেঁলে কোঁথায় চঁললে!

গাছপালা ভাঙতে ভাঙতে তুমুল কোলাহল সহ হনুমানের প্রস্থান,
পিছন পিছন খুদে রাক্ষস

তৃতীয় দৃশ্য

কালনেমি, গায়কবৃন্দ, রাবণ, দ্বারপাল, চেড়িবৃন্দ, খুদে রাক্ষস,
সভাসদ্‌গণ, বিরূপাক্ষ

রাবণের সভাগৃহ

জুড়ির গান

রামায়ণের বাহাদুর রামচন্দ্র নয়
কহ বাহু তুলে বদন খুলে
হনুমানের জয় ॥
সাগরপারের নামটি শুনে
শুষেন পাছে ভয় ॥
শতবলীর অষ্ট রম্ভা,
গয়-গবাক্ষের লয় ॥
অঙ্গদ হলেন শিবনেত্র
ভাবেই তন্ময় ॥
আর মূর্তিমান জাম্বুবান
চক্ষু বুজে রয় ॥
হাত-পা পেটে সেঁদোয় পাছে
লঙ্কা যেতে হয় ॥
ঢের ঢের বীর জানা আছে,
কেউ না লাগে হনুর কাছে,
কোথা সুগ্রীব বিভীষণ,
চটি ফেলে পলায়ন ॥
লঙ্কা গিয়ে একলা হনু
সীতার খবর লয় ।

কালনেমি। আঃ, আবার গোড়া থেকে শুরু কর, নে ধর—
(বেসুরো গলায়)—এ—এ—রাবণ রাবণ রাবণ রাবণ—

গায়করা। (সুর করে)

রাবণ বধিবে রাম-লক্ষ্মণ,
মেরে করবে ভুলোধুনো,

আহা, রাবণের কথা শুনো,
পাঠাবে শমন-সদন
ঐ দুরন্ত বিভীষণ,
রাবণ বধিবে রামলক্ষ্মণ—

প্রথম গায়ক। তার মানে কি হল, স্যার ?

কালনেমি। মানে আবার কিরে ? হ্যাঁরে, এই সামান্য জিনিসটার মানে বুঝতে পাল্লি না রে, ইডিয়ট্ ?

প্রথম গায়ক। না, না, বুঝতে পেরেছি ঠিকই, তবে কি জানেন ঐ একটু গুলিয়ে যাচ্ছে, কি বলছে তা টের পাচ্ছি নে, উ—উ—উঃ।

কালনেমি। ও কি ? ওঁ কি হচ্ছে ?

প্রথম গায়ক। চিম্‌টি কাটছে, স্যার। তা হলে মানেটা ?

দ্বিতীয় গায়ক। দুৎ! ওঁকে জিগ্‌গেস কচ্ছিস কেন ? উনি কি গাইতে জানেন, নাকি আর কিছু জানেন ?

কালনেমি। চোপ্ বেয়াদব! হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম ? ও হ্যাঁ গানের আবার মানে কি রে ? গানের বুঝি মানে হয় ?

দ্বিতীয় গায়ক। না স্যার, না স্যার, গানের শুধু সুর হয়।

কালনেমি। ও—ও! বড্ড বাড় বেড়েছে, না ? ওঠ্ বলছি, উঠে দাঁড়া! বল্, তুই-ই বল্ মানেটা কি!

দ্বিতীয় গায়ক। বলছি, বলছি। ঐ রাবণ বধিবে—অর্থাৎ কিনা রাবণকে পিটিয়ে হাড় গুঁড়ো করবে। কে করবে ?—না, রাম-লক্ষ্মণ। বুঝলে কিনা, তাতেও রক্ষে নেই, রাবণের কি হালটা হবে ? না, তাজ্জব যুদ্ধসজ্জায় বিভীষণের প্রবেশ হবে, ব্যাটা বেজায় দুরন্ত, রাবণের ঠ্যাং ধরে হিড়্-হিড়্ করে টেনে, একেবারে শমন-সদন, অর্থাৎ কিনা পুড়িয়ে-টুড়িয়ে একাকার!

সভাস্থসকলে। সাধু! সাধু! দশমুণ্ডুর একটা টিকি পর্যন্ত বাকি থাকবে না। বাঃ, বাঃ, বেশ বেশ!

প্রথম গায়ক। তাপ্পর কি হবে ?

কালনেমি। তাপ্পর কি হবে! ন্যাকা! তাপ্পর কি হবে, উনি জানেন না যেন। কোথাকার গবেট রে! তার পর রাবণ অক্কা পেলে, রাম-লক্ষ্মণ এসে লঙ্কা তছ্‌নছ্ করে দেবে, তোদের কাউকে বাকি রাখবে না। তাই বলছিলুম যুদ্ধ্ কর্, যুদ্ধ কর্।

প্রথম গায়ক। অ্যাঁ? যুদ্ধু করব? এই যে বললেন গান কর্!

কালনেমি। তুই তো আচ্ছা গাধা রে, ঠাট্টার সময় ইয়াকিও বুঝিস নে? রাবণ মলে—

দ্বারপালের প্রবেশ

দ্বারপাল। স্-স্-স্ চুপ, চুপ, রাবণ আসছে।

কালনেমি। স্-স্-স্ বসে পড়, যে যার জায়গায় বসে পড়। খোল করতাল ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ সব রেডি?—আচ্ছা, এইবার—

প্রথম গায়ক। স্যার! রাবণ আসছে? কই, তা হলে মরে নি তো? এ কি রকম অন্যায় কথা!

কালনেমি। স্-স্-স্! আরম্ভ কর, আরম্ভ কর, আহা! এটা কি পেট চুলকোবার সময় হল?

গায়কবৃন্দ। (বাদ্যের সঙ্গে)

রাবণ বধিবে রাম-লক্ষ্মণ,
মেরে করবে তুলোধুনো,

রাবণ। এই! এই! অত চ্যাঁচাস্‌নি। ও হে কালনেমিমামা, বাইরে অত হট্টগোলটা কিসের? হাতিমুখো, ঘোড়ামুখো এক পাল মেয়ে-ছেলে দেখলাম যেন।

কালনেমি। এঃ! গোলমাল নাকি? আমি গান শেখাচ্ছিলাম কিনা তাই—

রাবণ। ঢের হয়েছে, এবার ক্ষান্তি দিন। প্রহরী!

দ্বারপালের প্রবেশ

দ্বারপাল। এজ্ঞে মহারাজ!

রাবণ। বাইরে কি হচ্ছেটা কি? খেয়ে-দেয়ে মুখে পান ফেলে সভায় একটু ঘুমোতেও দিবি না নাকি? কে ওরা?

দ্বারপাল। ওরা না—এজ্ঞে ওরা অশোকবন থেকে এয়েচে, সেখানে নাকি কি হয়েচে।

রাবণ। অ্যাঁ! অশোকবনে আবার কি হল? ডাক্ ডাক্ শিগ্‌গির ডাক ওদের।

দ্বারপাল। (দরজার কাছে গিয়ে) আয়! তোমরা এবার এসো।

ছয় সাতটি রাক্ষসীর প্রবেশ, তাদের মধ্যে অজামুখী ও খুদে রাক্ষস

প্রথমা। তবে-না ঢুকতে দেবে না? এক চড়ে একেবারে সব দাঁতগুলোকে—।

দ্বিতীয়া। না, দেবে না ঢুকতে! ওর ঘাড় দেবে!

তৃতীয়া। এই সর্ ব্যাটা, দরজা থেকে। দে ব্যাটাকে ঠেলে যমের বাড়ি পাঠিয়ে।

চতুর্থা। ওর কান ছিঁড়ে দে!

পঞ্চমা। চিম্‌টি কাট্!

ষষ্ঠা। খিম্‌চে দে, খিম্‌চে দে!

সপ্তমা। এইবারে বোঝ বাছাধন! বলে নাকি ঢুকতে দেবে না!

খুদে রাক্ষস। আমি কচ্‌কচিটা খাব!

দ্বারপাল। ওরে বাবা রে! মেরে ফেললে রে!

[পলায়ন

রাবণ। (অবাক হয়ে) মামা এরা কারা? অমন কচ্ছে কেন?

কালনেমি। (মাথা চুলকিয়ে) তা আর করবে না? অশোকবন

কালনেমি তা আর করবে না? অশোকবন যে ভেঙে চুরমার!

ভেঙে চুরমার। ওদের বাসা-ফাসার আর-কিছু রাখে নি।

রাবণ। কে রাখে নি?

অজামুখী। ঐ একটা বাঁদর, মহারাজ! ভারি দুষ্টু, কত মানা করছি, শুনছে না।

রাবণ। কোথাকার বাঁদর? কি চায় সে? কেউ দেখেছে তাকে?

খুদে। আমি দেখেছি মহারাজ। আমি না—আমি ওর বন্ধুক। আমাকে বিস্কুট দেছে। ভারি ভালো বাঁদর।

অজা। এই চুপ, চুপ, পাজি বেয়াড়াকে ভালো বলতে হয় না।

রাবণ। কি চায় সে?

খুদে। তা জানি না। কি সব খাচ্ছিল মগডালে বসে। সীতেকে বলল, আমার পিঠে চাপো, আমি বোঁ করে উড়ে যাই। বাব্বা! সীতের কি ভয়, কিছুতেই গেল না! আমি হলে—

রাবণ। চোপ্। বাঁদরটার আস্পর্ধা তো কম নয়। গাছপালা নষ্ট করল, তা তোমরা কেউ বাধা দিতে পারলে না? একটা সামান্য বাঁদর দেখে ভয় পেলে?

প্রথমা। ওমা! সামান্য কোথায়! তেড়ে আসে, ভেংচি কাটে, ল্যাজ আছড়ায়, কান নাড়ে, বিকট চ্যাঁচায়!

দ্বিতীয়া। আর ল্যাজ দিয়ে পাকিয়ে ধরে এই বড়-বড় গাছ শেকড় বাকল সুদ্ধ উপড়ে আনে!

রাবণ। মামা! একটা সামান্য বাঁদর—নাঃ, এরা ঠিকই বলেছে, সামান্য নয় তা হলে। হয়তো রাম-লক্ষ্মণই বাঁদর সেজে—

সভাস্থ সকলে। (উঠে দাঁড়িয়ে)—অ্যাঁ! তাই নাকি! রাম-লক্ষ্মণ নাকি? তা হলে আমরা কোথায় যাব গো!

রাবণ। চুপ, কাপুরুষের দল! রাম-লক্ষ্মণের নাম শুনেই তোমাদের আত্মাপাখি খাঁচাছাড়া তো তারা সামনে এলে যুদ্ধ করবে কি করে। বসো, বসে যে যার কাজ কর। আমি একটু ভেবে দেখি।

যে-যার জিনিসপত্র গুছোতে ব্যস্ত হওন

প্রথম সভাসদ।—এই রে! আমার আবার স্বর্ণপটিতে জরুরি কাজ আছে। নেহাত না গেলেই নয়।

দ্বিতীয়। আমাকে যেতে হবে রথের ডিপোতে। শ্বশুরমশাই আসছেন কিনা।

তৃতীয়। ওয়াক্। পেটটা এমন মোচড় দিয়ে উঠল যে এখানে আর থাকা নিরাপদ নয়।

চতুর্থ। আমার জন্য ওদিকে দলিল-পত্র নিয়ে তিনটে লোক আবার বসে রয়েছে।

রাবণ। ওরে জম্বুমালীকে ডাক্, সে যা হয় একটা ব্যবস্থা করুক। এই তোর নাম কিরে? আমার পা থেকে জুতো-জোড়াটা খুলে দে তো বাপ্, পা দুটোকে তুলে বসি। কেমন ব্যথা-ব্যথাও কচ্ছে। তা ছাড়া সিংহাসনের তলাটাতে শুধু রাম-লক্ষ্মণ কেন, তাদের হাতি ঘোড়াও লুকিয়ে থাকতে পারে।

সভাস্থ সকলে। অ্যাঁ। (সকলের ঠ্যাং তুলে বসন)

রাবণ। কই, জম্বুবালী এখনো এল না?

প্রথম সভাসদ্। সে আসতে পারবে না স্যার, তার দাঁত কন্‌কন্ কচ্ছে।

রাবণ। কে বলেছে ওর দাঁত কন্‌কন্ কচ্ছে রে হতভাগা?

প্রথম। বাঃ! ও নিজেই তো যাবার সময় বলে গেল।

রাবণ। কি বলে গেল?

প্রথম। বলল, ভুঁড়ো ব্যাটা আমার কথা জিগ্‌গেস করলে বলিস আমার দাঁত কন্‌কন্ কচ্ছে। আমি ঘুমুতে গেলাম।

রাবণ। ঘুমুতে গেলাম? ব্যাটা আর ঘুমুবার সময় পেল না! বেশ, ও না যায় তো বিরূপাক্ষ যাক।

বিরূ। আমি, স্যার? আমি কি করে যাব? আমার না পায়ে ফোস্কা? তা ছাড়া গুরুদেব মানা করেছেন।

রাবণ। আহা! কি জ্বালা! তোমার সঙ্গে দুর্ধর, প্রঘস, ভাসকর্ণ, যুপাক্ষ, সবাই যাবে।

বিরূ। কই, কই তারা? এখানে তো কাকেও দেখছি না।

রাবণ। মামা, পাইক পাঠিয়ে তাদের ধরে এনে বাঁদরটাকে বধ করতে পাঠিয়ে দাও তো। আমি ততক্ষণ একটু ঘুমিয়ে নিই।

রাবণের শয়ন ও নিদ্রা। বিরূপাক্ষ, কালনেমি ও সভাস্থ সকলের প্রস্থান। যেতে যেতে রাবণের নাক-ডাকা শুনে রাক্ষসীদের চমক লাগন

মঞ্চের আলো নিবে গিয়ে আবার জ্বলে উঠবে। রাবণ তখনো নিদ্রিত, নাক -ডাকা চলেছে। হড়্‌মুড়্‌ করে কালনেমির প্রবেশ

কালনেমি। বলি, ও রাজা, ও ভাগ্নে, আর কত ঘুমুবে? এদিকে সবকটাই যে পটল তুলল। তুমি কখন যাবে?

রাবণ। (চমকে উঠে) অ্যাঁ, কে কি তুলল বললে?

কালনেমি। (কপাল চাপড়ে) হায়! হায়! ওদিকে লঙ্কার সর্বনাশ হতে চলেছে আর তুমি এদিকে দিব্যি নাক ডাকাচ্ছ!

রাবণ। (পেটে হাত বুলিয়ে) বড্ড খেইছিলুম কিনা। সত্যি মন্দোদরীর মতো অমন খাসা রাঁধিয়ে আর দেখলাম না। তা কে পটল তুলেছে বললে?

কালনেমি। কে তোলে নি তাই বল! দুর্ধর, প্রঘস, ভাসকর্ণ, জম্বুমালী, বিরূপাক্ষ—

রাবণ। অ্যাঁ! বল কি! একটা ছোট বাঁদরে—

কালনেমি। ছোট নয়, ভাগ্নে, ইচ্ছেমতো সে পর্বতের সমান বড়ও হতে পারে! আর সে কি যুদ্ধ! এই বড়-বড় থাম্বা নিয়ে, তাই দিয়ে পেটাচ্ছে, ঐ রথের উপর লাফিয়ে পড়ছে, ঘোড়াটোড়া সবসুদ্ধ চ্যাপটা জিবে-গজা! ঐ হাতি দিয়ে হাতি মারছে, ঘোড়া দিয়ে ঘোড়া মারছে রাক্ষসগুলোকে ইঁদুরের মতো দূরে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে আর তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

রাবণ। কি সর্বনাশ! কিন্তু অক্ষ যদি—

কালনেমি। অক্ষ? অক্ষ কি আর আছে? তাকে একেবারে ধুলোপড়া করে দিয়েছে!

রাবণ। হায়! হায়! এও ছিল কপালে।

কালনেমি। এখন কেঁদে কি হবে ভাগ্নে? তখন পই-পই করে বলি নি, ঐ সীতেটাকে এনো না, এনো না, তা কে কার কথা শোনে! সে যাক গে, এখন কুমার ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্র নিয়ে গিয়েছেন। দেখতে দেখতে, ব্যাটাচ্ছেলেকে এইখানে নিয়ে এসে ফেলবেন, দেখো। ব্রহ্মাস্ত্র আটকানো শুধু বাঁদরের কেন, রামেরও কম্ম নয়। •

নেপথ্যে। জয়, কুমার ইন্দ্রজিতের জয়।

মিলিত কণ্ঠ। হেঁইয়ো হো! হেঁইয়ো হো। হেঁইয়ো হো!

কালনেমি। ঐ বোধ হয় এল। ভাগ্নে ওঠো, ওঠো, আর ভয় নেই।

চতুর্থ দৃশ্য

রাবণ, সভাসদ্‌গণ, হনুমান, রাক্ষসগণ, নিকুম্ভ, মন্ত্রিগণ ও জনতা

রাবণের সভাগৃহ

রাবণ সিংহাসনে পা গুটিয়ে বসে ব্যস্ত হয়ে হাঁটু নাচাচ্ছেন। মন্ত্রীরা ভয়ে ভয়ে থেকে থেকে সিংহাসনের তলায় উঁকি মারছেন। সভাসদ্‌রা ও জনতা ব্যস্ত হয়ে পাইচারি করছে, দরজার দিকে তাকাচ্ছে, বাইরে যাবার সাহস হচ্ছে না।

নেপথ্যে সুর করে

মারো জোয়ান হেঁইয়ো!
আউর ভি থোড়া হেঁইয়ো।
এমনি ভারী, এমনি মোটা,
আর কোথা কেউ নেই-ও
হেঁইয়ো মারো বল্‌।

(গান)

উরি বাবারি
ব্যাটা বেজায় ভারী।
খায় শুধু গুপ্‌-গাপ্‌
ডাক ছাড়ে হুপ্‌-হাপ্‌।
অমন ভালো নগর-চুড়ো
পিটিয়ে করল গুঁড়ো গুঁড়ো
ভালোমানুষ সাজে কিন্তু
মনটা বড় খল।

আহা, অশোকবনের দশা দেখে.
চক্ষে ঝরে জল
হেঁইয়ো মারো বল্ ।

আষ্টেপৃষ্ঠে দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে হনুকে চ্যাংদোলা করে আট-দশজন রাক্ষসের প্রবেশ ও ধপাস্ করে দোর গোড়াতেই ফেলন

রাক্ষসদের গান

বলি ও রাবণ রাজা
এ কেমন দিলে সাজা ।
কাঁধে চেপে ব্যাটাচ্ছেলে
গাচ্ছে রাম নাম !
ভারের চোটে প্রাণটা বেরোয়
ঝরছে মোদের ঘাম !
ভোগের বেলা—

হনুমান। (খোঁচা দিয়ে) বলি, ও অলম্বুসের দল, একটা কি গান গাইবার সময় হল ? এইখেনেতে নামালি যে বড় ? ওঁর কাছে নিয়ে গিয়ে আমাকে ফেল্, নইলে আমাকে উনি ভালো করে অবলোকন করবেন কি করে ? এরই মধ্যে হাঁপিয়ে গেলি নাকি ? কি খাস্ তোরা ? দুব্বোঘাস বুঝি ?

বলি, ও অলম্বুসের দল, এটা কি গান গাইবার সময় হল ?

প্রথম রাক্ষস। আর পারি নে, বাপু। অত যে বল্লিমে কচ্ছিস, নিজে হেঁটে একটু যেতে পারিস নে?

হনু। ই-ই-ইস্। তোর কাজ আমি করব কেন রে? তুই মাস-কাবারে মাইনে পাস-না? তা ছাড়া, আমি বন্দীদশায় রাজসমীপে আনীত হচ্ছি, অত হাঁটা লাফানো কি শোভা পায়? নে, নে, তোল্ দিকি। আচ্ছা, আমিই নাহয় নিজের থেকে তোদের ঘাড়ে চাপছি। এই নে, ধর্! (ঘাড়ে ঠ্যাং স্থাপন)

দ্বিতীয় রাক্ষস। উ-হু-হু, ওরে বাবা রে, মরে গেলাম রে, কাঁধটার আর কিছু রইল না গো? ও রাজা, বসে বসে দেখছ কি? তোমার সামনেই কি আমাকে চ্যাপ্টা করে ফেলবে?

রাবণ। চুপ কর, বেয়াদব। কি, লাগিয়েছটা কি? এই কি তবে সেই দুর্বৃত্ত দুরাচার, যে আমার সোনার অশোকবন লণ্ডভণ্ড করে এক কাণ্ড করেছে? এ তো একটা সাধারণ কপি দেখছি—

জনতার মধ্যে থেকে। কি? কি বলছে রাবণ? ভালো করে শুনতে পাচ্ছি না। বিড়্-বিড়্ কচ্ছে কেন? গলায় জোর পায় না নাকি?

রাবণ। (চিৎকার করে) এটাকে এনেছিস কেন? একে তো একটা সাধারণ কপির মতো দেখাচ্ছে।

জনতার প্রথম কণ্ঠ। কবি? অ্যাঁ? বাঁদরটাকে কবি বলছে কেন?

দ্বিতীয় কণ্ঠ। কে জানে। কবিদের মতো মাথায় লম্বা লম্বা লোম বলে বোধ হয়।

মন্ত্রী। আঃ, তোরা চুপ করবি কি না। কবি নয়, কপি।

প্রথম কণ্ঠ। কপি? কপি কি ভাই?

দ্বিতীয় কণ্ঠ। কপি জানিস না? বাঁধাকপি, ফুলকপি, ওল-কপি। ওকে খেয়ে ফেলা হবে কি না, তাই কপি বলা হচ্ছে।

প্রথম কণ্ঠ। ও, তাই বল। আমি কপি খেতে বড্ড ভালোবাসি।

রাবণ। চোপ্। তোদের দিনরাত্ খালি খাই আর খাই। লজ্জাও করে না।

মন্ত্রী। আহা, মহারাজ, ওদের অমন বলতে নেই, ওরা হল গিয়ে আপনার প্রজা, যুদ্ধের সময় প্রাণ দেবে, ওদের চটাতে হয় না। শোনো

বাছা, কৃষ্ণপক্ষে কপি খেতে নেই। যাও, এখন যে যার জায়গায় বসো দিকিনি।

রাবণ। আমরা তো ছোটবেলায় ধামাচাপা দিয়ে বাঁদর ধরতাম। তা এটাকে ধরতে ব্রহ্মাস্ত্র লাগল কেন? ইকি! বাঁদরটা আমার দিকে অমন পিট্ পিট্ করে তাকাচ্ছেই-বা কেন?

হনু। 'অহো রূপমহো ধৈর্যমহো সত্ত্বমহো দ্যুতি!
ওহে রাবণ, পবন-নন্দন কচ্ছে তোমার স্তুতি।
যেমন বিরাট বাহু তোমার, তেমনি বুকের ছাতি,
এত রূপের সঙ্গে কেন এতটা বজ্জাতি?

রাবণ। কে এ? এ তো সাধারণ বাঁদর নয়। একি তবে শিবের অনুচর, নন্দী? নাকি অসুরদের রাজা, বাণ? একটু দেখো তো মন্ত্রী।

নিকুম্ভ। হ্যাঁরে, কে পাঠিয়েছে তোকে? কুবের? যম? ইন্দ্র? সত্যি কথা বল দিকিনি, তা হলে তোর বাঁধন খুলে দেব। মিথ্যা বললে কিন্তু পিটিয়ে পাপোশ বানাব।

হনু। বাঁধন আবার খুলবে কি গো? সে তো আপনিই খুলে গেছে। অনেক কষ্টে ধরে রেখেছি। আর কিছু থাকে তো দাও।

রাবণ। অ্যাঁ! ব্রহ্মাস্ত্র খুলে গেছে মানে? সে আবার খোলে নাকি?

নিকুম্ভ। আরে, সত্যিই তো তাই দেখছি! এটা কি করে সম্ভব হল ভেবে পাচ্ছি না।

হনু। মহারাজ, এ গবেটটাকে পেন্সিল দিয়ে দিন। ব্রহ্মাস্ত্রের ওপর শনের দড়ি পড়লে যে ব্রহ্মাস্ত্র খুলে যায়, আহাম্মুকটা তাও জানে না! ওরে ব্যাটা, মাছের মুড়ো খা, বুদ্ধি বাড়বে।

সভাসদ্‌রা (বেঞ্চির ওপর চড়ে) অ্যাঁ! তাই নাকি! বাঁধন খোলা নাকি। যদি কামড়ায়? ও বাবা! তবে আমরা এখন বাড়ি যাই, খাবার সময় হয়ে গেছে, স্ত্রী ছেলেপুলেরা বসে আছে—!

সকলের পাশের দরজার দিকে অগ্রসর হওন।

রাবণ। চোপ্! যে যার আসনে বসো গে। (হনুকে) বাছা, তুমি কি চাও?

হনু। চাই তো অনেক কিছুই, কিন্তু দিচ্ছে কে? আপাতত মা জানকীকে ছেড়ে দিলেই খুশি থাকব।

রাবণ। (চিৎকার করে) বাঁদরটার তো বড় বেশি আস্পর্ধা দেখছি! বন্দী অবস্থাতেও চোখ রাঙাচ্ছে!

হনু। ও মা! বলে কি। চোখ রাঙালাম কোথায়? আমি বাঁদর কিনা, আমার চোখটাই লালমতন। সত্যি রাঙালে তোমার দাঁত-কপাটি লেগে যেত। তোমার জন্যই বলছি, সীতা-মাকে ছেড়ে দাও। নইলে তুমি, তোমার রানীরা, ছেলেপুলেরা, ভাইবোন, পিসেমশাই, কালনেমিমামা, সভাসদ্, অনুচর, ভাই-বেরাদার, লোক-লস্কর, মায় লঙ্কাশহর কিচ্ছুর বাকি থাকবে না, সব ধুলোপড়া হয়ে যাবে।

সভাসদ্‌রা! (এক বাক্যে) না, না, না, না, আমরা এ বিষয়ে কিচ্ছু জানি না, ঠাকুরমশাই মানা করেছেন, তা ছাড়া আমরা কেউ সেখানে ছিলাম না।

রাবণ। চোপ্! কাপুরুষের দল! দেখো, বাঁদর, তোমার অনেক বেয়াদবি সহ্য করেছি, কিন্তু আর নয়। বুঝতে পারছি তুমি রামের লোক, নইলে ইঁদুর বাঁদর নিয়ে লঙ্কা আক্রমণ করার সাহস আর কার হবে? তোমার উচিত সাজার ব্যবস্থা করছি। মন্ত্রী, একে বধ করা হোক।

নিকুম্ভ। সহজে মরবে বলে তো মনে হয় না, যা ঠ্যাঁটা! তা ছাড়া—

রাবণ। থামলে কেন, মন্ত্রী? তা ছাড়া কি?

জনতার মধ্যে থেকে। ও বলতে ভয় পাচ্ছে, রাজা। পাছে ভালো কথা কানে গেলে তুমি রেগে যাও।

রাবণ। নির্ভয়ে বলো, মন্ত্রী। তা ছাড়া কি?

হনু। কি আবার তা ছাড়া? ও বলতে চায় দূতকে বধ করা মহাপাপ। তার মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢালা যেতে পারে। তাকে লাঠিপেটা করা যেতে পারে। ঠ্যাং ভাঙা, কান ছেঁড়া, মাথা নীচের দিকে করে গাছ থেকে ঝুলোনো, এই-সবই চলতে পারে, কিন্তু বধ করা যায় না।

রাবণ। যায় না বুঝি? কেন যায় না?

নিকুম্ভ। কি যেন একটা হয়, ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ভারি খারাপ কিছু।

রাবণ। বেশ, তোমাদের সকলেরই যখন তাই ইচ্ছা, তখন তাই হোক।

হনু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ভালো। নইলে আমাকে বধ করলে রাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে, তোমাদের সাহসের কথা কে বলবে, শুনি? ঐ সাগর লাফিয়ে যাওয়া তোমাদের কম্ম নয়। তা ছাড়া, আমি নিজে গিয়ে সব কথা বুঝিয়ে না বললে, তাঁরা না আবার ভেবে বসেন যে আমাকে দেখেই তোমাদের মুখগুলো দিস্ কাইন্ড অফ্ স্মল্ হয়ে গেছে, কিছু বলতেও সাহস পাচ্ছ না। আর সব চাইতে বড় কথা হল বধ করলে যদি শেষটা সত্যি সত্যি মরে যাই, তা হলে কি হবে?

রাবণ। চো—প্। নাঃ এ তো আর সহ্য করা যায় না। এ হতভাগাটার ল্যাজে আচ্ছা করে ন্যাকড়া জড়িয়ে—

প্রথম রাক্ষস। অত ন্যাকড়া কোথায় পাব, স্যার? দেখছেন না, চোখের সামনে বাঁদরটা কেমন হু-হু শব্দে বেড়ে যাচ্ছে!

রাবণ। কোথায় পাব আবার কি? কেন, তোদের পরনে কাপড়-জামা নেই? তার থেকে ছিঁড়ে নিবি। তাতে বেশ করে তেল ঢেলে—যে যার বাড়ি থেকে তেল আনবি—হ্যাঁ, কি যেন বলছিলাম, বেশ করে তেল ঢেলে, আগুন ধরিয়ে, সারা শহরময় ব্যাটাকে ঘুরিয়ে আনবি। সবাই দেখুক রাবণের সঙ্গে যারা বেয়াদপি করে, তাদের কি দশা হয়। যা এখন, একে তুলে নিয়ে চলে যা।

হনু। দেখো, বাপু, সাবধানে তুলো। আমার আবার বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা কন্‌কন্ করে, তেঁতুল খেলে বাড়ে, উটিতে হাত দিয়ো না। নাও, তোলো, ওয়ান-টু-থ্রি!

জনতার মধ্যে। হি-হি-হি, বাঁদরটা তো বেড়ে মজার রে! চ' চ' সঙ্গে যাই।

হনু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাবে বৈকি, শহরের কোথায় কি দ্রষ্টব্য জিনিস আছে, দেখিয়ে দিবি তো? চল্, যাওয়া যাক। ন্যাকড়া জড়ানো, আগুন ধরানো, এ-সব পারবি তো? নাহয় বলে দেব। চল্, চল্, দুর্গা দুর্গা।

পঞ্চম দৃশ্য

হনুমান, কালনেমি, লঙ্কাদেবী, খুদে রাক্ষস, উনুনমুখো ও অন্য রাক্ষস

রাবণের প্রাসাদের প্রাঙ্গণ

হনুমানের ল্যাজে ফালা ফালা ন্যাকড়া জড়ানো হচ্ছে

কালনেমি। আহা! তোদের যা কাণ্ড! অতটুকু ফালিতে কি হবে? পাহাড় পাহাড় নিয়ে আয়। ব্যাটা লক্ষ্মীছাড়ার বপুখানি দেখছিস নে?

হনু। দ্যাখ বাপু, কথায় কথায় অমন খুঁড়িস নে বলছি। বলি তোর ভাগের খেয়ে এতটা মোটা হইচি নাকি? বেশি বকবক করলে এক চড়ে ইদিককার দাঁতগুলো উদিক দিয়ে বের করে দেব।

কালনেমি। আচ্ছা, বাবা, আচ্ছা। এই তোরা সব হাঁ করে দেখছিস কি? যা, আরো ন্যাকড়া আন।

প্রথম রাক্ষস। আর কোথায় পাব, স্যার? এর উঠোন থেকে, ওর খাট থেকে, তার বাড়ি থেকে যতগুলো এনেছিলাম সব শেষ! আর নেই।

কালনেমি। আর নেই মানে? নেই বললেই হল কিনা! দ্যাখ ঠাট্টার সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না। যেখান থেকে পারিস নিয়ে আয়।

লঙ্কাদেবী। যত সব ন্যাকা! কেন, রাবণরাজা বলে নি তোদের পরনের কাপড় ছিঁড়ে সলতে পাকা। তার খানিকটে আমাকেও—

কালনেমি। ঠিক বলেছ, ঠাকরুন! এই ব্যাটা, দে তোর ধটিটা খুলে দে দিকিনি। ওরে উনুনমুখো, আগে ওরটা ফালা ফালা করে ছিঁড়ে তার পর তোর নিজেরটাকেও— ইকি! এরা সব পালাচ্ছে কেন? শেষটা কি আমাকে কাজ করতে হবে নাকি? এই হতভাগারা, বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথা?

রাক্ষসরা। আমাদের—আমাদের এখন খাবার সময়—

কালনেমি! ফের মিথ্যে কথা! তোদের শূলে দেব, জেলে দেব, মাইনে কাটব! ও হনুমান, দ্যাখ তো বাপ্, এ আবার কি গেরো! যা হয় একটা কিছু কর, অমন শুয়ে শুয়ে মুচকি হাসলে চলবে কেন?

হনু। (মাথা তুলে) ওরে, নারে, আর দরকার নেই রে!

এতেই ঢের হবে। মামার যা বুদ্ধি! আয়, আয়, আয়, মামা সবাইকে বিস্কুট দেবে। (রাক্ষসদের ফিরে আসা)

রাক্ষসরা কই? কোথায় বিস্কুট? আমরা বড়-বড় নেব।

হনু। হ্যাঁ হ্যাঁ তাই নিবি, মামা সব দেবে। এখন ঐ সরু ফালি-গুলোকে নিয়ে আমার ন্যাজের ডগা থেকে জড়াতে শুরু কর্ দিকিনি। (রাক্ষসদের তথাকরণ)

হনু (চিৎকার করে) উঃ! কি আরম্ভ করেছিস তোরা? অত টাইট্ কচ্ছিস কেন রে ব্যাটারা? আমার লাগে না বুঝি! ই—স্ দেখেছ! ন্যাজটাকে এঁটে একেবারে পেন্সিল বানিয়ে ফেলল গো! খোল্ খোল্, ঢিল দে বলছি!

প্রথম রাক্ষস। কি করে খুলি? গিঁট পড়ে গেছে যে! (ব্যাণ্ডেজ ধরে টান)

হনু। (বিকট চিৎকার) উঃ—উফ্! ছাড়্ ছাড়্! আচ্ছা আমিই নাহয় একটু ছোট হয়ে বাঁধন ঢিলে করে নিচ্ছি! হ্যাঁ এই বেশ! কই, তেল কই? তেল আনিস নি, আহাম্মুক? আচ্ছা, ঐ লণ্ঠনটা থেকেই নাহয় খানিকটা ঢেলে নে। ই কি! ব্যাণ্ডেজটা আবার ঝুলে পড়ছে কেন? সেপ্‌টিপিন লাগাস নি বুঝি? নাঃ, তোদের নিয়ে পারা গেল না দেখছি! যেটাই না দেখব, সেটাই ভণ্ডুল! বলি ও কালনেমি মামা।

কালনেমি। না, না, না, আমার সেপ্‌টিপিন আমি দিতে পারব না। বরং গিঁট পাকাও।

হনু। সে কথা বলছি না। আমি বলি কি, এখন একটু টিপিনের ছুটি হোক-না কেন? চ্যালা-চামুণ্ডারা যে না খেয়ে-খেয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। একটু নিমকি, মাছের চপ, আলুকাবলি, ঝালচানা—কি বল?

খুদে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই হোক, তাই হোক!

কালনেমি। না, না, বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখন বলে টিপিন খাব। তাপ্পর বলবে জিরুব। তাপ্পর বলবে আজ থাক, কাল হবে। অত দেরি করলে চলবে না, বাছা আর গোলমাল পাকিয়ো না, জাদু। তোমার ন্যাজে আগুন দিয়ে, পাড়াময় ঘুরিয়ে, লোকেদের শিক্ষা দিয়ে, তবে আমি বাজার যাব। খিদে পেয়ে থাকে, নাহয় ফিরে এসে যাহোক কিছু মুখে দিয়ো। কই, দে দিকি অয়েল-ক্যানটা। ই কি! এতে নেবুর গন্ধ কেন? (কিঞ্চিৎ চাখন) আ সর্ব্বনাশ! এ যে বাল্লির শরবত!

হনু। (উঠে বসে) কই, কই বাপ্পির শরবত ? আমি বড্ড ভালোবাসি। (টেনে নিয়ে গলায় ঢালন) আঃ নতুন প্রাণ পেলেম !

খুদে। আমিও! আমিও! ঐ দেখ দিচ্ছে না!

হনু। নে নে ধর! আঃ, প্রাণটা জুড়োল। (শুয়ে পড়ন) কই, দে দিকিনি দেশলাই।

কালনেমি। দেশলাই? কই দেশলাই ? ওরে উনুনমুখো ম্যাচিস আন্।

উনুনমুখো। কোথায় পাব স্যার ?

হনু। কি জ্বালা! আরে ঐ লণ্ঠনটা থেকে ধরাতে পারিস না রে, ব্যাটারা ?

কালনেমি। আচ্ছা, তাই হোক, তাই হোক। হ্যাঁ, এইবার ঠিক হয়েছে! তা হলে বল সবাই একসঙ্গে, জয়, রাবণের জয়।

হনু। (লাফিয়ে উঠে) হাঁ হাঁ হাঁ ও কি হচ্ছে ? আমি না রামের অনুচর ? আমার ন্যাজে দেশলাই দেবার সময় বলবি : রামচন্দ্রের জয়! তাপ্পর তোদের মগজে যখন দেশলাই দেওয়া হবে, তখন বলবি :

রাবণ রাজার জয়!
গোবুদ্ধি কারে কয়!
সীতা-মাকে আনলি ধরে
মরবি সুনিশ্চয়!

—কই, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস যে ? ম্লাই দে, ম্লাই দে! না থাকে তো নিদেন লণ্ঠনটাই দে। আচ্ছা, এই নে দেশলাই, আমার ট্যাকেই ছিল। বল্ তা হলে রামচন্দ্রের জয়!

কালনেমি। [দেশলাই ধরে] উঁ হুঁ হুঁ! নড়ো না বলছি, হনু, শেষটা যদি গায়ে আগুন লেগে যায়, তখন আমাকে দোষ দিলে চলবে না বলছি। হ্যাঁ, এই হয়েছে! ও কি। ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে দিলি কেন, পাজি? আর মোটে একটা কাঠি আছে।

হনু। আহা! আমার চোখে ধোঁয়া লাগে না বুঝি! তার চেয়ে এক কাজ কর্, আমাকে তুলে বাইরে নে চল্। সেখানে গিয়ে ধরানো যাবে। নে তোল্ দিকিনি। বল্, রামচন্দ্রের জয়!

সকলে। রামচন্দ্রের জয়!

অনেক কষ্টে হনুকে তুলে, মিলিত কণ্ঠে গান

হনুমানের ন্যাজের আগায়
আগুন জ্বালো, আগুন জ্বালো।
ব্যাটা, ন্যাজ দিয়ে মাছি ভাগায়,
কেসিন ঢালো, কেসিন ঢালো।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

চেড়িরা, খুদে রাক্ষস, রাক্ষসগণ, সীতা, হনু, বাঁদরের দল

অশোকবনের নিকটস্থ রাজপথ

ব্যস্ত হয়ে চেড়িদের ঘোরাঘুরি। লঙ্কাদেবী সহ এক দল রাক্ষসের হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ

প্রথমা। বলো না গো, কি সব্বনাশটা হচ্ছে? আকাশ লালে লাল! ফট্‌ফট্‌ হুড়্‌মুড়্‌ শব্দ। এ কি প্রলয় শুরু হল নাকি গো?

খুদে। ও মা! সে কি! মোটেই পেলয় নয়। ও আমার বন্দুক হনুমান মজা কচ্ছে!

দ্বিতীয়া। তা বাপু, তোমার বন্ধুর মজা করার রকমটি তো বেশ! কিন্তু হচ্ছেটা কি তাই শুনি?

খুদে। ওমা, তাও জান না বুঝি? হনুমান বলল কি না আমাকে বধ করে কাজ নেই, শেষটা যদি সত্যি মরে যাই! তাই রাবণ রাজা বললেন: বেশ, ব্যাটার ন্যাজে ন্যাকড়া জড়িয়ে, তেল ঢেলে, আগুন জ্বেলে, শহরে বেড়াতে নে যাও।

তৃতীয়া। ওমা কি কাণ্ড! তাপ্পর কি হল?

প্রথম রাক্ষস। হল কি জান, যত ন্যাকড়া জড়ায়, হনুমান ততই বড় হয়। তাই দেখে এই লঙ্কা ঠাকরুনের কি রাগ। বললেন, থাক আর জড়িয়ে কাজ নেই, ওতেই হবে! শেষটা আমার মন্দিরের প্রদীপে সলতে দেবার জন্য এক চিলতে ত্যানাও বাকি থাকবে না। এবার তেল ঢেলে আগুন লাগাও!

প্রথম চেড়ি। ব্যাটা তখন খুব জব্দ হল নিশ্চয়।

দ্বিতীয় রাক্ষস। জব্দ না আরো কিছু! চোখ মুদে বলে কিনা, আঃ কি আরাম! ঠিক যেন চন্দন মাখাচ্ছে! একটুও গা পুড়ছে না দেখেছিস?

খুদে। হ্যাঁ, খালি ন্যাকড়াগুলো পুড়ছিল, তার কি গন্ধ রে বাবা! আমাকে দেখে হনুমান বলল—ন্যাজ পুড়বে কি করে রে, আমি যে পবনের পুত্র, বাবা সব উড়িয়ে নে যাচ্ছে!

সীতার প্রবেশ

সীতা। কি হয়েছে? ও কিসের শব্দ? আকাশ লাল কেন? আমার বড় ভয় কচ্ছে।

দ্বিতীয়া চেড়ি। হবে আবার কি, ঠাকরুন তোমার পেয়ারের সেই

হবে আবার কি, ঠাকরুন!

তাঁবামুখো বাঁদরটা এদিকে পুড়ে শিক-কাবাব! তার বেশি কিছু হয় নি।

সীতা। হা ভগবান! এ-ও লিখেছিলে আমার কপালে!

রোদন

খুদে। এ রাম ছিঃ! বুড়ো ধাড়ি মেয়ে আবার কাঁদে। তা ছাড়া সব মিছে কথা, মোটেই হনুমান পোড়ে নি। সে আমাকে বলল, দেখেছিস রাস্কেলগুলোর আস্পদ্দা, দেখেছিস? আমার ন্যাজে আগুন দেওয়া! দাঁড়া, মজা দেখাচ্ছি! এই-না বলে, অত বড় শরীরটাকে গুটিয়ে এই এতটুকুন করে ফেলল। ব্যস্! সব দড়িদড়া খস্-খস্ করে খসে পড়ে গেল।

দ্বিতীয়া। তাপ্পর? তাপ্পর?

লঙ্কা। (কাষ্ঠ হেসে) তাপ্পর? হা সব্বনাশ, তাপ্পর ব্যাটাচ্ছেলে লম্বপাহাড়ের সমান উঁচু এক লাফে পগার পার। ন্যাজে দাউ-দাউ

লম্বপাহাড়ের সমান উঁচু এক লাফে পগার পার।

আগুন জ্বলছে, যেখানেই যাচ্ছে সব বাড়িঘর পুড়ে ছাই। সঙ্গে-সঙ্গে সে কি হাওয়া! হু-হু করে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে আমার সোনার লঙ্কা পুড়ে কাঠ-কয়লা! এখন আমার ভোগের কি ব্যবস্থা হবে, তাই বল্ তোরা! ক্ষীর, সর, মোষের মাংসের কালিয়া—হায় হায়! সব গেল!

সীতা। আর হনুমান ? তার কি হল ?

খুদে। (হেসে) কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, তাকে ধরতে পাল্লে, তবে তো কিছু হবে। যে কাছে যায়, তার মাথা ফাটিয়ে চীনে-পটকা। তাপ্পর দিব্যি সুন্দর সমুদ্রের জলে ন্যাজ ডুবিয়ে আগুন নিবিয়ে, বলল, উঃ তোদের দেশে বড্ড ধোঁয়া রে। দে তো আমার মুখে একটা বড় দেখে মিঠে পান ফেলে দে দিকিনি। যেই-না পানটা দিয়েছি, অমনি হুপ্ করে পগার পার।

অজামুখী। অ্যাঁ। পান কোথায় পেলি বল্, হতভাগা। আমার কৌটো থেকে নিয়ে থাকিস যদি, তা হলে তোর কানদুটোর কিছু রাখব না। (কান পাকড়ানো)

খুদে। আঃ। উঃ। ছাড়ো মা, বড্ড লাগে। তোমার পান নয়। তোমার পান ঝাল, তেতো। যেই-না সবাই রাবণের সভা থেকে মজা দেখতে বেরিয়ে এসেছে, অমনি আমিও ইন্দ্রের ভরতি করে পান নিয়ে, পালিয়ে এসেছি। আরে, ঐ তো হনুমান আসছে। এদিকে বন্দুক। এদিকে। ই কি। এরা সব পালায় কেন ?

হনুমানের প্রবেশ। সীতা ও খুদে ছাড়া সকলের পলায়ন

হনু। (সীতার পায়ে পড়ে) উঃ। তুমি তা হলে পুড়ে থাক্ হও নি, মা-সীতে। যা ভয় হল, কি জানি রাগের মাথায় তোমাকে সুদ্ধু বেগুন-পোড়া বানিয়ে ফেলি নি তো। তাপ্পর দেখি, অশোকবন যেমন সবুজ তেমনি সবুজ। বাবা, ধড়ে প্রাণ এল। এবার তবে বিদায় দাও, মা, শ্রীরামকে গিয়ে সব কথা বলি।

সীতা। দুদিন জিরিয়ে গেলে হত না, বাছা ?

খুদে। তোমার যেমন কথা। বাড়িঘরের কিছু রেখেছে যে জিরুবে ? না, বাপু, তুমি কেটে পড়। আর দেশে আবার যখন আসবে, আমার জন্য বেশি করে বাঁদুরে বিস্কুট এনো, কেমন ?

হনু। তথাস্তু। এবার তবে বিদায় দাও, মা।

[সীতাকে প্রণাম করে প্রস্থান

সীতা। নিরাপদে যাও, বাছা। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।

বাঁদরদলের প্রবেশ ও গান সহ নৃত্য

প্রথমদল। রামায়ণের বাহাদুর রামচন্দ্র নয়,
বল বাহু তুলে, বদন খুলে,
হনুমানের জয়।

দ্বিতীয়দল। অবাক হল রাবণরাজা,
লঙ্কা পুড়ে আলুভাজা,
হনুমানে দিলে সাজা,
উল্‌টো ফল-ই হয়।

প্রথমদল। কর হনু গুণ-গান!
উট-কপালের দু পাশেতে
হের বাঁধাকপি কান!

দ্বিতীয়দল। রামায়ণ-কথা সোটা-
লেমনেড্‌ সমান।
রামায়ণের বাহাদুর ইত্যাদি

উপেন্দ্রকিশোর

উপেন্দ্রকিশোর

প্রথম অধ্যায়

সে ছিল অন্য একটা কলকাতা। সত্তর পঁচাত্তর বছর আগেকার কথা, পথঘাট সব সরু সরু, রাতে জ্বলে গ্যাসের বাতি আর তেলের বাতি। বিজলীর তখনো চল হয় নি, লাইনের ওপর দিয়ে ঘড়্ ঘড়্ করে বিরাট ঘোড়ায় টানা ট্রামগাড়ি চলে। সে এক দেখবার জিনিস। রোদ বৃষ্টি বাঁচাবার জন্য ঘোড়ার মাথায় টুপি পরানো, তার ওপর দুটো ছ্যাঁদা দিয়ে ঘোড়ার কানদুটো বেরিয়ে রয়েছে। লোক বোঝাই ভারী গাড়িকে দুটো ঘোড়ায় আর কদ্দূর টানবে, কিছুদূর গিয়েই তাই থামতে হয়, ঘোড়া বদল করতে হয়। মোটর-বাস্ কেউ চোখেও দেখে নি, ট্যাক্সি নেই, এবাড়ি ওবাড়ি যেতে হলে সবাই ছ্যাকড়া-গাড়ি চড়ে, নয় তো পুরুষরা হেঁটে যায়, মেয়েরা চাপে পালকি। কনুই দুলিয়ে দুলিয়ে ষণ্ডা ষণ্ডা পালকি বেহারারা, হাঁই-হুঁই করতে করতে, দেখতে দেখতে গলি পেরিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে, একেবারে অন্দরের উঠোনে পালকি নামায়।

দুপুরবেলায় পথঘাট নিঝুম, ঝাঁকা মাথায় চুড়িওয়ালা হেঁকে যায়—বেলোয়ারি চুড়ি চাই, বালা চাই—? সন্ধেবেলায় কুলপি বরফওয়ালার, বেলফুলওয়ালার গলা শোনা যায়। আরেকজন ডাকে—সাড়ে বত্রিশ ভাজা! —বত্রিশ রকম শস্য, নারকেল ইত্যাদির সঙ্গে আধখানা শুকনো লঙ্কা ভেজে এই উপাদেয় সামগ্রীটি তৈরি হয়।

তখন দিন-কালই ছিল আলাদা, বড়লোকরা বড়-বড় জুড়ি-গাড়ি চড়ে সন্ধেবেলায় গড়ের মাঠে কিম্বা গঙ্গার ধারে হাওয়া খেতে যেতেন।

ফ্যাসানেবল ছোকরারা অনেকে এক ঘোড়ায় টানা টম্‌টম্‌ গাড়িও হাঁকাতেন তবে মোটর গাড়ি খুব আধুনিক, খুব সাহসী দু-চারজনা আনালেন আরো কিছুদিন পরে; অবিশ্যি বিলেত অ্যামেরিকাতেও তো তার খুব বেশিদিন আগে মোটরগাড়ি তৈরি হয় নি।

এই পুরোনো কলকাতার উত্তর দিকে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের তেরো নম্বরের বাড়িটা ছিল প্রকাণ্ড তিনতলা একটা লালচে রঙের দালান। বহু লোকের সেখানে বসবাস, সবাই ভাড়াটে, তার মধ্যে একটা মেয়েদের স্কুল আর বোর্ডিং পর্যন্ত রয়েছে। স্কুলটার নাম 'ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়', ছোট-ছোট ছেলেরাও নীচের ক্লাসে পড়ে, আর যেই-না বিকেলে স্কুল ছুটি হয়, যে যার জল খাবার খেয়ে বাড়ির মস্ত ছাদে উঠে সে যে কি দারুণ দাপাদাপি, হুটোপুটি, লাঠি নিয়ে এ ওকে তাড়িয়ে বেড়ানো, কানামাছি, কিৎ কিৎ সে আর বলে শেষ করা যায় না।

ঐ বাড়ির দোতলায় একজন আশ্চর্য মানুষ থাকতেন, ফরসা সুন্দর চেহারা, কালো কোঁকড়া দাড়ি আর সমস্ত দেহ থেকে ঝরে পড়ছে এমন একটা সুষমা, যে দেখছে সেই মুগ্ধ হচ্ছে। মানুষটির নাম ছিল উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। আর শুধু সুন্দর চেহারা কেন, ওরকম গুণী লোকও সচরাচর দেখা যায় না। যেমন ভালো ছবি আঁকতেন, তেমনি চমৎকার বেহালা বাজাতেন আর কলমটি তুলে যেই-না ছোটদের জন্যে লিখতে শুরু করতেন, অমনি কলমের আগা দিয়ে মধু ঝরত। যে-কোনো দেশে এ ধরনের মানুষ কালে-ভদ্রে এক আধটা জন্মায়। ওদিকে বৈজ্ঞানিক প্রতিভাও ছিল অদ্ভুত, ছবি তুলে ও ছবির ব্লক তৈরি করে দেশে-বিদেশের ছবি ছাপার জগতে যুগান্তর এনে দিয়েছিলেন।

একটা সময় ছিল যখন, কলকাতায়, আর শুধু কলকাতায় কেন, সারা বাংলাদেশের বাইরেও যেখানে যত প্রবাসী বাঙালী ছিলেন, তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা সবাই আশ্চর্য মানুষটির নাম জানত। প্রতি মাসের গোড়ায় কবে তাঁর নিজের হাতে আঁকা ছবি দিয়ে মোড়া 'সন্দেশ' পত্রিকাটি এসে পৌঁছবে তার জন্যে তারা পথ চেয়ে থাকত। তবে এ-সব অনেক পরের কথা, ততদিনে তেরো নম্বরের বিশাল বাড়িখানি ছেড়ে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর অন্য জায়গায় উঠে গেছেন। কিন্তু ছোটদের সুন্দর ছবি দেওয়া বই লেখার চিন্তা, তাদের জন্য ভালো একটা কাগজ বের করার স্বপ্ন, দানা বেঁধেছিল ঐখানে।

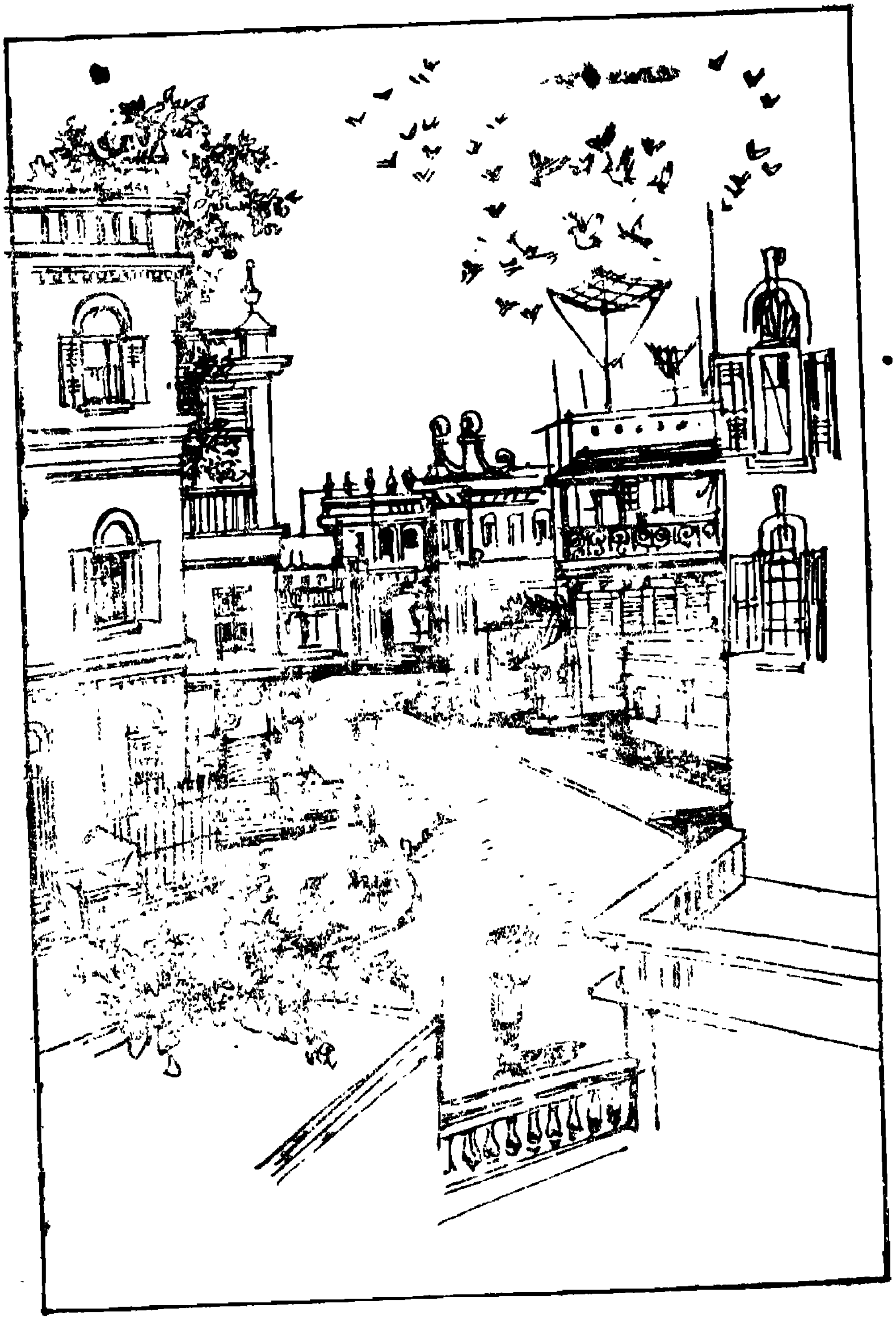

দুপুরবেলায় পথঘাট নিঝুম, ঝাঁকা মাথায় চুড়িওয়ালা হেঁকে যায়...

সারা বাড়ি জুড়ে ছোট ছেলেমেয়েদের গলার শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। স্কুলের ছেলেমেয়েরা তো ছিলই, তার উপরে উপেন্দ্রকিশোরের নিজের বাড়িতেও বেশ কয়েকজন ছিল, আবার এদিক ওদিক থেকে আরো কজনা জুটে তাদের সংখ্যা আরো বেড়ে গেল। তিনতলায় থাকতেন উপেন্দ্রকিশোরের শ্বশুরমশায়, সেকালের নাম করা তেজী সমাজসেবক দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর বিখ্যাত দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি ভারতের প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট তো বটেন, তার উপর প্রথম পাশ করা মহিলা ডাক্তারও। এমন-কি, সেকালে যখন খুব কম লোকই বিলেত যেত, তিনি সে সময়ে একলা সেখানে গিয়ে খেতাব নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর ছিল ঘর ভরা ছেলে মেয়ে। উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে মামা মাসি হলেও, খেলাধুলোর অন্তরঙ্গ বন্ধুও তারা।

সত্যি কথা বলতে কি, বাড়িটাতে যেন সব সময় একটা শিশুদের মেলা লেগে থাকত। সামনেই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দির, মাঘ মাসে সেখানে উৎসব হয়। ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যও একটি বিশেষ দিনে বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, সেদিন তারা দলে দলে রাস্তা পার হয়ে তেরো নম্বরের মস্ত ছাদে সারি সারি পাত পেড়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত। সারা বাড়িতে একটা আনন্দের হাওয়া বইত।

ঐ বাড়িটার একটা বিশেষত্ব ছিল। সেখানে অনেকগুলি পরিবার এসে বাসা বেঁধেছিল, যারা ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়েছে বলে আত্মীয়-স্বজনরা তাদের ত্যাগ করেছিল। এ ধরনের লোকদের ভারি একটা মনের বলিষ্ঠতা থাকে, তাঁরা যেটাকে সত্য বলে জেনেছেন, তার জন্যে করতে পারেন না এমন কাজ নেই। টাকা-পয়সার লোভ তাঁদের কাছে ঘেঁষতে পারে না। নিজেরা যেটাকে বিশ্বাস করেন, পাঁচজনের কাছে তাকে প্রকাশ করবার সাহস তাঁদের থাকে, যদিও তাঁরা ভালো করেই জানেন এর জন্যে তাদের নিন্দার গ্লানি সইতে হবে, হয়তো সত্যিকার বিপদেও পড়তে হতে পারে। যে জিনিস না চাইতেই পাওয়া যায়, সে যত ভালোই হোক-না কেন, তার মূল্য খুব বেশি হয় না। কিন্তু যার জন্য সারা জীবন খাটতে হয়, ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, দুঃখ বরণ করতে হয়, তাকে অবলম্বন করেই মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে। ঐ বাড়িটার বাসিন্দাদের মধ্যেও এইরকম মনষ্যত্বের বিকাশ দেখা যেত।

তখনকার সময়টাই ছিল ঐরকম। সেটা ছিল পুরোনো অকেজো নিয়ম ভেঙে ফেলে দিয়ে, বুদ্ধির আলোতে উজ্জ্বল নতুন একটা জীবন-যাত্রাকে প্রতিষ্ঠা করার যুগ। বিলেতে তখন মহারানী ভিক্টোরিয়া রাজত্ব করছেন, ভারি ধর্মভীরু মহিলা ছিলেন তিনি। তখন ভারতবর্ষও ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটা অংশ, সেখানকার চিন্তাধারার ঢেউ এসে আমাদের দেশেও লাগত।

বিলেতেও যেমন সেই সময়ে একসঙ্গে অনেকগুলি আশ্চর্য প্রতিভাবান মনীষীর দেখা পাওয়া গিয়েছিল, যাঁরা চিন্তার স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্যে প্রাণ দিতে পারতেন, আমাদের দেশেও ঠিক তাই হয়েছিল।

একদল লোক প্রাচীন হিন্দুয়ানিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন; অন্য দিকে ইংরিজি নিয়মে শিক্ষিত অতিশয় গুণী একদল যুবক পুরোনো ও দিশি যা-কিছু সব দূর করে দিয়ে, দেশে একটা নকল ইংরেজিয়ানা খাড়া করতে চাইতেন। মাঝখান থেকে দেশটার যে কি সর্বনাশ হত বলা যায় না, যদি কয়েকজন স্থিরবুদ্ধি স্বার্থত্যাগী দেশপ্রেমিক, দেশের যা ভালো, ভারতের যে-সব সুন্দর প্রাচীন আদর্শ তার সঙ্গে বিদেশের আধুনিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার একটা মিল ঘটিয়ে না দিতেন। এঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো নিষ্ঠাবান হিন্দুও ছিলেন, রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী ইত্যাদি আরো অনেকে ছিলেন, যাঁরা হিন্দু সমাজের প্রাচীন গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা থাকতে পারেন নি। এঁরা সবাই চেয়েছিলেন দেশে শিক্ষার বিস্তার হোক, মেয়েরা লেখাপড়া শিখুক, খুব ছোট মেয়েদের বিয়ে দেওয়া বন্ধ হোক, ছেলেমানুষ বিধবাদের কাজকর্ম শেখানো হোক, তাদের আবার বিয়ে দেওয়া হোক, জাতিবিচারের নিষ্ঠুরতা কমুক, ধর্মের নামে অন্যায় কাজ বন্ধ হোক।

যাঁরা সমাজের নেতা, তাঁদের পিছনে একদল নিষ্ঠাবান ত্যাগী কর্মী না থাকলে, এ-সব কাজে সাফল্য লাভ করা বড় শক্ত। দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর জামাই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং অনেকে ছিলেন এই ধরনের কর্মী। এখন আমরা বাংলাদেশের যে রূপটি দেখছি তার অনেকখানির জন্যই আমরা এই ধরনের মানুষদের কাছে ঋণী। আর বাংলার ছোট ছেলেদের তো কথাই নেই, রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথের মতো এঁরাও তাদের একটা নতুন পৃথিবীর পথ দেখিয়েছিলেন।

আজ থেকে একশো বছর আগে পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলায় মসূয়া নামের গ্রামে, ২৭শে বৈশাখ উপেন্দ্রকিশোর জন্মেছিলেন। সেদিনটার ইংরিজি তারিখ ছিল ১০ই মে, ১৮৬৩ সাল।

আধুনিক বাংলা তখন গড়ে উঠেছে, বাংলার ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সমাজ ধীরে ধীরে একটা বিশেষ রূপ নিচ্ছে, তার জন্য বহু গুণী কর্মীও দেখা দিচ্ছেন, সমস্ত দেশ জুড়ে যেন একটা নতুন জীবনের জোয়ার এসেছে, ভারতবর্ষ বিংশ শতকের জন্য তৈরি হচ্ছে। সৌভাগ্যবশত এইরকম আওতায় উপেন্দ্রকিশোরের সমস্ত জীবনটা কেটেছিল। তবে তার গোড়াপত্তন হয়েছিল তখনকার হিসাবে কলকাতা থেকে অনেক দূরে নদী-নালায় ভরা, আম-কাঁঠালের বনে ঢাকা, শ্যামল সবুজ একটা গ্রামে, যেখানে কলকাতায় নব্য জীবনের হাওয়া পৌঁছত একটা লোকের মুখে শোনা গল্পের মতো। কলকাতা থেকে যেতে রেলে, স্টিমারে, নৌকোতে, হাতিতে চেপে লাগত তিন দিন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ময়মনসিংহ জেলায় ঐ মসূয়া গ্রামটি ছিল বড়ই সুন্দর। লোকে তার নাম দিয়েছিল বড় মসূয়া; আদি মসূয়া ব্রহ্মপুত্র নদীর বানের জলে ভেসে গেলে পর সেখানকার কায়স্থ বাসিন্দারা কিছুটা দূরে উঁচু জায়গা দেখে, নিজেদের কেনা জমিতে বড় মসূয়ার পত্তন করেছিলেন। যে দিকে তাকানো যায় সেখানে আম কাঁঠালের ঘন বন, মাছে ভরা বড়-বড় পুকুর। যতদূর চোখ যায়, ছিপ্‌ছিপে বাঁশঝাড়গুলো আকাশে যেন পাতার জালি কেটে রাখত। চারি দিকে নদী নালার অন্ত নেই, বর্ষা-কালে জলে জলে সব টইটুম্বুর। ব্রহ্মপুত্র নদী আগে উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বপুরুষদের বসতবাড়ির গা ঘেঁষে বইত। তার পর সরে গিয়ে মাইল দেড়েক তফাতে চলে গেল নদীর স্রোত। ব্রহ্মপুত্রের বিশেষত্বই এই, আজ এখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, কাল অন্য দিকে পাড়ি ভেঙে নদীর গতি বদলে গেল, সেখানকার বাড়ি ঘর নদীর নীচে তলিয়ে গেল।

ভারি উর্বরা জায়গাটি। একেবারে আসামের দক্ষিণে কাছাড়ের পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কোনো কোনো জায়গা সমতল, কোথাও বা এবড়ো

খেবড়ো, পাথুরে। ওখানকার সোনামুগের ডাল, লাল লাল গোল গোল আলু আর পাকা আনারসের খ্যাতিও কম ছিল না। ওদিকে ঘন বনের অভাব ছিল না, বাঘ আর বুনো শুয়োরের কত গল্পই যে শোনা যেত। যেমন তেমন নেকড়ে কিম্বা চিতাও নয়, ডোরা কাটা আসল বাঘ, সুন্দর-বনে যেমন দেখা যায়।

ময়মনসিংহ হল গিয়ে গানগল্পের দেশ। গাইয়ের দল যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে মহুয়ার আর চন্দ্রাবতীর দুঃখের গল্প গেয়ে বেড়াত, তেমনি ঘরে ঘরে ছেলেমেয়েরা কত যে বাঘের গল্প শুনত আর বন্ধ দরজার বাইরে দূরে সত্যি বাঘের হুঙ্কারও কত সময় তাদের কানে আসত। ছোট-বেলায় উপেন্দ্রকিশোরও এইরকম কত বাঘের সত্যি গল্প শুনতেন কে জানে।

ভারী তেজী বংশ ওঁদের, একবার নাকি সম্পর্কে ওঁর এক ঠান্‌-দিদির বাছুরকে বাঘে ধরেছিল একেবারে বিকেলবেলার পরিষ্কার আলোয়। ঠান্‌দিদি লোক দিয়ে বাড়ির গাছ থেকে নারকেল পাড়া-চ্ছিলেন, তখুনি বাড়ি ফিরেছেন, হাতে ঝুলছে একসঙ্গে বাঁধা দুটো বড়-বড় ডাব। কে যেন এসে খবর দিল তেঁতুলতলায় ঠান্‌দিদির নতুন বাছুরকে বাঘে ধরেছে।

আর যাবে কোথায়! আশে পাশে মাইনে করা দু-একজন কাজের মানুষ ছাড়া কারো সাড়াশব্দ নেই, ঠান্‌দিদি ডাব হাতে একাই ছুটলেন তেঁতুলতলায়, বাছুর ছাড়াতে। সেখানে গিয়ে দেখেন বাঁধা বাছুরের ঠাং ধরেছে বাঘে, অমনি ডবল-ডাবের বাড়ি খেয়ে বাঘের চক্ষু ছানাবড়া! ঠান্‌দিদি তাকে বে-ধড়কা পিটে যাচ্ছেন; ততক্ষণে খবর পেয়ে লাঠি সোঁটা দা কুড়ুল নিয়ে মেলা লোকজন এসে বাঘের দফা শেষ করল!

এইরকম কত গল্প যে শোনা যেত। একরকম বলা যেতে পারে ও দেশের লোকদের সেকালে বাঘের সঙ্গেই ঘর করতে হত। লোকের থাকবার বাড়ির ঘরগুলো হত আলাদা আলাদা, একটা থেকে আরেকটায় যেতে ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোন পেরিয়ে, তবে অন্য ঘরের দাওয়ায় গিয়ে উঠতে হত। কত সময় সন্ধ্যার দিকে ঘরের মধ্যে লোকেরা আটকা পড়ে যেত, বাইরে বেরুবার জো নেই, বাঘ দেখা গেছে, কিম্বা বাঘের কাশি শোনা গেছে। হয় তো পাড়ার কোনো বাড়িতে পাশা খেলার আড্ডা বসেছে, পুরুষরা সেখানেই আটকা, হাঁক দিয়ে বাড়ির

মেয়েদের সাবধান করে দিচ্ছেন, তোমরা দরজা বন্ধ করে থেকো, বাঘ বেরিয়েছে। বাঘ না যাওয়া পর্যন্ত কারো পথে বেরুবার জো নেই।

আরেকটা গল্প শোনা যেত রায়বাড়ির চাকর যামিনীদার শ্বশুর আড্ডায় বসে খুব গাঁজা খাচ্ছে। সন্ধে হয়েছে, ঘরের দরজা বন্ধ, এমন সময় বাইরে খক্ করে বাঘের কাশি। চারি দিকে অমনি দুদ্দাড় দুম-দাম যে যার কবাট আঁটছে। একজন এয়ার বললে, সাহস কেমন বুঝি যদি বাঘটাকে কেউ তাড়িয়ে গাঙ পার করে দিয়ে আসে।

গাজার ঘোরে যামিনীদার শ্বশুর বলে উঠল, "আলবৎ পারুম, এ আর এমনডা কি।" এই-না বলে, ঘরের কোণে ডাল পাতা সুদ্ধ একটা কাঠ পড়েছিল, সেইটেকে হাতে তুলে, হারে—রে—রে, বলে মাটিতে আছাড় মারতে মারতে একেবারে দড়াম্ করে দরজা খুলে বাইরে। বাঘের তো চক্ষুস্থির। এ আবার কি নতুন জানোয়ার। অমনি লেজ তুলে পলায়ন।

যামিনীদার শ্বশুরও ঐরকম চ্যাঁচাতে আর গাছ আছড়াতে আছড়াতে গাঙ পর্যন্ত গিয়ে, মনের আনন্দে গাছটাকে কাঁধে ফেলে, গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরছে। গান শুনে বাঘ কিন্তু ফিরে দাঁড়িয়েছে। আরে! এ তো তবে সামান্য একটা মানুষ। অমনি লম্বা-লম্বা লাফ দিয়ে বাঘ তার পিছু নিয়েছে। সেও প্রাণের ভয়ে গাছ ফেলে পাঁই পাঁই ছুট। কোনোরকমে ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দেওয়া হয়েছে, আর বাঘও এসে দরজার উপর পড়েছে। অনেক কষ্টে সে যাত্রা সবাই প্রাণে বাঁচল।

এই ধরনের ঘটনা হামেশাই শোনা যেত, কলকাতার শিক্ষিত সভ্য আবহাওয়ার থেকে এর কত তফাত। তবে চিরকাল ওদের পূর্বপুরুষরা মসুয়ায় থাকতেন না। প্রায় চারশো বছর আগে ওঁদের বাড়ি ছিল পশ্চিমবাংলার নদীয়া জেলার চাকদহ গ্রামে। তখনকার কথা খুব বেশি একটা জানা যায় না, যতদূর মনে হয় ১৪৮০ থেকে ১৬০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে রামসুন্দর দেব বলে উপেন্দ্রকিশোরের একজন সাহসী পূর্বপুরুষ, হয়তো আর্থিক উন্নতির আশায় কিম্বা দেশ দেখার ইচ্ছায়, যে কারণেই হোক, দেশ ছেড়ে পূর্ববাংলার দিকে যাত্রা করলেন। আর তিনি দেশে ফেরেন নি।

অবিশ্যি ঐ চাকদহ জায়গাটাও ওঁদের আদি বাসভূমি ছিল না। বহুকাল আগে, কবে কারো জানা নেই, ওঁরা বর্তমান যেহার অঞ্চল থেকে

এসেছিলেন, তখন ওঁদের পদবী ছিল 'দেও'। জাতে ওরা ছিলেন দক্ষিণ রাঢ়ী কায়স্থ। 'দেও' বাংলায় দাঁড়াল 'দেব'।

রামসুন্দর দেব যখন পূর্ববাংলার সেরপুর গ্রামে এসে পৌঁছলেন, তখন বারো ভুঁইয়ার একজন, স্বনামধন্য ঈশা খাঁর খুব বোলবোলা। পূর্ব-বাংলার যে বারোজন জমিদার মোগল শক্তিকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিলেন, ইনি ছিলেন তাঁদের একজন। দিল্লীর সিংহাসনে তখন আকবর বাদশা বসেছেন, কিন্তু সমস্ত বাংলাদেশ তখনো পুরোপুরি তাঁর বশ হয় নি। ছোটোখাটো গোলমাল লেগেই থাকত, তবে মোটের উপর শেষপর্যন্ত অধিকাংশ জমিদারই মুখে দিল্লীর প্রাধান্য মেনে নিয়ে কাজে অনেকটা ইচ্ছামতো চলতেন।

তখন ময়মনসিংহ বলে কোনো জেলা ছিল না, তবে সেরপুর শহরটির বেশ নাম ছিল। সেখানকার জমিদার রামসুন্দরের সুন্দর চেহারা, অসাধারণ বুদ্ধি ও মনোরম ব্যবহারে খুশি হয়ে তাঁকে আশ্রয় ও সম্ভবত তাঁরই সেরেস্তায় কোনো ভালো চাকরি দেন। দেখতে দেখতে ভারি প্রতিষ্ঠা হল রামসুন্দরের। যশোদলের জমিদার রাজা গুণিরাম রায় তাঁকে জামাই করলেন। রামসুন্দর যশোদলে এসে বসবাস করতে লাগলেন।

এই রামসুন্দর দেবের নাতির ছেলে রামনারায়ণই প্রথম মসূয়াতে ঘরবাড়ি করে বাস করতে আরম্ভ করেন। এঁরা বংশ পরম্পরায় সরকারি চাকরি করে ভারি সুনাম কিনেছিলেন, অবস্থার উন্নতি করেছিলেন, একটু একটু করে জায়গা-জমি করেছিলেন। এঁদের আরেকটা বিশেষত্ব ক্রমে দেখা দিল, এঁরা অনেকেই আশ্চর্যরকম প্রতিভাবান ভাষাবিদ হয়ে উঠলেন। আরবী, ফার্সি ও সংস্কৃতে এমন পাণ্ডিত্য কম লোকের দেখা যেত। তা ছাড়া কারো কারো কবি ও সংগীতজ্ঞ বলেও খ্যাতি হয়েছিল। কালে নবাবের সেরেস্তার লোকেরা তো বটেই, তর্ক উঠলে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরাও সিদ্ধান্তের জন্য এঁদের কাছে আসতে লাগলেন।

শুধু যে জ্ঞানবিদ্যার জন্য এই বংশের নামডাক হতে লাগল তা নয়, এঁদের অনেকের অদ্ভুত শারীরিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যেতে লাগল। এতদিনে 'দেব' পদবী ছেড়ে পরিবারের উপাধি হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'রায়'। এক শরিক পয়সাকড়ি করে, আস্তে আস্তে ঐ অঞ্চলের জমিদার হয়ে বসলেন, তাঁরা হলেন 'রায়চৌধুরী'।

মসূয়া গ্রামকে, ব্রহ্মপুত্র ভাসিয়ে নিলে পর রামনারায়ণের দুই নাতি ব্রজরাম আর বিষ্ণুরাম দুইজনেই বড় মসূয়ায় বাস করতে লাগলেন। দুজনের মধ্যে অনেক তফাত ছিল। ব্রজরাম থাকবার জন্য একখানি বাড়ি করে, পড়াশুনা আর সরকারি সেরেস্তার চাকরি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন, পয়সাকড়ি করার দিকে তাঁর মন ছিল না। তাঁর ছোট ভাই বিষ্ণুরাম অন্য প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। বিষয়বুদ্ধির জন্য তাঁর নাম ছিল, ফলে তিনি অল্পে অল্পে জমিজমা কিনতে পেরেছিলেন। তাঁর ছেলে সোনারাম রায়কে লোকে কৃপণ বলত। তিনি অনেক টাকা সঞ্চয় করে শেষপর্যন্ত জমিদারির মালিক হয়েছিলেন। বেজায় গায়ের জোর ছিল তাঁর, গলার আওয়াজটিও ছিল সেইরকম। একবার কাউকে হাঁক দিয়ে ডাকলে নাকি দু মাইল দূরে নদীর ওপার থেকে শোনা যেত। অনেকদিন বেঁচেও ছিলেন, মরবার সময় একশো কুড়ি বছর বয়স হয়েছিল, সব দাঁত পড়ে গিয়ে নাকি আবার তৃতীয়বার দাঁত গজিয়েছিল।

ব্রজরামের ছেলের নাম ছিল রামকান্ত, যেমনি সুন্দর চেহারা ছিল তাঁর, তেমনি গায়ের জোর। স্নান সেরে এক ঝুড়ি খই আর একটা কাঁঠাল খেয়ে তাঁর জলযোগ হত বলে শোনা যায়, তার পর ভাতের আয়োজনটিও নিশ্চয় সেই অনুপাতেই হত। একদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি ঘরের দাওয়ায় বসে আছেন, এমন সময় কোত্থেকে একটা বুনো শুয়োর তাঁকে আক্রমণ করল। তিনিও অমনি দু হাতে শুয়োরের চোয়াল চেপে ধরে প্রাণপণ চ্যাঁচাতে আরম্ভ করেছেন, 'কে কোথায় আছ এগিয়ে এসো, শুয়োরে আমাকে মেরে ফেলল।' ঐ হাঁক শুনে পাশের বাড়ি থেকে তাঁর ভাইপো গদাধর ছুটে এলেন, তার পর দুজনে মিলে স্রেফ খড়ম পিটে সেই হিংস্র বুনো শুয়োরটার ভবলীলা সাঙ্গ করে দিলেন। ও-সব শুয়োর আজকাল বড় একটা দেখা যায় না, চোয়াল থেকে এই বড়-বড় চারটে দাঁত বেরিয়ে থাকত, তাই দিয়ে মানুষ জন্তুর পেট চিরে ফেলতে একটুও কষ্ট করতে হত না। মাপেও হত তেমনি বিরাট। এই রামকান্তর ছেলে লোকনাথই হলেন উপেন্দ্রকিশোরের ঠাকুরদাদা।

রামকান্ত যেরকম দরাজ আর জোরালো প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তেমনি তাঁর অন্যান্য গুণও ছিল। চমৎকার গাইতে পারতেন, খোল বাজিয়ে গাইতেন, এক সময় স্ফূর্তির চোটে খোলের উপর এমনি চাঁটি মারতেন যে খোল ফেটে চৌচীর!

তিনি অমনি দুহাতে শুয়োরের চোয়াল চেপে ধরে...।

রামকান্তর বিয়ে সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। গছিহাটার এক জমিদারের মেয়েকে তাঁর বিয়ে করবার ইচ্ছা হল। কিন্তু গছিহাটার ঐ নন্দীরায়দের ভারি নামডাক, হয়তো খানিকটা অহঙ্কারও ছিল। রামকান্তর রূপগুণের কথা শুনেও মেয়ের বাবা রাজি হলেন না। তার পর কোনো জমিদারের বাড়িতে চমৎকার দেখতে একটি ছেলের সুন্দর ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে, খবর নিয়ে জানলেন এই সেই রামকান্ত যাকে মেয়ের উপযুক্ত বলে মনে হয় নি, কারণ পয়সাকড়ির দিক দিয়ে রামকান্তর সেরকম কিছু ছিল না। এখন নিজে যেচে রামকান্তর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন। মেয়েটির নাম জয়ন্তী।

তৃতীয় অধ্যায়

জয়ন্তীর আর রামকান্তর দুই ছেলে, লোকনাথ আর ভোলানাথ দুটিই গুণের আধার। ভোলানাথকে যে দেখত সেই ভালোবাসত। আশেপাশে কোথায় কোন গরিব দুঃখী কষ্ট পাচ্ছে সদাই সেই খোঁজে থাকতেন আর যতক্ষণ না তাকে সাহায্য করতে পারতেন ততক্ষণ তাঁর শান্তি ছিল না। সরল হাসিখুশি মানুষটি, কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেই ছড়া কেটে তার উত্তর দিতেন। সে সময় মুখে মুখে কবিতা রচনার ভারি আদর ছিল। তখনকার কবি-লড়াইগুলি দেখবার জিনিস ছিল। এমন গুণের অধিকারী ভোলানাথ লোকের কাছে বড়ই প্রিয় ছিলেন।

কিন্তু লোকনাথ ছিলেন অন্য প্রকৃতির, সদাই সাধন ভজন নিয়ে আছেন, শক্তি সাধনা করেন। এদিকে অঙ্কে অদ্ভুত মাথা, আরবী ফারসি সংস্কৃতে অমন পাণ্ডিত্য কম দেখা যেত। ভাষাজ্ঞান তাঁর এতই অপূর্ব ছিল, যে শোনা যায় আরবী ফার্সি বা সংস্কৃত যে-কোনো ভাষায় লেখা একখানি বই সামনে খুলে রেখে, তখুনি মুখে মুখে অনুবাদ করে অপর দুই ভাষায় অনর্গল পড়ে যেতেন, দেখে লোকের বিস্ময়ের সীমা থাকত না। জরীপের কাজেও তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। লোকে বলত রামকান্তর এই ছেলের সরকারি চাকরিতে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

কিন্তু যা হবার নয় তা কি আর কেউ ঘটাতে পারে। সাংসারিক জীবনের জন্যে লোকনাথ জন্মান নি। সেদিকে তাঁকে আকৃষ্ট করবার

চেষ্টা কম হয় নি। একবার দুটি বড় জমিদারীর সীমানা নিয়ে তর্ক উঠেছে। জরীপের কাজে যে লোকনাথ রায়ের সমকক্ষ কেউ ছিল না এ কথা তখনকার হাকিমরাও জানতেন। এলেন তাঁরা লোকনাথের কাছে, কিন্তু লোকনাথের কোনোই উৎসাহ নেই। শেষপর্যন্ত গুরু-জনদের পেড়াপিড়িতে যদি-বা সে কাজটুকু করে দিলেন, তার পরে আর নয়। বললেন জমিদাররা তাঁকে হাজার কুড়ি ঘুষ দিতে চেয়েছিল। এমন চাকরি তিনি করতে পারতেন না।

লোকনাথ তন্ত্রসাধনা করতেন। তাঁর একখানি ডামরগ্রন্থ, একটি নরকপাল ও মহাশঙ্খের মালা ছিল। ডামরগ্রন্থ, তন্ত্রসাধনায় লাগে আর মহাশঙ্খর মালা মানুষের মাথার খুলি দিয়ে তৈরি হয়। তাই নিয়ে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা নির্জনে কাটিয়ে দিতেন। ছেলের ভাবগতিক দেখে রামকান্তর ভয় হল লোকনাথ বুঝি সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। কৃষ্ণমণি নামের একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে অনেক বুঝিয়ে ছেলের বিয়েও দিলেন। তবুও ছেলের মন ফিরল না। শেষটা রামকান্ত একদিন লুকিয়ে ডামরগ্রন্থটি, নরকপাল আর মহাশঙ্খের মালা ব্রহ্মপুত্রের জলে ভাসিয়ে দিলেন।

ফল হল উল্টো। সাধনার জিনিস না পেয়ে লোকনাথ সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। তিন দিনের দিন তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গেল। তখন তাঁর মাত্র বত্রিশ বছর বয়স। কৃষ্ণমণি পড়ে রইলেন; কিছুদিন পরেই তাঁর ছেলে হবে, তাঁর দুঃখের কথা ভাবা যায় না।

শোনা যায় মৃত্যুর আগে কৃষ্ণমণিকে লোকনাথ এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন দুঃখ কোরো না, দেখো, তোমার যে ছেলে হবে, সেই এক ছেলে থেকেই একশো হবে।

থান পরে হবিষ্যি করেই কৃষ্ণমণির বাকি জীবনটা কেটেছিল, কিন্তু সত্যিই সেই ছেলের আটটি ছেলেমেয়ে হয়েছিল, তাদের মধ্যে তৃতীয়ের নাম রাখা হয়েছিল কামদারঞ্জন। এঁকে এঁর দূর সম্পর্কের কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী পোষ্যপুত্র নিয়ে, নাম বদলিয়ে উপেন্দ্রকিশোর নাম রেখেছিলেন। লোকনাথের ছেলের নাম ছিল কালীনাথ রায়, লোকে তাঁকে ডাকত শ্যামসুন্দর বলে। তাঁর আরবী ফার্সি সংস্কৃতে আশ্চর্য পাণ্ডিত্য দেখে সবাই বলত শ্যামসুন্দর মুন্সি। শ্যামসুন্দরের আট ছেলেমেয়ের সবসুদ্ধ তিপ্পান্নটি সন্তান হয়েছিল। তার পর তাদের

ছেলেমেয়েদের হিসাব ধরলে দেখা যাবে লোকনাথের কথা ফলতে আর বেশি বাকি নেই।

শ্যামসুন্দরও সাধারণ মানুষের মতো ছিলেন না। চমৎকার চেহারা ছিল তাঁর, ফুট্‌ফুট্‌ করত গায়ের রঙ, তাঁর মধুর কণ্ঠের স্তবপাঠ যারা একবার শুনেছিল তারা জীবনে ভুলতে পারত না। শোনা যায় এই-সঙ্গে খুব রাগও ছিল। যেমনি উদার হৃদয়, নির্ভীক চরিত্র, তেমনি কড়া মেজাজও ছিল। একবার নাকি খুব ছোটবেলায় উপেন্দ্রকিশোর বাপের বিশাল বপু নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছিলেন ছোট ভায়ের সঙ্গে। তাই-না শুনে শ্যামসুন্দর এমনি একটি চপেটাঘাত করেছিলেন যে উপেন্দ্র-কিশোর একেবারে উড়ে গিয়ে দরজার বাইরে পড়ে ছিলেন। অবিশ্যি খুব বেশি লাগে নি।

শ্যামসুন্দর তো এই ছেলেটিকে অপুত্রক আত্মীয় হরিকিশোরকে পোষ্যপুত্র দিয়ে দিলেন। হরিকিশোর ছিলেন রামকান্তর খুড়তুতো ভাই সোনারামের নাতি। অতি সাধু সুপণ্ডিত জমিদার, তাঁর সততার কথা ও অঞ্চলে প্রায় প্রবাদের মতো ছিল। পরে ওঁর নিজেরও একটি ছেলে হয়েছিল, তার সঙ্গে পোষ্যপুত্রের কোনো তফাত করেন নি। তবে অমন রূপবান গুণবান ছেলেকে ঘরে পাওয়াও কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এও শোনা যায় যে শ্যামসুন্দর নাকি ছেলে দেবার সময় বলেছিলেন যে পরে যদি হরিকিশোরের নিজের ছেলে হয়ও, তবুও সমস্ত জমিদারীর অধিকারী হবে উপেন্দ্রকিশোর। কিন্তু অনেকদিন পরে যখন সময় এল, উপেন্দ্রকিশোর নরেন্দ্রকিশোরের সঙ্গে সমানভাবে সম্পত্তির অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর চরিত্রে কোথাও এতটুকু স্বার্থের লেশ ছিল না।

পরে তিনি ছোটবেলার অনেক গল্প করতেন। নাকি হরিকিশোরের বাড়িতে পরম আদরে থাকতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে কোনো কারণে যৎসামান্য শাসন করা হলে দুই বাড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মহা কান্না জুড়ে দিতেন, যেন তাঁর কেউ নেই; তাই শুনে শ্যামসুন্দরও যেমন অস্থির হয়ে তাঁর স্ত্রী জয়তারাকে বলতেন, কাজ নেই সম্পত্তিতে, আমি আজই ছেলে ফিরিয়ে আনছি! স্নেহময় হরিকিশোরও তেমনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন।

ছেলে তো নয়, হরিকিশোর সিংহের বাচ্চা ঘরে এনেছিলেন। তারা কখনো পোষ মানে না, সর্বদা নিজের বুদ্ধিতে চলে। 'তাদের এমন

প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব থাকে, যে প্রভাবিত করতে হলে যেমন তেমন লোক দিয়ে চলে না। জমিদারীর উত্তরাধিকারী দরকার ছিল বলে হরিকিশোর এমন ছেলেই পোষ্য নিয়েছিলেন, জমিদারীর উপর যার এতটুকু আকর্ষণ ছিল না; আজীবন যে ছোট ভাই নরেন্দ্রকিশোরের উপর জমিদারীর ভার ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানসাধনায় নিজেকে নিবেদন করে দিয়েছিল।

আসলে হরিকিশোরের নিজের ছেলে নরেন্দ্রকিশোর ছিলেন সব দিক দিয়ে বাপের উপযুক্ত পুত্র। তাঁরও ছিল সুন্দর চেহারা, ভারি ধর্ম-পরায়ণও ছিলেন তিনি, হরিকিশোরের মতো তাঁরও ঠাকুর-দেবতায় ভক্তি ছিল, পুজো উপবাস করতেন, জমিদারীর যত্ন করতেন। অল্প বয়স থেকেই জমিদারীর কাজ শিখবার আগ্রহ ছিল তাঁর, শিখেও ছিলেন ভালোমতোই, দুজনার হয়ে চিরকাল জমিজমার তদারক করেছিলেন।

কিন্তু লোকনাথের রক্তে একটা প্রবলতা ছিল, তার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া উপেন্দ্রকিশোরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ছোটবেলা থেকে মানুষ হলেন যে বাড়িতে, সে বাড়ির মতো স্বভাব না হয়ে, হল লোকনাথের বংশধরের মতোই। মানুষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়, রক্তের সঙ্গে সেগুলো বইতে থাকে, বাইরে থেকে যতই-না শিক্ষা যতই-না প্রভাব বিস্তার করা যাক, রক্ত তাতে বশ মানে না। জমিদারী করা উপেন্দ্র-কিশোরের ধাতে ছিল না, গতানুগতিকের ধারা মেনে চলা লোকনাথের নাতির পক্ষে সহজ ছিল না।

শেষপর্যন্ত তাঁর জীবনের স্রোত, মসূয়ার নদী থেকে আলাদা হয়ে বইতে লাগল। আর তিনি মসূয়াতে বাস করেন নি, মাঝে মাঝে সপরিবারে বেড়াতে যেতেন শুধু। সেই বেড়াতে যাওয়াগুলো ছিল মহা আনন্দের ব্যাপার। উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীযুক্তা পুণ্যলতা চক্রবর্তী সে-সব দিনের কথা ষাট বছর পরে লিখেছেন।

"বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে প্রায় সন্ধ্যা হত, কারা যেন শাঁখ বাজাত, ঠাকুরমা পিসিমারা এগিয়ে এসে আমাদের আদর করে ঘরে নিয়ে যেতেন।

"দেশের ঘরবাড়ি বাগান পুকুর আমাদের কাছে সে এক নতুন রাজ্য। বাগানে অজস্র ফুল, কোঁচড় ভরে তুলে আনতে কত আনন্দ। গাছের পাকা ফল নিজের হাতে পেড়ে খেতে কি মজা! শ্বেতপাথরের খেলনার মতো সুন্দর চিনির তৈরি হাতি, ঘোড়া, রথ, গ্রামের কুমারের হাতে গড়া

আর পোড়ামাটির খেলনা...”

নৌকো যেখানে ঘাটে লাগত, বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূর। ৮ বাড়ির হাতি আসত নিয়ে যাবার জন্য, একটার নাম ছিল 'যাত্রামঙ্গল'” আরেকটা হল 'কুসুমকলি'। যাত্রামঙ্গল একটু রগ-চটা হলেও, কুসুমকলির স্বভাবটি বড় মিষ্টি, শুঁড় বাড়িয়ে বড়দের পায়ে বুলিয়ে আবার শুঁড় গুটিয়ে কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করত। দারুণ খেত সারাদিন দুটোতে মিলে; জমিদার ছাড়া কজনারই-বা হাতি পোষবার ক্ষমতা থাকত!

চতুর্থ অধ্যায়

জমিদার বাড়িতে মানুষ উপেন্দ্রকিশোরের জীবনযাত্রা ভাইদের চেয়ে যে আলাদা রকমের হবে, এ তো জানা কথা। ভাগ্যের পরিহাস বলে একটা কথা আছে, এক্ষেত্রে তারই একটা নিদর্শন পাওয়া গেল। শ্যামসুন্দরের মধ্যে কোথাও এতটুকু সংকীর্ণতার স্থান ছিল না। ঐ পাড়াগাঁয়ে বাস হলে কি হবে, নিজে নিজে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে খানিকটা ইংরিজিও শিখেছিলেন। মনটা ছিল ভারি উদার ও প্রগতিশীল। তখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় কয়েকজন বালবিধবার বিয়ে হল। ময়মনসিংহেও একটা হল। গোঁড়া সমাজ, অনেকেই বিরক্ত হলেন, শ্যামসুন্দর আত্মীয় বন্ধুদের আপত্তি সত্ত্বেও সেই বিয়েতে গিয়েছিলেন।

হরিকিশোর কিন্তু অনেকটা প্রাচীনপন্থী ছিলেন, এ-সবের সঙ্গে তাঁর সহানুভূতি ছিল না। হরিকিশোরের বাড়িতে মানুষ হলেও উপেন্দ্রকিশোর নিজের বাপের মন পেয়েছিলেন। পড়াশুনোয় ভালো ছিলেন, যদিও গান-বাজনার দিকে ঝোঁকটা ছিল আরো বেশি। প্রথমে বাঁশি পরে বেহালা হল তাঁর সঙ্গের সাথী। পড়াশুনো করতে বড়-একটা দেখা যায় না, অথচ ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের মাস্টারমশাইরা যখন প্রশ্ন করেন চট্‌পট্‌ সঠিক জবাব পান। সবাই অবাক হয়ে যায়। একবার একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল ঠিক ঠিক উত্তর দিস কি করে? সারাক্ষণ তো বাঁশি বাজাস, পড়িস কখন?

উপেন্দ্রকিশোর বললেন—কেন, ঘরে অন্য ছেলেরা পড়া তৈরি করে

আর আমি শুনে শুনে শিখি। অবশ্য পরীক্ষা কাছে এসে গেলে বেহালা বাঁশি তুলে রেখে বই নিয়ে বসতেন। একবার নাকি মাস্টারমশাইরা কে বকাবকি ক'রছিলেন বলে তাঁর সাধের বেহালা ভেঙে ফেলে দিয়েছিলেন। পরীক্ষার ফল সর্বদাই ভালো হত। ময়মনসিংহে স্কুলে থাকতে গগনচন্দ্র হোম বলে ক্লাসের একটি ছেলের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের ভারি ভাব হল। গোড়া হিন্দুদের মতে এই ছেলের মতিগতি ভালো ছিল না, রামমোহন রায়ের প্রভাবে যে ব্রাহ্মসমাজ গড়ে উঠেছিল, সেদিকে তার বড় বেশি ঝোঁক। সেই-সব কথা উপেন্দ্রকিশোরকেও বলে, তিনিও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ব্রাহ্মরা জাত মানেন না, স্ত্রী-শিক্ষায় বিশ্বাস করেন, সামাজিক উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন, তাঁদের কথা শুনতে উপেন্দ্রকিশোরের ভালো লাগা স্বাভাবিক। তার উপর ব্রাহ্মরা ঠাকুর পুজো করেন না, নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, পুরোনো আচার-বিচার বিধিনিষেধ কিছুই তাঁরা মেনে চলেন না, বুদ্ধি দিয়ে যাকে বিচার করা যায় না, যুক্তি দিয়ে যাকে বোঝানো যায় না, এমন কোনো মত তাঁরা গ্রহণ করেন না, এই-সব অস্বস্তিকর কথা গগনচন্দ্র উপেন্দ্রকিশোরের কানে ঢালে আর হরিকিশোরের বড় ভাবনা হয়। শেষপর্যন্ত উপেন্দ্রকিশোরকে ডেকে গগনের সঙ্গে মিশতে বারণ করে দেওয়া ছাড়া হরিকিশোর আর উপায় দেখলেন না। তখনো শ্যামসুন্দর বেঁচে, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর কাছ থেকে কতখানি সমর্থন পাওয়া যাবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কারণ তাঁর মতামতও বড় বেশি উদার।

বাড়িতে অশান্তি হবে এই ভয়ে উপেন্দ্রকিশোরও সাবধান হয়ে গেলেন। গগনচন্দ্রের সঙ্গে মিশবেন না, তাই কি হয় কখনো? তবে আর প্রকাশ্যভাবে মেলামেশা না করে, বনে জঙ্গলে গিয়ে তারা ধর্ম, সমাজসংস্কার, ভগবানের স্বরূপ এই-সব বিষয়ে আলোচনা করতেন। বাঁশি বাজিয়ে নাকি তারা পরস্পরকে সঙ্কেত দিতেন। এদিকে হরিকিশোর এই-সব কিছুই জানেন না, তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে পুজো উপবাস করে চলেছেন আর নিজের ছেলে নরেন্দ্রকিশোরকে মনের মতো করে সনাতন হিন্দুধর্মে আস্থাবান করে তুলছেন।

ধীরে ধীরে উপেন্দ্রকিশোরের নানান প্রতিভা বিকশিত হতে লাগল। অঙ্কে আর বিজ্ঞানে ভারি মেধা ছিল তার, আর ছিল ছবি আঁকবার আশ্চর্য ক্ষমতা। যেখানে সেখানে লেখার খাতায়, কাগজের টুকরোয়

কেবলই ছবি আঁকতেন। আলো ছায়ার রহস্য ভেদ করতে চাইতেন। এইসঙ্গে চলত সংগীত-সাধনা; শ্যামসুন্দরও যে সংস্কৃতে ধর্মসংগীত রচনা করে গাইতেন সে কথা ভুলে গেলে চলবে না।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল থেকে উপেন্দ্রকিশোর প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে বৃত্তি পেলেন। এইবার তাঁর মসূয়ার বাস শেষ হল, তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হলেন।

এর পরে শ্যামসুন্দর খুব বেশি দিন বাঁচেন নি, সব ছেলেদের মানুষ করে দিয়ে যেতে পারেন নি। বড় ছেলের নাম সারদারঞ্জন, ভারি প্রচণ্ড পৌরুষের মূর্তি ছিলেন তিনি। উনিশ বছর পেরুতে না পেরুতে অঙ্কে সংস্কৃতে ডবল এম. এ.। তাঁর পরীক্ষা পাশের বিষয়ে সুন্দর একটা গল্প শোনা যায়। অঙ্ক পরীক্ষার ঠিক আগেই তাঁর এমনি অসুখ করল যে সব বইগুলোকে আর দেখা হল না। পরীক্ষার আগের রাত্রে তো বেচারা ভেবেই সারা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন যেন পরীক্ষার হলে গেছেন, থামের পাশে সীট, পায়ের কাছে একটা ইঁট পড়ে আছে, প্রশ্ন-পত্র দেওয়া হচ্ছে। দুরুদুরু বুকে সারদারঞ্জন স্বপ্নে সেই প্রশ্নপত্র খুলে প্রশ্নগুলি পড়ে দেখলেন। এই সময় উত্তেজনার চোটে ঘুম ভেঙে গেল। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিল, প্রশ্নগুলি সব মনে ছিল; সেই দুপুর রাতে উঠে বই নিয়ে সেগুলি তৈরি করে ফেললেন। পরদিন পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলেন হুবহু যেমন স্বপ্নে দেখেছিলেন, সেই থাম, সেই ইঁট আর সেই প্রশ্ন! বলা বাহুল্য সারদারঞ্জন অতিশয় কৃতিত্বের সঙ্গেই পাশ করেছিলেন। অবিশ্যি অঙ্কে তিনি বরাবরই খুব ভালো ছিলেন।

এম. এ. পাশ করে সারদারঞ্জন অধ্যাপনা শুরু করলেন, আগে ঢাকায়, পরে কলকাতায়। শেষপর্যন্ত মেট্রোপলিটান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন, এখন যাকে বিদ্যাসাগর কলেজ বলে। কিন্তু ছেলের কর্ম জীবনের গোড়ার দিকেই শ্যামসুন্দর চোখ বুঁজলেন। কৃষ্ণমণি তখনো বেঁচে, তাঁর দুঃখের আর শেষ নেই। জয়তারাও বিধবা হলেন; থান পরে শাশুড়ি বউয়ে মসূয়ার বাড়িতে থেকে ছোট ছেলেমেয়েগুলিকে মানুষ করতে লাগলেন। ততদিনে উপেন্দ্রকিশোরও কলকাতাবাসী হয়েছেন।

তখন হয়তো ১৮৮০ কি ১৮৮১ সাল হবে, আজকালকার বাঙালী জীবনযাত্রার সঙ্গে সে সময়ের আকাশপাতাল প্রভেদ। যে-সব জিনিস দেখে দেখে আমাদের চোখ সওয়া হয়ে গেছে, তখন লোকে তাকে মনে করত

অদ্ভুত, উৎকট। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ঘোড়ায় টানা বাস পথ দিয়ে যেত জানলার ঝিলিমিলি নামিয়ে, আর পাড়ার ছোট ছেলেরা সুর করে টিট্‌কিরি দিত—'ওঁ তৎসৎ, বেম্মজ্ঞানীর নাকে খৎ'। এমন-কি, রাত্রে দল বেঁধে মধ্যবিত্ত বাঙালী মাতালদের পর্যন্ত পথে বেরোতে দেখেছিলেন তখনকার সমাজসেবক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী। এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের দেশের সামাজিক আবহাওয়াটা অনেক মার্জিত হয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম যাঁরা পর্দার বাইরে এসেছিলেন সেই মেয়েরা ও তাঁদের স্বামীরা যে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন এ কথা বলা যায়।

কলকাতায় এসে উপেন্দ্রকিশোর এই-সব স্বাধীনচেতা লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে মিশবার সুযোগ পেলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে অনেকটা বড়, অদ্ভুত তেজস্বী পুরুষ, অমন দেশপ্রেমিক সেকালেও কম দেখা যেত। দেশটাকে স্বাধীন করতে হলে যে স্ত্রী-শিক্ষার কত দরকার, সেটা মনেপ্রাণে বুঝে সারাজীবন স্ত্রী-শিক্ষার ও স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করে গেছেন।

যে-কোনো নতুন নিয়মের সমালোচকের অভাব হয় না। দ্বারকানাথ যেমন স্ত্রী-শিক্ষার জন্য প্রাণপাত করেছিলেন, তেমনি আরেক দল লোক স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী ছিলেন; সরকারী সমর্থন থাকাতে অবশ্যি খুব বেশি বাধা দিতে পারতেন না, তবে সুবিধা পেলেই নানারকম প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি করতেন। এঁদের দলের একজন একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সেই পত্রিকাতে স্ত্রী-স্বাধীনতার সম্বন্ধে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার সঙ্গে কতকগুলো মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। তাই পড়ে দ্বারকানাথ রেগে আগুন, কাগজ থেকে ঐ অংশটুকু কেটে পকেটে নিয়ে, লাঠি হাতে গেলেন সম্পাদকের কাছে। ঘরে আর কেউ নেই, লাঠি হাতে দ্বারকানাথকে দেখে সম্পাদকের চক্ষু চড়ক্‌গাছ। যেমন ছিল তার মনের তেজ, তেমনি ছিল শরীরের শক্তি। ইংরিজিতে একটা চমৎকার কথা আছে 'ইট্‌ ইয়োর ওয়ার্ডস্‌', তার বাংলা করলে দাঁড়ায় 'তোমার কথা তুমি খাও', তার মানে হল নিজের কথা ফিরিয়ে নেওয়া, অর্থাৎ অন্যায় কথা স্বীকার করা। দ্বারকানাথ সম্পাদককে দিয়ে তাই করালেন। কাগজ-টিকে তালগোল পাকিয়ে জল দিয়ে গিলে খেতে বাধ্য করলেন। এই

অতিশয় তেজী মানুষটি উপেন্দ্রকিশোরকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় অনেকদিন হল মারা গেছেন। তার প্রেরণায় যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার তিনটি শাখা হয়েছে, আদি সমাজ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধররা এই সমাজের সভ্য; আর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নব বিধান সমাজ; কিন্তু সব চেয়ে মুক্তিপ্রিয়, সব চেয়ে আধুনিক দল হল সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ; শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের কেশবচন্দ্র সেনের সঙ্গে মতে মিলছিল না বলে, এই সমাজ গড়ে তুলেছিলেন। এরই প্রতি উপেন্দ্রকিশোর আকৃষ্ট হলেন, এরই কথা গগনচন্দ্র হোম তাঁর কাছে বলতেন।

প্রথমে কলকাতায় এসে পাড়াগাঁয়ের ছেলে উপেন্দ্রকিশোর নিশ্চয় খানিকটা হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর যে ধরনের গুণ ছিল, সংগীতের দিকে, সাহিত্যের দিকে, চিত্রকলার দিকে আর ক্রমশ বিজ্ঞানের দিকে, শহর ছিল তারই উপযুক্ত পীঠস্থান।

কলেজে ভর্তি হয়ে প্রথম দিকে উপেন্দ্রকিশোর চুপচাপ পড়াশুনো নিয়েই থাকতেন। আর যেখানে যা দেখতেন লক্ষ্য করতেন, শিখতেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে গানবাজনার ভারি রেওয়াজ ছিল, যুবক রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্ভবত এই সময় থেকেই আলাপ পরিচয় ও পরে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। কয়েকজন প্রতিভাবান চিত্রশিল্পীও সে সময় কলকাতায় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে হয়তো শশী হেষ ছিলেন; এঁর সঙ্গে অনেকদিন পর্যন্ত উপেন্দ্রকিশোরের বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ছিল। ইনি বিলেত ঘুরে এসেছিলেন, ইটালিয়ান স্ত্রী ছিল, অনেকদিন পরে তাঁর কাছ থেকে উপেন্দ্রকিশোরদের বাড়ির মেয়েরা নানারকম সৌখীন রান্না শিখেছিলেন। শশী হেষের আঁকা সুন্দর সুন্দর ছবি, বেশির ভাগই মানুষের চেহারা, এখনো রায় পরিবারের আত্মীয়দের বাড়িতে দেখা যায়। শশী হেষ বেশি দিন বাঁচেন নি।

উপেন্দ্রকিশোরের বড়দাদা সারদারঞ্জন কিছুদিন থেকে কলকাতায় কায়েমী হয়ে বসেছেন, মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনা করেন। তার চেয়েও বড় একটি কাজ করেন। সেটি হল ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রিকেট খেলা ভালোবাসতে শেখান। এইজন্য তাঁকে সেকালে লোকে 'ভারতীয় ক্রিকেটের জনক' নাম দিয়েছিল। খেলার মাঠে সাদা বিলিতি

পোশাক পরে, ভিক্টোরীয় যুগে যেমন ফ্যাসান ছিল, এক মুখ দাড়ি নিয়ে ব্যাট হাতে যখন উইকেটের সামনে দাঁড়াতেন, বিলেতের বিখ্যাত ক্রিকেটার ডব্লু. জি. গ্রেসের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য দেখে, দর্শকরা অবাক হয়ে যেত।

পরে এঁদের ছোট ভাইরা তিনজনেই ক্রিকেটের মাঠে নাম কিনেছিলেন, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর এদিকে যান নি, তাঁর বাঁশি বেহালা, রঙ তুলিই যথেষ্ট ছিল! এবার হাতে উঠল কলম, ক্যামেরা আর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি। সাধারণ যুবকরা যেরকম সখ করে যখন তখন ছবি তোলে এ সেরকম নয়! এ একটা গভীর সাধনা, বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি দিয়ে আলোছায়ায় রহস্য বিশ্লেষণ, নিজেদের হাতে নানান গবেষণা। তার ফলও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী, ফলে বিলেতের ছবি ছাপার জগতেও উপেন্দ্রকিশোর অভাবনীয় সম্মান পেয়েছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

এমনি করে যে পরিবারের কেন্দ্র ছিল মসুয়ায়, আস্তে আস্তে তার কলকাতাতে আসন পড়ল। এসেই হয়তো উপেন্দ্রকিশোর কোনো ছাত্রাবাসে উঠেছিলেন। সেখান থেকে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করতেন, সেখানেই দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয় ও সম্ভবত তাঁর পরিবারের সঙ্গেও পরিচয় হয়।

অমন রূপবান গুণবান ছেলে যেদিন কোনোরকম ঘটা না করে ব্রাহ্মসমাজের খাতায় নাম লেখালেন, সেদিন নিশ্চয়ই ব্রাহ্মদের মধ্যে তো বটেই উপেন্দ্রকিশোরের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যেও একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়েছিল। রায় পরিবারের কেউ এর আগে সনাতন ধর্ম ছাড়েন নি, যদিও অনেকেই স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছিলেন।

শ্যামসুন্দর আর ইহলোকে নেই যে খুশি হবেন কিম্বা রাগ করবেন। হরিকিশোর ছিলেন, তবে তাঁরও দিন ঘনিয়ে আসছিল। ক্ষুব্ধ নিশ্চয়ই হয়েছিলেন, তবে নিজের ছেলে নরেন্দ্রকিশোর ছিল তাঁর সান্ত্বনা। জয়তারা চিরকাল নিষ্ঠাবতী হিন্দু মেয়ের জীবন কাটিয়েছেন, অনেকদিন আগেই ছেলেকে কাছ ছাড়া করার দুঃখ তাঁকে সইতে হয়েছিল, তাঁর মন সম্ভবত

আরো আঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। দুঃখিত নিশ্চয়ই হয়েছিলেন, কিন্তু ভারি উদার দৃষ্টিও ছিল তাঁর।

শোনা যায় সারদারঞ্জনও দারুণ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় উপেন্দ্রকিশোরের প্রতি কারো ভালবাসার এতটুকু ঘাটতি হয় নি। তবে আস্তে আস্তে হিন্দু আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে তাঁর জীবনযাত্রার ধারা আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের কাজে উপেন্দ্রকিশোর আরো জড়িয়ে পড়তে লাগলেন। একুশ বছর বয়সে বি.এ. পাশ করেছিলেন। ফোটো তোলা, ফোটো ছাপা ও ছবি আঁকা সম্বন্ধে এতদিন ধরে এত পড়াশুনো ও নিজে গবেষণা করেছিলেন যে সে বিষয়ে আর কিছু তাঁর জানতে বাকি ছিল না। সবাই বুঝতে পারত যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে এদিকে তিনি আরো অনেক অগ্রসর হবেন। এরই মধ্যে কিছু কিছু রোজগারও হচ্ছিল। তিনি নিজেও জানতেন যে অন্য অনেক ব্রাহ্ম যুবকদের হিন্দু বাবারা যেমন তাদের ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন, হরিকিশোর হয়তো তাও করতে পারেন; তবু তাঁর ধর্মবিশ্বাস কেউ টলাতে পারবে না। আর নিজের খরচ, সেটুকু নিজে চালাবার তাঁর ক্ষমতা হয়েছে।

কিন্তু হরিকিশোর যতই-না দুঃখিত হয়ে থাকুন পোষ্যপুত্রকে ত্যাজ্যপুত্র করেন নি। এর কয়েক বছর পরে যখন পরলোকে গেলেন নরেন্দ্রকিশোর আর উপেন্দ্রকিশোর সমান ভাবে সম্পত্তি ভোগ করতে লাগলেন। অবিশ্যি উপেন্দ্রকিশোর জমিদারীর ধার ধারতেন না, সমস্ত ভার থাকত নরেন্দ্রকিশোরের উপরে, তিনি বড় ভাইকে যা পাঠাতেন, ভাই তাতেই খুশি থাকতেন।

আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দূরত্বটা আরো বেড়ে গেল যখন মাত্র তেইশ বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর নিজে আগ্রহ করে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা বিধুমুখীকে বিয়ে করলেন। এবার ভাঙনটা পাকাপাকি হল। বিধুমুখী শুধু যে ব্রাহ্ম তা নয়, উপরন্তু তিনি ব্রাহ্মণ কন্যা, জাত ভেঙে বিধর্মীর মেয়ে বিয়ে করে, উপেন্দ্রকিশোর নিজেকে সত্যি সত্যি হিন্দুসমাজের বাইরে এনে ফেললেন। তাঁর নিজের মা জয়তারাও কখনো তাঁর বাড়িতে রাত কাটান নি। মাঝে মাঝে যখন কলকাতায় আসতেন সারদারঞ্জনের বাড়িতে উঠতেন, অবিশ্যি এ বাড়িতেও সর্বদা আসা যাওয়া করতেন। বলতেন আমার ছেলে যখন ওকে বিয়ে করেছে, তখন ওকে

আমিই-বা আদর করব না কেন।

বিধুমুখী দেখতে সুন্দরী ছিলেন না; অমন রূপবান গুণবান ছেলে তাঁকে পছন্দ করল দেখে অনেকে অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু বিধুমুখীর বাইরের রূপের চেয়ে বড়ো জিনিস ছিল, সেটা হল অন্তরের মাধুর্য, দয়া, স্নেহ, সহানুভূতি, কর্তব্যনিষ্ঠা। লেখাপড়া জানতেন, কিন্তু নিজের বিদ্যা কখনো জাহির করতেন না। যতদিন বেঁচেছিলেন নিজের পরিবার, অতিথি আগন্তুক সকলের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

তাঁর পাশে তাঁর সুন্দরী, সৌখীন, তাঁর চেয়ে সামান্য বড় বিমাতাকে দেখলে তফাতটা নিশ্চয় খুবই চোখে পড়ত। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর তো সুন্দরী সৌখীন মেয়ে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন শান্ত স্নিগ্ধ মমতা–ময়ী স্ত্রী, তাই পেয়েওছিলেন।

ব্রাহ্মমতে বিয়ে হল, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরেই। তার পরে মন্দিরের সামনে সেই তেরো নম্বরের বিশাল লাল বাড়িটার দোতলার একটা অংশ ভাড়া নিয়ে উপেন্দ্রকিশোর সংসার পাতলেন ও বাড়ির বোধ হয় কোনো বাসিন্দার জীবনই সে সময়কার বাংলাদেশের সাধারণ গৃহস্থ-জীবনের মতো ছিল না। দ্বারকানাথের পারিবারিক জীবন তো নয়ই।

সত্যি কথা বলতে কি ভারতের ঐ প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট ও ডাক্তারকে, এখনকার হিসাবেও আধুনিক না বলে উপায় নেই। আধুনিক জীবনের সব চেয়ে বড় সমস্যা হল যে মেয়েরা বাইরে কাজ করে তাদের দিয়ে সংসারের যত্ন করানো অনেক ক্ষেত্রেই মুশকিল হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৮৬ সালে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী এই সমস্যার সঙ্গে দিব্যি বোঝাপড়া করে নিয়েছিলেন। বাড়িতে স্বামী ছিলেন, বুড়ি এক ননদ ছিলেন, একে একে গুটি সাতেক ছেলেমেয়েও হয়েছিল। সমানে বাইরের কাজ করেছেন, নেপালের রাজবাড়িতে পর্যন্ত চিকিৎসা করেছেন, আরো পড়াশুনো করেছেন, কোলের ছেলে নিজের মায়ের কাছে রেখে বিলেত গিয়েছেন। আবার ফিরে এসে ঘরকন্নার ভার নিয়েছেন, হাল ফ্যাসানে বাড়িঘর সাজিয়েছেন, রোজগারও করেছেন এন্তার, খরচও করেছেন উদারভাবে, অমানুষিক পরিশ্রম করেছেন। কুঁড়েমি কাকে বলে জানতেন না; সেকালে মোটর ছিল না, রুগী দেখতে যেতেন ঘোড়ার গাড়িতে করে, পৌঁছতে অনেক সময় লাগত। কিন্তু সে সময়টুকু নষ্ট না করে কি সুন্দর সূক্ষ্ম কাজের ক্রুশ কাঁটার লেস্ বুনতেন, সবাই দেখে

প্রশংসা করত।

সাজসজ্জাতেও কাদম্বিনী ছিলেন তখনকার আধুনিকা। তখনকার মহিলারা কৃত্রিম কিছু ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ভারতের ভিক্টোরীয় যুগের এই আধুনিকা মহিলার চালচলন সাজসজ্জাতে ভারি একটা সম্ভ্রান্ত রুচির সঙ্গে গাম্ভীর্যের মিশ্রণ ছিল। অনেকটা পার্সি মেয়েদের মতো করে কাপড় পরে, বাঁ কাঁধে সোনার সেফ্টিপিন লাগাতেন। মাথায় তিন কোনা 'ভেল' পরতেন, দুটি খুদে খুদে ব্রূচ দিয়ে আটকে, কনুই পর্যন্ত লম্বা জামার হাত থেকে চার ইঞ্চি চওড়া লেসের ঝালর ঝুলত, পায়ে থাকত কালো মোজা আর ছোট একটু গোড়ালি তোলা বন্ধ জুতো।

এই আশ্চর্য মহিলাটির সম্বন্ধে এত কথা বলতে হল, কারণ উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের উপরে তাঁর যে একটা গভীর প্রভাব থাকবে, এ তো বলাই বাহুল্য! বিধুমুখী একটুও ফ্যাসানেব্‌ল ছিলেন না, কিন্তু বাইরে বেড়াবার সময় তিনি আর অন্যান্য ব্রাহ্ম মহিলারাও সবাই অল্প বিস্তর ঐ ধরনের কাপড়-চোপড় পরতেন। হেঁটে বেরোবার রেওয়াজ ছিল না, কাছাকাছি যেতে হলেও গাড়ি কিংবা পালকি, পায়ে হেঁটে বড় জোর রাস্তা পার হওয়াটুকু চলত।

তবু সেকালের ঐ প্রথম মহিলারা, যাঁরা অন্দরমহল ছেড়ে বাইরে এসেছিলেন, আজকালকার সব চেয়ে আধুনিক মেয়েদের আদর্শ হবার যোগ্য ছিলেন। উপেন্দ্রকিশোরের পারিবারিক জীবনও তাঁদের সেই আদর্শেই গড়ে উঠেছিল। আধুনিক হাওয়াটা যে সাজ-পোশাক পার্টি পিকনিকের উপর নির্ভর করে না, তার চেয়ে অনেক গভীর জিনিস যার উপরে গোটা জীবনযাত্রার ভিত্তি গড়া হতে পারে, এ জ্ঞান তাঁদের ছিল। সেইজন্য শিক্ষায় দীক্ষায়, কাজে কর্মে, সেবায় ও সামাজিকতায় ভারি বলিষ্ঠ একটা নব্য বাঙালী সমাজ উনিশ শতকের শেষ ভাগে গড়ে উঠতে পেরেছিল। সেই আদর্শের অনেকখানিকেই স্বাধীন ভারত আশি-নব্বুই বছর পরেও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বেশ ছিল তেরো নম্বরের বাড়িটা, যদিও অতগুলি পরিবার মায় একটা বোর্ডিং স্কুল সুদ্ধ একসঙ্গে থাকলে নিশ্চয়ই জল ইত্যাদি নিয়ে অনেক সমস্যাও দেখা দিত তবে আনন্দের মাত্রাটাই হয় তো বেশি ছিল, তাই সেখানে যে-সব ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা থাকত, বড় হয়ে শুধু সবাই মিলে খেলা করার, গল্প শোনার, একসঙ্গে পাত পেড়ে সারি সারি বসে খাবার, লোকজন আসা যাওয়ার আনন্দের কথাই বেশি করে তাদের মনে পড়ত।

রাস্তার দিকে একটা বারান্দা ছিল, তার গা ঘেঁষে ছিল একটা কদম্ব গাছ, তাতে সাদা সাদা গোল গোল ফুল ফুটে ছোট ছেলেমেয়েদের তাক্ লাগিয়ে দিত। পিছন দিকে আরেকটা বাড়ির বাগানে মস্ত আমড়াগাছ ছিল, তাতে থোকা থোকা আমড়া ঝুলে থাকত। সে বাড়ির মালি বড় ভালো ছিল, বাঁশের ডগায় আমড়া বেঁধে দোতলার স্নানের ঘরের জানলা দিয়ে গলিয়ে দিত।

সে কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের কথা এখন কল্পনাও করা যায় না; কলকাতা শহরটারই তখন বয়স কম ছিল। তেরো নম্বরের পাশেই অনেকটা খোলা জায়গা ছিল। একবার শীতকালে সেখানে তাঁবু ফেলে একটা সার্কাসের দল খেলা দেখাল। বাঁদর, কুকুর, ঘোড়া, খাঁচায় পোরা বাঘ এল। মাসখানেক ধরে পিছনের বারান্দা থেকে ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে সার্কাসের লোকদের থাকবার ছোট-ছোট তাঁবু আর চালাঘরের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকত। তারা রাঁধাবাড়া ঘরকন্নাও করত, আবার খেলা অভ্যাস করত, জন্তুদের খাওয়াত। সাধারণ পোশাক পরে তাদের অন্য রকম দেখাত।

ধর্মত্যাগী হলেও উপেন্দ্রকিশোরও আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হন নি। বড়দাদা সারদারঞ্জনের প্রথম রাগটাও ধীরে ধীরে কমে এল, ভালোবাসাটাই বড় হয়ে দেখা দিল। এই পিতৃহীন সাতটি ভাই-বোনের শেষ বয়স পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে এই আশ্চর্য ভালোবাসা টিঁকে ছিল। একটি বোন খুব অল্প বয়সে মারা যান।

সেকালে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে অনেক বেশি কঠোর নিয়ম মানার ছিল। হরিকিশোর কলকাতায় আসতেন না, আর উপেন্দ্রকিশোর কলকাতাবাসী হবার পর খুব বেশিদিন তিনি বাঁচেনও নি। কাজেই তাঁকে নিয়ে কোনো সমস্যাই হয় নি।

তাঁর ছেলে নরেন্দ্রকিশোর একবার এসে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে উঠেছিলেন বটে, কিন্তু নিজের ঠাকুর চাকর এনে আলাদা রাঁধাবাড়া করে খেতেন। পরে তিনিও কলকাতায় এসে থাকতেন, নিজের বাসা করে।

এদিকে সেই থেকে মসূয়ার বাড়ি আগলে আছেন জয়তারা; ছেলে-মেয়েরা যখন ছোট ছিল, তাঁর শাশুড়ী, সেই আশ্চর্য লোকনাথের স্ত্রী কৃষ্ণমণিও তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তার পরে মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেল, পড়াশুনোর জন্যে ছেলেরাও সব একে একে কলকাতায় চলে এল, কৃষ্ণমণিও স্বর্গে গেলেন, দেশের বাড়িতে রইলেন জয়তারা একলা। ছেলে-মেয়েরা নাতি-নাতনিরা কেউ গেলে তাদের বুকে তুলে নিয়ে আদর করতেন। না গেলেও, যাকে পেতেন তার হাত দিয়ে ক্ষীরের নাড়ু, ক্ষীরের তক্তি, নারকেলের চিঁড়ে, বড়-বড় আমসত্ত্ব, ছোট-ছোট আমসত্ত্ব, আমসি পাঠিয়ে দিতেন। নাতি-নাতনিদের মুখে আজ পর্যন্ত তার স্বাদ লেগে রয়েছে।

মসূয়া গ্রামসুদ্ধ সকলে জয়তারাকে ভক্তি করত, ভালোবাসত। একবার খুব ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্পে গ্রামের প্রায় সব কাঁচা বাড়িই পড়ে গেল, রইল শুধু জয়তারার ঘর ও ঠাকুরঘর। গাঁয়ের লোকেরা বলতে লাগল, হবে না, অমন পুণ্যবতীর ঘর ভাঙবে কার এত সাহস হবে।

উপেন্দ্রকিশোরের বড় বোন গিরিবালার ময়মনসিংহের নন্দীচৌধুরী বংশে বিয়ে হয়েছিল। তিনি সারা জীবনই দেশে থাকতেন, মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন, সারদারঞ্জনের বাড়িতে থাকতেন, সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেন। ভারি গম্ভীর প্রকৃতির রাসভারী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে ছিলেন তিনি, ছোট ভাইবোন ও ভাইপো ভাইঝি আর নিজের ছেলেমেয়েরা সবাই তাঁকে যমের মতো ভয় করত। ছেলেপিলের যত্ন করবার ধরনটি ছিল তাঁর ভারি মজার। মস্ত বড় বোগি থালায় এক রাশি ভাত তরকারি মেখে, পিঁড়িতে করে তাদের খাওয়াতে বসতেন, তারা আট দশ জনা থালার চার দিকে গোল হয়ে বসে পড়ত। গিরিবালা নুন লঙ্কা দিয়ে দিব্যি মুখরোচক করে ভাত মেখে হাত ভরে প্রকাণ্ড গ্রাস

বানিয়ে তাদের মুখে পুরে দিতেন। আর যদি এক চক্কর ঘুরে এসে দেখতেন কারো মুখের গ্রাস তখনো মুখেই রয়েছে, অমনি তার মুখে আরেক দলা ভাত আর সঙ্গে-সঙ্গে পিঠে পড়ত প্রচণ্ড কীল। তবে উপেন্দ্রকিশোরের বয়সটা তাঁর বড় বেশি কাছাকাছি হয়ে যাওয়াতে এ আদরটুকুর থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছিলেন।

এন্ট্রান্স পাশ করে তৃতীয় ভাই মুক্তিদারঞ্জনও কলকাতায় এসে সারদারঞ্জনের বাড়িতে থেকে মেট্রোপলিটান কলেজে ভর্তি হলেন। থাকতেন বড়দার বাড়িতে কিন্তু ঘন ঘন যাওয়া আসা চলত মেজদার বাড়িতে। সারা জীবনে এই ভালোবাসায় এতটুকু চিড় খায় নি। ভাইয়ে ভাইয়ে এমন গভীর স্নেহ দেখলে বাস্তবিক মানবজীবনের অনেক দুঃখকষ্ট ভুলে থাকা যায়।

রায়বাড়িতে গল্প শোনা যায় যে পাছে মুক্তিদারঞ্জনও কিছু একটা করে বসেন, তাই উপেন্দ্রকিশোরের বিয়ের পরেই, তাড়াতাড়ি বড়দাদা মুক্তিদারঞ্জনেরও বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। তখন বেচারির বয়স কুড়ির অনেক নীচে।

দেখতে দেখতে চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন ও ছোটভাই প্রমদারঞ্জনও পড়াশুনোর জন্যে কলকাতায় চলে এলেন। ছোট বোন মৃণালিনীর স্বামী হেমেন্দ্রমোহন বসু, ময়মনসিংহের আনন্দমোহন বসুর ভাইপো। হেমেন্দ্রমোহন কুন্তলীন তেল ও দেলখোস এসেন্স আবিষ্কার করে ঘরে ঘরে একটা প্রবাদের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তখনকার দিনে দেশী প্রসাধনী জিনিসের কথা কেউ ভাবতে পারত না, বিশেষ করে অমন উঁচুদরের জিনিস। মৃণালিনী ও হেমেন্দ্রমোহনও কলকাতায় থাকতেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিলেন। এখানেই ক্রমশ সুগন্ধ দ্রব্য প্রস্তুতকারক এইচ্. বসুর কোম্পানি বড় হয়ে উঠতে লাগল।

ক্রমে এঁরা কলকাতার লোক হয়ে পড়তে লাগলেন, দেশের সঙ্গে যোগটা যেন ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল। দেশে সবাই ময়মনসিংহের বাঙাল ভাষায় কথা বলতেন। সে ভাষাটাও নিতান্ত উপেক্ষা করবার মতো নয়। তার নিজস্ব একটা ভারি সমৃদ্ধ সাহিত্য আছে; ময়মনসিংহের গীতিকাব্য ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল রত্ন। এই গীতিকাব্য পড়লে যেন মসূয়ার রায়দের আরো ভালো করে বোঝা যায়, কারণ এ-সব গানগুলো ওখানকার জীবনযাত্রার টীকার মতো।

রায় পরিবারের সংগীত ও সাহিত্য-প্রীতি, তাদের স্বাধীন মনোভাব, তাদের মেয়েদের প্রবল ব্যক্তিত্ব, এ-সবই ময়মনসিংহের মাটি থেকে রস টেনে নিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছিল এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কলকাতার বাসিন্দা হয়ে ওঁরা ময়মনসিংহের বাঙাল কথা ভুলে যেতে লাগলেন, কিন্তু চারশো বছর ধরে ময়মনসিংহের আলো মাটি জলে পুষ্ট রক্ত তাঁদের শিরায় তবু বইতে থাকল।

তেরো নম্বরের বাড়িটা রায়েদের কলকাতাবাসের প্রাণকেন্দ্র ছিল। উপেন্দ্রকিশোর যে অংশে থাকতেন তার ভিতর দিকেও চওড়া একটা বারান্দা ছিল। রোজ সন্ধ্যাবেলায় সেখানে গান-গল্পের আসর বসে যেত, বাইরের অনেকেও এসে যোগ দিতেন। মসুয়ার রায়েদের অনেকেরই একটা অসাধারণ গুণ দেখা যেত, তাঁরা চমৎকার গল্প বলতে পারতেন। কয়েক বছরের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখীর নিজেদের তিন-চারটি ছেলেমেয়ে হল। বড় মেয়ের নাম সুখলতা, এখন তাকে সুখলতা রাও নামেই ছোট ছেলেমেয়েরা জানে। দেশবিদেশের গল্প সংগ্রহ করে বাংলার ছেলেমেয়েদের উপহার দিয়েছেন। আর সে যে কি মিষ্টি ছড়া, কবিতা, নাটিকা তাঁর কলম থেকে ঝরেছে সে আর কি বলব।

তার পরে ছিলেন সুকুমার, যাঁর বিষয় বলে শেষ করা যায় না। রসের আর কৌতুকের চাবিকাঠি হাতে করে তিনি জন্মেছিলেন, কিন্তু মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সেই স্বর্গে গেলেন। তাঁর আবোলতাবোল, হযবরল, পাগলা দাশু, হেঁসোরাম হুঁসিয়ারের ডায়রি, বহুরূপী, লক্ষ্মণের শক্তিশেল এবং আরো কত বই বাংলাদেশের ছোট ছেলেমেয়েদের আনন্দের সামগ্রী হয়ে চিরকাল থাকবে। তার পরের মেয়ের নাম পুণ্যলতা, তিনিও চমৎকার কথা বলতে ও লিখতে পারেন; তাঁর স্মৃতিকথার বই 'ছেলেবেলার দিনগুলি'র তুলনা হয় না। তার পরে ছিলেন সুবিনয়, বৈজ্ঞানিক গল্প ও প্রবন্ধ লিখে খুব খ্যাতি পেয়েছিলেন। সবার ছোট মেয়ে শান্তিলতা ও ছেলে সুবিমল—তাঁরাও চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, ছড়া তৈরি করতেন। শান্তিলতাও অল্প বয়সে পরলোকে চলে যান।

এই ছটি ছেলেমেয়ের প্রত্যেকের মনে যেন জাদুকাঠির ছোঁয়া লেগেছিল। আরেকটি মেয়েও তাঁর পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল। তার নাম ছিল সুরমা। তার বাবা মাও ঐ তেরো নম্বর বাড়িতেই

থাকতেন। মা হঠাৎ মারা গেলেন, বাবা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেলেন, সুরমা বলে তিন বছরের মেয়েটিকে উপেন্দ্রকিশোর ও বিধুমুখী তাঁদের পরিবারের মধ্যে নিয়ে নিলেন; সুখলতার চেয়ে সামান্য বড়, সব ছেলেমেয়েদের সুরমামাসি হয়ে সেও ওঁদের একজন হয়ে রইল। অনেক বছর পরে, উপেন্দ্রকিশোরের কনিষ্ঠভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে সুরমার বিয়ে হয়। তার কাছে উপেন্দ্রকিশোরের পারিবারিক জীবনের অনেক সুন্দর গল্প শোনা যেত। সেই-সব গল্পের মধ্যে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোর এমন একটি স্নেহমমতায় পূর্ণ উদার পৌরুষের মূর্তি হয়ে ফুটে উঠতেন যে যাঁরা তাঁকে ভালো করে চিনবার সুযোগ পায় নি, কিম্বা হয়তো চোখেও দেখে নি, তাদের কাছেও তিনি যেন জীবন্ত হয়ে উঠতেন।

তবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষরা তাঁদের স্মৃতিকথার মধ্যে দিয়ে ততটা মূল্যবান হয়ে ওঠেন না, যতটা হন তাঁদের কর্মময় জীবনের চিহ্নগুলির মধ্যে দিয়ে। যে মানুষ মরে গেলেই ফুরিয়ে গেল, আর কারো কোনো কাজে এল না, কেবল পাঁচটা গল্প দিয়ে যার স্মৃতি বাঁচিয়ে রাখতে হয়, কি আর তেমন কীর্তি তার? কিন্তু যার নাম লোকে ভুলে গেলেও তার কাজের সুফল বংশপরম্পরায় ভোগ করে, তারই কি সার্থক জীবন! আজকালকার অনেক বাঙালী ছেলেমেয়ে উপেন্দ্রকিশোরের নামও জানে না, কিম্বা হয়তো জানে আবোলতাবোলের রচয়িতা সুকুমার রায়ের বাবা বলে কিম্বা বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের ঠাকুরদাদা বলে। তবু এই-সব ছেলেমেয়েরাও যেই একখানি বই খোলে অমনি উপেন্দ্রকিশোরের কাজের সুফল ভোগ করে!

সপ্তম অধ্যায়

যেদিন মানুষ পৃথিবীতে প্রথম ভূমিষ্ঠ হয়, সেদিন সে তার সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দেয় না। জন্মাবার পরে দিনে দিনে পলে পলে যে কতকগুলো দোষ গুণ দুর্বলতা ক্ষমতা, কি শারীরিক কি মানসিক, তার সঙ্গের সাথী হয়ে জন্মেছিল, তাদের কত যে ভাঙাগড়া লোপ পাওয়া বৃদ্ধি পাওয়া চলতে থাকে তার আর লেখাজোখা নেই। কার সঙ্গে মিশল, কি দেখল, কি শুনল, কি শিক্ষা পেল, কি চিন্তা করল, এই সবটা জড়িয়ে

মিশিয়ে ধীরে ধীরে একটা গোটা ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। তার কতখানি যে জন্মগত আর কতখানি পরিবেশ থেকে আহরণ করা তা বলা শক্ত।

ময়মনসিংহের খোলা বাতাসে মানুষ উপেন্দ্রকিশোরের বেলাতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। কতকগুলি অসাধারণ গুণ নিয়ে তিনি জন্মেছিলেন সত্যি, কিন্তু ছোটবেলাকার ঐ-সব বিশেষ সঙ্গী বন্ধু, তার পর আরেকটু বড় হয়ে কলকাতায় ছাত্রজীবনের অভিজ্ঞতা, কয়েকজন অসাধারণ মনীষীর প্রভাব, এই-সব যদি তিনি লাভ না করতেন, তা হলে তাঁর জন্মগত প্রতিভা কি ভাবে বিকশিত হত, কে জানে। এ-সব ছাড়াও ভাগ্যগুণে তিনি তাঁর বিশেষ মেধা ফুটিয়ে তুলবার জন্য মস্ত বড় একটা সহায় পেয়েছিলেন নিতান্তই সৌভাগ্যক্রমে। সেটি হল পয়সাকড়ির ভাবনা থেকে অনেকখানি নিষ্কৃতি। প্রথম জীবনেই যদি তাঁকে পরিবার প্রতিপালনের জন্য টাকা রোজগার করতে হত, তা হলে ছবি তোলা আর ছবি ছাপা কিম্বা রঙ তুলি কিনে নিজে ছবি আঁকা, এ-সব কাজের অবকাশ বা সঙ্গতি কোনোটাই উপেন্দ্রকিশোর পেতেন না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার ছোট-ছোট আবিষ্কারের ইতিহাস যদি পড়া যায়, দেখা যায় যে এতটুকু সফলতার পিছনে কি বিরাট পরিমাণের বিফলতা থাকে। অনেকখানি বিশ্বাস, উদ্যম আর ধৈর্য না থাকলে, শুধু বৈজ্ঞানিক গবেষণা কেন, কোনোরকম সৃষ্টিমূলক কাজই করা যায় না। কিন্তু কত সময়, এ-সমস্ত সম্ভাবনা হয়তো ব্যর্থ হয়ে যায়। এই নিষ্কৃতির জন্য উপেন্দ্রকিশোর প্রথমে হরিকিশোর ও পরে নরেন্দ্রকিশোরের কাছে ঋণী ছিলেন।

যাঁরা জ্ঞান সাধনা করেন তাঁরা সকলে এক ধরনের হন না। কেউ কেউ সাংসারিক জীবনকে যতটা সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে নির্জনতা খোঁজেন, যেখানে সাধনার কোনো বিঘ্নের ভয় থাকে না। আবার কেউ কেউ সংসারের মধ্যে থেকে নিশ্চিন্ত মনে সাধনা করে যান, বাধা হওয়া দূরে থাকুক, মনে হয় যেন তাঁদের সাংসারিক ও পারিবারিক জীবন তাঁদের সাধনাকে আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। আবার তেমনি তাঁদের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তাঁদের সংসারটিও আরো সুন্দর হয়ে ওঠে। তার একটা কারণ হল এ ধরনের অসাধারণ মানুষদের মনের মধ্যে একটা নিভৃত জায়গা থাকে, সংসারের ঝামেলা যেখানে পৌঁছতে পারে না। শান্তির দরকার হলে সেইখানে তাঁরা নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে রাখতে পারেন, কেউ তাঁদের

সাধনার বিঘ্ন ঘটাতে পারে না।

এইরকম মানুষ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সমাজ, প্রত্যেকের প্রতি তাঁর কর্তব্য পালন করে আনন্দও পেতেন, কিন্তু যে জ্ঞানসাধনার জন্যে তিনি জন্মেছিলেন কখনো তার অবহেলা করতেন না।

আসল কথা তাঁর জীবনে এ দুটি জিনিস আলাদা ছিল না। তাঁর ছবি আঁকা, ছবি ছাপা, গান লেখা, বেহালা বাজানো, বই রচনা করা, সবই ছিল মানুষকে আনন্দ দেবার জন্য, সংসার থেকে নিজেকে আলাদা করবার তাঁর জো ছিল না। কিন্তু তাঁর চরিত্রে এতটুকু লোভ বা স্বার্থপরতার খাদ ছিল না। শিল্প সাধনা করে, সংগীত রচনা করে, বই লিখে, ছোটদের জন্যে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে, কখনো এতটুকু ব্যক্তিগত লাভের কথা মনে আনেন নি।

এ-সব ছিল তার প্রাণের জিনিস, তার আনন্দের জিনিস, তার জীবনের উদ্দেশ্য। কলেজে পড়তে নিজের মাথা থেকে এটা ওটা তৈরি করতেন, ছোট-ছোট যন্ত্র বানাতেন, পরীক্ষা করতেন, ফোটোগ্রাফির নেশাটাকে নানান কার্যকরী উদ্দেশ্যে লাগাতেন। আলো জিনিসটা কি, কিভাবে আলো বিশ্লেষণ করা যায়, কোন অবস্থায় আলোর কি প্রতিক্রিয়া হয়, এই-সমস্ত বিষয়ে পৃথিবীতে যত ভালো বই লেখা হয়েছে, তার ইংরিজি অনুবাদ আনিয়ে তন্ময় হয়ে পড়তেন। শুধু পড়তেন না, সেগুলো নিজের হাতে পরীক্ষা করেও দেখতেন। এটা ছিল তাঁর প্রতিভার এক পিঠ।

অন্য পিঠে ছিল তার শিল্প ও সংগীত-সাধনা। প্রতিভা না থাকলে এ দুটির কোনোটাই হয় না; কিন্তু শুধু প্রতিভা থাকলেই হয় না, তার সঙ্গে থাকা চাই আপ্রাণ চেষ্টা। সৃষ্টির জগতে এক মুহূর্তের আলস্য নেই; আলস্য তো নেই-ই, বিশ্রামও যে খুব বেশি আছে তা মনে হয় না। শিল্পীকে যেন ভূতে পায়, সারাক্ষণ কি একটা প্রবল তাগাদা মানুষটাকে তাড়িয়ে বেড়ায়, জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে জুড়ে থাকে। খালি অনলস চেষ্টা করা, সফল না হলে ফেলে দিয়ে আবার চেষ্টা করা। কান পেতে গান শোনা, ওস্তাদের কাছে কায়দাটি ধরা, অবিরাম অভ্যাস করা, আবার কান পেতে থাকা যতক্ষণ না ঠিক সুরটি বেরুল। এর কি কোনো শেষ থাকে?

তেরো নম্বরের বাড়িতে একটা অন্ধকার ঘর ছিল, ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা সেখানে ঢুকতে ভয় পেত, সেটি ছিল ছবি তোলার গবেষণার ঘর। অন্য ঘরের কোণে বেহালা ছিল, একটা ঈজেল ছিল, তাতে অর্ধেক আঁকা হয়তো একটা তেল রঙের ছবি থাকত। যখন যে কাজটি করতেন তন্ময় হয়ে করতেন। বেহালা যখন বাজাতেন, সুরের মধ্যে একেবারে ডুবে যেতেন, চারি দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে জ্ঞান থাকত না। সব ক্ষণিক দুঃখ ভুলে থাকতেন, সেই যে নিজের হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ, তার মধ্যে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। কেউ সেখানে পৌঁছতে পারত না।

কিন্তু নিজের আয়ত্ত করা বিদ্যা দুহাতে দান করতেও ভালোবাসতেন, কেউ কিছু শিখতে চাইলে সে যে কি খুশি হতেন। বাড়িতে একটা গান বাজনা সাহিত্য শিল্পের হাওয়া বইত। সন্ধেবেলায় ভিতর দিকের চওড়া বারান্দায় সে যে কতরকম গল্প হত, ইতিহাসের গল্প, নানান দেশের গল্প, পুরাণের গল্প, সেকালের জীবজন্তুর গল্প, আকাশের গ্রহ তারার গল্প, দেশের গল্প, যারা বড় হয়েছেন তাদের ছোটবেলাকার গল্প, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গল্প। ছোটরা যারা শুনত তাদের কিছুতেই আশা মিটত না। রাত হয়ে যেত, খাবার সময় হয়ে যেত, তবু কিছুতেই উঠতে চাইত না, শেষটা জোর করে গল্প বলা বন্ধ করে দেওয়া হত।

গল্পের নেশা কি কম নেশা। দ্বারকানাথের এক ছোট ছেলে জ্যান্ত একটা ছোট মাছ হাতে নিয়ে চলেছে, কাঁচের বোতলে রেখে পুষবে বলে। এমন সময় উপেন্দ্রকিশোরের সব চেয়ে ছোট ভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে দেখা। আর যাবে কোথা 'গল্প বল, গল্প বল' বলে ছেলে নেচে উঠেছে। প্রমদারঞ্জন সরকারি জরীপ বিভাগে কাজ করতেন, বনজঙ্গলের অদ্ভুত গল্প বলতেন, তা ছাড়া দেশবিদেশের কত যে গল্প তাঁর জানা ছিল তার হিসাব নেই, সব বীরত্বের গল্প, সাহসের গল্প, জন্তুজানোয়ারের গল্প, হাসির গল্প। কার না ইচ্ছে করে সে-সব গল্প শুনতে। মজা করে প্রমদারঞ্জন বললেন, 'বলব, যদি তোর হাতের ঐ মাছটাকে কাঁচা গিলে খেতে পারিস!' ব্যস্ আর কথাটি নেই, কপ্ করে মাছ মুখে পোরা। 'ওরে খাস্ নে, খাস্ নে, গল্প বলছি!' আর খাস্ নে। মাছ ততক্ষণে কিলবিল করতে করতে পেটে চলে গেছে; গল্প শোনার এমনি নেশা।

পরে যে, উপেন্দ্রকিশোর, তাঁর ভাইরা, ছেলেমেয়েরা ও বন্ধুবান্ধব সবাই মিলে শিশুসাহিত্যের জগতে নতুন একটা যুগ এনে দিয়েছিলেন, এইখানেই তার প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল। সেটা ছিল একটি গড়ে ওঠার, তৈরি হওয়ার যুগ। বাংলাদেশের এই গড়ে ওঠার প্রথম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শগুলিকে রূপ দিয়েছিলেন; তাঁর ছেলেমেয়েরা অনেকেই বাংলার নতুন সংস্কৃতির সেবক ছিলেন, শিক্ষাদীক্ষায়, সমাজ-জীবনে, সাহিত্যে, সংগীতে, শিল্পে, নাট্যে, সব ক্ষেত্রেই তাঁদের অকাতর দানে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এঁদের যেমন সাহিত্যের তেমনি গান-বাজনার চর্চা ছিল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের চেয়ে মাত্র দু বছরের বড়। একই ধরনের সখ সাধ থাকলে যা হয় দুজনের মধ্যে একটা গভীর বন্ধুত্বের সৃষ্টি হল। মাঘোৎসবের সময় দেখা যেত উপেন্দ্রকিশোর বেহালা নিয়ে জোড়াসাঁকোর দিকে চলেছেন, গানের সঙ্গে বেহালা বাজাবেন।

ঠাকুর পরিবারের আরেকটা ঝোঁকও ছিল, সেটি হচ্ছে শিশুসাহিত্য। সেকালের বাংলাদেশে ছোটদের জন্য আলাদা করে বিশেষ কিছু লেখা হয় নি; তবে নানারকম ছড়ার প্রচলন ছিল; ঠাকুরমা দিদিমা নাতি নাতনিদের ঘুম পাড়াবার সময় রূপকথা বলতেন; মেয়েরা নানারকম ব্রত করত, সেই সময় ব্রতকথার সুন্দর সুন্দর গল্প বলা হত; কবিগান ছিল, যাত্রা ছিল সন্ধেবেলা চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ পড়া হত, কাজেই ছেলেমেয়েদের গল্প শোনার সখ মেটাবার উপায়ও ছিল অনেক। কিন্তু সে-সবই ছিল পুরোনো দিনের কথা, আধুনিক জগতের সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যেত না, বিজ্ঞানের নামগন্ধও থাকত না। কাজেই যাঁরা ছোট ছেলেদের শিক্ষার কথা ভাবতেন, তাঁরা শিশুসাহিত্য নিয়েও মাথা ঘামাতেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেকালের খৃস্টান পাদরি ও মিশনারিরা, তাঁরা নানান বিলাতী গল্পের বাংলা করে আর নিজেদের লেখা রচনার মধ্যে দিয়ে বিলিতি শিক্ষা যে কত ভালো তাই প্রমাণ করতে চেষ্টা করতেন।

বাইরে থেকে যেটাকে ঘাড়ে চাপানো হয় তার সঙ্গে তো আর নাড়ির যোগ থাকে না, কাজেই ঐ ধরনের ছোটদের বই একটা বিদেশী উপদ্রবের মতোই হয়ে রইল। তার পরে যখন উনিশ শতকের শেষের দিকে বাংলা-

দেশের সব ক্ষেত্রেই একটা জেগে ওঠার সাড়া পড়ল, শিশুসাহিত্যও বাদ গেল না। খানকতক বই লেখা হল, ছোটদের জন্য দু চারটে পত্রিকাও বেরুল। তার মধ্যে.প্রথম হল ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত 'বালক', রবীন্দ্রনাথের মেজো বউঠান জ্ঞানদানন্দিনী দেবী তার সম্পাদনা করেছিলেন, তরুণ রবীন্দ্রনাথ তাতে লিখতেন, সম্পাদনার ভারও তাঁর ওপর কিছুটা ছিল। 'মুকুল' বলে আরেকটি পত্রিকাও পরে বেরিয়েছিল। তা ছাড়া 'সখা' ছিল, 'সাথী' ছিল এবং সে-দুটি মিলে পরে 'সখা ও সাথী' হয়েছিল। কিন্তু ছাপা কিম্বা ছবির দিক থেকে কোনোটাই খুব চিত্তাকর্ষক ছিল না। ছোটদের জন্য লেখা বই যে আবার খুব সুন্দর করে প্রকাশ করা যায় সে কথা আমাদের দেশে বিশেষ কেউ জানতই না।

কেউ না জানলেও উপেন্দ্রকিশোর জানতেন। তিনি অনেক বিলাতী বই দেখেছিলেন, তার মধ্যে ছোটদের বইও ছিল, যেমনি মনোরম তাদের পাঠ্য বিষয়গুলি, তেমনি সুন্দর তাদের ছাপা ও ছবি। দীর্ঘকাল ধরে নিজের অন্ধকার ঘরে বসে ছবি তোলা আর ছবি ছাপা নিয়ে পরীক্ষার পর পরীক্ষা করেছেন। তিনি জানতেন যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যও সুন্দর ছবিতে ভরা সুন্দর করে ছাপা সুন্দর বই তৈরি করা সম্ভব। কে জানে তখনি হয়তো মনে মনে সঙ্কল্প করেছিলেন যে তাঁর হাত দিয়েই এ কাজের অনেকখানি সম্পন্ন হবে।

অষ্টম অধ্যায়

সময় কারো জন্যে বসে থাকে না, কাজকর্ম পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে একের পর এক বছরগুলো কেটে যেতে লাগল। পারিবারিক জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে উপেন্দ্রকিশোর ভারি যত্নশীল ছিলেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার দিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল; যার যা স্বাভাবিক গুণ ছিল তাকে যত্ন করে ফুটিয়ে তোলা এও একটা কর্তব্য, এদিকেও তিনি যত্নবান ছিলেন। পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করতে হলে মনটাকে মুক্তি দিতে হয় তিনি জানতেন, তাই সকলে একসঙ্গে চিড়িয়াখানায়, জাদুঘরে, এখানে ওখানে চড়িভাতি করতে যেতে তাঁর উৎসাহও কম ছিল না।

এক জায়গায় বদ্ধ থাকা তাঁর স্বভাব ছিল না, ছুটি হলেই সপরিবারে

নানান স্বাস্থ্যকর জায়গায় বেড়াতে যেতেন, গিরিডি, চুনার, পুরী, দার্জিলিং। সে-সব কথা তাঁর ছেলেমেয়েদের মনে আনন্দের স্মৃতি হয়ে আজও গাঁথা হয়ে আছে। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে ছাপার কাজ ও ছবি এন্‌গ্রেভ করা সম্বন্ধে তাঁর এতখানি শেখা ও জানা হয়ে গিয়েছিল, এতখানি দক্ষতা ও নিজের উপরে একটা বিশ্বাস এসেছিল যে সাহস করে নিজের পয়সায় বিলেত থেকে কিছু যন্ত্রপাতি আনিয়ে নিজের ছাপাখানার কাজ শুরু করে দিলেন। এইভাবে সেকালের বিখ্যাত ইউ. রায় এণ্ড সন্সের ছাপাখানার গোড়াপত্তন হল।

এই ছাপাখানার বিশেষত্ব হল এখানে হাফটোন বুক প্রিন্টিং এর কাজ হত; ভারতবর্ষে তখন আর কেউ এ বিষয় জানত না। এদেশে ছাপা বইয়ের ছবিও ভালো হত না। উপেন্দ্রকিশোরের প্রথম বইয়ের নাম 'ছেলেদের রামায়ণ' এ বই এখনো ছোট ছেলেমেয়েরা কত খুশি হয়ে পড়ে। উপেন্দ্রকিশোরের নিজের হাতে এর চমৎকার ছবি আঁকা হল। তখনো নিজের ছাপাখানা হয় নি, অন্য জায়গায় বই ছাপতে দেওয়া হল। তারা বুক তৈরি করতে গিয়ে সব ছবি খারাপ করে ফেলল, উপেন্দ্রকিশোরের সে কি দুঃখ! এর পর আর কোনো বইয়ে এমনটি হয় নি, তার কারণ সব ছবি তাঁর নিজের প্রেসে নিজের প্রণালীতে ছাপা হয়েছে।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাঠের প্যাকিং কেসে করে গোরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে যেদিন বিলেত থেকে যন্ত্রপাতিগুলো এসে তেরো নম্বর বাড়িতে পৌঁছল সে একটি স্মরণীয় দিন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে দেখতে লাগল কেমন করে ঐ-সব বিরাট ভারী প্যাকিং কেসগুলোকে গোরুর গাড়ি থেকে নামিয়ে ঘরে তোলা হয়। সারাটা সকাল এইভাবে কাটল।

কিন্তু তেরো নম্বরের বাড়িতে যন্ত্রপাতি বসিয়ে একটা ছাপাখানার জায়গা কোথায়? উপেন্দ্রকিশোরকে অন্য বাড়ি দেখে উঠে যেতে হল। ওদের জীবনের একটা অধ্যায় ঐখানে শেষ হল। মস্ত বড় বাড়িটার জমজমাট ভাবের আকর্ষণ, চওড়া বারান্দায় সন্ধ্যাবেলার আসর, এক-তলার ভাড়াটেদের প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় মাছ কচ্ছপের মজা দেখা সব ছেড়ে চলে আসতে হল।

গেলেন ওরা কাছেই, সাত নম্বর শিবনারায়ণ দাস লেনে। তখন উপেন্দ্রকিশোরদের পরিবারে নিজেদের দুটি ছেলে, তিনটি মেয়ে, আর

সুরমা বলে সেই মেয়েটি। শিবনারায়ণ দাস লেনের বাড়িতে ছোট ছেলে সুবিমল জন্মেছিলেন। তেরো নম্বরের পুরোনো পরিবেশটাও অনেকখানি বদলিয়ে গেল। ওরা চলে গেছেন, ১৮৯৮ সালে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মারা গেলেন, অনেকগুলি ছেলেমেয়ের সমস্ত দায়িত্ব কাদম্বিনীর উপযুক্ত হাতে এসে পড়ল। তবে তাঁর ডাক্তারি ব্যবসার সাফল্যের জন্য কোনো দিনই তাঁকে অর্থাভাবে পড়তে হয় নি।

নতুন বাড়িটি ছিল মাঝারি রকমের, সেইখানে চাকর-বাকর নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরেরা গুছিয়ে বসলেন। একটা ঘর হল ছবি তোলার আর ছবি আঁকার স্টুডিও; আরেকটি ঘরে ছোট একটি প্রেস বসল, অন্য একটি ঘরে আর মস্ত বারান্দায় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য দরকারি সরঞ্জাম রাখা হল। একটা স্নানের ঘর হল ছবির ডার্ক-রুম। সেইখানে হাফটোনের কাজে উপেন্দ্রকিশোর আরো হাত পাকাতে লাগলেন। আস্তে আস্তে তাঁর ছাপাখানার খ্যাতি চারি দিকে ছড়াতে লাগল।

প্রথমে বিলিতি ছাপার কেতাটা শিখলেন। তার পরে মনে হতে লাগল তাতে অনেক খুঁত রয়েছে, আরো ভালো করা যায়। এক মনে তাই নিয়ে পরীক্ষা করে চললেন। বিলেতের বিখ্যাত প্রিন্টিং-এর পত্রিকা পেনরোজ এনুয়েলে এই বিষয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখতে লাগলেন, তাঁরা আদর করে সে-সব ছাপতে লাগলেন। এই-সব প্রবন্ধের লেখকের জ্ঞানের গভীরতা ও ভাষার মাধুর্য দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। সে সময়ে যে একজন বাঙালী যুবক এত সহজ সুন্দর করে ইংরিজিতে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতে পারলেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।

তেরো নম্বরের বাড়িতে যে শিশুসাহিত্যের বীজের অঙ্কুর বেরিয়েছিল, আস্তে আস্তে তাতে ফুল ফুটতে লাগল। বারান্দায় বসে ছেলেমেয়েদের কাছে উপেন্দ্রকিশোর যে-সব সেকালের গল্প বলতেন, তাই দিয়ে 'সেকালের কথা' বই তৈরি হল। আগাগোড়া উপেন্দ্রকিশোরের নিজের লেখা, নিজের হাতে আঁকা, নিজের ছাপাখানায় ছাপা, এ বইয়ের হাফটোন ব্লকে ছাপা ছবিগুলি হল প্রায় নিখুঁত।

ততদিনে উপেন্দ্রকিশোর বিলিতি নিয়মে হাফটোন ছাপার আরো উন্নতি করে ফেলেছেন। বিলেতের ছাপাখানার মহলে তাই নিয়ে বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টিও হয়েছিল। তাঁরা গুণগ্রাহী জাত, তাঁদের

পত্রিকাদিতে উপেন্দ্রকিশোরের উচ্চ প্রশংসা বেরুল, সেখানে যাবার জন্য তাঁর কত নিমন্ত্রণ এল, এমন-কি, তাঁরাও কেউ কেউ এখানে এসে ছাপাখানার কাজ দেখবার প্রস্তাব করলেন। এখানে এসে ছোটোখাটো একটা ভাড়াবাড়িতে সামান্য উপকরণ দিয়ে কেবল নিজের প্রচণ্ড প্রতিভাবলে মাত্র বত্রিশ বছরের একজন বাঙালী যে এতখানি সম্পাদন করতে পেরেছিলেন এ বোধহয় তাঁরা ধারণাও করতে পারেন নি।

সেকালে আমাদের দেশে ছবি ছাপা হত কাঠের উপরে খোদাই উডকাট কিম্বা ইস্পাতের পাত ইত্যাদির সাহায্যে, তাকে বলত স্টিল প্লেট। ছবি হত অস্পষ্ট ও মোটা। কলেজে পড়বার সময়ই উপেন্দ্রকিশোর জানতে পেরেছিলেন যে তামা ও জিঙ্কের পাতে খোদাই করে ছাপলে আরো অনেক মোলায়েম ও সূক্ষ্ম ছবি হয়। হাফটোন ও লাইন ব্লক সম্পর্কে অনেক পড়াশুনো ও গবেষণার ফলে উপেন্দ্রকিশোর সে-সব প্রণালীর যে উন্নতিসাধন করতে পেরেছিলেন, বাস্তবিক তাতে শুধু এদেশের নয়, পৃথিবীর ছবিছাপার বিজ্ঞান উপকৃত হয়েছিল।

দিনে দিনে ছাপাখানার উন্নতি হতে লাগল, ক্রমে এ বাড়িতেও জায়গা কুলোয় না, তখন আরো বড় বাড়ি দেখে উপেন্দ্রকিশোরকে আবার উঠে যেতে হল। এই হল বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ি, ১৯০০ সাল থেকে এই বাড়ির একতলায় চলতে লাগল ইউ. রায় এণ্ড সন্সের ছাপাখানার কাজ, উপেন্দ্রকিশোর সপরিবারে থাকতেন দোতলায়, তিনতলায়।

পরিবারটি ততদিনে আরো বেড়ে গেছে। নিজেদের ছটি ছেলে-মেয়ে, সুরমা, বিধুমুখীর রুগ্ন ছোট ভাই সতীশচন্দ্র, উপেন্দ্রকিশোরের চতুর্থ ভাই কুলদারঞ্জন এঁরা তো ছিলেনই, তা ছাড়া আরো বহু আত্মীয়-বন্ধুর যাওয়া আসা লেগেই থাকত।

মনে হয় ওঁদের ছিল অবারিত দ্বার, কোনো দুঃখী নিরাশ্রয় ওঁদের বাড়ি থেকে ফিরে যেত না। কত রুগ্ন লোক এসে চিকিৎসা করিয়ে যেত। একবার এক বৃদ্ধ পাগল ভদ্রমহিলাও অনেকদিন থেকে গেলেন। বাড়িসুদ্ধ সকলে নাস্তানাবুদ, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ির দরজা তবুও তেমনি খোলা রইল।

কুলদারঞ্জনের জীবনটি তাঁর মেজদাদার জীবনের সঙ্গে একেবারে জড়িয়ে গিয়েছিল। ছবি তোলা, ছোটদের জন্য লেখার সখ এঁরও ছিল

প্রবল। ইনিও ব্রাহ্মসমাজে বিয়ে করে হিন্দু আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে একটু সরে এসেছিলেন। বিয়ের পর কয়েক বছর আলাদা বাড়ি করে ছিলেন, কিন্তু তিনটি ছেলেমেয়ে রেখে অল্প বয়সে স্ত্রী মারা গেলে পর, আবার এসে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে রইলেন। ছেলেমেয়েরা জ্যাঠাইমার কাছেই মানুষ হল।

এই কুলদারঞ্জনের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের চেহারার বা প্রকৃতির খুব বেশি সাদৃশ্য ছিল না অথচ সখগুলো ছিল এক ধরনের। উপেন্দ্রকিশোর ছিলেন অনেকটা লম্বা চওড়া ফরসা, সুন্দর উঁচু নাক ছিল, ঠাণ্ডা মেজাজ ছিল। শান্ত সংযত ব্যবহার ছিল। কুলদারঞ্জন বেঁটে, গায়ের রঙ শামলা, নাকমুখ অতটা সুগঠিত নয়, চট করে যেমন রেগে যেতেন, তেমনি দুটো মিষ্টি কথাতেই গলে জল হয়ে যেতেন। দুজনেই ছিলেন স্নেহশীল, ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো বই লেখা হোক দুজনেরই এই এক স্বপ্ন। বড় ভাইয়ের মতো প্রতিভা না থাকলেও কুলদারঞ্জন সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ছবি আঁকার হাত ছিল চমৎকার, খুব ভালো ফোটো তুলতে পারতেন, নিজে সে ছবি এনলার্জ করে, রঙ দিয়ে সম্পূর্ণ করতেন। অত উঁচুদরের হাতে ফিনিস্ করা ছবি কম দেখা যায়। পয়সাকড়ির ধার ধারতেন না দুজনের মধ্যে কেউ, যেমন রোজগার হত, তেমনি মুক্তহস্তে খরচ হত, একে ওকে দিয়ে দুই ভাই সমান আনন্দ পেতেন।

তার উপর উপেন্দ্রকিশোরের ছিল উদার ধার্মিক চিত্ত। ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত মঙ্গল কাজের জন্য তাঁর ছিল গভীর দরদ। ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের জন্য কত চিন্তা করতেন, কতরকমে সাহায্য করতেন, পরিচালক সমিতির সদস্য ছিলেন, গান লিখে, নাটিকা লিখে, ছেলেমেয়েদের শিখিয়ে যখন যেভাবে পারতেন সাহায্য করতেন।

সে সময় মেয়েরা খুব বেশি স্কুল-কলেজে পড়ত না, এমন-কি, গোঁড়ারা অনেকে বলতেন যে কলেজে পড়লে মেয়েরা হয় মরে যায়, নয় তো বিধবা হয়, নিদেন জাত যায়। এইরকম আবহাওয়াতে উপেন্দ্রকিশোরদের বাড়ির সব মেয়েরা স্কুলে কলেজে পড়তে যেতেন, খৃশ্চানদের তো কথাই নেই। এইভাবে সামাজিক উন্নতির পথ একটি একটি করে পাথর ফেলে বাঁধতে হয়, তবে সে উন্নতি স্থায়ী হয়।

বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়িতে ইউ. রায় এণ্ড সন্সের ছাপাখানা আর উপরের তলায় উপেন্দ্রকিশোরের বাস অনেক বছর ছিল। বাড়িটি

ক্রমে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। মৌচাকের চারি দিকে মৌমাছিরা যেমন ছেঁকে ধরে, বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের ছাপাখানার দরজা জানলার বাইরে ফেলে দেওয়া রঙিন ছবির আশায় পাড়ার ছেলেরা তেমনি ভিড় করত।

বাড়িটার একটা বিশেষ শব্দ আর গন্ধ ছিল, যা শুনলে আর শুঁকলে ছোট-ছোট ছেলেদের মন পাখির মতো উড়ে যেতে চাইত। একটানা শব্দটা ছিল প্রেস চলার আর গন্ধটা ছিল কালি রঙের গন্ধ। দুটিতে মিলে এমন একটা জাদুর সৃষ্টি করত যে কেবলই মনে হত এই বুঝি ডানা মেলে গোটাবাড়িটা আকাশে উড়ে পড়বে।

বাড়ির কর্তা ঐ সুন্দর গম্ভীর মানুষটি সম্পর্কেও ছেলেদের কম কৌতূহল ছিল না। প্রেসে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের তারা 'ছবি দিন, ছবি দিন' করে জ্বালিয়ে খেত আর দাড়িওয়ালা গম্ভীর ভদ্রলোকটিকে দূর থেকে সমীহ করত আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত। এই ভক্ত ছেলের দলের মধ্যে স্বর্গীয় সুনির্মল বসুও ছিলেন। গিরিডিতে তিনি একবার সাহস করে উপেন্দ্রকিশোরের একেবারে সামনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—কি চাও? সুনির্মল বসু কিছু না বলেই পালিয়েছিলেন।

নবম অধ্যায়

লেখাপড়া জোর করে প্রায় সবাইকেই শেখানো যায় বটে, কিন্তু লিখতে পারা, ভালো লেখা চিনতে পারা অন্যকে চেনাতে পারা সে হল আলাদা জিনিস। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলতেন শিল্পী যে সেও অন্য সবাকার মতো যখন পৃথিবীতে আসে একেবারে খালি হাতেই আসে, সঙ্গের সাথী করে নিয়ে আসে শুধু একটুখানি পিপাসা। সে পিপাসাটাই হল সব, সাধারণ জল দিয়ে তাকে মেটানো যায় না, তার জন্য অন্য রকমের রস চাই, সুর, শব্দ, রূপ, এ-সব নইলে তার চলে না। যারা এই পিপাসাটুকু নিয়ে জন্মায় শুধু তারাই হয় শিল্পী, তারাই হয় সাহিত্যিক। আর যদি এই পিপাসাটি না থাকে তো হাজারখানা ছবি আঁকলেও সে শিল্পী হয় না, পাঁচশো বই লিখলেও সাহিত্যিক হয় না।

কেমন করে জানি মসূয়ার রায় পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেকেই ঐ পিপাসার একটুখানি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যায়। তার জন্যে কোনো উপকরণও লাগে না, আপনা থেকেই কেমন এসে যায়। উপেন্দ্রকিশোরের ঠাকুরদাদা লোকনাথের ভাই ছিলেন ভোলানাথ, তিনি কথায় কথায় ছড়া কাটতেন, বাঙালদেশের ভাষায় বলা এমন কিছু উঁচুদরের কবিতা নয়, তবে রসে ভরপুর। তাঁর বউদিদি কৃষ্ণমণি রান্না করছেন, উনুনের ধোঁয়া লেগে চোখ দিয়ে জল পড়ছে। তাই দেখে ভোলানাথ বললেন,

'এক বউয়ের নাম সুদক্ষিণা, ভাত খাইন না, খাইন চীনা।
গির্তাইনের নাম কৃষ্ণমণি, রান্‌তে পড়ে চোখের পানি।
পাগ্‌ বাইয়াতে ফুঁপানি।'

বউরা খেতে বসেছে, বাইরে থেকে কান পেতে আর শব্দ শুনে ভোলানাথ বললেন,

'ঘরে খাইন, বাইরে খপর,
চেপাপোড়া পানিভাত চাপর চপর।'

একবার ভোলানাথ খাজনা করতে গেছেন কিন্তু নায়েবমশাই গায়ে তেল মাখছেন তো তেলই মাখছেন। ভোলানাথ বললেন,

'আমি আইলাম খাজনা করতাম, নায়েব লাগাইল ত্যা'ল্‌,
আশা উমেদ যত আছিল্‌, মার্গের তলে গেল্‌।'

শুনেই নায়েব চমকে উঠে তাড়াতাড়ি করে কাজ সেরে দিলেন।

এঁদের বংশধররা যে খেলা করতেও কবিতা করবে এ আর আশ্চর্য কি? সবাই মিলে গোল হয়ে বসে একটা জানা গল্প নিয়ে এ এক লাইন ও এক লাইন করে ছড়া গেঁথে গল্পটি শেষ করতে ভারি মজা। একদিন হল কথামালার বাঘ ও বকের গল্প। ছড়াটা এইরকম ভাবে শুরু হয়েছিল—

'একদা এক বাঘের গলায় ফুটেছিল অস্থি,
যন্ত্রণায় কিছুতেই নাহি তার স্বস্তি,
তিনদিন তিনরাত নাহি তার নিদ্রা,
সেঁক দেয়, তেল মাখে, লাগায় হরিদ্রা...'

উপেন্দ্রকিশোরও এ রস থেকে বঞ্চিত ছিলেন না, বাইরে থেকে তাঁকে

যতই-না গম্ভীর মনে হোক। বিদেশে কোথাও কাজে কি বেড়াতে গেলে মজার মজার ছবি এঁকে, পদ্যে কত চিঠি লিখতেন। একবার বিধুমুখীর ভাই সতীশচন্দ্রকে ময়মনসিংহ থেকে লিখেছিলেন ময়মনসিংহী ভাষায়—

সৈত্যাদ্দা, হা হা হা,
কথাডা শুইন্যা যা,
কৈলকাত্তা বৈস্যা খা
দৈ ছানা ঘি পাঁঠা।
ময়মনসিং ঘোড়াড্ডিম!
দেখবার নাই, কিচ্ছু তাই,
সার্ভেন্ট ইজ্ ইন্‌ট্‌পিড্
রাইন্ধ্যা থোয় যাইচ্ছা তাই।'

—সতীশচন্দ্র ময়মনসিংহের উপর হাড়ে চটা ছিলেন, সুতরাং রসটা জমেছিল ভালো। আরেকবার কোথায় নেমন্তন্ন খেয়ে ছেলেমেয়েদের লিখেছিলেন—

'মাগো আমার সুখলতা,
টুনি, মণি, খুশি, তাতা,
কাল আমি খেয়েছি শোনো
কি ভয়ানক নেমন্তন্ন

...

জলে থাকে একটা জন্তু
দেখতে ভয়ানক, কিন্তু
মাছ নয়, কুমীর নয়,
করাত আছে, ছুতার নয়,
লম্বা-লম্বা দাড়ি রাখে,
লাঠির আগায় চোখ থাকে,
তার যে কতকগুলো পা
ঢের লোক তা জানেই না।
দুটো পা যে ছিল তার
বাপ্ রে সে কি বলব আর!

চিম্‌টি কাটত তা দিয়ে যদি
ছিঁড়ে নিত নাক অবধি।'

তার পাশেই অবিশ্যি জন্তুটার ছবিও আঁকা ছিল, কাজেই বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না।

এ-সব তো গেল হাসি-ঠাট্টার কথা, উপেন্দ্রকিশোরের ভারি ধার্মিক ও গম্ভীর একটা দিকও ছিল, গম্ভীর কিন্তু রুক্ষ বা কর্কশ নয়। এই দিকটা প্রকাশ পেত তাঁর সংগীত-সাধনায় খুব বেশি। ওস্তাদের কাছে উচ্চাঙ্গ সংগীত শিখেছিলেন, তার চর্চাও রেখেছিলেন, গান শেখাতেন, নানারকম বাজনা বাজাতেন, সেতার, পাখোয়াজ, হার্মোনিয়ম, বাঁশি আর বিশেষ করে তাঁর প্রাণপ্রিয় বেহালা। বিখ্যাত সংগীত-যন্ত্র ব্যবসায়ী ডোয়াকিন কোম্পানির পত্রিকা সংগীত-শিক্ষার সম্পাদনের ভারও অনেকদিন তাঁর হাতে ছিল।

অনেকগুলি ধর্মসংগীত রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে একটি 'জাগো পুরবাসী' এখনো প্রতি বছর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে মাঘোৎ-সবের সময় সকালবেলায় গাওয়া হয়। এ-সব গানের যেমন মধুর ভাব তেমনি মিষ্টি ভাষা।

'জাগো পুরবাসী ভগবত-প্রেমপিয়াসি !
আজি এ শুভদিনে কিবা বহিছে করুণা রস-মধু ধারা।...
শূন্য হৃদয় লয়ে নিরাশার পথ চেয়ে, বরষ কাহার কাটিয়াছে ?
এসো গো কাঙাল জন, আজি তব নিমন্ত্রণ, জগতের জননীর কাছে।'

এ-সব গানের মধ্যে ভারি সরল একটা বিশ্বাস প্রকাশ পেত, ভগবানের চরণে নিজেকে নিবেদন করে দিতে পারলেই আর কোনো ভয় নেই। তাঁর কাছে শুধু পুণ্যবানরাই ঠাঁই পাবে এমন কোনো কথা নেই, কে কোথায় পাপী তাপী দুঃখী অভাজন আছে, এসো, একবারটি এসে বসো, কোনো দুঃখ থাকবে না। এই সরল বিশ্বাস নিয়েই তিনি জীবন কাটিয়েছিলেন, তাঁর জীবনের আনন্দময় সৃষ্টিগুলিও ভগবানের মঙ্গল বিধানে তাঁর অগাধ বিশ্বাসেরই স্বীকৃতি।

তখন দেশে একটা জাতীয়তাবোধের বান ডেকেছে, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্যরা সুন্দর সুন্দর দেশপ্রেমের গান লিখছেন। কলকাতায় এক-বার দারুণ প্লেগ হল, সবাই মিলে মহা উৎসাহে সেবার কাজে লেগে

গেলেন। দেশপ্রেম মানেই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূত্রপাত। ইণ্ডিয়ান ন্যাশানাল কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতাদাবীর কাজ আগেই আরম্ভ হয়েছিল, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন তার এক মহা উৎসাহী পাণ্ডা। তরুণ রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষার দৈন্য ঘুচোতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, নাটোরে জাতীয় অধিবেশনে কাকেও ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হবে না, এই নিয়ে মহা আন্দোলন করেছিলেন। বাঙালী পোশাক, বাংলা কথা, বাংলা সংস্কৃতি এ-সব জিনিসের আদর করতে সারা দেশটাকে শেখাতে লাগলেন। এ-সমস্ত বিষয়েই যে উপেন্দ্রকিশোরেরও সাগ্রহ সমর্থন থাকবে সে আর আশ্চর্য কি?

দেশের সংস্কৃতি মানেই দেশের গান, গল্প, শিল্পকর্ম। উপেন্দ্রকিশোর জানতেন রামায়ণ মহাভারত সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকলে নিজের দেশকে চিনতে কেউ আরম্ভও করতে পারে না। যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জোরে আমাদের দেশে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন, তারই প্রভাবে তিনি দেশের পুরোনো সুন্দর সুন্দর কাহিনী উদ্ধার করতে লেগে গেলেন। একে একে 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছোটদের মহাভারত' এবং অনেকদিন পরে 'মহাভরেতের গল্প' বেরুল।

তফাতটা শুধু এই, সেকালের পুরোনো মনগড়া গল্প না হয়ে, উপেন্দ্র-কিশোরের কলমের জোরে সে-সব হয়ে দাঁড়াল জীবন্ত কাহিনী, অথচ মূল গল্প কোথাও এতটুকু পালটাবার কথা মনেও আনেন নি। এ-সব বইয়ের অর্ধেক আকর্ষণ ছিল তাদের অপূর্ব সব সাদা কালো ও রঙিন ছবি। কি রাক্ষুসে সব রাক্ষস, কি রাজকীয় রাজা, কি জোরালো সব বীর, কী করুণ দুঃখিনী সীতা। পড়তে পড়তে আর ছবি দেখতে দেখতে ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাণটা পর্যন্ত যেন আকুল হয়ে উঠত। আর গল্প বলার সে কি আশ্চর্য ঢং। কোথাও একটা বাড়তি কথা নেই, রঙ চড়াবার এতটুকু চেষ্টা নেই, ন্যাকামির লেশমাত্র নেই, বুড়োমিও নেই, গুরুগিরি করবার কোনো প্রয়াস নেই, এমন নিখুঁত গল্প বলার কায়দা কম দেখা যায়।

এ-সব গল্প পড়লে বোঝা যায় যে কোনো গল্পই একদিনে লেখা হয় না। কাগজ কলম নিয়ে হয়তো একদিনই বসা হল, কিন্তু তার পিছনে থাকে সারা জীবনের পর্যবেক্ষণ, মনের মধ্যে অনেকদিন ধরে তৈরি হওয়া।

তার পর আরেকটা কথাও ছিল। কি করলে বাজারে বই কাটবে ভালো, এ কথা মনেও স্থান পেত না, তাঁর একমাত্র চিন্তা ছিল, কিসে বই ভালো হবে, ছেলেমেয়েরা শিখবে কিন্তু আনন্দের মধ্যে দিয়ে শিখবে। মাস্টারমশাইগিরি করা চলবে না।

যত সম্ভব ভালো কাগজ কেনা হত, উৎকৃষ্ট রঙ কালি ব্যবহার হত, কত ভালোবাসা কত নিষ্ঠার সঙ্গে ছবি আঁকা হত ; তার পর ব্লক যদি ভালো না হত, ছাপা যদি মনের মতো না উঠত, তখুনি ফেলে দিয়ে আবার নতুন করে করা হত। খরচের প্রশ্ন উঠতই না। বাস্তবিক লাভের কথা ভাবেনও নি কখনো, যেখানে অন্য লোকে হয়তো হাজার হাজার টাকা কামাচ্ছে, উপেন্দ্রকিশোর ভালো জিনিস তৈরি করেই সন্তুষ্ট থেকেছেন।

সে লেখার বেলাও যেমন, ছবির বেলাও তেমন। হাফটোন ব্লক তৈরির অমন যুগান্তকারী উন্নতি করে, তার ফল দান করে দিলেন পেনরোজ কোম্পানিকে অকাতরে। কিছু গোপন রাখলেন না। বিলেতে কতজনে লাখপতি হয়ে গেলেন, উপেন্দ্রকিশোরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। জিনিসটা তৈরি করেই খুশি, অন্যদের কাজে লাগছে বলেই কৃতার্থ হয়ে গেলেন।

এরকম মানুষ ব্যবসার জগতে বড় একটা দেখাই যায় না। শুধু বিলেতে কেন, কলকাতায়ও ইউ. রায় এণ্ড সন্সের কাছে দীর্ঘকাল কাজ শিখে সব জেনে নিয়ে আরেকটা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসা খুলেছে লোকে এমনও দেখা গিয়েছিল। উপেন্দ্রকিশোর তাতেও কাতর হয়ে পড়েন নি।

আসলে লোকনাথের নাতির কাছে টাকার কোনো মূল্য ছিল না। জমিদারীর উত্তরাধিকারী তবু বিলাস করেন নি কখনো, কিন্তু গবেষণার জন্য, সরঞ্জামের জন্যে যখনি টাকা দরকার হয়েছে, জমিদারী থেকে টাকা এসে গেছে। সহজে না এলে কিছু জমি বন্ধক রেখেও টাকার জোগাড় হয়েছে, এর কি ফল হতে পারে উপেন্দ্রকিশোর সে বিষয়ে একবারও চিন্তা করেন নি।

দশম অধ্যায়

উপেন্দ্রকিশোরের আরেকখানি বই আছে তার নাম টুনটুনির বই। বইয়ের প্রথম পাতায় তারিখ দেওয়া আছে ১৩১৭, গ্রন্থকার নিবেদন করছেন—

'সন্ধ্যার সময় শিশুরা যখন আহার না করিয়াই ঘুমাইয়া পড়িতে চায়, তখন পূর্ববঙ্গের কোনো কোনো অঞ্চলের স্নেহরূপিনী মহিলাগণ এই গল্পগুলি বলিয়া তাহাদের জাগাইয়া রাখেন। এই গল্পের স্বাদ শিশুরা বড় হইয়াও ভুলিতে পারে না। আশা করি আমার সুকুমার পাঠক-পাঠিকাদেরও এই গল্পগুলি ভালো লাগিবে।'

সেই তাঁদের আমকাঁঠালের বনে ভরা, বাঁশ বাগানের ছায়া ফেলা দেশের জল মাটি হাওয়ায় জন্ম এই-সব গল্পের। এই গল্প শুনে শুনে উপেন্দ্রকিশোরের পিতৃপুরুষরা রাতে ঘুমোতে যেতেন, এ-সব সাধারণ গল্প নয়, এমন বই বাংলা ভাষায় আর দুটি নেই।

প্রথম গল্প হল, 'টুনটুনি আর বিড়ালের কথা'। টুনটুনি একটা ছোট পাখি, এত ছোট যে হাতের মুঠোর মধ্যে স্বচ্ছন্দে ধরে রাখা যায়। গল্প শুরু হচ্ছে—'গৃহস্থদের ঘরের পিছনে বেগুন গাছ আছে। সেই বেগুন গাছের পাতা ঠোঁট দিয়ে সেলাই করে, টুনটুনি পাখিটি তার বাসা বেঁধেছে।

'বাসার ভিতরে তিনটি ছোট্ট-ছোট্ট ছানা হয়েছে। খুব ছোট্ট ছানা, তারা উড়তে পারে না। খালি হাঁ করে আর চিঁ চিঁ করে।

'গৃহস্থদের বিড়ালটা ভারি দুষ্টু। সে খালি ভাবে টুনটুনির ছানা খাব।

একদিন সে বেগুন গাছের তলায় এসে বললে, কি করছিস লা টুনটুনি? টুনটুনি তার মাথা হেঁট করে বেগুন গাছের ডালে ঠেকিয়ে বললে—

'প্রণাম হই মহারানী'।

'তাতে বিড়ালী খুশি হয়ে চলে গেল।'

এইভাবে তো গল্প আরম্ভ হল, পাঠকের অমনি ভাবনা ছানাগুলোর শেষ অবধি কি হয়। ভাবনার অবিশ্যি কোনো কারণ নেই যেহেতু

এরকম খোসামুদি করে বেড়ালকে ঠেকিয়ে রেখে, শেষে যখন বাচ্চারা উড়তে শিখল, তাদের তালগাছের ডালে নিরাপদে বসতে বলে, যেই-না বেড়াল এসে বলেছে—'কি করছিস্ লা টুনটুনি ?'

অমনি পা উঠিয়ে লাথি দেখিয়ে টুনটুনি পাখি বললে 'দূর হ', লক্ষ্মী-ছাড়ি বিড়ালনী।'

বলেই সে ফুড়ুক করে উড়ে পালাল।

টুনটুনির বইয়ে এইরকম সাতশটি গল্প আছে।

গদ্যের চেয়ে পদ্য কিন্তু মনকে নাড়া দেয় বেশি। 'ছেলেদের রামায়ণ' লিখে উপেন্দ্রকিশোরের মন ওঠে নি, তাই 'ছোট্ট রামায়ণ' লেখা হল। বই তো নয়, যেন একটি নিখুঁত নিটোল গজমতি। রামায়ণের গল্প ছোটদের জন্যে আগাগোড়া কবিতায় লেখা। বই যে কি মিষ্টি হতে পারে জানতে হলে এই বই পড়তে হয়। ছোট্ট ভূমিকাটিও তেমনি—

'বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময় বায়ু বহে ধীরে,
সুখে পাখি গায় গান, ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুলকুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড় সুন্দর কথা শুন মন দিয়া।'

তার পরে আর কোনো কথা নয়, আদিকাণ্ড শুরু হয়ে গেল—

'সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগর,
দেবতার পুরী হেন পরম সুন্দর।
সোনামণিমুকুতায় করে ঝল্‌মল্,
ছায়া লয়ে খেলে তার সরযূর জল।
বড় ভালো দশরথ সে দেশের রাজা,
দুঃখীজনে দেন সুখ, শঠে দেন সাজা।...

অমনি সেই বড় প্রিয় বড় চেনা গল্প নতুন রূপ নিয়ে যেন নদীর

মতো বয়ে চলল। সে কখনো পুরোনো হয় না, আজও যে শোনে তার চোখ জলে ভরে ওঠে, মন রসে ডুবে যায়। উপেন্দ্রকিশোর জানতেন এই-সব গল্পের সঙ্গে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ চিন্তার ধারা মিশে আছে; ধর্ম আর সমাজ যা কিছু শিখতে পারে, সবই এই গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। এদের যদি জীবনের সঙ্গী করে নেওয়া যায়, আর কখনো একলা পড়বার ভয় থাকে না।

সেকালে সাধারণত ছেলেমেয়েরা দুরকম বই পড়ত, এক হল শিখবার জন্য পড়া, সে-সব বইয়ে অনেক সময়ই কোনো রস থাকত না, পড়তে ভালো লাগত না, নেহাত শিখতেই হবে বলে পড়া। আরেক রকম বই ছিল শুধু আনন্দের জন্য পড়া, এই বইয়ের সংখ্যা বড় কম ছিল। উপেন্দ্রকিশোর ভাবতেন দুটো আলাদা হবে কেন? নিজে যখনই যা শেখাতেন, তাকে এমনি একটা আনন্দের ব্যাপার করে তুলতেন, যে শিক্ষাটা হত নিজেরই অজান্তে, আর কখনো ভোলাও যেত না।

অগাধ ধৈর্যও ছিল। প্রদর্শনীতে কি বাইরে কোথাও বেড়াতে গেলে ছেলেমেয়েরা তাঁকে যতই প্রশ্ন করুক, সব প্রশ্নের চমৎকার করে উত্তর দিতেন। দেখতে দেখতে শ্রোতার ভিড় বেড়ে যেত, মেলা বাইরের অচেনা লোকও জুটে যেত।

গল্প করে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র চেনাতেন, তাদের সম্বন্ধে, আলো বাতাস মহাশূন্য সম্বন্ধে কত কথাই যে বলতেন তার হিসাব নেই। তার নিজের একটা ভালো দুরবীন ছিল, তার মধ্যে দিয়ে চাঁদের পাহাড় গুহা-গহ্বর ছেলেমেয়েদের দেখাতেন। শনির চার দিকে কেমন বালার মতো আলোর চক্র আছে, তাই দেখাতেন। এমনি করে আরেকখানি বইয়ের মালমশলা জমে গেল, 'আকাশের কথা' নিয়ে আরেকটি বই লেখা হল। তাতেও কতই-না ছবি।

উপেন্দ্রকিশোর যে শুধু বই লিখে নিজে ছেপে বের করতেন তা নয়, নানান পত্রিকাতেও যে কত বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন তার ঠিক নেই। বিলেতের বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ফোটোগ্রাফি, ছাপার কাজ ও নানান বৈজ্ঞানিক বিষয়ে তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতেন। আমাদের দেশেও ততদিনে অনেক কাগজ বেরিয়েছে, তাতে নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন, এখনো সেগুলি পড়লে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা ও চিন্তার মৌলিকতা দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না।

একবার সংগীত ও চিত্রবিদ্যা সম্পর্কে একটি বিস্ময়কর প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে গান বাজনা আর ছবি আঁকার যে কত সাদৃশ্য তা প্রমাণ করে দিয়েছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধি না থাকলে এভাবে কেউ চিন্তাও করতে পারে না। উপেন্দ্রকিশোর লিখেছিলেন সংগীত ও চিত্রবিদ্যা প্রসঙ্গে '—দুই বিষয়ের দুইটি মূল—শব্দ ও বর্ণ (আলোক), তরঙ্গের রাজ্যে ইহারা প্রতিবেশী। এই তরঙ্গমূলকত্বই ইহাদের ঘনিষ্ঠতার কারণ বলিয়া বোধ হয়। সাত সুর, সাত রঙ। লোহিতাদি সাতটি রঙ, ইহারা ক্রমান্বয়ে চিত্রবিদ্যার সারেগামার স্থানীয়...' ষাট সত্তর বছর আগেও যে একজন বাঙালী এইভাবে চিন্তা করতে পেরেছিলেন এই বড় বিস্ময়।

এক দিকে এই-সব জ্ঞানগর্ভ রচনা, আবার অন্য দিকে ছেলেমেয়েদের স্কুলে উৎসব হবে, তার জন্যেও মজার মজার মজার নাটিকা লেখা চাই। 'বেচারাম ও কেনারাম', 'গুপী গাইন ও বাঘা বাইন' এও যে এই একই মানুষের রচনা ভাবলে অবাক হতে হয়।

এইসঙ্গে মনে হয় এইরকম মানুষটিকে যারা বাবা কিম্বা অভিভাবক রূপে পেয়েছিল, তারা কিরকম লোক ছিল। শোনা যায় স্পর্শমণির ছোঁয়া যাতে লাগে সেই নাকি সোনা হয়ে যায়। মানুষের জীবনেও এ কথাটা সব সময় না হলেও অনেক সময়ই খাটে, যদি সেই স্পর্শমণিটি তেমন তেমন জোরালো হয়।

উপেন্দ্রকিশোরের ছেলেমেয়েরা কেউই সাধারণ মানুষের মতো হন নি। কম বেশি প্রত্যেকের মধ্যে একটা-না-একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যেত, যার মূলে তাঁদের অসাধারণ বাবার প্রভাব ছিল বলে মনে হয়।

প্রথম সন্তান সুখলতা যেমন সুন্দর ছবি আঁকেন তেমনি সুন্দর ছোটদের জন্যে গল্প ও কবিতা লেখেন। এ গুণগুলি তাঁর মধ্যে খুব অল্প বয়সেই প্রকাশ পায় আর আজ তাঁর পঁচাত্তরের উপরে বয়স, এখনো তার চর্চা রাখেন। আর মনটা তাঁর স্নেহ ভালোবাসায় ভরা।

তার পর ছিলেন সুকুমার। আট বছর বয়সে তাঁর 'নদী' কবিতা প্রকাশিত হয়। খুব ছোটবেলা থেকে মজার মজার ছবি এঁকে ভাইবোনদের হাসিয়ে মারতেন। কৌতুক করবার যেমন অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, তেমনি বাপের মতো একটা গভীর গম্ভীর দিকও ছিল, ব্রাহ্মসমাজের যুবকেরা তাঁকে নেতার মতো শ্রদ্ধা করত, ব্রহ্মসংগীতে তাঁর লেখা অপূর্ব সব গান আছে। কাউকে আঘাত না দিয়ে মানুষের অহংকার দুর্বলতা

সম্বন্ধে এমন অনাবিল হাসির খোরাক জোগাতে মানুষের ইতিহাসে খুব কম লোকই পেরেছে।

উপেন্দ্রকিশোর নিশ্চয়ই ছেলের গুণ দেখে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে আশ্বস্ত হতেন, এই ভেবে যে তাঁর আরব্ধ কাজগুলো যোগ্য লোকের হাতেই পড়বে।

সুকুমারের পরে পুণ্যলতা, তিনিও কিছু কম গুণী নন। তার পরে সুবিনয়, বাপের বৈজ্ঞানিক রচনার অনুকরণে কত রচনা লিখে, কত হাসির গল্প লিখে, মজাদার খেলা ও ধাঁধার কথা বলে কত ছোট ছেলেকে যে আনন্দ দিতেন তার ঠিক নেই।

তার ছোট সুবিমলও ছোটদের অন্তরঙ্গ বন্ধু, কথায় গল্পে অদ্বিতীয়, অথচ তাঁরও একটা ধীর গম্ভীর মমতাময় দিকও যে আছে, যেই কাছে এসেছে সে-ই অনুভব করেছে।

ছোট মেয়ে শান্তিলতা যৌবন না পেরোতেই পরলোকে গিয়েছিলেন, তাঁরও লিখবার প্রতিভা ছিল কম নয়। অনেকদিন আগে 'সন্দেশ' পত্রিকার পাতায় তাঁর এমন একটি কবিতা বেরিয়েছিল, যা একবার পড়লে আর ভোলা যায় না। কবিতার আরম্ভটি হচ্ছে—"ওগো রাঁধুনী, শোনো গো শোনো, রান্না বলে দি শোনো'—তার পর রাঁধুনীকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রান্না বাতলানো হল। কিন্তু দশ বারো জন অতিথি খেতে বসলে তাঁদের সামনে রাঁধুনী যে রান্না এনে হাজির করল সে আর কহতব্য নয়।

সুরমা মেয়েটির এঁদের মতো লিখবার কিম্বা আঁকবার প্রতিভা ছিল না। উপেন্দ্রকিশোরের যে আরেকটি গুণ ছিল যার জন্যে তিনি যখন যা করেছেন সবই হয়ে উঠেছিল অনন্যসাধারণ; সে হচ্ছে তাঁর মানবতার গুণ, সুরমা তার প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেন নি। যতদিন বেঁচেছিলেন একটি মিথ্যা কথা বলেন নি, এতটুকু স্বার্থপরতা করেন নি, কখনো ধৈর্য হারান নি, কোনো কঠোর কথা কখনো মুখে আনেন নি। আর বিধুমুখীর রুগ্ন ভাই সতীশচন্দ্র ভারি মজার কবিতা লিখতেন আর ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর রুগ্ন চেহারা দেখে একটু ভয় পেলেও, তিনি তাদের সমানে স্নেহ করেই গিয়েছেন।

১৯০৫ সালে নিজের ছোট ভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোর সুরমার বিয়ে দিলেন। তার পরে সুখলতার বিয়ে হল কৃতী ডাক্তার

জয়ন্ত রাও-এর সঙ্গে, পুণ্যলতার বিয়ে হল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অরুণনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে। সুকুমার বি, এস্-সি পাশ করে ১৯১১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি নিয়ে বিলেত গেলেন ফোটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং সম্বন্ধে আরো শিখতে।

একাদশ অধ্যায়

এমনি করে একের পর এক বছর গুলি কাটতে লাগল। সব এক-ভাবে নয়, তার মধ্যে মহামারী, ভূমিকম্প, দেশ-বিভাগ, সন্ত্রাসবাদীদের আন্দোলন সব-কিছুরও স্থান ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের আরেকটি যে কাজ বাকি ছিল, যার স্বপ্ন বহু বছর ধরে দেখেছেন, এবার সে কাজে হাত দিলেন। এখন তাঁর বয়স হয়েছে প্রায় পঞ্চাশ, নাতি-নাতনিও হয়েছে গুটি দুই তিন।

কাজটি হল ছোটদের জন্যে ভালো মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা। পত্রিকার নাম হল 'সন্দেশ'।

১৯১৩ সালে একদিন সন্ধেবেলায় 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি হাতে করে উপেন্দ্রকিশোর ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এসে বসবার ঘরের দরজার কাছে হাসিমুখে দাঁড়ালেন। অমনি ঘরময় একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। সেই সময় সেই ঘরে যে কজন মানুষের উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল তারা কেউই বোধ হয় জীবনে কখনো সে সন্ধ্যার কথা ভুলতে পারবে না।

'সন্দেশে'র প্রকাশন শিশুসাহিত্যের জগতে একটা নতুন দিনের উদ্বোধন করে দিয়েছিল। হঠাৎ যেন একদিনের মধ্যে বাংলার শিশু-সাহিত্যের সমস্ত দৈন্য ঘুচে গিয়ে সে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। বাস্তবিক ঐ প্রথম সংখ্যার 'সন্দেশ'খানি পৃথিবীর যে-কোনো দেশের শ্রেষ্ঠ শিশু মাসিক পত্রিকার পাশে আসন পাবার যোগ্য। যেমন তার পাঠ্যবস্তুর শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈচিত্র্য তেমনি তার ছবি, কাগজ, ছাপা ও মলাট। তার পরে আরো পঞ্চাশটি বছর কেটে গেছে, বাংলাদেশে আর কোনো ছোটদের পত্রিকা অমন মনোহর রূপ নিয়ে দেখা দিল না। নামকরণটি কি চমৎ-কার, সন্দেশ মানে খবর, সন্দেশ মানে মিষ্টিও, হাজার রকম যার রূপ

ও স্বাদ।

তার দুটি কারণ ছিল। প্রথম হল সে সময় বাংলাদেশে যে-সব প্রতিভাবান লেখক-লেখিকারা ছোটদের জন্য একটুও চিন্তা করতেন, তাঁরা কেউই দেশের ছেলেমেয়েদের সেবা করবার এই সুবর্ণ সুযোগটি ছাড়লেন না। দেখতে দেখতে 'সন্দেশে'র সম্পাদককে ঘিরে দাঁড়ালেন এমন একদল গুণী, যাঁরা নানান দিক থেকে বাণীর দরবারে উঁচু আসন দাবি করতে পারেন। 'সন্দেশে'র কাছে সবাই সমান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আচার্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, বিজয়রত্ন মজুমদার, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রিয়ম্বদা দেবী, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ সরকার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি।

তা ছাড়া আত্মীয়স্বজনরা তো ছিলেনই। কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাইরা যোগেন্দ্রনাথ বসু ও নরেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ছেলেমেয়েরা, উপেন্দ্র-কিশোরের ভাইরা, ছেলেমেয়েরা বন্ধুবান্ধবরা যে যেখানে ছিলেন সবাই একেবারে যেন সন্দেশ কার্যালয়ে ভেঙে পড়লেন। চাঁদের হাট বসে গেল! তখনকার দিনে ছোটদের জন্যে লেখা বই কিম্বা পত্রিকা নিয়ে রেষারেষি দলাদলির কথা কেউ ভাবতেও পারত না। বিজ্ঞাপন বেরুত মাঝে মাঝে, তাতেও কত সরসতা। 'প্রবাসী'তে একবার বিজ্ঞাপন বেরুল কবিতাতে!

টাকাপয়সার জন্যে কেউ চিন্তাও করেন না, ছোটদের জন্যে কাগজ, তার থেকে আবার লাভ করা কি! লেখকেরা লেখা দিতেন বিনা মূল্যে। সম্পাদকমশাই মাসকাবারে হিসাব মেলাবার সময় প্রসন্নচিত্তে ট্যাঁক থেকে অনেকগুলো টাকা গচ্চা দিতেন। এমন ভালো কাজে টাকা খরচ করতে পারাটাও যেন মস্ত সৌভাগ্য।

মজা হচ্ছে কেউ জোর করে লিখতেন না, কাউকে পেড়াপিড়ি করেও লেখানো হত না; সবাই লিখতেন মনের আনন্দে। আস্তে আস্তে দেখা গেল যে যার নিজের বিষয়টি বেছে নিয়ে, সেই বিষয়ে লিখে লিখে এমনি হাত পাকাচ্ছেন যে লেখাগুলো হয়ে উঠছে অদ্বিতীয়। পুরোনো একটা আটচল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার সন্দেশ নিয়ে আজ যদি হুবহু তেমনি করে ছেপে দেওয়া যায়, তাই নিয়ে ছেলেবুড়োতে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলোকে খানিকটা সেকেলে লাগবে, কারণ এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিজ্ঞানজগতের বিস্ময়কর অগ্র-

গতি হয়েছে। কিন্তু সন্দেশে যেটুকু বেরিয়ে ছিল তাকে বোধ হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এখনো নির্ভুল বলে স্বীকার করতে হবে। বিশেষ করে প্রাণীতত্ত্ব প্রসঙ্গে।

কি না থাকত সন্দেশে, পুরাতত্ত্বের সঙ্গে নতুন আবিষ্কার, জীবনী, ভ্রমণকাহিনী, পৌরাণিক গল্প, দেশবিদেশ থেকে সংগ্রহ করা, নাটক, কবিতা, গান, গল্প, হাসিতামাশা, ধাঁধা, কিছুই বাদ যেত না।

তার পরে সুকুমার যখন বিলেত থেকে ফিরে এসে সন্দেশ পরিচালনার খানিকটা ভার নিলেন, তখন এ-সবের সঙ্গে এমন একটা অভূতপূর্ব সরসতার সমাবেশ হল সে আর কি বলব। সেটাও যেন একটা ছোঁয়াচে ব্যামো; একবার ছবি আঁকা প্রতিযোগিতায় নাতির হাতের সার্টিফিকেট সুদ্ধ অবনীন্দ্রনাথও যোগ দিয়ে একটা অতিরিক্ত পুরস্কার পেয়ে গেলেন, একশিশি লজঞ্চুস।

প্রতিমাসে সুকুমারের লেখা অপূর্ব কবিতা কিম্বা গল্প আর তার সঙ্গে তাঁর অদ্বিতীয় তুলির আঁকা সাদাকালো ছবি বেরুতে লাগল। বাংলা-দেশের ঘরে ঘরে সন্দেশের আগমনের জন্য প্রতিমাসে ছেলেমেয়েদের সে কি আকুল প্রতীক্ষা। সেই-সব ছেলেমেয়েরা এখন আধবুড়ো হয়ে গেছে, কিন্তু সেদিনকার সে রোমাঞ্চ আজও তারা ভুলতে পারে নি।

সন্দেশের জনপ্রিয়তা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে শুধু উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার কেন, কুলদারঞ্জন ও প্রমদারঞ্জনও ছেলেমেয়েদের কাছে বড় পরিচিত হয়ে উঠলেন। কুলদারঞ্জন পৌরাণিক গল্প লিখতেন। তাঁর 'বেতালপঞ্চ-বিংশতি' আর 'বত্রিশ সিংহাসনের' গল্প, তাঁর 'পুরাণের গল্প' ইংরিজি থেকে তাঁর অনুবাদের বইগুলি—রবিন হুড্, আশ্চর্য দ্বীপ, অজ্ঞাত জগত, শার্লক হোম্সের বিচিত্র কীর্তি কাহিনী, বাস্কারভিলের কুক্কুর—এ-সব বই অনুবাদ হলেও বাংলা শিশুসাহিত্যের সম্পদ।

প্রমদারঞ্জনকে সরকারি কাজে জরিপের জন্য শ্যামদেশ ও বর্মার ঘোর বনে প্রাণ হাতে করে বেড়াতে হত। সেই-সব অভিজ্ঞতার কথা 'বনের খবর' নাম নিয়ে সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের রোমাঞ্চিত করত। বিচিত্র বিষয়ে লেখা বেরুতে 'সন্দেশে', কিন্তু তার মধ্যে একটা সুদৃঢ় সুন্দর নিয়মও ছিল, কোনোরকম ন্যাকামি ঠাঁই পেত না, ঠাট্টাতামাশার মধ্যে কোনো খেলো কথা থাকত না, সব-কিছুর মধ্যে ভারি একটা বলিষ্ঠতা থাকত।

দেশসেবার কতরকম কাজ আছে তার মধ্যে দেশের ছেলেমেয়েদের নির্ভীক্ বলিষ্ঠ সত্যনিষ্ঠ করে মানুষ করে দেওয়া শ্রেষ্ঠ স্থান দাবী করতে পারে। 'সন্দেশে'র মধ্যেও এইরকম একটা আদর্শ স্থাপন করবার চেষ্টা চলত।

স্বাদেশিকতা জিনিসটা বড় অদ্ভুত, এক দিকে কেউ দেশের অপমান বা নিন্দা করলে তখুনি তার প্রতিবাদ করা চাই। আরেক দিকে স্থির চিত্তে বসে নিন্দার কারণগুলোকে বিশ্লেষণ করে তাদের দূর করা চাই নিজের মনের কাছে নিজেদের দুর্বলতা কোথায় সেটা স্বীকার করা চাই। কিন্তু অপরের কাছে নিজেদের ছোট করলে চলবে না। স্বামী বিবেকানন্দ উনিশ শতকের শেষের দিকে এই শক্ত কাজটির জন্যে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে দশ এগারো বছর কেটে গেল 'সন্দেশ' বাংলার শিশুদের মধ্যেও ঠিক সেই কাজটি করতে লাগল। দেশের যা কিছু গৌরবের বিষয় তাই নিয়ে আলোচনা, দেশের যে-সব হাস্যকর দুর্বলতা, তাই নিয়ে পরিহাস। এ পরিহাসের মধ্যে কোনো ঝাঁঝ ছিল না, কিন্তু যাদের নিয়ে ঠাট্টাটি কর হল, তারা ঠিকই বুঝত।

তখন দেশী জিনিস খুব ভালো হত না, সবেমাত্র অল্প টাকা হাতে নিয়ে, অনেক সাহস মনে নিয়ে, দেশের লোকে ব্যবসার ক্ষেত্রে নেমেছেন। এখন যে-সব দেশী জিনিস আমরা নিত্য ব্যবহার করি, মিহি কাপড়, সুন্দর চীনেমাটির বাসন, তখন তার কিছুই ছিল না। অনেক ভরসা করে অনেক চেষ্টা করে যে-সব মোটা কাপড়, তেড়া ব্যাঁকা বাসন প্রথম প্রথম তৈরি হত, দেশকে যারা ভালোবাসে তাই তারা আদর করে নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করত। উপেন্দ্রকিশোরের মেজো ছেলে সুবিনয়ও এই দলে ছিলেন। খুঁজে খুঁজে কোথায় কি দেশী জিনিস তৈরি হচ্ছে, কিনে আনতেন আর বাড়িসুদ্ধ সবাই সেগুলো ব্যবহার করতেন। সুকুমারও ব্যবহার করতেন আর হেসে হেসে গান বাঁধতেন,

'আমরা দিশি পাগলার দল
দেশের জন্যে ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল।

...

দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি।
তা হোক্‌না তাতে দেশেরই মঙ্গল।'

গান শুনে সুবিনয়ও হাসতেন, আবার গিয়ে ঐ-সব জিনিস কিনে এনে সুকুমারকে ব্যবহার করতে দিতেন। আস্তে আস্তে জিনিসগুলো আরো ভালো, আরো সুন্দর হতে লাগল, এখন, আর দেশী বিদেশীতে বিশেষ কোনো তফাতই দেখা যায় না।

দুবছর বিলেতে কাটিয়েও সুকুমার এততুকু সাহেবিয়ানা করতেন না। তার সামনে ছিল নিজের বাপের স্বদেশপ্রেমের বলিষ্ঠ আদর্শ, দেশের যা ভালো তাকে আদর করতে শিখতে হবে, দেশের যা মন্দ তাকে দূর করতে হবে। বিজ্ঞানশিক্ষা দিয়ে দেশটাকে ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর সমান করে তুলবার চেষ্টা করতে হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

ছেলে বিলেত থেকে ফিরে ঘরে বউ আনল, ঢাকার নামকরা সমাজ-সেবক ৺কালিনারায়ণ গুপ্তর নাতনি সুপ্রভা এসে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়ি আরো উজ্জ্বল করে তুললেন। লম্বা, শ্যামা মেয়েটি, সুন্দর মুখ আর চমৎকার গানের গলা। সকলের মনে হতে লাগল এবার উপেন্দ্র-কিশোরের সাংসারিক জীবন একেবারে পরিপূর্ণ হয়ে এসেছে।

তার উপরে ১৯১৪ সালে একশো নম্বর গড়পার রোডে নিজেদের মস্ত তিনতলা বাড়িতে যখন ওঁরা উঠে এলেন, মনে হল সৌভাগ্যের এবার ষোলো কলা পূর্ণ হল। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর মনে মনে জানতেন সাংসারিক সুখকে বড় বেশি মূল্য দিতে হয় না।

সময়টাই ছিল মন্দ। ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল, আমাদের দেশে তার খুব বেশি প্রতিক্রিয়া না হলেও খানিকটা হল। পয়সাকড়ি তোলা হল, জিনিসপত্রের দাম খানিকটা বাড়ল, কিছু লোক সেনাদলে ভর্তি হয়ে লড়াই করতে ফ্রান্সে, মধ্য ইউরোপে গেল, অনেক বিলিতি জিনিসপত্র এদেশে আসা বন্ধ হল। তার মধ্যে অনেক দরকারি ওষুধপত্রও ছিল। শুনে মনে হতে পারে সামান্য ব্যাপার কিন্তু অনেক সময় সামান্য ব্যাপারেরও ফল হয় মর্মান্তিক।

একশো নম্বর গড়পার রোডের বাড়িটার কথা খানিকটা বলতে হয়। রাস্তার উপরে সাদা তিনতলা বাড়ি, তার কপালে পদ্মফুলের নকশা করা,

সামনে এক চিলতে জমি সদর দরজা দিয়ে ছাপাখানায় ঢুকতে হয়। পাশের গলি দিয়ে বাড়ির ভিতরে যাবার রাস্তা ; বাড়ির পিছনে সুন্দর বাগান, আমের গাছ, খানিকটা ঘাস-জমি।

বাড়ির দুপাশে দুটি বিদ্যালয়। একপাশে ছেলেদের স্কুল, তার নাম এথিনিয়ম ইন্‌সটিটিউসন, অন্য পাশে কালা-বোবাদের স্কুলের খেলার মাঠ। ততদিনে মসূয়ার এই রায় পরিবার পুরোপুরি কলকাতাবাসী হয়ে গেছে। সারদাঞ্জন, মুক্তিদারঞ্জন একসঙ্গে থাকেন কাছেই। কুলদারঞ্জন ছেলেমেয়ে নিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের সঙ্গেই থাকতেন ; প্রমদা-রঞ্জন সরকারি জরিপ বিভাগে তখনো কাজ করেন, থাকতেন শিলঙে। হেমেন্দ্রমোহন বসুও বাড়ি করলেন আমহার্স্ট স্ট্রীটে, তাঁর সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবসায়ে ভারি উন্নতি হয়েছে। বাঙালীরা যখন প্রথম মোটর-গাড়ি কিনল, তিনিও প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে একটা ফোর্ডগাড়ি কিনে ফেললেন। নরেন্দ্রকিশোরও বাড়ি ভাড়া করে অনেক সময় কলকাতাতেই থাকেন, ছেলেমেয়েরা পড়াশুনা করে। বড় বোন গিরিবালা অবশ্য চিরকাল ময়মনসিংহেই রইলেন, তাঁর নাতিরা একে একে কলকাতায় চলে এল। আর ছিলেন জয়তারা। স্নেহমমতার প্রতিমূর্তি হয়ে একলা তিনি দেশের বাড়ি আগলান, ছেলেরা কৃচিৎ যায়, তিনিও মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে সবাইকে দেখে যান।

উপেন্দ্রকিশোরের বাহান্ন বছর বয়স, কিছুদিন থেকে শরীর ভাঙতে শুরু করেছে। ডাইবিটিস রোগ, চিনি খাওয়া বারণ, একমাত্র ভালো ওষুধ ইন্‌সুলিন্‌ সে তখনো হয় নি। অন্য যা ছিল সে পাওয়া ক্রমে কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, যুদ্ধের জন্যে চালান বন্ধ।

যে মানুষটা চিরকাল নিজেই সব কাজ করে এসেছেন, তিনি এবার 'সন্দেশের' ভার দিলেন সুকুমার সুবিনয়ের উপরে। তাঁরাও যোগ্যভাবে কাজ চালিয়ে যেতে লাগলেন। আর শুধু 'সন্দেশে'র কাজ নয় ক্রমে ছাপাখানার কাজের ভারও নিতে হল।

স্বাস্থ্যের চেষ্টায় এখানে ওখানে ভালো জায়গায় কত ঘুরলেন উপেন্দ্র-কিশোর, কিন্তু কোনো ওষুধই যখন নেই তখন জায়গা বদলে আর কতটুকু উপকার হতে পারে।

বন্ধুবান্ধব ছিলেন মেলা, উপেন্দ্রকিশোরের জন্যে সকলের মনে দুশ্চিন্তা। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুরা ছিলেন, ছাপাখানায় কত লোককে নিজের

হাতে কাজ শিখিয়েছেন, ছবি আঁকার বন্ধু, গানবাজনার সঙ্গী, সন্দেশের সহকর্মীরা, বন্ধুর সংখ্যা তো বড় কম ছিল না। কিন্তু সবাইকে ফেলে মাত্র তিপান্ন বছর বয়সে উপেন্দ্রকিশোর পরলোকে যাবার জন্য নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন।

মৃত্যুর জন্যে কেউ এমন করে প্রতীক্ষা করে বলে শোনা যায় না। এতটুকু অস্থিরতা নেই, মুখে হাসিটি লেগেই আছে, যতটা পারেন কাজ করে যাচ্ছেন, লোকজন আসছে, দেখাশুনা করছেন। বিদেশে কত তাঁর প্রতিষ্ঠা, সেখান থেকে চিঠিপত্র আসে, কেউ এদেশে এলে দেখাও করে যান। সংগীতজ্ঞ ফক্স স্ট্র্যাঙ্গওয়েজ এভাবে এসেছিলেন, উপেন্দ্রকিশোরের প্রসন্ন গম্ভীর মূর্তি ও কোমল সৌজন্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

আসল কথা হল ভগবানে যাঁদের গভীর বিশ্বাস থাকে, তাঁরা পরকালকে ভয় করেন না, মৃত্যু তাঁদের কাছে ইহকাল থেকে পরকালে যাবার একটা দরজা মাত্র। অনেকদিন আগে উপেন্দ্রকিশোর গান লিখেছিলেন,

'প্রভু', এই জগতে তব থাকি যতদিন মোরা,
তব শান্তিসুধা করি পান ;
আর ভুলিয়া অপর সব মনের হরষে যেন
করি সদা তব গুণ-গান।
শেষে পৃথিবীর যবে ফুরাইবে খেলা,
তোমারি আদেশে ত্যজিব এ দেহ ;
ডাকিয়া লইও পিতা তোমার সুখের দেশে,
চিরশান্তিময় যেই স্থান।'

তাই তিনি অকালে স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, ভাইবোন, বন্ধুবান্ধব, দুঃখিনী মা, সব ছেড়ে হাসিমুখে চিরদিনের কাম্য সেই ভগবানের চরণতলে যাবার ডাকের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে পারলেন।

এমনি করে গভীর শান্তির মধ্য দিয়ে ১৯১৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর দিনটি এল। ভোরবেলা জানলার কাছে একটা পাখি এসে গান গেয়ে গেল।

আশেপাশে ব্যথিত হৃদয়ে আত্মীয়স্বজনরা দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রসন্ন-মুখে তাঁদের দিকে ফিরে উপেন্দ্রকিশোর বললেন,

'পাখি কি বলে গেল জানো? সে বললে, যাও চিরদিনের পথে এবার শান্তিতে যাও।' মাঝে মাঝে পরম ক্লান্তিতে চোখ বুজে আসে। বিধুমুখীকে বললেন,

'চোখ বুজলেই কি সুন্দর আলো দেখি। ভগবান কত দয়া করে আমাকে পরকালের পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন।'

মাঝে মাঝে মনে হয় বুঝি পুরোনো দিনের বিগত বন্ধুবান্ধব প্রিয়-জনেরা কাছে এসে বসেছেন। এর মধ্যে দুঃখের স্থান কোথায়? ধীরে ধীরে সেই সুন্দর আলো চোখের পাতার উপর এসে পড়ল, তাই পথ ধরে তিপান্ন বছর ধরে যে চিরশান্তিময় স্থান তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে-ছিল, সেইখানে তিনি চলে গেলেন।

শোকার্ত আত্মীয়স্বজনের চোখের সামনে রোগক্লিষ্ট দেহখানি শুধু পড়ে রইল, তিনি আর রইলেন না।

শিলঙে সুরমা বলে মেয়েটির কাছে তার গেল, সেটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ অন্ধচোখে সে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল। এতদিন পরে সে সত্যিকারের পিতৃহীন হল।

তিনি রইলেন না বলা ঠিক নয়। সময় হলেই মানুষের জীবনের অবসান হয় কিন্তু তার সারাজীবনের কাজের মধ্যে দিয়ে সে বেঁচে থাকে। উপেন্দ্রকিশোর বিদায় নিয়ে যাবার পরে আটচল্লিশ বছর কেটে গেছে কিন্তু পুকুরের জলে ঢিল ছুঁড়লে যেমন তরঙ্গের চক্র ছোট থেকে বড় হতে হতে তীরে গিয়ে মিলিয়ে যায়, তেমনি তাঁর জীবনের কাজের ক্ষেত্র ক্রমে বড় হতে হতে দেশের লোকের জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে গেছে। শিশুসাহিত্যের জন্যে, ছবি আঁকা, ছবি ছাপার জন্যে তিনি যা করতে চেয়েছিলেন সবই আজ সার্থক হয়েছে। প্রতি বছর পুজোর সময় ছেলেমেয়েদের জন্য রাশি রাশি এত সুন্দর বই বেরোয় যে তার দিক থেকে চোখ ফেরানো যায় না।

পরিশেষ

এই বড় দুঃখ যে উপেন্দ্রকিশোরের মৃত্যুর পরে দশ বছরের মধ্যে তাঁর সারা জীবনের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত ইউ. রায় এণ্ড সন্স উঠে গেল। কত আশা করে নামের শেষে 'এণ্ড সন্স' লিখে-ছিলেন, তিনটি গুণী পুত্র তাঁর, লেখাপড়ায় ছবি আঁকায়, ছবি তোলায়, বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় ছাপাখানার যাবতীয় কাজে. এমন দক্ষ ছেলে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া দায়, এরাও যে প্রাণ দিয়ে ছাপাখানাটিকে বাঁচিয়ে রাখবে সে বিষয়ে উপেন্দ্রকিশোরের মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না।

কিন্তু সব সময়ে মানুষের শক্তি দিয়ে ঘটনাচক্রকে বাগ মানানো যায় না। দেশের জমিদারীটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার যন্ত্রপাতি কেনা, ছাপাখানার উন্নতি করার জন্য অজস্র টাকা জুগিয়ে জুগিয়ে শেষে এক-দিন একেবারে ফুরিয়ে গেল। অমন যে কাগজ 'সন্দেশ' আজ অবধি যে অদ্বিতীয়, তার জন্যেও কম খরচ হয় নি, বিষয়-বুদ্ধির চেয়ে শিল্প-রচনা সাহিত্যরচনার প্রতিভাও হয় তো প্রবল ছিল, সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যবসাটি নিলামে উঠে গেল।

কিন্তু সে দুঃখের দিনের আগে রায় পরিবারকে আরো মর্মান্তিক শোক বইতে হয়েছিল। জয়তারা স্বর্গে গেলেন ১৯২০ সালে বিরাশি বছর বয়সে, আত্মীয়স্বজন, নাতি-নাতনি, এমন-কি, তাদেরও ছেলেমেয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে। সারাজীবন একলা ময়মনসিংহে থেকে বড় ছেলে সারদারঞ্জনের বাড়িতে মৃত্যু বরণ করলেন। সে ছিল সুখের যাওয়া, একটি মেয়ে একটি ছেলে আগেই গেছে, জয়তারার কোনো খেদ রইল না।

কথায় বলে ভাগ্যের চাকা ওঠে পড়ে, কখনো সুখ এনে দেয় কখনো দুঃখ। একশো নম্বর গড়পার রোডের জীবন যাত্রা চলতে থাকে, সব-কিছুর পিছনে থাকে উপেন্দ্রকিশোরের স্মৃতির প্রেরণা। প্রেস চলে, এ বাড়িটাতেও বাইশ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটের সেই শব্দ, সেই গন্ধ পাওয়া যায়, এখানে ওখানে রঙিন ছবি কুড়িয়ে পাওয়া যায়। বিধুমুখী

যেন অন্তরালে সরে গিয়েছেন, দেখা করতে চাইলে খুঁজে বের করতে হয়।

বাড়িতে তখন দুই বউ। দ্বিতীয় ছেলে সুবিনয় বিয়ে করেছিলেন জব্বলপুরের নাম করা ডাক্তার লক্ষ্মীনারায়ণ চৌধুরীর কন্যা পুষ্পলতাকে, তাঁদের একটি ছেলে। কিন্তু সুকুমার আর সুপ্রভার ঘর তখনো খালি।

তার পরে ১৯২১ সালে সত্যজিত জন্মাল। ছোটখাটো শামলা রঙের ছেলেটি, সারাক্ষণ বিরাট হাঁ করে হয় চ্যাঁচাচ্ছে নয় খাই খাই করছে, সমস্ত রায় পরিবারের মধ্যমণি উপেন্দ্রকিশোরের বড় ছেলে অনন্যসাধারণ সুকুমারের একমাত্র ছেলে। বাড়িতে উৎসব লেগে গেল।

ভাগ্যের চাকা পড়তে শুরু করল। সত্যজিতের যখন দু'বছর বয়স, মুখে কথা ফুটেছে, তখন মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে, ময়মনসিংহের রায়কুলকে অন্ধকার করে কালাজ্বর রোগে সুকুমার স্বর্গে গেলেন। বিধুমুখীর দুঃখের অন্ত রইল না।

আরো দুঃখ ছিল তার কপালে। শোকের আঘাতে মুহ্যমান না হয়ে সাহসে বুক বেঁধে সুবিনয় একলাই ইউ. রায় এণ্ড সন্স চালাতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিই-বা তখন বয়স তার, বড় জোর বত্রিশ তেত্রিশ। কি সুন্দর চেহারা ছিল, সোনার মতো গায়ের রঙ, মাথায় এতখানি লম্বা, বাপের সুগঠিত নাক ও কোমল মধুর স্বভাব। কিন্তু ভাগ্য বিপর্যয় হলে কেউ দাঁড়াতে পারে না। ছোট ভাই সুবিমল ছাপাখানার কাজ বোঝে না, এম. এ. পাশ করেছে সে, সে গিয়ে সিটি স্কুলে অধ্যাপনার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিল, সারাজীবন তাই নিয়েই কাটিয়ে দিল।

আর 'সন্দেশ' কাগজটার কি হল? সুখে দুঃখে যখন যে অবস্থায় আছেন, সুবিনয় 'সন্দেশ' পত্রিকা চালিয়ে গেলেন। ততদিনে নতুন এক দল লেখক তৈরি হয়েছেন, যাঁরা 'সন্দেশে'র আদর্শে ছোটবেলা থেকে চিন্তা করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। বড়রা অনেকেই নেই, কিন্তু পরিবারে তখনো লেখকের অভাব নেই।

তার পরে একদিন ব্যবসা বন্ধ করে দিয়ে উপেন্দ্রকিশোরের দুঃখিনী স্ত্রী ও ছেলে বউ আর নাতিরা চিরদিনের মতো একশো নম্বর গড়পার রোড ছেড়ে চলে গেলেন। বাড়িটা পরে একটা স্কুল হয়ে গেল। বাসিন্দারা আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়লেন। বিধুমুখী পরম স্নেহময়

দেবর মুক্তিদারঞ্জনের বাড়িতে অল্পদিন পরে চোখ বুঁজলেন। বাড়ি ছাড়া পর্যন্ত কুলদারঞ্জন সঙ্গে-সঙ্গে ছিলেন, তাঁর ছেলেমেয়েরা সংসারী হয়ে যে যে যার চলে গেল। গড়পারের বাড়ির সঙ্গে উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের যোগাযোগ মাত্র বছর দশেকের।

'সন্দেশ' কার্যালয় সুদ্ধ ইউ. রায় এণ্ড সন্স যাঁরা কিনে নিয়েছিলেন, সুবিনয়ের সুযোগ্য সম্পাদনায় কয়েক বছর তাঁরা পত্রিকাটি চালিয়ে ছিলেন, এবং খুব ভালোভাবেই চলেছিল। তার পরে নানাকারণে কাগজ বন্ধ করে দিতে হয়। সুবিনয় জিয়োলজিকেল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়াতে সম্মানের সঙ্গে কাজ করতেন। তিনিও মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে মারা যান।

আজ গড়পার রোডের বাড়ি থেকে রায় পরিবারের সব চিহ্ন মুছে গেছে, কিন্তু এখনো যদি 'সন্দেশে'র সেই পুরোনো পড়ুয়ার দলের চুল-পাকা সভ্যরা কেউ সুকিয়া স্ট্রীট দিয়ে যায়—সে রাস্তার অনেকখানির এখন নাম কৈলাস বসু স্ট্রীট—তা হলে তাদের চোখ দুটি নিজেদের অজান্তে বাইশ নম্বরের বাড়িটাকে খোঁজে।

তখন তারা আর রঙ-জ্বলা, বহু মেরামত করা, রক-বাঁধানো, পাশের বাড়ির সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়ানো একটা সাধারণ চেহারার পুরোনো বাড়ি দেখতে পায় না। রাস্তার মোটর গাড়ির শব্দও তাদের কানের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। তারা শোনে একটা ঝম্‌ঝম্ ঘড়্‌ঘড়্ যন্ত্র চলার শব্দ, নাকে আসে একটা রঙ কালির অদ্ভুত গন্ধ, স্মৃতিতে ওড়ে কতকগুলো চক্‌চকে মোলায়েম কাগজে ছাপা কমলা, সবুজ, নীল হলদে ছবি, তার কতকগুলোতে এক রঙের উপর আরেক রঙ ছাপা হয়েছে, ঠিক করে পড়ে নি, পাশ দিয়ে প্রধান ছাপার রঙটা দেখা যাচ্ছে। তখন তাদের মনে হয় হয়তো ভিতরে গেলেই দেখা যাবে দোতালার ঘরে একজন কোঁকড়াদাড়ি সুন্দর মানুষ ঈজেলের সামনে দাঁড়িয়ে তেল রঙ দিয়ে ছবি আঁকছেন, হয়তো অপরূপ সুন্দর কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিই হবে, কান পাতলে হয়তো কোনো সময়ে বেহালার সুর শোনা যাবে; হয়তো হঠাৎ গলির দরজা খুলে রেশমী দাড়ি মুখে সাদা আদ্দির পাঞ্জাবী পরা এক মাথা একটু লম্বাচুল নিয়ে কে একজন লোক ফস্ করে বেরিয়ে চটি পায়েই হেঁটে চলে যাবে, মনটা কেমন করে উঠবে, লোকটার সাথে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে! মনে হবে হয়তো ছোটখাটো হাল্কা কালো

আরেকটি লোকের দেখাও মিলে যেতে পারে, চালাকচতুর চটপটে ময়মনসিংহ থেকে প্রথম কলকাতায় এলে লোকে যাকে বলত 'বাঙাল,' কিন্তু ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে খপ্ করে পাতি কাগ্ সে অনায়াসে ধরে ফেলতে পারত, নাম তার কুলদা।

চোখের সামনে ধড়্ফড়্ করবে বাড়িটা, ভয় হবে এই বুঝি সাধারণের মুখোস খসিয়ে ফেলে ডানা মেলে আকাশে উড়ে যাবে। কিন্তু তা তো করবে না, শুধু বুকের মধ্যে ডানা গুটিয়ে বসবে যেখানে সব স্মৃতির সব স্বপ্নের আবাস।

ভূতের গল্প

সূচীপত্র

খাপায় নমঃ	১৮৯
পেনেটিতে	১৯৬
আহিরিটোলার বাড়ি	২০১
ভুতুড়ে গল্প	২০৬
সত্যি নয়	২১২
যুগান্তর	২১৫
পাশের বাড়ি	২২১
রামুকাকার বিপত্তি	২২৪
স্পাই	২২৯
নটরাজ	২৩৫
কর্তাদাদার কেরদানি	২৪১
আকাশ পিদ্দিম	২৪৯
চেতলায়	২৫১
পিলখানা	২৫৫
গোলাবাড়ির সাকিট হাউস	২৬৩
অশরীরী	২৭০
তেপান্তরের পারের বাড়ি	২৭৩
হানাবাড়ি	২৭৯

খাগায় নমঃ

ছোটবেলায় এই দোল-টোলের সময়, দেশে যেতাম, আমার ছোট-ঠাকুরদা আমাদের যত রাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প বলতেন, সে-সব একবার শুনলে আর ভোলা যায় না। একদিন বললেন, "দেখ্, এই যে আমাদের গুষ্ঠির ধন-দৌলত দেখে গাঁ-সুদ্ধ লোকের চোখ টাটায়, এ কি আর একদিনে হয়েছিল ভেবেছিস, না কি চিরকাল এমনটি ছিল? বুঝলি এ-সব লেখাপড়া শিখে, সারা জীবন খেটেখুটেও কেউ করে দিয়ে যায় নি, বা লটারিতেও জেতে নি। কি শ্বশুরের কাছ থেকেও পায় নি। মাটি খুঁড়তে-খুঁড়তেও কেউ ঘড়া-ঘড়া সোনা পায় নি, চুরিও করে নি, ডাকাতিও করে নি। তবে হল কি করে? আরে, ও-সব করে কি আর সত্যি-সত্যি ভাগ্য ফেরে? এই আমাকেই দেখ্ না, তিন-তিনটি বার ম্যাট্রিক ফেল করে সেই নাগাদ দিব্যি বাড়িতে বসে আছি। কিন্তু তাই বলে কি আর আমি তাদের কারু চাইতে মন্দ, না কি তাদের চাইতে কম খাই? তোরাই বল না। এই দেখ, এরকম হীরের আংটি দেখেছিস কখনো? এটার দাম কম সে-কম একটি হাজার টাকা। কখনো ভেবেছিস এত সব হল কোথেকে? এই যে দু-বেলা ভাল ভাল মাছ মাংস দই ক্ষীর তোরা পাঁচজনা ওড়াচ্ছিস, তাই-বা আসে কোথেকে? জানিস, এ-সমস্তরই একমাত্র কারণ হল গিয়ে একটা এই এত বড় কালো পালক।"

শুনে আমরা তো হাঁ। ছোটঠাকুরদা আরো বললেন—

"হ্যাঁ, একটা কালো পালক ছাড়া আর কিছুই নয়। ওটিকে তোরা না-দেখে থাকতে পারিস, কিই-বা দেখছিস দুনিয়াতে, ভূত পর্যন্ত

দেখিস নি। তবে ওটি কপ্পুর-টপ্পুর দিয়ে লাল সালুতে মোড়া হয়ে, একটা চন্দন কাঠের বাক্সে ব'রে আমার ঠাকুমার লোহার সিন্দুকে পোরা আছে।

"তোদের মতো আকাট মুখ্যুদের কিই-বা বলব, তবে শোন ব্যাপারটা গোড়া থেকে। আমার ঠাকুরদা ভারি চালাক-চতুর কায়দা-দুরস্ত মানুষ ছিলেন। ক্যায়সা তার চুলের টেরি বাগাবার ঢঙ, ক্যায়সা কোঁচানো মলমলি ধুতি, গিলে করা পাঞ্জাবি, কানের পিছনে তুলোর পুঁটলি করে আতর গোঁজা। সে-সব একবার দেখলেই লোকের তাক লেগে যেত। তার উপর আবার লোককে খুশি করতে তাঁর জোড়া খুঁজে পাওয়া দায় ছিল। বুঝতেই পারছিস এই-সব কারণে এখানকার যিনি রাজা ছিলেন তাঁর সঙ্গে ঠাকুরদার ভারি দহরম-মহরম ছিল। সেইজন্য রাজসভাতেও তাঁর বেজায় খাতির, আর তাই দেখে পাঁচজনার হিংসে।

"এক-এক দিন সকালে স্নান সেরে সেজে-গুজে ঠাকুরদা রান্নাঘরের পাশের ঐ গন্ধরাজ গাছটি—ওটির কি কম বয়স ভেবেছিস? —ঐ গাছটা থেকে দুটো ফুল পেড়ে নিয়ে রাজসভায় গিয়ে হাজির হতেন। আর সটাং গিয়ে রাজার কানে-কানে কি যে না বলতেন তার ঠিকানা নেই। ব্যস্, রাজাও আহ্লাদে আটখানা হয়ে হাতের কাছে যা পেতেন, শাল-দোশালা—শিরোপা, জামা, জুতো, সব তাঁকে উপহার দিয়ে বসে থাকতেন।

"এমন-কি, শেষটা এমনি অবস্থা দাঁড়াল যে, দূর থেকে তাঁকে সভায় ঢুকতে দেখেই সভাসদ যত উজির নাজিররা যে-যার গয়নাগাটি, জুতো, পাগড়ি লুকিয়ে ফেলতেন। এমনি সব ছোট মন ছিল। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছিস যে এঁরা কেউই ঠাকুরদা বেচারিকে সুনজরে দেখতেন না। সত্যি কথা বলতে কি সব্বাই তাঁর উপর হাড়ে চটা ছিলেন, এমন-কি, একা পেলে তাঁকে খোসামুদে বলে অপমান করতেও ছাড়তেন না। অবিশ্যি তাতে আমার ঠাকুরদার কাঁচকলাও এসে যেত না, তিনি দিব্যি আদরে-গোবরে রাজার কাছে দিন কাটাতেন।

"এখন মুশকিল হল যে মানুষের কখনো চিরদিন একভাবে যায় না। তোরাই কি আর সারাটা জীবন ঐরকম কাজকম্ম না করে পরের ঘাড়ে দিব্যি চেপে কাটাতে পারবি ভেবেছিস? ঠাকুরদা বেচারি খাসা নিশ্চিন্তে

রাজসভায় মৌরসি পাট্টা গেড়ে জেঁকে বসেছেন। রাজবাড়ি থেকে রোজ তাঁর জন্যে কলসি-কলসি দুধ, ঘি, ভাঁড়-ভাঁড় দই ক্ষীর, ধামা-ধামা চাল-কলা, থোক থোক নতুন গরদ, তোড়া-তোড়া মোহর যায়। তাঁর আবার ভাবনা কিসের?

"এমনি সময় হঠাৎ একদিন কোত্থেকে এক ছোকরা কবি, বলা নেই কওয়া নেই, একেবারে রাজসভায় এসে হাজির! কেউ তাকে কস্মিনকালেও চোখে তো দেখে নি, নাম পর্যন্ত শোনে নি। কিন্তু যেমনি তার রূপ, তেমনি তার খোসামুদে স্বভাব; দুদিনের মধ্যে রাজ্যসুদ্ধু রাজসভাকে একেবারে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলল।

"কী আর বলব তোদের! তার উপর তার খাসা গানের গলা ছিল, আর কত যে ছলচাতুরি জানত! যখন-তখন যেমন-তেমন করে দুটো ছড়া গেঁথে নিয়ে গুব্‌গুবাগুব্ না বাজিয়ে, বাউলদের মতো করে এমনি নেচে-কুঁদে দিত যে সভাসুদ্ধু সব্বাই একেবারে গলে জল।

"ওদিকে ঠাকুরদা পড়ে গেলেন মুশকিলে। রাজা আর তাঁর দিকে ফিরেও তাকান না। রাজবাড়ি থেকে রসদের লাইনও বন্ধ। এমনিতেই রাজ্যের লোককে চটিয়ে রেখেছেন। আর বছরের পর বছর বসে বসে এটা-ওটা খেয়ে দারুণ কুঁড়েও হয়ে গেছেন, তায় আবার দিব্যি টইটম্বুর একটি নাদাপাতিয়াও বাগিয়েছেন। অন্য জায়গায় কাজকর্মের জন্য যে একটু চেষ্টাচরিত্তির করবেন তারও জো নেই। অথচ মনে-মনে বেশ বুঝছেন যে এবার এখানকার পাট উঠল, ঐ ছোকরার সঙ্গে পেরে ওঠা, শুধু তাঁর কেন, তাঁর চোদ্দোপুরুষের কারো কম্ম নয়।

"আস্তে আস্তে ঠাকুরদার জীবন থেকে সুখ-শান্তি বিদায় নিল।—এই, তোরা যে বড় হাসছিস? নিজের অতিবৃদ্ধ-ঠাকুরদার দুর্গতির কথা শুনলে তোদের হাসি পায়? আরো শোন্ তবে। মানুষের অবস্থা মন্দ হলে যেমন হয়, ভোর না-হতেই—গয়লা রে, মুদি রে, তাঁতি রে, নাপিত রে, ধোপা রে, যে যেখানে ছিল সব টাকা দাও টাকা দাও করে সারি সারি হাত পেতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

"ওদিকে দিনে-দিনে অভাবে অনটনে ঠাকুমার মেজাজও এমনি খিঁচড়ে যেতে লাগল যে বাড়িতে টেঁকাও দায় হয়ে উঠল। শেষপর্যন্ত একদিন গভীর রাতে ঠাকুরদা বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলেন। গভীর রাতে পা টিপে-টিপে বাড়ি থেকে না বেরিয়ে একেবারে সটাং গিয়ে এই গ্রামের

বাইরে মাঠের মাঝখানে যে বিখ্যাত ভুতুড়ে বটগাছ ছিল, দিনের বেলাতেও যার ছায়া মাড়াতে লোকে ভয় পেত—ইদিক-উদিক কি তাকাচ্ছিস বল দিকিনি? সে গাছ কোনকালে মরে-ঝরে চ্যালাকাঠ হয়ে গেছে। এখন চুপ করে শোন্ তো।—সেই গাছতলাতে না গিয়ে, এক হাঁড়ি শুঁটকিমাছ নিবেদন করে দিয়ে ঠাকুরদা ধর্না দিয়ে পড়ে থাকলেন। একটা যা-হয় ব্যবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত উঠবেন না।

"পড়ে আছেন তো পড়েই আছেন। প্যাঁচা-ট্যাঁচা ডাকছে, কিসের একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে, কি সব সড়্‌সড়্‌ খড়্‌খড়্‌ করে পায়ের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, কারা জানি চাপা গলায় ফিস্-ফিস্ করছে, কিন্তু ঠাকুরদা নড়েনও না চড়েনও না।

"হয়তো-বা একটু তন্দ্রামতো এসে থাকবে, হঠাৎ মনে হল কে যেন বলছে, 'ওঠ্ ব্যাটা, বাড়ি যা। যা যা বাড়ি যা, আর তোর কোনোও চিন্তা নেই। ওঠ্ বলছি। কেটে পড় দিকিনি। কি জ্বালা। ভাগ বলছি!'

"ঠাকুরদাও তখনই আর কালবিলম্ব না করে, উঠে পড়ে বাড়িমুখো হাঁটা দিলেন। আর, কি আশ্চর্য ব্যাপার! একেবারে দোরগোড়ায় এসে দেখেন, পায়ের কাছে কি একটা লম্বাটে জিনিস চাঁদের আলোতে চক্‌চক্ করছে। তুলে নিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে দেখেন, কুচ্‌কুচে কালো একটি পালক। তার মাঝখানে একটা চওড়া সাদা ডোরা কাটা, মুখের দিকটা একটু ছুঁচল মতন, একটু ছেঁটে নিলেই খাসা এক খাগের কলম।

"কলমটা হাতে নিতেই হাতের আঙুলগুলো কেমন 'চিড়্‌বিড়্‌ করে উঠল! ঠাকুরদা আর থাকতে না পেরে দিদিমার আলতার শিশি আর ধোপার হিসেবের খাতা নিয়ে বসে পড়লেন। আর সেই অদ্ভুত কলমটি, বিশ্বাস করিস আর নাই করিস, অনবরত কি যে সব মাথামুণ্ডু লিখে যেতে লাগল, পড়ে তো ঠাকুরদার নিজেরই চুল দাড়ি খাড়া হয়ে উঠল।"

এই অবধি শুনে আমরা সবাই ব্যস্ত হয়ে বললাম, "কেন? চুল-দাড়ি খাড়া হবে কেন?"

"আরে, সে যে দাঁড়াল গিয়ে একটা ভূতের গল্প, যা পড়লে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়। আমার ঠাকুরদা নিজের লেখা নিজে পড়ে প্রথমটা থ মেরে গেলেন। পরে বুঝলেন ধর্না দেওয়ার ফল ধরেছে। সারাদিন ঘরে বসে গল্পটা মুখস্থ করে ফেললেন, তার পর সন্ধ্যা লাগতে সেজেগুজে রাজসভায় গিয়ে হাজির হলেন।

•

এক হাঁড়ি শুঁটকিমাছ নিবেদন করে ঠাকুরদা ধর্না দিয়ে পড়ে রইলেন।

"দেখেন গিয়ে, সেই ব্যাটা হাত-পা নেড়ে দাঁত বার করে গান ধরেছে, আর লোকগুলো সব হাঁ করে তাই শুনছে আর বাহবা দিচ্ছে।

"ঠাকুরদা সভায় ঢুকতেই সঙ্গে-সঙ্গে একটা দমকা হাওয়া এসে ঝাড়লণ্ঠনটার অনেকগুলো আলো নিবিয়ে দিল। গানও তক্ষুনি থেমে গেল, সভাও থম্‌থমে চুপচাপ হয়ে গেল। আর ঠাকুরদা রাজার সামনে এসে সিংহাসনের সিঁড়ির ধাপে বসে নিচু গলায় ভূতের গল্প শুরু করলেন। দেখতে-দেখতে সভাসদরা যে-যার আসন ছেড়ে ঠাকুরদাকে ঘিরে বসল। কবি ছোকরা তো পাঁচজনকে সরিয়ে দিয়ে সব চেয়ে কাছে এসে ঘেঁষে বসল। ঠাকুরদা অর্ধেকটা বলে থেমে গেলেন। কবি ব্যাকুল হয়ে বলল, 'তার পর?' রাজা বললেন, 'তার পর?' সভাসুদ্ধু সকলে বলল, 'তার পর?'

"গল্প শেষ করে ঠাকুরদা হাত জোড় করে বললেন, "মহারাজ, এবার আমায় বিদায় দিন। এখানে খেতে পাই নে, ভিনগাঁয়ে দেখি গিয়ে চেষ্টা করে।' রাজা কিছু বলবার আগেই কবি বললে, 'না, না, সেকি! তা হলে আমাদের ভূতের গল্প কে বলবে? এই নাও আমার মনিব্যাগটা নাও।' দেখতে-দেখতে সভার লোকরা ভিড় করে যে-যা পারে ঠাকুরদার হাতে গুঁজে দিতে লাগল। ঠাকুরদা সে-সব চাদরে বেঁধে বাড়ি গিয়ে সকালবেলায় সব ধার-টার শোধ করে দিলেন।

"তার পর আবার যেই খাগের কলমে হাত দিয়েছেন কি, আবার আঙুল চিড়্‌বিড়্ করে আবার সেইরকম লেখা বেরুতে লাগল। এমনি করে ঠাকুরদা এক বছর ধরে তিনশো পঁয়ষট্টিটা ভূতের গল্প লিখে ফেলেছিলেন। আর ঘরের মধ্যে টাকার পাহাড় জমিয়ে ফেলেছিলেন। তাই দিয়েই তো বাড়ি-ঘর, জমি-জমা, গোরু-বাছুর, ক্ষেত-খামার সব হয়েছিল। তাই থেকেই তো তোরা সব দিব্যি মজা লুটছিস।"

আমরা বললাম, "তার পর উনি থেমে গেলেন কেন? মরে গেলেন বুঝি?"

ছোট্‌ঠাকুরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, "মোটেই মরেন নি! তোরা বললেই ওঁকে মরে যেতে হবে নাকি? মরেন-টরেন নি। তবে এক বছর বাদে একদিন পুরোনো পুকুরে স্নান করতে গিয়ে দেখেন এই মোটা একটা কালো পাতিহাঁস চান সেরে পাড়ে উঠে পালক সাফ করছে, আর ঠোঁটের খোঁচা খেয়ে এত বড়-বড় কালো পালক এদিকে-ওদিকে পড়ে

যাচ্ছে, তার প্রত্যেকটাতে একটা করে চওড়া সাদা দাগ আর মুখটা কেমন ছুঁচল ধরনের, একটু ছেঁটে নিলেই খাসা খাগের কলম।

"তাই দেখে ঠাকুরদা ঘরে গিয়ে সিন্দুক থেকে নিজের খাগের কলমটা নিয়ে এসে মিলিয়ে দেখলেন হুবহু এক, একেবারে বেমালুম মিলে গেল। এমনি মিলে গেল যে কোনটা নিজের পালক তা একদম আর চেনাই গেল না। এক ফোঁটা লাল আলতাও তাতে লেগে ছিল না। রোজ তাকে এত যত্ন করে পরিষ্কার করা হত।

"ব্যস্ গল্প লেখা বন্ধ হল, ঠাকুরদাও পেনসিল নিলেন। কিন্তু তদ্দিনে তাঁর অবস্থাও ফিরে গেছে, চিন্তাও ঘুচে গেছে। শেষ বয়সটা দিব্যি আরামেই কাটল। ঐ গল্পগুলোর কতক-কতক হারিয়ে গেছে, কিন্তু ধোপার খাতায় লেখা প্রথম পঞ্চাশটি আমার কাছে আছে। আমার কথা মতো চলিস যদি, মাঝে মাঝে এক-আধটা শোনাতে পারি।

"ছোট্ঠাকুরদা মারা যাবার আগে আমার উপর খুশি হয়ে ঐ খাতাটা আমাকে দিয়ে গেছেন। এখন ওটি আমার কাছে আছে। তোমরাও যদি আমার কথা মতো চলো তো মাঝে-মাঝে এক-আধটা শোনাতে পারি।"

পেনেটিতে

পেনেটিতে, একেবারে গঙ্গার ধারে, আমার বড় মামা একটা বাড়ি কিনে বসলেন। শুনলাম বাড়িটাতে নাকি ভূতের উপদ্রব তাই কেউ সেখানে থাকতে চায় না। সেইজন্য বড় মামা ওটাকে খুব সস্তাতেই পেয়েছিলেন।

যাই হোক, বিয়ে-টিয়ে করেন নি, আপত্তি করবার লোকও ছিল না। মেজো মাসিমা একবার বলেছিলেন বটে, "নাই-বা কিনলে দাদা, কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে কেউ থাকে না কেন?"

বড় মামা রেগে-মেগে বাড়ির কাগজপত্র সই করবার আগে ওঁদের কুস্তির আড্ডার দুজন ষণ্ডাকে নিয়ে সেখানে দিব্য আরামে দু রাত কাটিয়ে এলেন। ষণ্ডাদের অবিশ্যি সব কথা ভেঙে বলা হয় নি। তারা দুবেলা মুরগি খাবার লোভে মহাখুশি হয়েই থাকতে রাজি হয়েছিল। পরে আড্ডায় ফিরে এসে যখন বড় মামা ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন তখন তারা বেজায় চটে গিয়েছিল। "যদি কিছু হত দাদা? গায়ের জোর দিয়ে তো ওনাদের সঙ্গে পেরে ওঠা যেত না!"

দুমাস পরে বড় মামা সেখানে রেগুলার বসবাস শুরু করে দিলেন। সঙ্গে গেল বঙ্কু ঠাকুর, তার রান্না যে একবার খেয়েছে সে জীবনে ভোলে নি; আর গেল নটবর বেয়ারা, তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, রোজ সকালে বিকেলে আধ-ঘণ্টা করে দুটো আধমণি মুগুর ভাঁজে। আর ঝগড়ু জমাদার, সে চার-পাঁচ বার জেল খেটে এসেছে গুণ্ডামি-টুণ্ডামির জন্য। এরা কেউ, শুধু ভূত কেন, ভগবানেও বিশ্বাস করে না।

আমরা বরানগরে ছিলাম, আমি ক্লাস নাইনে পড়ছি। এমন সময় বাবা পাটনা বদলি হয়ে গেলেন আর আমার স্কুল নিয়েই হল মুশকিল। বড় মামা তাই শুনে বললেন, "কুছ পরোয়া নেই, আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, এমন কিছু দূরও পড়বে না। ব্যাটা বঙ্কুর রান্না খাবে আর আমিও আমার নতুন কবিতাগুলো শোনাবার লোক পাব, বন্ধুরা তো আজকাল আর শুনতে চায় না! ভালোই হল।"

শেষপর্যন্ত তাই ঠিক হল। মারা যেদিন সকালে পাটনা চলে গেলেন, আমার জিনিসপত্র বড় মামার ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হল, আর আমিও সারাদিন স্কুল করে বিকেলে গিয়ে সেখানে হাজির হলাম।

মনটা তেমন ভালো ছিল না, মারাও চলে গেছেন আবার আমাদের ক্লাসের জগু আর ভুটে বলে দুই কাপ্তেন কিছুদিন থেকে এমনি বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল যে স্কুলে টেঁকা দায় হয়ে উঠেছিল। আগে ওরাই আমার বেস্ট ফ্রেণ্ড ছিল, কিন্তু পুজোর ছুটির সময় সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওরা এমন পয়ে আকার ছোটলোকের মতো ব্যবহার আরম্ভ করেছিল যে, ওদের সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। এখন ওরাই হলেন ফুটবলের ক্যাপ্টেন, ক্লাবের সেক্রেটারি। সেদিনও ওদের সঙ্গে বেশ একটা কথা কাটাকাটি হয়ে গেছে; সে আবার অঙ্ক ক্লাসে। আমার একার দোষ নয়, কিন্তু ধরা পড়ে বকুনি খেলাম আমিই। ওরা দেখলাম খাতার আড়ালে ফ্যাচ্ ফ্যাচ্ করে হাসছে।

বাড়ি এসেও মনটা একটু খারাপই ছিল। একেবারে জলের মধ্যে থেকে ঘাটের সিঁড়ি উঠে গেছে বারান্দা পর্যন্ত। বিশাল বিশাল ঘর, ঝগড়ু আর নটবর তক্‌তকে করে রেখেছে। প্রায় সবগুলোই খালি, শুধু নীচের তলায় বসবার ও খাবার ঘরে আর দোতলায় দুটো শোবার ঘরে বড় মামা কয়েকটা দরকারি আসবাব কিনে সাজিয়েছেন।

কেউ কোথাও নেই। বড় মামাও কোথায় বেরিয়ে গেছেন। নীচে থেকে বঙ্কুর রান্না লুচি-আলুরদম খেয়ে উপরে গেলাম। বই রেখে, আমার ঘরের সামনের চওড়া বারান্দা থেকে দেখি বাগানময় ঝোপঝাপ, আমগাছ, কাঁঠালগাছও গোটা কতক আছে। গঙ্গার ধার দিয়ে জবা ফুলের গাছ দিয়ে আড়াল-করা একটা সরু রাস্তা একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে চলে গেছে। সেখানে তিনজন মাঝি গোছের লোক মাছ ধরার ছিপ সারাচ্ছে। একজন বুড়ো আর দুজন আমার চেয়ে একটু বড় হবে। ওখানকারই লোক বোধ হয়। আমাকে দেখতে পেয়ে তারা নিজের থেকেই ডাকল। দেখতে দেখতে বেশ ভাব জমে গেল। ওরা বলল, পিছন দিকের পুকুরে আমাকে মাছ ধরা শেখাবে, শনিবার নদীতে জাল ফেলবে, নিশ্চয় নিশ্চয় যেন আসি। বুড়োর নাম শিবু, ছেলে দুটো ওর ভাইপো, সিজি আর গুজি।

বেশ লোকগুলো। বাড়ির মধ্যে আসত-টাসত না, চাবরবাবরদের

এড়িয়ে চলত, কিন্তু আমার সঙ্গে খুব দহরম-মহরম হয়ে গেল। আমাকে সাপ-কামড়ানোর ওষুধ, বিছুটি লাগার ওষুধ, এই-সব শিখিয়ে দিল। আমাদের বাগানেই পাওয়া যায়।

মামা মাঝে মাঝে খুব রাত করে বাড়ি ফিরত। আর দোতলায় একা একা আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে শুয়ে থাকতাম। শিবুদের কাছে সে কথা জানাতেই, যেদিনই মামা বেরোতেন, সেদিনই ওরা জলের পাইপ বেয়ে উপরে উঠে, বারান্দায় বসে আমার সঙ্গে কত যে গল্প করত তার ঠিক নেই। সব মাঝিদের গল্প, ঝড়ের কথা, নৌকাডুবির কথা, কুমির আসার কথা, হাঙর মারার কথা, সমুদ্রের কথা।

ওদিকে স্কুলের ঝগড়া বাড়তে বাড়তে এমন হল যে ঐ জগু, ভুটে আর নেলো বলে ওদের যে এক সাকরেদ জুটেছে, এই তিনজনকে অন্তত আচ্ছা করে শিক্ষা না দিলে চলে না। শিবু বললে, "বাবু, এইখানে ডেকে এনে সবাই মিলে কষে পিটুনি লাগাই।"

বললাম, "না-রে, শেষটা ইস্কুল থেকে নাম কাটিয়ে দেবে। তার চেয়ে এখানে এনে এমনি ভূতের ভয় দেখাই যে বাছাধনদের চুলদাড়ি সব খাড়া হয়ে উঠবে।" তাই শুনে ওরা তিনজনেই হেসে লুটোপুটি।

আমি বললাম, "দেখ, তোদের তিনজনকে কিন্তু ভূত সাজতে হবে আর আমি ওদের ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনব। তোদের সব সাজিয়ে-গুজিয়ে দেব।"

"অ্যাঁ! সেজিয়ে-গুজিয়ে দেবেন কেন বাবু? রঙ-টঙ মেখিয়ে দেবার দরকার হবে না। তিনটে চাদর দেবেন। আমরা সাদা চাদর গায়ে জড়িয়ে, গঙ্গার ধারে ঝোপের মধ্যে এমনি এমনি করে হাত নাড়তে থাকব আর ওঁ ওঁ শব্দ করব, দেখবেন ওনাদের পিলে চমকে যাবে।" ছেঁড়া চাদর তিনটে দিয়ে দিলাম। সত্যি ওদের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। ভালোই হবে, তা হলে আমাকে কেউ সন্দেহও করবে না, বাড়িটার একটা অপবাদ তো আছেই।

শুক্রবার ইস্কুলে গিয়ে জগু ভুটেদের সঙ্গে কথা বন্ধ করলাম। বাবা! ওদের রাগ দেখে কে! "কি রে, হতভাগা, ভারি লাটসাহেব হয়েছিস যে? কথা বলছিস না যে বড়?"

বললাম, "মেয়েদের সঙ্গে আমি বড় একটা কথা বলি না। ব্যাচেলর আমার শিক্ষা।" তারা তো রেগে কাঁই—"মেয়েদের সঙ্গে মানে? মেয়েদের আবার কোথায় দেখলি?"

আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিল—ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি।

বললাম, "যারা ভূতের ভয়ে আমাদের বাড়ি যায় না, তাদের সঙ্গে মেয়েদের আবার কি তফাত ?"

জগু রাগে ফোঁস্-ফোঁস্ করতে করতে বলল—"যা মুখে আসবে, খবরদার বলবি না, গুপে।"

"একশো বার বলব, তোমরা ভীতু, কাপুরুষ, মেয়েমানুষ।" জগু আমাকে মারে আর কি! শুধু অঙ্কের মাস্টারমশাই এসে পড়লেন বলে বেঁচে গেলাম।

স্কুল ছুটির সময় ভুটে পিছন থেকে এসে আমার কানে কানে বললে, "সন্ধেবেলা সাতটার সময় তোমাদের বাড়ির বাগানে আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বেড়াব। দেখি তোমাদের ভূতের দৌড় কতখানি। হুঁ, আমাদের চিনতে এখনো তোমার ঢের বাকি আছে।"

আমি তো তাই চাই; শিবুরা আজকের কথাই বলে রেখেছিল।

বাড়ি গিয়ে খেয়ে-দেয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরলাম, ওদের দেখতে পেলাম না। একটু একটু নার্ভাস লাগছিল, যদি ভুলে যায়। নদীর ধারে একটা ঝোপের পিছন থেকে গুজি ডেকে বলল—"বাবু, সব ঠিক আছে আমাদের।" প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই জগু, ভুটে, নেলো তিন কাপ্তেন এসে হাজির।

বড় মামা বেরোচ্ছিলেন, ওদের দেখে আমাকে বললেন, "বন্ধুদের কেচটনগরের মিষ্টি-টিষ্টি দিস, সব একা একা খেয়ে ফেলিস না যেন।" কথাটা যেন না বললেই হত না। ওরা তো হেসেই গড়াগড়ি, যেন ভারি রসিকতা হল।

বড় মামা গেলে, খাওয়া-দাওয়া সেরে বাগানে গেলাম। এক্ষুনি বাছারা টের পাবেন। চারি দিকে অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটু একটু চাঁদের আলোতে সব যেন কিরকম ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে, আমার গা ছম্‌ছম্ করছে। গল্প করতে করতে ওদের গঙ্গার ধারের সেই সরু রাস্তাটাতে নিয়ে এলাম। বাড়ি থেকে এ জায়গাটা আড়াল করা। পথের বাঁক ঘুরতেই, আমার সুদ্ধু গায়ে কাঁটা দিল—ঝোপের পাশে তিনটে সাদা মূর্তি! মাথা মুখ হাত সব ঢাকা, আবার হাত তুলে তুলে যেন ডাকছে আর অদ্ভুত একটা ওঁ ওঁ শব্দ! একটু একটু হাসিও পাচ্ছিল।

জগুরা এক মিনিটের জন্য ভয়ে সাদা হয়ে গিয়েছিল, তার পর

আমার দিকে তাকিয়ে—"তবে রে হতভাগা! চালাকি করবার জায়গা পাস নি!"—বলে ছুটে গিয়ে চাদরসুদ্ধ মূর্তিগুলোকে জাপটে ধরল।

তার পরের কথা আমি নিজের চোখে দেখেও যখন বিশ্বাস করতে পারছি না, তোমরা আর কি করে করবে? ছোঁবামাত্র মূর্তিগুলো যেন ঝুর্‌ঝুর্‌ করে হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, শুধু চাদর তিনটে মাটিতে পড়ে গেল।

জগু, ভুটে, নেলোও তক্ষুনি মূর্চ্ছা গেল।

আমি পাগলের মতো "ও শিবু, ও সিজি, ও গুজি" করে ছুটে বেড়াতে লাগলাম; গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বইতে লাগল আর গোলযোগ শুনে বঙ্কু, নটবর আর ঝগড়ু হল্লা করতে করতে এসে হাজির হল। ওরা জগুদের তুলে, ঘরে নিয়ে গিয়ে, চোখে মুখে জল দিল। আমার গায়ে মাথায়ও মিছিমিছি এক বাল্‌তি জল ঢালল।

মামাকেও পাড়া থেকে ডেকে আনা হল। এসেই আমাকে কি বকুনি!

"বল্‌ লক্ষ্মীছাড়া, চাদর নিয়ে গিয়েছিলি কেন?"

যত বলি শিবু সিজি গুজির কথা, কেউ বিশ্বাস করে না।

"তারা আবার কে? এতদিন আছি, কেউ তাদের কোনোদিনও দেখে নি শোনে নি; এ আবার কি কথা? আন্‌ তা হলে তাদের খুঁজে।" কিন্তু তাদের কি আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়? তারা তো আমার চোখের সামনে ঝুর্‌ঝুর্‌ করে কর্পূরের মতো উবে গেছে।

আহিরিটোলার বাড়ি

আহিরিটোলা কোথায় জানো তো? সেখানে গঙ্গার ধারে আমার পূর্বপুরুষদের একটা মস্ত বাড়ি আছে। সেখানে কেউ থাকে না। দরজা-জানলা ঝুলে রয়েছে, ছাদ দিয়ে জল পড়ে, দেয়ালে সব ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। শুধু ইঁদুর বাদুড়ের বাস, আর সব জায়গায় একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ। বাড়িটা বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কোম্পানির আমলে তৈরি করেছিলেন, কলকাতা শহরই তখন সবে তৈরি হচ্ছে। দিব্যি

চকমেলান দোমহলা বাড়ি, দেয়ালে সব জং ধরে যাওয়া চিত্র-টিত্র করা, বিরাট পাথরের সিঁড়ি। টাকারও তাঁদের অভাব ছিল না, কি সব চোরাকারবার চলত ; তখনকার দিনে অত আইন-আদালতের হাঙ্গামা ছিল না। মোট কথা, বাবার ঠাকুরদার ঠাকুরদা ভয়ংকর ধনী লোক ছিলেন। প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ি ছিল, তাতে চারটে কালো কুচ্‌কুচে ঘোড়া জোড়া হত, বাড়ির পিছন দিকে বিশাল আস্তাবল ছিল। সে-সব কবে বিক্রি হয়ে গেছে, তার জায়গায় তিনতলা সব বাড়ি হয়ে, সেগুলো পর্যন্ত ভেঙেচুরে যাচ্ছে। সেবার প্রি-টেস্টে অঙ্কে পনেরো পেলাম। তাই নিয়ে বাড়িময় সে যে কিরকম হৈ চৈ লেগে গেল সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বাবা পর্যন্ত এমন কাণ্ড আরম্ভ করলেন যে শেষ অবধি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম। কাউকে কিছু না বলে, সন্ধেবেলায় কয়েকটা কাপড় জামার পুঁটলি কাঁধে নিয়ে, ঘড়ি কিনবার জমানো টাকাগুলো পকেটে পুরে, একেবারে আহিরিটোলার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

সেখানে আলো-টালো নেই, রাস্তার আলো এসে যা একটু ভাঙা দরজা জানলা দিয়ে ঢুকছে, অদ্ভুত সব ছায়া পড়েছে। সামনের দরজায় তালামারা। কিন্তু জানলায় শিক নোনা ধরে ভেঙে গেছে, ঢুকতে কোনো অসুবিধা হল না। একটু যে ভয় করছিল না তাও নয়, আর কতরকম শেডের যে অন্ধকার হয়, তাই দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম। খিদেও পেয়েছে প্রচুর, আবার রাগও হয়েছে। নীচের তলাটা কেমন যেন ঘুপ্‌সিপানা, পুঁটলি বগলে ধুলোমাখা সিঁড়ি দিয়ে দুম্‌ দুম্‌ করে উপর তলায় উঠে যাচ্ছি। এমন সময় সিঁড়ির ঠিক উপর থেকে কে বলল—"আহা। তোদের জ্বালায় কি সন্ধেবেলাতেও হাত মুখ ধুয়ে আল্‌বোলাটা নিয়ে একটু চুপ করে বসা যাবে না ? সারাদিন শুধু দাও, দাও, দাও, দাও, এটা নেই, ওটা নেই, এটা চাই, ওটা চাই, এবার একটু ক্ষান্তি দে।" ভুর্‌ভুর্ করে নাকে একটা ধুপধুনোর সঙ্গে গোলাপজল আর ভালো তামাকের গন্ধ এল। চেয়ে দেখি তারার আলোতে সিঁড়ির উপর একজন বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ভুস্কো রঙের লম্বা জোব্বা পরনে, পায়ে সাদা নাগরাই জুতো, মাথায় ভুস্কো একটা ছোট্ট সাদা টুপি, আর ডান হাতের বকবার আঙুলে একটা মস্ত সবুজ পাথরের আংটি।

যেমন সিঁড়ির উপরের ধাপে এসে উঠেছি ; আশ্চর্য হয়ে বললেন, "এ্যাঁ, তোকে তো আগে দেখি নি। তুই এখানে কেন এসেছিস ? কি

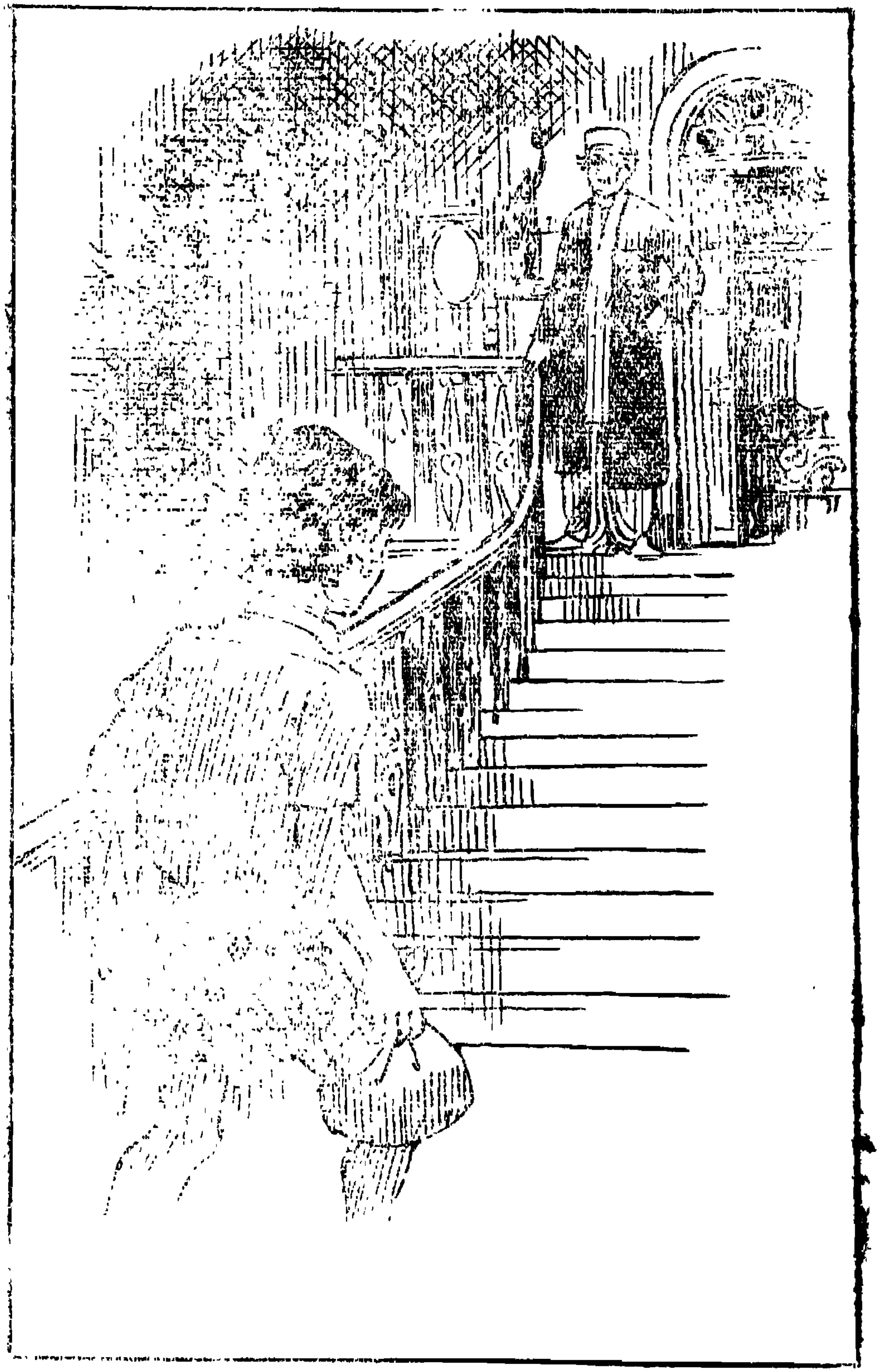

চেয়ে দেখি তারার আলোতে সিঁড়ির উপর একজন
বুড়ো লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন...

চাস তাই বল্ দেখি বাবা ?” খিদেয় পেটটা খালি খালি লাগছিল, বললাম, “কেন আসব না, এটা আমার বাবার ঠাকুরদাদার ঠাকুরদাদার বাড়ি !” ভীষণ চমকিয়ে গিয়ে লোকটি কাছে এসে আমার কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, “তোমার বাবার নাম কি ? তোমার ঠাকুরদাদার নাম কি ? নাম শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন।

কোথাও জনমানুষ নেই, চারি দিকে অন্ধকার, রেলিং-এর কাছে গিয়ে বুড়ো হাঁক দিলেন, “পরদেশি ! আমিন ! বলি, কাজের সময় গেলি কোথায়, আলো দিবি না ?” নীচের তলার অন্ধকার থেকে অস্পষ্ট একটা সাড়া এল, তার পর লম্বা একটা কাচের ঢাকনি পরানো সেজ হাতে কুচ্‌কুচে কালো, ডিগ্‌ডিগে লম্বা, গোলাপী গেঞ্জি, মিহি ধুতি আর গলায় সোনার মাদুলি পরা একটা লোক সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল।

“ছিলি কোথায় হতভাগা ? বাড়িতে লোক এলে দেখতে পাস না ?”

“এজ্ঞে, বারোয়ারিতলায় হাফ-আখড়াইটা একবার দেখে এলাম।”

আমার দিকে ফিরে বলল, “যাবে না, খোকাবাবু, হাফ-আখড়াইতে ? কেমন সব সঙ বেনিয়েছে, গান-বাজনা হতেছে।” বুড়ো বললে—“চোপ্ ও-সব ছেলেমানুষের জায়গা নয়। এসো, দাদা তুমি আমার সঙ্গে এসো।”

সামনের ঘরে গেলাম। মেঝেতে লাল গাল্‌চে পাতা, মস্ত নিচু তক্তপোষে হলদে মখমলের চাদর বিছানো। তার কোনায় গোঁফ ঝোলা চুড়িদার পাঞ্জাবী গায়, কানে মাকড়ি একজন লোক দাঁড়িয়ে। তাকে বললেন—“যাও এখন, বলছি তো দশ টাকা চাঁদা আর পাঁচ ভরি আতর দেব তোমাদের বারোয়ারী পুজোর জন্য, এখন কেটে পড়ো।”

লোকটি চলে গেলে, আমাকে তক্তপোষে বসিয়ে পুঁটলির দিকে চেয়ে বললেন, “ওতে কি ? পালিয়ে এসেছ নাকি ? কেন ?” বলতে হল সব কথা। খানিকটা ভেবে হঠাৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, “পনেরো পেইছিস ? হতভাগা, তোর লজ্জা করে না ? আঁক হয় না কেন ? শুভঙ্করী পড়িস না ? মুখ অমন পাংশুপানা কেন ? খেইছিস ? এ্যাঁ, খাস নি এখনো ? পরদেশি, যা দিকিনি, পচ্চুকে বল গে যা।” পরদেশি চলে গেলে বললেন, “আমার কক্ষনো একটা আঁক কষতে ভুল হত না, আর তুই ব্যাটা একেবারে পনেরো পেলি ! জানিস নবাবের কাছ থেকে

সার্টিফিকেট পেইছিলাম, হৌসের সব হিসেবের ভুল শুধরে দিয়েছিলাম বলে। দাঁড়া কুট্টিকে ডেকে পাঠাই, সে তোকে আঁক শিখিয়ে দেবে।"

পরদেশি একটা রুপোর থালায় করে লুচি, সন্দেশ, ছানামাখা, আর এক গেলাস বাদামের সরবত এনে দিল।

তার পর বারান্দার কোণে শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো স্নানের ঘরে আরাম করে হাত-পা ধুয়ে, পাশের ঘরে কারিকুরি করা খাটে সাদা বিছানায় শুয়ে সারারাত ঘুমোলাম।

সকালে পরদেশি এসে ডেকে দিল, "কুট্টিবাবু আঁক শেখাতে এসেছেন।" কুট্টিবাবুও এসে, চিত্র-করা পাটিতে বসে সারাটা সকাল আমাকে অঙ্ক কষালেন। পরদেশি কোনো কথা না বলে দুজনকে দুই গেলাস দুধ দিয়ে গেল। বই নেই, পুঁটলিতে খাতা পেনসিল ছিল, তাই দেখে কুট্টিবাবু মহাখুশি। কি বলব, যে-সব অঙ্ক সারা বছর ধরে বুঝতে পারছিলাম না, সব যেন জলের মতো সোজা হয়ে গেল। কুট্টিবাবুর বই দরকার হয় না, সব মাথার মধ্যে ঠাসা।

উনি চলে গেলে, বারান্দায় বেরিয়ে দিনের আলোতে ভালো করে চেয়ে দেখি এরা সব বাড়িঘর ঝকঝকে পরিষ্কার করে ফেলেছে। উঠোনের ধারে ধারে বড়-বড় টব করে কতরকম পাতাবাহারের গাছ, আর উঠোনে দাঁড়ের উপর লাল নীল হলদে সবুজ মস্ত-মস্ত তোতা পাখি রোদে বসে ছোলা খাচ্ছে।

দেয়াল ঠেস দিয়ে পরদেশি মুচকি মুচকি হাসছে। "কাকে খুঁজছ, খোকাবাবু?" বুড়ো লোকটির খোঁজ করলাম। "কি তার নাম পরদেশি? বড্ড ভালো লোক।" পিছন থেকে তিনি নিজে বললেন, আমার নাম শিবেন্দ্রনারায়ণ, লোকে শিবুবাবু বলে ডাকে। তুমি নাকি ভালো করে অঙ্ক কষেছ, কুট্টি বলছিল। এই নাও তার পুরস্কার।' আমার হাতে একটা মস্ত সোনার মোহর গুঁজে দিলেন। "ও কি পরদেশি?" বাইরের দরজায় কারা যেন মহা ধাক্কাধাক্কি চেঁচামেচি করছে। "সওরা নয় তো পরদেশি?" পরদেশি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল, আমি বললাম, "এই রে, তবে নিশ্চয় বাবা এসেছেন আমাকে খুঁজতে।" ছুটে নীচে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম, মা, বাবা, বড় কাকা আর পিসেমশাই এসেছেন। "ইস্, কি সাংঘাতিক ছেলে বাপু তুমি। এই খালি বাড়িতে অন্ধকারে, কালিঝুলের মধ্যে, খাওয়া নেই দাওয়া নেই দিব্যি রাত কাটিয়ে

দিলে? বলিহারি তোমাকে।" অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি এক মুহূর্তের মধ্যে পরিষ্কার তক্তকে উঠোন, তোতা পাখির সারি, খাতাবাহারের গাছ, সব উড়ে গেছে। পাগলের মতো দৌড়ে উপরে উঠলাম, খালি ঘর খাঁ খাঁ করছে, ভাঙা স্নানের ঘরে শ্বেতপাথরের সব টালি খুলে পড়ে আছে। "পরদেশি, ও পরদেশি, শিবুবাবু, কোথায় তোমরা?"

বাবা আমাকে খপ্ করে ধরে ফেললেন, "জানিস না, শিবুবাবু আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা, পরদেশি তাঁর খাস খানসামা।"

আস্তে আস্তে আমার হাতের মুঠোর মধ্যে মোহরটাকে পকেটে পুরে বললাম, "চলো, টেস্টে আমি অঙ্কে ভালো নম্বর পাব, দেখো।" কাউকে কিছু বলতে পারলাম না।

আমি ঠিক করেছি বড় হয়ে টাকা পয়সা রোজগার করে আহিরিটোলার বাড়িটা সারিয়ে সুরিয়ে সেখানেই থাকব। গঙ্গাটাও বেশ সামনে আছে

ভুতুড়ে গল্প

বাড়িটাতে পা দিয়েই আমার মেজো পিসেমশাই টের পেলেন কাজটা ভালো করেন নি। বাড়িটার বাইরে থেকেই গা ছম্ছম্ করে। কবেকার পুরোনো বাড়ি, দরজা-জানলা ঝুলে পড়েছে, শ্যাওলা জন্মে গেছে, ফোকরে ফাটলে বড়-বড় অশ্বত্থগাছ গজিয়েছে, ফটক থেকে সামনের সিঁড়ি পর্যন্ত রাস্তাটা আগাছায় ভর্তি আর তার দু পাশের শিরিষ গাছগুলো ঝোপড়া হয়ে মাথার উপর আকাশটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। সন্ধেও হয়ে এসেছে, চারি দিকে সাড়াশব্দ নেই, কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ নাকে আসছে।

মেজো পিসেমশাই হাতের লণ্ঠনটা জ্বেলে ফেললেন। বার বার দোতলার ভাঙা জানলার উপর চোখ পড়তে লাগল, বার বার মনে হতে লাগল এক্ষুনি জানলার সামনে থেকে কে বুঝি সরে গেল। মেজো পিসেমশাইয়ের তো অবস্থা কাহিল। অথচ উনি ভূত বিশ্বাস করেন না। সেইজন্য তাল ঠুকে ঢুকে পড়লেন বাড়ির ভিতরে।

গঙ্গার উপরে বাড়ি। ঢুকেই একটা বড় খালি হল্‌ঘর, আবছায়াতে হাঁ করে রয়েছে, লণ্ঠনের আলোতে দেয়ালে পিসেমশাইয়ের প্রকাণ্ড ছায়াটা নড়ে বেড়াচ্ছে। পিসেমশাই তাড়াতাড়ি হল্‌ পেরিয়ে গঙ্গার ধারে এসে দাঁড়ালেন। প্রকাণ্ড একটা বারান্দা, তার রেলিং ভাঙা, তার পর এক-ফালি সান-বাঁধানো চাতাল, তার চারি দিকে সাদা সাদা সব পাথরের মূর্তি সাজানো। তার পরেই ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি জল অবধি নেমে গেছে, তার অসংখ্য ইঁট জলে ধুয়ে গেছে। সিঁড়ির পাশেই একটা বুড়ো বাতাবিলেবুর গাছ, তার নীচে কবেকার পুরোনো ইঁটের গাদা, রোদে পুড়ে জলে ভিজে কালো হয়ে গেছে। গঙ্গার ওপারে জুট মিলের সাহেবদের বাড়িতে আলো জ্বলছে দেখে পিসেমশাই ফোঁস্‌ করে একটা নিশ্বাস ছাড়লেন।

একতলায় বসে থাকলে চলবে না। উপর যেতে হবে, রাত কাটাতে হবে। নইলে বাজি হেরে যাবেন; ক্লাবে মুখ দেখাতে তো পারবেনই না, উপরন্তু জগুর বাবা সোনালী ছাগলটাকে নিয়ে যাবেন।

হলের দুপাশে সারি সারি ঘর, তাদের দরজাগুলো আধখোলা। দু-একটা বিশাল বিশাল কারিকুরি-করা ভাঙা তক্তপোষ, দু-চারটে প্রকাণ্ড খালি সিন্দুক, এক-আধটা বৃহৎ রঙচটা আয়না ছাড়া কোথাও কিছু নেই। মেজো পিসেমশাই তাড়াতাড়ি একবার সবটা দেখে নিয়ে এক দৌড়ে উপরে উঠে গেলেন।

দোতলাটাও ঠিক একতলার মতো। সেখানেও মাঝখানে প্রকাণ্ড একখানি হল্‌। তার মধ্যে আসবাব কিছু নেই, খালি মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড বড় ঘোর নীল রঙের গালচে পাতা, তাতে বহুদিনের ধুলো জমে পুরু হয়ে রয়েছে। আর ঘরের কোণে দেয়ালে একটা সেতার ঝুলছে, তাতে তারের কোনো চিহ্ন নেই।

মেজো পিসেমশাই খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দেয়ালের দিকে পিঠ করে, যাতে পিছন দিক থেকে হঠাৎ কিছুতে এসে না পড়ে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলেও চলবে না। প্রত্যেকটা ঘরের বর্ণনা দিতে হবে, তাই প্রত্যেকটা ঘর একবার দেখা দরকার। ভয় আবার কিসের? ভূত তো আর হয় না। ঘরগুলি প্রায় সব কটাই দরজা খোলা। একেবারে খালি, ধুলোয় ধূসর। দু-একটাতে ভাঙা ভাঙা আলমারি, প্রকাণ্ড জলচৌকি দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছাদের

দিকে তাকিয়ে দেখেন আলো ঝোলাবার বড়-বড় হুক আছে, তার আশে-পাশের ছাদটাতে ঝুলকালির দাগ রয়েছে। মেজো পিসেমশাই দারুণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। তা ছাড়া রাতই যখন কাটাতে হবে একটা বসবার জায়গা তো চাই।

হলের ওপাশে, গঙ্গার উপরে চওড়া বারান্দা। গঙ্গায় একটা স্টীমার যাচ্ছে, তাতে মানুষ আছে, আলো জ্বলছে। ওপারে শত শত আলো জ্বলছে। মেজো পিসেমশাই রেলিঙের কাছে এসে দাঁড়ালেন, ভর দিতে ভয় করে। যদি ভেঙে পড়ে। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন ঐ তো জাহাজে কত লোক দেখা যাচ্ছে, আঃ।

"এনেছিস? কই দেখি।"

চমকে মেজো পিসেমশাই ফিরে দেখেন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন সাদা জাব্বাজোব্বা-পরা একজন বুড়োমতো লোক। কি ভালো দেখতে, হাতির দাঁতের মতো গায়ের রঙ, দাড়ি নেই, লম্বা গোঁফটা পাকিয়ে পাকিয়ে কানের উপর তুলে রেখেছেন, টানা টানা চোখ। আশ্চর্য ফরসা একখানি হাত বাড়িয়ে বললেন, "দে, দে, দেরি করিস নে। কখন এসে পড়বে।"

মেজো পিসেমশাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছেন লোকটার গলায় মুক্তার মালা জড়ানো, কানে মুক্তো পরা, হাতের ভুল আঙুলে হীরের আংটি। এ্যাঁ! এ আবার কে!

লোকটি এবার বিরক্ত হয়ে বললেন, "তুই কি বোবা হলি নাকি রে? আজকাল সব যা তা চাকর রাখতে আরম্ভ করেছে দেখছি। আছে, না নেই?"

মেজো পিসেমশাইয়ের গলা-টলা শুকিয়ে একাকার, নীরবে মাথা নাড়লেন।

লোকটি হতাশভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, "একটা বসবার জায়গাও কি এগিয়ে দিতে পারিস না? মাইনে খেতে লজ্জা করে না তোর? আমি আর কে, তা বটে তা বটে, আমি এখন আর কে যে আমার কথা শুনবি?"

হঠাৎ কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বললেন, "অত যে নিলি তখন মনে ছিল না হতভাগা? এর জন্য তোকে কষ্ট পেতে হবে বলে রাখলাম, কি ভীষণ কষ্ট পেতে হবে জানিস না। তিলে তিলে তোকে—

আশ্চর্য ফরসা একখানি হাত বাড়িয়ে বললেন, "দে দে, দেরি করিস নে।
কখন এসে পড়বে।"

ঐ রে, এল বুঝি।"

বিদ্যুতের মতো বুড়ো লোকটি হলের পাশের ঘরটাতে ঢুকে পড়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

মেজো পিসেমশাইয়েরও যেন কানে এল স্পষ্ট পায়ের শব্দ। দেয়ালের মতো সাদা মুখ করে লণ্ঠনটাকে উঁচু করে ধরে, চারি দিক ভালো করে দেখে নিলেন, কেউ কোথাও নেই। লোকটা নিশ্চয় পাগল-টাগল হবে। অত গয়নাগাটিই-বা পেল কোত্থেকে? কেমন অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

লণ্ঠন হাতে বারান্দা থেকে হলে ঢুকলেন। নীচের তলাটা বরং ভালো, একটা তক্তপোষে বসে বসেই রাত কাটানো যাবে। পকেট চাপড়ে দেখলেন 'অশরীরী-খুনে' লোমহর্ষণ ১০নং খানা দিয়ে দিতে জগুর বাবা ভোলেন নি। রাত জেগে ঐটি পড়ে শেষ করে কাল সকালে আগাগোড়া গল্পখানি বলতে হবে। তবে বাজি জেতা।

পা টিপে টিপে হল্ পার হয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সদর দরজার ডান পাশের ঘরখানিতে ঢুকে, ভাঙা সিন্দুকের উপর লণ্ঠন নামিয়ে, তক্তপোষের কোণটা ধুতির খোঁট দিয়ে ঝেড়ে, ধপ্ করে পিসেমশাই বসে পড়লেন। ময়লা খোঁটটা দিয়েই গলার, কপালের ঘাম মুছতে লাগলেন। আঃ, বাঁচা গেল। ভাগ্যিস ভূতে বিশ্বাস করেন না। নইলে তো আজ ভয়েই আধমরা হয়ে যেতে হত।

সামনের রঙচটা আয়নাতে একখানি সাদা ছায়া পড়ল: বুড়ো লোকটি ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে, অনুনয়ের স্বরে বললেন, "দিয়েই দে না বাবা। তোর আর কি কাজে লাগবে বল? যারা দেয় তারা প্রাণ হাতে করে এনে দেয়। না পেলে আমার প্রাণ বেরিয়ে যায়। কেন দিচ্ছিস না, বাপ? একে একে সবই তো প্রায় নিয়েছিস. আরো চাস বুঝি? তোর প্রাণে কি মায়া-দয়াও নেই? প্রথম যখন এলি, কি ভালো মানুষটিই ছিলি? আমি উপরের ঐ নীল গালচেটাতে বসে সেতার বাজাতাম, আর তুই বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে শুনতিস। তোকে কত-না ভালো বাসতাম, এটা-ওটা রোজই দিতাম, কত-না ভালোমানুষ সেজে থাকতিস। ভেতরে ভেতরে তুই যে এত বড় একটা বিশ্বাসঘাতক কেউটে সাপ তা কি আর জানি।"

মেজো পিসেমশাই লাফিয়ে উঠে–এক হাত সরে দাঁড়ালেন। বুড়ো

লোকটিও খানিকটা এগিয়ে এলেন, রাগে তার দু চোখ লাল হয়ে গেল, ফরসা দুটো মুঠো পাকিয়ে মেজো পিসেমশাইয়ের নাকের কাছে ঘুষি তুলে বললেন, "একদিন এই ঘুষিকে দেশসুদ্ধ লোকে ভয় করত, কোম্পানির সাহেবরা এসে এর ভয়ে পা চাট্‌ত। এখন বুড়ো হয়ে গেছি, দুর্বল হয়ে গেছি, তাই আমার বাড়িতে আমার মাইনে-খাওয়া চাকর হয়ে তোর এত বড় আস্পর্ধা। তবে এখনো মরি নি, এখনো তোকে এক মুঠো ভস্ম—না রে না, কি বাজে কথা বলছি। দিয়ে দে বাবা, দেখ তোকে তার বদলে কি দেব।"

এই বলে বুড়ো লোকটি আঙুল থেকে হীরের আংটিখানি খুলে মেজো পিসেমশাইয়ের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মরিয়া হয়ে পিসেমশাই ইদিক-উদিক তাকালেন। কি যে দেবেন ভেবে না পেয়ে, পকেটে হাত দিতেই গোলাপী বিড়ির প্যাকেট দুটোর উপরে হাত পড়ল। তাই বের করে বুড়োর হাতে দিয়ে দিলেন।

"সত্যি দিলি? আঃ, বাঁচালি বাবা। এই নে, আমি আশীর্বাদ করছি তোর একশো বছর পরমায়ু হবে।"

এই বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে, মেজো পিসেমশাইয়ের বুকপকেটে আংটি ফেলে দিয়ে হলের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ির দিকে দে ছুট। পিসেমশাই হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন। সিঁড়ির প্রথম ধাপটা অবধি তাকে লণ্ঠনের ক্ষীণালোকে দেখতে পেলেন, তার পর সে যেন বাতাসে মিলিয়ে গেল। আর পিসেমশাইও তক্ষুনি "আরে বাপ" বলে মূর্চ্ছা গেলেন।

পরদিন সকালে জগুর বাবা, গুপিদের মামা, আমাদের দাদা, আরো পাঁচ-সাতজনা মিলে ঠ্যাং ধরে টেনে পিসেমশাইয়ের ঘুম ভাঙালেন। উঠে দেখেন ঘরদোর রোদে ভরে গেছে। তাঁরা বললেন, "উপরে গেছিলি? তবে দে, উপরের বর্ণনা দে।"

ঠিক বলছেন কি না পরখ করবার জন্য সবাই মিলে উপরে গেলেন। পিসেমশাইও গেলেন। সব ঘরদোর শূন্য হাঁ হাঁ করছে। জগুর বাবা তো রেগে টং। ইস্, অত ভালো ছাগলছানা হাতছাড়া হয়ে গেল! ইস্, ক্লাবের রাক্ষসগুলোকে তার উপরে বাজির খাওয়া খাওয়াতে হবে।

মাটিতে 'অশরীরী-খুনে' পড়ে ছিল।

"এ্যাঁ! ঠিক হয়েছে। বড় যে ঘুমুচ্ছিলি, বইটা পড়েছিলি? বল্

তবে, আগাগোড়া গল্পটা বল।" মেজোপিসেমশাই-এর মুখে আর কথাটি নেই। মনে মনে দেখতে পেলেন জগুর বাবা সোনালী ছাগলটাকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন। সারারাত ঘুম লাগিয়েছেন, স্বপ্ন দেখেছেন, তার উপযুক্ত সাজা তো হবেই।

লজ্জায়, দুঃখে, মাথা নিচু করতেই চোখ পড়ল বুক পকেটের ভিতর হীরের আংটি জ্বলজ্বল্ করছে। মেজো পিসেমশাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বললেন, "নিয়ে যা তোর ছাগল। ইস্ ভারি তো ছাগল।" বলে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে সোজা বাড়িমুখো রওনা দিলেন।

সত্যি নয়

—দলের মধ্যে মেলা লোক ছিল—মেজো মামা, ভজাদা, জগদীশবাবু, গুপীর সেজদা, গুপী আর শিকারীরা দুজন। সারাদিন বনে জঙ্গলে পাখি-টাখি আর মেলা খরগোশ তাড়িয়ে বেড়িয়ে সন্ধের আগে সকলে বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। জমিদারবাবুর ঘোড়ার গাড়ি এসে বাজ-পড়া বটগাছের তলায় অপেক্ষা করতে থাকবে, ওঁরা জন্তুজানোয়ার মেরে ক্লান্ত হয়ে গাড়ি চেপে জমিদার-বাড়ি যাবেন। সেখানে স্নান-টান করে রাতে খুব ভোজ হবে। কিন্তু কি মুশকিল, আধঘণ্টা অপেক্ষা করবার পরও যখন গাড়ি এল না, শিকারীরা দুজন খোঁজ করবার জন্য এগিয়ে গেল। এরা সব গাছতলায় পা মেলে যে যার পড়ে রইল।

আরো মিনিট কুড়ি গেল, দিব্যি চার দিক অন্ধকার হয়ে এসেছে, তখন জগদীশবাবু লাফিয়ে উঠে পড়লেন।—"ওঠ্ তোরা, এ জঙ্গলে নিশ্চয়ই বাঘ আছে।" খিদেয় সকলের পেট জ্বলে যাচ্ছে, তার উপর দারুণ পায়ে ব্যথা, কিন্তু ও কথা শুনেই সবাই তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠল। বেশ তারার আলো হয়েছে। তার মধ্যে মনে হল যেন ডান দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে জঙ্গলটা পাতলা হয়ে এসেছে, সেখানে যেন আলো বেশি। সেদিকে খানিকটা যেতেই সবাই অবাক হয়ে দেখল সামনেই বিশাল একটা পোড়ো বাড়ি।

মেজো মামা তো মহা খুশি। বাঃ, খাসা হল, এবার শুকনো

কাঠকুটো জেলে দুপুরের খাবার জন্য যে হাঁড়িটা আনা হয়েছিল তাতে করে খরগোশের মাংস রাঁধা যাবে। নিদেন একটু বিশ্রাম তো করা যাবে। সবাই খুশি হয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

গেটটা কবে থেকে ভেঙে ঝুলে রয়েছে, একটু একটু বাতাস দিচ্ছে, তাতে ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দ করছে। বিশ্রী লাগে। পথে সব আগাছা জন্মে গেছে, বাগানটা তো একেবারে সুন্দরবন। প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড বারান্দা। বারান্দার উপর উঠে জগদীশবাবু শ্বেতপাথরের মেজের উপর বেশ করে পা ঘষে কাদামাটি পরিষ্কার করে ফেললেন। গুপীর সেজদা একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে বলল, "জায়গাটাকে সেরকম ভালো মনে হচ্ছে না।"—"সেজদার যেমন কথা, ঘোর জঙ্গলের পোড়ো বাড়ি আবার এর থেকে কত ভালো হতে পারে।" গুপী আবার বলল, "বাড়িটার বিষয় আমাদের চাকর হরি একটা অদ্ভুত গল্প বলছিল। এদিকে কেউ আসে না।"

একেবারে ভাঙা বাড়ি কিন্তু নয়। দরজাগুলো সব বন্ধ রয়েছে, কেউ বাস করাও একেবারে অসম্ভব নয়। তখন সকলে মিলে মহা হাঁকডাক লাগিয়ে দিলেন। কোনো সাড়া শব্দ নেই। সকলের যে ঠিক ভয় করছিল তা নয়, কিন্তু কিরকম যেন অস্বস্তি লাগছিল, তাই সব এক জায়গায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মেজো মামা বললেন—"যা, যা, যে-সব বীরপুরুষ, নে চল্, দরজা ঠেলে খোল্, রাঁধাবাড়ার আয়োজন করা যাক।"

ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল, খালি খালি সব বিশাল বিশাল ঘর, ধুলোতে ঝুলেতে ভরা। সেকালের পুরোনো চক্-মেলানো বাড়ি, মাঝখানে বিরাট এক উঠোন তার মধ্যে আবার একটা লেবুগাছ, একটা পেয়ারাগাছ। সবটাই অবিশ্যি আবছায়া আবছায়া। উঠোনের পাশেই রান্নাঘর, সেখানে উনুন তো পাওয়া গেলই, এক বোঁচকা শুকনো খরখরে কাঠও পাওয়া গেল। মেজো মামা দেখতে দেখতে জায়গাটা খানিকটা ঝাড়পোঁছ করে নিয়ে রাঁধাবাড়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। তখনো একটু একটু আলো ছিল, কিন্তু ঘরের ভিতর বেশ অন্ধকার। তবে ওঁদের সকলের সঙ্গেই পকেট-লণ্ঠন ছিল। এখন একটু জল চাই।

আর সকলে কেউ-বা উঠোনের ধারে জুতো খুলে পা মেলে দেয়াল ঠেসান দিয়ে বসে পড়েছে, আবার কাউকে যেমন গুপীকে, গুপীর

সেজদাকে খরগোশ কাটবার জন্য লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারাও বলছে জল না হলে পারবে না।

অগত্যা মেজো মামা টিফিন ক্যারিয়ারের বড় ডিবেটা আর একগাছি সরু দড়ি নিয়ে জলের চেষ্টায় গেলেন।

রান্নাঘরের ওপাশে সবজি-বাগান ছিল, তার কোনায় একটা কুয়ো দেখা গেল। মেজোমামা খানিকটা এগিয়ে গিয়েই থম্‌কে দাঁড়ালেন। আঃ, বাঁচা গেল, এখানে তা হলে লোকজন আছে। যে একটা থম্‌থমে ভাব, আর গুপীটা যা বাজে বকে যে আরেকটু হলে ভয়ই ধরে যেত! এই তো এখানে মানুষ রয়েছে। একটা ছোক্‌রা চাকর ধরনের লোক কুয়োর আশে পাশে কি যেন আঁতি পাঁতি করে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

মেজো মামার হাতে আলো দেখে সে ভারি খুশি হয়ে উঠল—"যাক্‌ আলোটি এনে বড়ই উব্‌গার করলেন বাবু, আমাদের বাবুর মাদুলীটা কোথাও পাচ্ছি না। বাবু আর আমাকে আস্ত রাখবেন না।"

মেজো মামার মনটা খুব ভালো—তিনিও মাদুলী খুঁজতে লেগে গেলেন, "হ্যাঁরে কি রকম মাদুলী রে? এখানে আবার তোর বাবুও বাস করেন নাকি? আমরা তো মনে করেছিলাম বুঝি পোড়ো বাড়ি।" চাকরটা বলল, "আরে ছো, ছো! পয়সার অভাবেই পোড়ো বাড়ি। ঐ মাদুলীটা আমার বাবুকে একজন সন্ন্যাসী দিয়েছিল। ঔষধ হাতে বাঁধা থাকলে যে ঘোড়াতেই বাজি ধরেন সেটাই জিতে যেত। এমনি করে দেখতে দেখতে ফেঁপে উঠলেন, টাকার গাদার উপরে বসে থাকলেন।—দেখি পাটা সরান এখানটায় একটু খুঁজি। হ্যাঁ তার পর একদিন আমাকে বললেন, বড্ড জং ধরে গেছে রে, এটাকে মেজে আন্‌। মাজলামও। তার পর যে বিড়ি ধরাবার সময় কোথায় রাখলাম আর খুঁজে পাচ্ছি না। সেই নাগাড়ে খুঁজেই বেড়াচ্ছি, এদিকে বাবুর সর্বনাশ হয়ে গেল। যে ঘোড়াতেই বাজি ধরেন সেটাই হয় মুচ্ছো যায়, নয় বসে পড়ে, নয় খানিকটা গিয়ে আবার ফিরে আসে। এমনি করে বাড়ি গেছে, বাগান গেছে, টাকা-পয়সা গয়নাগাটি, হাতিঘোড়া সব গেছে। এখন দুজনে দিনরাত সেই মাদুলীই খুঁজে বেড়াই।" উপর থেকে ভাঙা হেঁড়ে গলায় শোনা গেল—"পেলি রে?" "না স্যার।" "বলি খুঁজছিস তো নাকি খালি গল্পই কচ্ছিস?" বলতে বলতে একজন ফরসা মোটা আধবুড়ো লোক দোতালার বারান্দার ধারে এসে দাঁড়ালেন—"দেখ্‌ দেখ্‌, ভালো করে দেখ্‌,

যাবে কোথায় ?" ঠিক সেই সময়ে মেজো মামা একটু ঠেস দিয়ে পাটা আরাম করবার জন্য হাত বাড়িয়ে যেই-না পাশের বারান্দার থামটাকে ধরেছেন অমনি তার ছোট্ট কার্নিশ থেকে টুপ্ করে পুরোনো লাল সুতোয় বাঁধা একটা মাদুলী মাটিতে পড়ে গেল। সুতোটা আলগা হয়ে গেল, মাদুলীটা গড়িয়ে চাকরটার পায়ের কাছে থামল। চাকরটার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসার জোগাড়—"দেন কত্তা দুটো পায়ের ধুলো দেন—বাঁচালেন আমাদের—।" উপর থেকে তার বাবুও দুড়্দাড়্ করে পুরোনো শ্বেতপাথর-বাঁধানো সিঁড়ি বেয়ে ছুটতে ছুটতে নেমে এলেন।—"পেইছিস! আর আমাদের ঠেকায় কে? বড় উপকার করলেন ব্রাদার, আসুন একটু কোলাকুলি করি—" বলে দুই হাত বাড়িয়ে মেজো মামাকে জড়িয়ে ধরেন আর কি, এমন সময়, "ও মেজো মামা, ও নেপেন-বাবু, কোথায় গেলেন, আর জল দরকার নেই, শিকারীরা ঘোড়াগাড়ি নিয়ে এসে হাজির হয়েছে।" বলে দলে দলে সব এসে উপস্থিত। মেজো মামা চমকে দেখেন চাকরটা, তার বাবু আর মাদুলী কিছুই কোথাও নেই। খালি পায়ের কাছে লাল সুতোটা পড়ে রয়েছে।

আস্তে আস্তে সেটা কুড়িয়ে বললেন, "চ, খিদেও পেয়েছে ভীষণ!"

পথে যেতে শিকারীরা বললে, "সাহস তো আপনাদের কম নয়, ওটা ভূতের বাড়ি তা জানতেন না? বহুকাল আগে এক জমিদার ছিলেন, রেস খেলে সর্বস্বান্ত হয়ে গেছিলেন, তাঁর বাড়ি। কেউ ওখানে যায় না।"

যুগান্তর

ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের হাফইয়ার্লির ফল বেরুবার ঠিক পরেই। পরীক্ষার আগে দু-তিন দিন ধরে না খেয়ে না ঘুমিয়ে এত পড়লাম, অথচ ফল বেরুলে দেখলাম ইংরেজিতে ২২, বাঙলায় ২৯, আর অঙ্কের কথা নাই বললাম। তাই দেখে শুধু বাড়ির লোকেদের কেন, আমার নিজের সুদ্ধু চক্ষুস্থির। শেষপর্যন্ত বাড়িতে একরকম টেঁকা দায় হল।

আমার বন্ধু গুপীরও সেই একই অবস্থা। ওর বাবা আরেক কাঠি

বাড়া। ক্লাবের নাম কাটিয়ে-টাটিয়ে, মাউথ-অর্গ্যান কেড়ে নিয়ে একাকার করলেন। সন্ধেবেলায় গুপী এসে বলল, "জানিস, মানোয়ারি জেটি থেকে একটা মালবোঝাই জাহাজ আন্দামান যাচ্ছে আজ!" আমার হাত থেকে পেনসিলটা পড়ে গেল, বুকের ভিতরটা ধ্বক্ করে জ্বলে উঠল। বললাম, "কে বলেছে?" গুপী বলল, "মামাদের আপিস থেকে মাল বোঝাই-এর পারমিট করিয়েছে। আজ রাত দুটোয় জোয়ারের সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে পড়বে।"

বললাম, "ডায়মণ্ডহারবারের কাছেই ওপার দেখা যায় না। আরেকটু এগুলে না জানি কেমন!" গুপী বলল, "যাবি? না কি জীবনটা রোজ বিকেলে অঙ্ক কষে কাটাবি?" পেনসিলটা তুলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিলাম। বললাম, "পয়সাকড়ি নেই, তারা নেবে কেন?" গুপী বলল, পয়সা কেন দেব? অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এক সময়ে চড়ে বসে থাকব, মেলা জেলে ডিঙি রয়েছে, তার কোনো অসুবিধা হবে না। তার পর লাইফবোটের ক্যাম্বিশের ঢাকনির তলায় লুকিয়ে থাকতে হয়। তার পর জাহাজ একবার সমুদ্রে গিয়ে পড়লেই হল, ওরও ফেরবার নিয়ম নেই, আমাদেরও নামাবার উপায় থাকবে না। যাবি তো চল্। আজ রাত বারোটায় এসপ্ল্যানেডে তোর জন্য অপেক্ষা করব।"

চোখের সামনে যেন দেখতে পেলাম আন্দামানের ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো রাস্তার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সবুজ টিয়া পাখি উড়ে যাচ্ছে, আর মাথার উপর ঘোর নীল আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করছে, দূরে সুন্দরী গাছের বন থেকে সারি সারি কালো হাতি বিরাট বিরাট গাছের গুঁড়ি মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসছে। বললাম, "বেশ তাই হবে!"

তার পর যে কত বুদ্ধি করে রাত বারোটায় সেখানে গিয়ে গুপীর সঙ্গে জুটলাম সে আর কি বলব! সঙ্গে একটা শার্ট, প্যান্ট, তোয়ালে আর টর্চ ছাড়া আর কিছু নেই। রাতে খাবার সময় ঐ পুরোনো কথা নিয়ে আবার একচোট হয়ে গেছে। বাড়িতে থাকবার আর আমার একটুও ইচ্ছা নেই। আর গুপীর কথা তো ছেড়েই দিলাম। সে কোনো দিনই বাড়িতে থাকতে চায় না।

গঙ্গার দিকেই যাচ্ছিলাম। অনেকটা এগিয়েছি, লাটসাহেবের বাড়ির গেটটা পেরিয়ে আরো খানিকটা গিয়েছি, এমন সময় দেখি

গাড়িটা ততক্ষণে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাঁ হাতে ঘুরে
এসেম্বলি হাউসের দিকে বেঁকেছে।

ক্যালকাটা গ্রাউণ্ডের পাশে, ইডেন গার্ডেনের সামনে দিয়ে একটা প্রকাণ্ড চার ঘোড়ার গাড়ি আসছে। আমরা তো অবাক। জন্মে কখনো চার ঘোড়ার গাড়ি দেখি নি। কলকাতা শহরে আবার চার ঘোড়ার গাড়ি যে আছে তাই জানতাম না। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে এগিয়ে গেলাম।

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম চারটে কালো কুচ্‌কুচে দৈত্যের মতো বিরাট ঘোড়া। তাদের সাজগুলো তারার আলোয় জ্বল্‌ জ্বল্‌ করছে, ঘাড়গুলো ধনুকের মতো বাঁকা, মাঝে মাঝে মাথা ঝাড়া দিচ্ছে, নাক দিয়ে ফড়র্‌ ফড়র্‌ আওয়াজ করছে, ঝন্‌ঝন্‌ করে চেন বকলস্‌ বেজে উঠছে, অত দূর থেকেও সে আওয়াজ আমার কানে আসছে। ঘোড়াটা ক্ষুর থেকে মাঝে মাঝে স্পার্ক দিচ্ছে। সে না দেখলে ভাবা যায় না।

গাড়িটা ততক্ষণে ইডেন গার্ডেনের পাশ দিয়ে বাঁ-হাতে ঘুরে এসেম্বলি হাউসের দিকে বেঁকেছে। ঐখানে সারাদিন মিস্ত্রীরা কাজ করেছে, পথে দু-একটা ইঁট-পাটকেল পড়ে থাকবে হয়তো। তাতেই হোঁচোট খেয়ে সামনে দিককার একটা ঘোড়ার পা থেকে নালটা খুলে গিয়ে শাঁই শাঁই করে অন্ধকারের মধ্যে একটা ভাঙা চক্র এঁকে, কতকগুলি ঝোপ-ঝাপের মধ্যে গিয়ে পড়ল। খানিকটা ক্ষুরের খটাখট্‌ চেনের ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করে, আরো হাত-বারো এগিয়ে এসে, বিশাল গাড়িটা থেমে গেল।

ততক্ষণে আমরা দুজনে একেবারে কাছের গোড়ায় এসে পড়েছি। দেখি গাড়ির পিছন থেকে চারজন সবুজ পোশাক-পরা, কোমরে সোনালী বেল্ট-আঁটা সইস্‌ নেমে পড়ে, ছুটে গিয়ে চারটে ঘোড়ার মুখে লাগাম কষে ধরেছে। সামনে দিকের ডান-হাতের ঘোড়াটার চোখের সাদা দেখা যাচ্ছে। আকাশের দিকে মাথা তুলে সে একবার ভীষণ জোরে চিঁ-হি-হি-হি করে ডেকে উঠল। সেই শব্দ চার দিকে গম্‌গম্‌ করতে লাগল। গাড়ির মধ্যে থেকে একজন লম্বাচওড়া লোক নেমে পড়ল।

বোধ হয় ওরা কোনো থিয়েটার পার্টির লোক, কোনো বিদেশী জাহাজে অভিনয় করে ফিরছিল। কারণ লোকটার দেখলাম রাজার মতো পোশাক-পরা, কিংখাবের মখমলের জোব্বা পাজামা, গলায় মুক্তোর মালা, কানে হীরে। আর সে কি ফরসা সুন্দর দেখতে। মাথায় মনে হল সাত ফুট লম্বা। রাজা সাজবারই মতো চেহারা বটে।

ততক্ষণে সবাই মিলে অন্ধকারের মধ্যেই নালটাকে খুঁজছে। আমাদের দিকে কারো লক্ষ্য নেই। আমি টপ্-করে থলি থেকে টর্চটা বের করে টিপতেই দেখি ঐ তো ঝোপের গোড়ায় নালটা পড়ে আছে। রুপোর মতো ঝক্ঝক্ করছে। গুপী ছুটে গিয়ে সেটি হাতে করে তুলে নিল, তখনো একেবারে গরম হয়ে আছে।

নাল হাতে ওদের কাছে গেলাম। এতক্ষণে আমাদের দিকে ওদের চোখ পড়ল। "কোথায় পেলি বাপ্?" "ঐখানে ঝোপের গোড়ায়" গুপী ঝোপটা দেখিয়ে দিল। "বাঃ, বেড়ে আলোখানি তো বাপ। ওরাই দিয়েছে বোধ হয়। তা হলে আরেকটু দয়া করে, ঐদিকে কোথায় কামারের দোকান আছে বলে দে দিকিনি, ওটি না লাগালে তো আর যাওয়া যাবে না।"

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গুপীর দিকে তাকালাম। কামার কোথায় পাব? গুপী বললে, "চলুন, আগে একটা সাইকেল মেরামতের দোকান আছে, তাদের আমি চিনি, তারা করে দিতে পারবে মনে হচ্ছে।"

"তা হলে ওঠ্, বাপ্, ওঠ্। আর সময় নেই।"

দুজনে গাড়ির মধ্যে ভদ্রলোকটির পাশে উঠে বসলাম। মখমলের সব গদি। থিয়েটারের লোকেরা আছে বেশ। আর ভুর্ভুর্ করছে আতরের তামাকের গন্ধ। ভদ্রলোকের সঙ্গে মেলা দলিলপত্রও রয়েছে দেখলাম।

গুপী বাৎলিয়ে দিল, বাঁয়ে ঘুরে ডালহৌসী স্কোয়ারের দিকে পথ, আস্তে আস্তে চললাম। ঘোড়ার পায়ে ব্যথা লাগে। ছোট্ট গলির মধ্যে দোকান। অত বড় চার ঘোড়ার গাড়ি তার মধ্যে ঢুকবে না। ঢুকলেও আর ঘুরবার উপায় থাকবে না। ভদ্রলোক কেবলই তাড়া দিতে লাগলেন, দেরি করলে নাকি নন্দকুমার নামের একটা মানুষের প্রাণ যাবে। তখন গুপী নাল হাতে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে বলল, "এইখানেই দাঁড়ান, আমি গিয়ে যন্ত্রপাতি সুদ্ধু শম্ভুকে ডেকে আনি। তুই আয় আমার সঙ্গে।" অগত্যা দুজনেই নামলাম। শম্ভুকে ঠেঙিয়ে তুলতে একটু দেরি হল। তার পর প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস করে না। "চার ঘোড়ার গাড়ি আবার কি? এ তল্লাটে কোথাও চার-ঘোড়ার গাড়ি হয় না। 'একটা চার-ঠ্যাংওয়ালা ঘোড়াই দেখতে পাওয়া যায়

না। তা আবার চারটে ঘোড়া একগাড়িতে।" শেষটা ঘোড়ার নালটা দেখে একেবারে থ! "এই এত বড় নাল হয় কখনো ঘোড়ার? হাতি নয় তো? হাতির পায়ে আমি নাল লাগাতে পারব না গুপী দাদা, এই বলে দিলাম।"

আমরা বুঝিয়ে বললাম, "চলো না গিয়ে নিজের চোখেই দেখবে। এত প্রকাণ্ড ঘোড়াই দেখলে কোথায় যে এত বড় নাল দেখবে? চলো, তোমার লোহা-টোহা নিয়ে চলো, ওঁদের খুব তাড়াতাড়ি আছে, দেরী করলে কার যেন প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। মেলা কাগজপত্র নিয়ে চলেছেন। চলো। নাও, ধরো, নালটাও তোমার যন্ত্রের বাক্সে রাখ। ভারী আছে।"

শম্ভু জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। "বড় ঘোড়া হয় না তা বলছি না। ফতেপুরশিক্রি গিয়ে আকবরের ঘোড়ার যে বিরাট নাল দেখে এসেছি, তার পরে আর কি বলি।"

কথা বলতে-বলতে গলির মুখে এসে পড়েছি। কিন্তু কোথায় চার-ঘোড়ার গাড়ি? চারি দিক চুপচাপ থম্‌থম্ করছে, পথে ভালো আলো নেই, একটা মানুষ নেই, কুকুর নেই, বেড়াল নেই, কিছুই নেই! ডাইনে-বাঁয়ে দু দিকে যত দূর চোখ যায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

রাস্তার আলোর কাছে গিয়ে কি মনে করে শম্ভু যন্ত্রপাতির বাক্সটা খুলে নালটা বের করতে গিয়ে দেখে বাক্সের মধ্যে নালও নেই। তখন শম্ভু ফ্যাকাশে মুখে আমার দিকে চেয়ে বলল, "ও গাড়ি আরো অনেকে দেখেছে, কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না। ঐ রাজা বাহাদুর মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণ বাঁচাতে চেয়েছিল। কিন্তু সময়কালে পৌঁছতে পারে নি। তোমরা তাই দেখেছ! বলে আমাদের একরকম টানতে টানতে গুর বাড়ি নিয়ে গেল। পরদিন সকালে যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম। গুপী আর জাহাজের কথা তুলল না।

পাশের বাড়ি

ইচ্ছে না হয় ব্যাপারটা আগাগোড়া অবিশ্বাস করতে পার, স্বচ্ছন্দে বলতে পার আমি একটা মিথ্যাবাদী ঠগ্ জোচ্চোর। তাতে আমার কিছুই এসে যাবে না, যা যা ঘটেছিল সে আমি একশো বার বলব। আসলে আমি নিজেও ভূতে বিশ্বাস করি না।

বুঝলে, মার মেজো মাসিরা হলেন গিয়ে বড়লোক; বালিগঞ্জে বিরাট বাড়ি, তার চার দিকে গাছপালা, সবুজ ঘাসের লন, পাতাবাহারের সারি। মস্ত মস্ত শ্বেতপাথর দিয়ে বাঁধানো ঘর, তার সাজসজ্জা দেখে তাক লেগে যায়। তা ছাড়া মেজো মাসিদের ক্যায়সা চাল, হেঁটে কখনো বাড়ির বার হন না, জলটা গড়িয়ে খান না। কিন্তু কি ভালো সব টেনিস খেলেন, পিয়ানো বাজান। আর কি ভালো খাওয়া-দাওয়া ওঁদের বাড়িতে। আসলে সেই লোভেই আজ গিয়েছিলাম, নইলে ওঁদের বাড়িতে এই খাকি হাফপ্যান্ট পরে আমি! রামঃ!

যাই হোক, ওঁদের পাশের বাড়িটার দারুণ দুর্নাম। কেউ সেখানে পঁচিশ-ত্রিশ বছর বাস করে নি, বাগান-টাগান আগাছায় ঢাকা, দেয়ালে অশ্বত্থগাছ, আস্তাবলে বাদুড়ের আস্তানা। দিনের বেলাতেই সব ঘুপ্সি অন্ধকার, স্যাঁৎসেতে গন্ধ, আর তার উপর সন্ধেবেলায় নাকি দোতলার ভাঙা জানলার ধারে একজন টাকওয়ালা ভীষণ মোটা ভদ্রলোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তার চেহারা নাকি অবিকল এখনকার মালিকদের ঠাকুরদাদার মতো দেখতে। অথচ সে বুড়ো তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে মরে-ঝরে সাবাড়। আর মালিকরা থাকে দিল্লীতে।

নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ ভয়ের চোটে কেউ আর ওবাড়ি মুখো হয় না। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। আমি ভূত-টুতে বিশ্বাস করি না। রাতে একা অন্ধকার ছাদে বেড়িয়ে আসি। সত্যি কথা বলতে কি ঐ এক বেড়াল ছাড়া আমি কিছুতে ভয় পাই না। শুধু বেড়াল দেখলেই কিরকম গা-শির্-শির্ করে।

যাই হোক্, বিকেলে সবাই মিলে ওঁদের দক্ষিণের বারান্দায় বেতের

চেয়ার-টেবিলে বসে মাংসের সিঙাড়া, মুরগির স্যাণ্ডউইচ, ক্ষীরের পান্তুয়া, গোলাপি কেক আরো কত কি যে সাঁটলাম তার হিসেব নেই। কিন্তু তার পরই হল মুশকিল। কোথায় এবার গুটি-গুটি বাড়ি যাব, তা নয়! গান, বাজনা, নাচ কবিতা বলা শুরু হল। হাঁপিয়ে উঠি আর কি! শেষটায় কি না আমাকে নিয়ে টানাটানি! আমিও কিছুতেই রাজি হব না! মার মেসোমশাই আবার ঠাট্টা করে বললেন, "ওঃ গান-বাজনা হল গিয়ে মেয়েদের কাজ, আর উনি ভারি লায়েক হয়েছেন। আচ্ছা দেখি তো তুই কেমন পুরুষ বাচ্চা; যা তো দেখি একলা একলা ঐ ভূতের বাড়িতে, তবেই বুঝব কত সাহস!" আর সবাই তাই শুনে হ্যা হ্যা করে হেসেই কুটোপাটি!

শুনলে কথা! রাগে আমার গা জ্বলে গেল, উঠে বললাম, "কি ভয় দেখাচ্ছ আমাকে? ভূত-ফুত আমি বিশ্বাস করি না। এই দেখ গেলাম।" বলেই বাগান পার হয়ে টেনে দৌড় মারলাম। এক মিনিটে পাঁচিল টপ্‌কে ওবাড়ি!

হাঁটু ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েই মনে হল ভূত না মানলেও, কাজটা ভালো হয় নি। কিরকম যেন থম্‌থমে চুপচাপ। দুষ্টু লোকদের পক্ষেও ঐখানে লুকিয়ে থাকা কিছুই আশ্চর্য নয়।

যাই হোক টিটকিরি আমার কোনো কালেই সহ্য হয় না, কাজেই না এসে উপায়ও ছিল না। গুটি গুটি এগুলাম। তখনো একেবারে অন্ধকার হয় নি, একটু একটু আলো রয়েছে। দেখলাম দরজা জানলা ভেঙে ঝুলে রয়েছে, শ্বেতপাথরের সাদা-কালো মেঝে ফুঁড়ে বটগাছ গজিয়েছে, চার দিকে সাংঘাতিক মাকড়সার জাল। তার উপর আবার কিরকম একটা হাওয়া বইতে শুরু করেছে, ভাঙা দরজা জানলা খট্‌খট্‌ করছে, মাকড়সার জাল দুলছে, দোতলা থেকে কি অদ্ভুত সব আওয়াজ আসছে মানুষ হাঁটার মতো, বাক্সপ্যাঁটরা টানাটানি করার মতো। অথচ মস্ত কাঠের সিঁড়িটা ভেঙে নীচে পড়ে আছে, এদিক দিয়ে উপরে উঠবার জো নেই। চাকরদের ঘোরানো সিঁড়িও ভাঙা।

মিথ্যা বলব না, বুকটা একটু টিপ্‌টিপ্ করছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে আবার বাইরে এলাম। এমন সময় দেখি চাকরদের সিঁড়িটার পাশেই একটা গাছ-ছাঁটা কাঁচি হাতে একজন উড়ে মালি। উঃ, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। তা হলে বাড়িটা একদম খালি নয়, জানলায় হয়তো

ওকেই দেখা যায়, আঁকড়ে মাকড়ে হয়তো দোতলায় ওঠে।

মালি কাছে এসে হেসে বলল, "কি খোকাবাবু ভয় পেলে নাকি? আমার নাম অধিকারী, হেথায় কাজ করি।" আমি বললাম, "দুর, ভয় পাব কেন? কিসের ভয় পাব?" সে বলল, "না ভয়ের চোটে কেউ আজকাল এই পাশে আসেই না, তাই বললাম।" আমি হেসে বললাম—"যাঃ, আমি ভূত-টুত বিশ্বাস করি না।" অধিকারী লোকটা ভারি ভালো, আমাকে সমস্ত বাড়িটা দেখাল। দুঃখ করতে লাগল কর্তারা আসে না, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—ঝাড়লণ্ঠনগুলো ভেঙে পড়ছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মেহগিনি কাঠের আসবাবে সব পোকা ধরেছে, রোদে জলে মস্ত-মস্ত ছবিগুলোর রঙ চটে যাচ্ছে। বাস্তবিক কিছুই আর বাকি নেই দেখলাম। একা একজন মালি আর কত করতে পারে।

বাগানেও সব হিমালয় থেকে আনা ধুতরো ফুলগুলোতে আর ফুল হয় না, কুচিগাছ মরে গেছে, আমগাছে, ঘুণ ধরেছে, বলতে বলতে অধিকারী কেঁদে ফেলে আর কি—"কেউ দেখতেও আসে না।"

শেষে উঠোনের কোণে ওর নিজের ঘরে নিয়ে গেল। পরিষ্কার তক্‌তকে দাওয়ায় বসিয়ে ডাব খাওয়াল, ভাবছিলাম লোকেরা যে কি ভীতুই হয়। কি দেখে যে ভূত দ্যাখে ভেবে হাসিও পাচ্ছিল। তারার আলোয় চার দিক ফুট্‌ফুট্ করছিল। আমার পাশে বসে অধিকারী বলল, "কেউ এ বাড়ি আসে না কেন বল দিকিনি? সেকালে কত জাঁকজমক ছিল। গাড়িতে গাড়িতে ভিড় হয়ে থাকত, গাড়োয়ানরা, সইস্‌রা এখানে বসে ডাব খেত, তামাক খেত, চার দিক গম্‌গম্ করত।" আমি তাকে বললাম, "ওরা বলে কিনা এ বাড়িতে ভূত আছে তাই ভয়ের চোটে আসে না।" শুনে অধিকারী বেজায় চটে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "ভূত? এবাড়িতে আবার ভূত কোথায়? নিজের বাড়ির জানলায় বড়কর্তা নিজে দাঁড়ালেও লোকে ভূতের ভয় পাবে? বললেই হল ভূত। আমি তোমাকে বলছি খোকাবাবু, একশো বছর ধরে এবাড়ির কাজ করছি, একদিনের জন্যও দেশে যাই নি, কিন্তু কই একবারও তো চোখে ভূত দেখলাম না?" বলে একবার চার দিকে চেয়ে বলল, "যাই, আমার আবার চাঁদ উঠবার পর আর থাকবার জো নেই।" বলেই, সে তোমরা বিশ্বাস কর আর নাই কর, লোকটা আমার চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। দেশলাই কাঠিতে ফুঁ দিলে আগুনটা

যেমন মিলিয়ে যায়, ঠিক সেইরকম করে। চার দিকে বাতাস বইতে লাগল, দরজা-জানলা দুলতে লাগল, পুব দিকে চাঁদ উঠতে লাগল, আর আমি উর্ধ্বশ্বাসে ভাঙা সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। এই দেখ এখনো হাঁপাচ্ছি।

দামুকাকার বিপত্তি

অনেক দিন আগেকার কথা ; আমাদের গাঁয়ের দামুকাকা সন্ধে করে হাট থেকে বাড়ি ফিরছে। সেদিন বিক্রি ভালোই হয়েছে, দড়ির ঝোলাটা চাঁচাপোঁছা, ট্যাঁকটিও দিব্যি ভারী। কিন্তু তাই বলে যে দামু-কাকার মুখে হাসি ফুটেছিল সে কথা যেন কেউ মনে না করে। ওর মতো খিটখিটে রুক্ষ বদমেজাজি লোক সারা গাঁটা খুঁজে উজাড় করে ফেললেও আরেকটা পাওয়া যেত না। দুনিয়া-সুদ্ধ সকলের খুঁত ধরে বেড়ানোর ফলে এখন এমনি দাঁড়িয়েছিল যে এক-আধটা বন্ধুবান্ধব থাকা দূরের কথা, বাড়ির লোকদের মধ্যেও বেশির ভাগের সঙ্গেই কথা বন্ধ, এমন-কি, ও ঘরে ঢুকলে ওদের বিরাটাকার ছাই রঙের হুলো বিড়ালটা পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ উঠে ঘর থেকে চলে যেত। দামুকাকা সবই দেখতে পেত কিন্তু বেড়ালটাকে মুখে কিছু বলত না। অন্যদের শুধু এইটুকু বলত, "তোদের ভালোর জন্যই তোদের বলি, তা তোদের যদি এতই মন্দ লাগে, যা খুশি কর গে যা, পরে যখন কষ্ট পাবি তখন আমাকে কিছু বলিস না।"

যাই হোক সূর্য অনেকক্ষণ হল ডুবে গেছে, চারি দিক থেকে দিব্যি অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, আকাশে চাঁদ নেই, শুধু তারার আলোতে সব ঝাপসা-ঝাপসা দেখা যাচ্ছে। দামুকাকা হন্ হন্ করে এগিয়ে চলেছে, এক ক্রোশ পথ, যত শিগ্গির পার হয়ে যাওয়া যায় ততই ভালো। ভূত-প্রেতে দামুকাকার বিশ্বাস নেই, কিন্তু গোটা দেশ জুড়ে লোকগুলো দিন দিন এমনি পাজি বদমায়েস হয়ে উঠেছে যে পয়সাকড়ি নিয়ে পথে বেরুনোই দায়। বরং বড় কুমড়োটাকে বিক্রি করবার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা না করলেই ছিল ভালো।

প্রায় অর্ধেকটা পথ পেরিয়ে এসেছে, মাথাটা কিরকম যেন একটু ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, আসবার আগে হাট থেকে একটা পান মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, তাতেই কাঁচা সুপুরি ছিল হয়তো। তবে বুদ্ধিশুদ্ধি যে সবই দিব্যি চাঙ্গা ছিল, এ কথা দামুকাকা বার বার বলত।

পথের পাশেই বিরাট বাঁশঝাড়, তারার আলোয় পথের উপর তার ছায়া পড়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ঘোর অন্ধকার করে রয়েছে। ঐখানটার কাছাকাছি আসতেই দামুকাকার কেমন গা শির্‌শির্‌ করে উঠল। তবুও হাতের মোটা বাঁশের লাঠিটি বাগিয়ে ধরে সে বড়-বড় পা ফেলে এগিয়ে চলল।

ঠিক বাঁশঝাড়ের সামনা-সামনি আসতেই মনে হল সুড়ুৎ করে কালো একটা কি যেন পথের এধার থেকে ওধারে গিয়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে দামুকাকার কানে এল একটা খ্যাঁস্‌ খ্যাঁস্‌ ফ্যাঁস্‌ ফ্যাঁস্‌ শব্দ, তা সে বাদুড়ের না বেড়ালের না আর কিছুর আওয়াজ ঠিক বোঝা গেল না।

ততক্ষণে দামুকাকার বেশ বুক টিপ্‌টিপ্‌ শুরু হয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের সকলের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি না করে সঙ্গী-সাথী নিয়ে দল বেঁধে পথ চলাই যেন ভালো বলে মনে হচ্ছিল।

বাঁশঝাড়ের অর্ধেকটা পার হয়ে গেছে এমন সময় বাঁশঝাড়ের মধ্যে থেকে কে যেন একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে লাঠিগাছটি হাত থেকে কেড়ে নিল। দামুকাকা দারুণ চম্‌কে উঠে ফিরে দাঁড়াতেই তিন চারটে কালো কালো ডিগ্‌ডিগে রোগা লোক ওকে ঘিরে ফেলে, কোলপাঁজা করে তুলে নিয়ে বাঁশঝাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

দামুকাকা যে-সে ছেলে নয়। ওর বাবা ছিল সেকালের নামকরা হাজারি পালোয়ান, লাঠিখেলায় সে হাজার শত্রুকে ঘায়েল করেছিল। মেরে ফেলে নি অবিশ্যি, কারণ দামুকাকারা ছিল দারুণ বৈষ্ণব, কিন্তু এইসা ঠেঙিয়েছিল যে তারা পালাবার পথ পায় নি। তাদের মধ্যে যে কটা পেছিয়ে পড়েছিল লম্বা-লম্বা করে একটার পর একটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে তবে ছেড়েছিল। কাজেই দামুকাকাও নেহাত হেঁজিপেঁজি নয়। নড়বার-চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে সে এমনি ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাতে লাগল যে বাঁশগাছগুলো মড়্‌-মড়্‌ করে, ঠিক ভেঙে না পড়লেও, তাদের গা থেকে গোছা-গোছা পাতা খসে পড়তে লাগল, ফালা ফালা ছাল ছাড়িয়ে

আসতে লাগল।

অগত্যা লোকগুলোর মধ্যে একজন একটা কালো গিরগিরে হাত দিয়ে দামুকাকার মুখ চেপে ধরল। মুখ চেপে ধরতেই দামুকাকার নাকে এল কেমন একটা অনেকদিন বন্ধ ঘরের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গন্ধ। ও তক্ষুনি হাত-পা এলিয়ে, দুচোখ কপালে তুলে মুচ্ছো যাবার জোগাড়।

কিন্তু তারা মুচ্ছো যেতে দিলে তো! অমনি খনখনে গলায় পাঁচ-সাত জন মিলে কানের কাছে "ওঁ মোঁড়োলের পোঁ, এঁখন ভিঁমি গেঁলে চঁলবে নাঁ! আমাদের সভায় আঁগে বিঁচার কঁরে দাও, তাঁর পরে যাঁ ইচ্ছে কঁর গে যাঁও। নঁইলে এঁয়ারা যেঁ খ্যাঁচাখেঁচি কঁরে প্রাঁণ অঁতিষ্ঠ কঁরে তুঁললেন।"

তাই শুনে দামুকাকা মুচ্ছো ছেড়ে, উঠে বসে চারি দিকে তাকিয়ে একেবারে থ! বাঁশঝাড়ের মাঝখানটা একদম ফাঁকা, সেখানে একটা ধুনি জ্বলছে, আর তারই চার ধারে একদল কুচ্‌কুচে কালো মেয়ে আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি করছে, আর তাদের ঘিরে কাতারে কাতারে কালো কালো ছেলে ঝগড়া থামাবার চেষ্টা করছে আর খুব কানমলা আর চিমটি খাচ্ছে। এক বেচারা মাথায় একটা হাঁসের পালক গুঁজে একটা ঢিপির উপর বসে ছিল। দামুকাকাকে টেনে সে পাশে বসাল। দামুকাকার ততক্ষণে অনেকখানি সাহস ফিরে এসেছে, জিজ্ঞাসা করল, "তা মশাই, তা হলে আমায় কি করতে হবে?"

"কিঁছুঁ না, শুঁধু এঁই মেঁয়েগুঁলোর মঁধ্যে কেঁ যেঁ কাঁর চেঁয়ে ভাঁলো দেঁখতে সেঁটুকু বঁলে দিন, আঁমরা তো হিঁমশিম খেঁয়ে গেঁলাম। সঁব চেয়ে ভাঁলোর গঁলায় এঁই সোঁনার মাঁলা পঁরিয়ে দিন, আঁর কিছু কঁরতে হবে না।"

দুনিয়ার কোনো মেয়েকে দামুকাকা ভয় পায় না। সামনে এসে হাঁক দিয়ে বলল, "এই সুন্দরীরা, তোরা এখন চ্যাঁচামেঁচি রাখ দিকিনি! এইখানে লাইন বেঁধে দাঁড়া, আমি ভালো করে দেখি কে সব চেয়ে ভালো দেখতে।

অমনি মেয়েগুলো ঝগড়াঝাঁটি ভুলে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়ে যে যার চুল ঠিক করতে লেগে গেল, হাত-পা সোজা করতে লাগল।

তাদের রূপ দেখে দামুকাকার তো চক্ষু চড়কগাছ! প্রত্যেকটা

সবাই হাসি-হাসি মুখ করে দাদুকাকার দিকে চেয়ে আছে।

সমান হতকুচ্ছিত, কুলোর মতো কান, মুলোর মতো দাঁত, গোল-গোল চোখ, আর গিরগিরে রোগা। সবাই হাসি-হাসি মুখ করে দামুকাকার দিকে চেয়ে আছে। দামুকাকা একবার তাদের ধারালো দাঁত আর লম্বা-লম্বা নখের দিকে তাকিয়ে দেখল। আর অমনি সব ছেলেগুলো করল কি, গতিক বুঝে তফাতে সরে দাঁড়াল, ভাবখানা, একজনকে মালা দিলেই তো হয়েছে!

কিন্তু দামুকাকা যে-সে ছেলেই নয় সে তো বলেছি, এগিয়ে এসে মেয়েগুলোর দিকে ভালো করে নজর করে আরেকবার দেখে নিয়ে বলল—

"সমবেত ভদ্রমহোদয়াগণ, আমি আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করছি যে আপনারা সকলেই সব চেয়ে সুন্দরী, একজনও অন্যদের চেয়ে একটুও কম সুন্দরী নন; অতএব সকলেই এই সোনার মালা পাবার যোগ্যা!" বলেই পট্ করে মালার সুতো ছিঁড়ে ফেলে, প্রত্যেকের হাতে হাতে একটা করে সোনার পুঁতি দিয়ে, বাকিগুলো নিজের ট্যাঁকের মধ্যে গুঁজে ফেলল। মেয়েরা সবাই ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে, আর ছেলেরা সমস্ত গোলমাল এমন নির্বিঘ্নে কেটে যাওয়াতে এমনি খুশি হল যে কেউ আর কিছু লক্ষ্যই করল না।

তখন দামুকাকাও গুটি গুটি বাঁশঝাড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে সদর রাস্তা ধরে "রাম! রাম!" বলতে বলতে উর্ধ্বশ্বাসে গাঁয়ের দিকে ছুটল।

বাড়িতে ততক্ষণে কান্নাকাটি পড়ে গেছে, তার মধ্যে দামুকাকা এসে হাজির হওয়াতে সবাই মহা খুশি। গাঁয়ের লোকও মেলা এসে জড় হয়েছিল; দামুকাকা তাদের হাত ধরে বসিয়ে, মুদির কাছ থেকে চিঁড়ে বাতাসা নিয়ে এসে পেট ভরে খাইয়ে দিল। সবাই অবাকও হল যেরকম, খুশিও হল তেমনি।

এর পরে আর দামুকাকা কখনোও রাগ-মাগ করত না। হাট থেকে সবাই দল বেঁধে ফিরত।

এই গল্প শেষ করে দামুকাকা বলল, "ঐ কালো লোকগুলোর কথা আর কাউকে বলি নি বুঝলি। কি জানি গাঁয়ের লোকেরা যা ভীতু, হয়তো ভূত মনে করে ভয়-টয় পাবে, ও-পথে আর যাওয়া আসাই করবে না, তা হলে আবার হাট-ফেরত আরো আধ মাইল পথ হাঁটতে

হবে। তা ছাড়া সত্যি তো আর ভূত-ফুত হয় না।"

আমরা বলতাম, "ও দামুকাকা, ওরা ভূত নয় তো কি?" দামু-কাকা বিরক্ত হয়ে বলত, "তা আর আমি কি জানি! তবে তোদের ইস্কুলে ওদের চাইতেও অনেক খারাপ দেখতে মেয়ে পড়ে, এ আমার নিজের চোখে দেখা।"

স্পাই

আপনারা সকলেই যে আমার কথা বিশ্বাস করবেন এতটা আমি আশা করি না। সত্যি কথা বলতে কি আপনাদের মধ্যে অনেকেই ভগবানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না, ভূতের কথা তো ছেড়েই দিলাম। তবে সত্যি কথা কখনো বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অপেক্ষায় বসে থাকে না, এই ভরসাতে এই কাহিনী প্রকাশ করলাম।

নানা কারণে নামধাম গোপন করতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তাতে মূল কাহিনীর বিশেষ কোনো ক্ষতি হয় নি। ব্যাপারটা ঘটেছিল দ্বিতীয় মহা-যুদ্ধের শেষে এবং ফ্রান্সের উত্তর উপকূলে। সে-সব জায়গা আপনারাও দেখেন নি, আমিও দেখি নি, তবে আমার ছোট মামার মুখে যেমন শুনেছিলাম, সেইরকম বিবৃত করে যাচ্ছি।

ছোট মামা বলেছিলেন—

মিলিটারীতে চাকরি করে-করে যে চুল পাকিয়ে ফেলেছি সে কথা তো তোরা সকলেই জানিস। দুনিয়াতে এমন জায়গাই নেই যেখানে নানারকম সামরিক কাজে কোনো-না-কোনো সময়ে আমি যাই নি। গত মহাযুদ্ধের শেষে যাদের কাজ ছিল ফ্রান্সের আনাচে-কানাচে ঘুরে ঘুরে, যত সব বিশ্বাসঘাতক বকধার্মিকরা দেশপ্রেমিকের ভেক নিয়ে নিশ্চিন্তে গা ঢাকা দিয়ে নিজের দেশের সর্বনাশের মধ্যে থেকে বেশ দু-পয়সা করে খাচ্ছিল, তাদের ধরিয়ে দেওয়া; পাকেচক্রে পড়ে আমিও তাদের দলের সঙ্গে জড়িত ছিলাম।

এই সময়ে যে কতরকম অভাবনীয় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়েছিল সে তোরা কল্পনাও করতে পারবি না।

ভয় কাকে বলে জানিস? এমন ভয় যে মুহূর্তের মধ্যে হিমের মতো ঠাণ্ডা ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে সপ্‌সপে হয়ে যায়? তবে শোন।

একবার একটা ভূতের বাড়ির সন্ধান পেয়ে হেডকোয়ার্টারের ভারি সন্দেহ হল। সমুদ্রের ধারে নির্জন জায়গায়, বহুদিনের পুরোনো কালো পাথরের এক বিরাট বাড়ি। কতকাল যে কেউ ওখানে বাস করে নি তার ঠিক নেই। বড়ই দুর্নাম বাড়িটার। দিনের বেলাতেও সেখানে কেউ বড় একটা যাতায়াত করে না। জানিসই তো, পৃথিবীর সর্বত্রই পাড়া-গাঁয়ের লোকদের মনে এই ধরনের কুসংস্কার থাকে।

কিন্তু ব্যাপারটা শুধু গেঁয়ো গুজবে থেমে গেল না। সামরিক বিভাগের দুজন অফিসার এক জলঝড়ের সন্ধেবেলায় ঐখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাড়িটার সম্বন্ধে কানাঘুষো তারাও শুনেছিলেন এবং আমারই মতো তাঁরাও ঘোর নাস্তিক ও ভূত বা পরলোকে অবিশ্বাসী ছিলেন। সেইজন্য দিনের আলো থাকতে থাকতে গোটা বাড়িটা তাঁরা তন্ন-তন্ন করে খুঁজেও দেখেছিলেন। বলা বাহুল্য ধুলোয় ঢাকা ঘরগুলির মধ্যে ঘুরে-ঘুরে কিম্বা বাইরে বালি ও বেঁটে-বেঁটে আগাছায় ভর্তি বাগানের দিকে চেয়ে-চেয়ে কোথাও অস্বাভাবিক কিছু তাঁদের চোখে পড়ল না।

চারিদিক অন্ধকার করে রাত নেমে এল, বাড়িটার হাবভাব কেমন যেন বদলে গেল। ধরা ছোঁয়ার মধ্যে তেমন কিছু নয়। কিন্তু সমুদ্রের ও বাতাসের উদ্দাম গর্জনকে ছাপিয়ে বাড়ির ভিতরকার ছোটোখাটো নানান শব্দ যেন বেশি করে তাঁদের কানে আসতে লাগল।

প্রথমটা তাঁরা অতটা গা করে নি, কিন্তু ক্রমশ তাঁদের অস্বস্তির ভাবটা এমনি বেড়ে গেল যে, একটা শক্তিশালী টর্চের আলোতে গোটা বাড়িটা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখলেন এবং শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন যে বাড়িতে নিশ্চয়ই আর কেউ আছে। হাতে হাতে যে প্রমাণ পেলেন তাও নয়। কিন্তু কিরকম জানিস, এই মনে হল স্নানের ঘরে কলের জল পড়ছে; দোরগোড়ায় পৌঁছলেই কে যেন চট্ করে কল বন্ধ করে পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল অথচ দরজা ঠেলে বাইরে প্যাসেজে বেরিয়ে দেখা গেল কেউ কোথাও নেই, সব ভোঁ ভাঁ।

আবার শোবার ঘরের মধ্যে স্পষ্ট দেশলাই জ্বালবার খস্‌খস্ শব্দ

শুনে হুড়্মুড়্ করে সেখানে ঢুকে পড়ে দেখেন কিচ্ছু নেই, মেঝের উপর দুই ইঞ্চি পুরু হয়ে বহু দিনের জমানো ধুলো পড়ে রয়েছে।

অবশেষে দুই বীরপুরুষ অন্ধকারের মধ্যে জলঝড় মাথায় করে ছুটে বেরিয়ে পড়েছিলেন। পরদিন সকালে দিনের আলোতে ব্যাপারটাকে খানিকটা হাস্যকর মনে হলেও ঐরকম পরিস্থিতিতে যখন চারদিকে স্পাই খুঁজে বেড়ানো হচ্ছে তখন, এ বিষয়ে আরেকটু অনুসন্ধান করাই উচিত বলে সকলের মনে হল।

এই ব্যাপারেই তদন্ত করবার জন্য আমরা জনা পাঁচেক সামরিক বিভাগের ঘুঘু অফিসার, সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র, চোর ধরার নানারকম ফাঁদ আর ফাঁসজাল, বড়-বড় টর্চ ও শেড-লাগানো লণ্ঠন আর বলা বাহুল্য ঝুড়ি ভরে আহার্য ও পানীয় নিয়ে, সন্ধ্যা নামবার পর রওয়ানা হলাম।

বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে জিপ গাড়িটা রেখে, পায়ে হেঁটে, নিঃশব্দে ও যথাসম্ভব গোপন ভাবে, ভূতের বাড়িতে উপস্থিত হলাম।

ভয়-টয় পাবার ছেলেই ছিলাম না আমরা। পৌঁছেই ঢাকা আলো নিয়ে সারা বাড়িটাকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে নিলাম। তার পর এক-তলায় সিঁড়ির পাশের বড় ঘরটার এক ধারের খানিকটা ধুলো ঝেড়ে নিয়ে, মেঝের উপরেই পা মেলে দিয়ে বসে পড়লাম। বিরাট ঘর, উঁচু ছাদ দেখাই যায় না, কার্নিশে কারিকুরি করা, মস্ত গুহার মতো চিমনি, তাতেও কত কারুকার্য, আর তার মধ্যেই চারটে মানুষ অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারে। বদমাইসদের আস্তানা গাড়বার এমন উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পাওয়া দায়।

পাছে ভয় পেয়ে চোর পালায়, তাই নড়ছি চড়ছি পা টিপে-টিপে; নিশ্বাস প্রায় বন্ধ করে রেখেছি, একটা সিগারেট পর্যন্ত ধরাচ্ছি না, আলোতে বা গন্ধে পাছে জানান দেয়। এমনি ভাবে বসে আছি তো বসেই আছি।

এইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না, এমন সময় খট্ করে কে যেন দোতলার একটা দরজা খুলল, সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ হাত থেকে দরজা ফস্কে গেলে বাতাসে যেমন দড়াম্ করে বন্ধ হয় সেইরকম একটা আওয়াজ হল। আমরা সতর্ক হয়ে উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে অতি সাবধানে কে যেন নেমে আসছে। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দরজার আড়ালে

এসে দাঁড়ালাম। সিঁড়ির শেষ দুটো ধাপ ক্যাঁচ্ কোঁচ্ করে উঠল, তার পর স্পষ্ট দেশলাই জ্বালবার শব্দ। অন্ধকার ভেদ করে আমাদের পাঁচ জোড়া চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল, আবছায়াতে যেন দেখতে পেলাম সে হাত আড়াল করে চুরুট ধরাচ্ছে। পাঁচজনে হঠাৎ টর্চ জ্বেলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

সিঁড়ির গোড়ায় ফ্যাকাশে মুখে গোল-গোল চোখ করে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন পাড়াগাঁয়ে ভদ্রলোক। হাসব না কাঁদব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তার পরনে চেক-কাটা ছাই রঙের ঝোলাঝোলা একটি ড্রেসিং গাউন। মাথায় একটা কালোমতো তেলচিটে ভেল্‌ভেটের গোল টুপি, পায়ে তালি দেওয়া পুরোনো স্লিপার, মুখে একটা সরু লম্বা জঘন্য ময়লা পাইপ, এক হাতে তামা দিয়ে বাঁধানো একটা দেশলাইয়ের বাক্স, অন্য হাতে কাঠি।

নিরীহ গোবেচারি ভদ্রলোক, হাত দুখানি ভয়ে থর্‌থর্ করে কাঁপছে. চোখে হঠাৎ অত আলো পড়াতে যেন ধাঁধা লেগে গেছে, সর্বাঙ্গে ভয়ের ছাপ।

আমরা পাঁচজনে কাণ্ড দেখে অট্টহাস্য করে উঠলাম। ঘাড় ধরে তাকে টেনে ঘরের মধ্যে এনে, উজ্জ্বল সব আলো জ্বেলে তাকে প্রশ্ন করতে লেগে গেলাম। এতক্ষণ পর স্বাভাবিক কণ্ঠে কথা বলতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম।

লোকটি কিন্তু বোকা সেজে রইল। আম্‌তা-আম্‌তা করে নাম বললে, ফিলিপ বারো। বার বার বললে, এই বাড়িতেই বাস করে। তার চেয়ে বেশি কিছু বের করা গেল না, কেমন যেন হকচকিয়ে গেছে, পরিষ্কার চিন্তা করতে পারছে না।

তখন আমরা বুদ্ধি করে খাবারের ঝুড়ি খুললাম। অত খাবার দেখে তার চোখ দুটো চক্‌চক্ করে উঠল। যুদ্ধের মধ্যে ও পরে ও-সব দেশের লোকেদের সে যে কি কষ্ট, সে আর তোদের কি বলব। হয়তো দু-তিন বছরের মধ্যে এত খাবার একসঙ্গে দেখেই নি। তার সারা মুখে দারুণ একটা খিদে-খিদে ভাব।

তবুও লোকটা যে একটা স্পাই এ বিষয়ে কারো মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। এইরকম ভীতু চেহারার মানুষরাই ভালো স্পাইগিরি করতে পারে। তাদের আসা-যাওয়া কারো নজরে পড়ে না, কেউ

তাদের সন্দেহ করে না। কিন্তু এইরকম একটা ক্ষুধার্ত ক্যাংলা স্পাই জন্মে কেউ দেখি নি।

যাক ভূতের বাড়ির রহস্যটা এতক্ষণে খানিকটা খোলসা হল বলে সকলে মহা খুশি হয়ে তাকে পেড়াপীড়ি করে খাওয়াতে লাগলাম। আর সেও অকাতরে থাক-থাক স্যাণ্ডউইচ বিস্কুট আর ফ্লাস্ক থেকে চা গিলতে লাগল। অবিশ্যি আমরা নিজেরাও যে উপোস করে রইলাম তা নয়। বাইরে সমুদ্রের উপর দিয়ে হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বইছে, মস্ত-মস্ত ঢেউ এসে পাহাড়ের উপর আছড়ে পড়ছে আর ঘরের ভিতর লণ্ঠনের কোমল আলোতে খাবারদাবার নিয়ে সকলে গোল হয়ে বসে দিব্যি একটা মজলিসি আবহাওয়া গড়ে তুলেছে।

লোকটার কাছ থেকে কিন্তু সত্যিই বিশেষ কিছু খবর পাওয়া গেল না। তার পিছনে কে আছে, কি ধরনের তাদের কাজের পদ্ধতি সে বিষয়ে হ্যাঁ না কিছুই বলে না। শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন লুই বললেন, 'ব্যাটা হয় নিরেট বোকা, নয় দারুণ চালাক। ওকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া ছাড়া তো উপায় দেখছি না।'

আমার নিজের লোকটার উপর কেমন একটা মায়া পড়ে যাচ্ছিল। এরকম একটা অসহায় নিরবলম্ব ভাব কখনো আমার চোখে পড়েছে বলে মনে হয় না। নিরীহ পাড়াগেঁয়ে বেচারা, ভয়েই আধমরা। যদি সত্যিই স্পাইও হয়, তবুও সে যে নিজের তাগিদে হয় নি, অপর কেউ ভয় দেখিয়ে জোর জবরদস্তি করে দলে বাগিয়ে নিয়েছে, এইরকম আমার মনে হতে লাগল। আর সেইজন্যই ওকে হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া দরকার, সেটাও বুঝতে পারলাম।

শেষপর্যন্ত ক্যাপ্টেন লুই বললেন, 'তুমি তো নিজের কোনো পরিচয় দিতে পারছ না। নাম বলছ অথচ কি করে তোমার দিন চলে বুঝি না; আত্মীয়-স্বজন কে কোথায় বলতে পারছ না।' লোকটা দুহাতে মুখ ঢেকে বললে, 'নেই, তারা কেউ নেই।' তার সর্বাঙ্গ থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল। ক্যাপ্টেন লুই-এর দয়া-মায়া ছিল, তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন, 'তা বললে চলবে না, তুমি যে স্পাই নও তাই-বা কে বলবে?'

সে হঠাৎ মাথা তুলে অনেকখানি স্পষ্ট করে বলল—'স্পাই? কার স্পাই? কে আছে যার জন্য স্পাই হব?'

'আচ্ছা, এখন হেডকোয়ার্টারে চলো তো। যদি স্পাই নাই হও তবে

ক্যাপ্টেন লুইও ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন ।

তো ভালোই। কেউ তোমাকে কিছু বলবে না।

কিন্তু সে উদ্‌ভ্রান্তের মতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ অন্ধভাবে সিঁড়ির দিকে দৌড় মারল। ক্যাপ্টেন লুইও সঙ্গে-সঙ্গে 'আরে, ধর, ধর' করে ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। সে একবার চারিদিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে, 'না, না, না, এটা আমার বাড়ি। এখান থেকে আমি কোথাও যাব না,' এই বলে, কি আর বলব তোদের, সেই আমাদের পাঁচজনের ঔৎসুক্য-ভরা চোখের সামনে, সেই লণ্ঠনগুলির উজ্জ্বল আলোতে, মুহূর্তের মধ্যে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ক্যাপ্টেন লুই এর মনে হল বুঝি বাতাসকে আলিঙ্গন করছেন।

বুঝতেই পারছিস আমরা আর এক দণ্ডও অপেক্ষা না করে, জিনিসপত্র সব সেখানে ফেলে রেখে, টলতে-টলতে কোনোরকমে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মিলিটারি ব্যাপার ঐখানে শেষ হয়ে যেতে পারে না। পরদিন লোকজন গিয়ে জিনিসপত্র উদ্ধার করে আনল। বহু অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে ও বাড়ি খালি পড়ে আছে। মালিকরা ঐ সময়ে নির্বংশ হয়ে গিয়েছিলেন।

নটরাজ

আমাদের রাঁধবার লোকটির খাসা রান্নার হাত থাকলেও একটা মুশকিল ছিল যে রান্নাঘরে সে কিছুতেই একা থাকবে না। বলুন তো আজকালকার দিনে এ-সব নবাবী করলে কেমন করে চলে? অথচ দিশি রান্নাছাড়াও সে আশ্চর্য সব বিলিতি রান্না জানত; পুদিনা দিয়ে এক-রকম অম্বল করত, বাতাসার সঙ্গে তার কোনো তফাত ছিল না। দুধ দিয়ে আর এক চামচ মাখন দিয়ে এমন চিংড়ি মাছ করত সে না খেলে বিশ্বাস হয় না। বন্ধুবান্ধবরা ওর তারিফও করত যেমন, হিংসাও করত তেমনি। এখন ঐ একটি অসুবিধার জন্য সব না পণ্ড হয়ে যায়।

আমি বললাম "নটরাজ, তা বললে চলবে কেন, আজকাল একটা লোক পুষতেই ট্যাঁক গড়ের মাঠ! তোমার জন্য আবার একটি সঙ্গী এনে

দিতে হবে, এ বাপু তোমার আব্দার। চারটি মনিষ্যির রান্নার জন্য দু-দুটো লোক এ কে কবে শুনেছে?"

নটরাজ মাথা নিচু করে বলল, "ঠিক তা নয়, মা। অন্য লোকটার রান্না না জানলেও চলবে। ঐ সামান্য কাজ, সে আমি একাই করে নিতে পারি। সেজন্য নয়।" অবাক হয়ে বললাম, "তবে?"

নটরাজ মাথা চুলকে বললে, "আসল ব্যাপার কি জানেন মা, রান্নাঘরে একা আমি কিছুতেই থাকতে পারব না।"

"তোর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। একা আবার কি? সন্ধেবেলা টিকারামের সেরকম কাজ থাকে না, সে তো স্বচ্ছন্দে ওখানে বসতে পারে। ভূতের ভয় আছে বুঝি? পাড়াগাঁর লোকদের ঐ এক মুশকিল। আসলে যে-সব ভয়ের জিনিস, এই যেমন চোর-ছ্যাঁচড়, তার ভয় নেই, দিব্যি পিছনের দরজা খুলে রেখে বিড়ি কিনতে যাবে, অথচ ভূত আছে কি নেই, তারই ভয়ে আধমরা। এটা কি ঠিক উচিত হল বাছা? গাঁ থেকে চলে এসেছিসও তো বহুদিন। আর দিনের বেলায় ভূতের উপদ্রব কে কবে শুনেছে?"

নটরাজ কখনো মখোমুখি উত্তর দেয় না। নরম গলায় বললে, "গাঁয়ে থাকতে কিছুকেই ভয় করতাম না মা। গাঁ ছেড়ে এসেই তো যত বিপদ।"

আমি চালের বাক্সের উপর বসে পড়ে বললাম, "ব্যাপারটা একটু খোলসা করেই বল না, দেখি কি করতে পারি।"

যেন একটু খুশি হয়ে নটরাজ বললে, "মানুষ সাথী না হলেও চলবে, মা।" শুনে আমি দারুণ চমকে ওঠাতে আরো বলল, "মানে একটা কুকুর হলেও হবে, মা! একটা বড় দেখে কুকুর হলেই সব চেয়ে ভালো হয়।" আমি অবাক হয়ে বসেই রইলাম, নটরাজ বলল, "বুঝলেন মা বাড়ি আমাদের অজয় নদীর ধারে, ইলেম বাজারের পাশে। বোলপুর সিউড়ির বাস ওর ধার ঘেঁষে যায়। আমাদের মা মহাময়ী এমনি জাগ্রত দেবতা, মা, যে গোটা গাঁটাকে বুকে আগলে রেখেছেন, কারো চুলের ডগা ছোঁয় ভূত পিরেতের সাধ্য কি। ভূতের ভয় কোনোদিনই ছিল না।

"কিন্তু বাড়িতে খাওয়া জুটত না তাই নকুড়মামার সঙ্গে কলকাতায় এলাম। ঐ যে মিশিন রো, ঐখানে এক বাঙালী সাহেবের বাড়িতে নকুড়মামা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। শুনতে বেশ ভালোই চাকরি মা।

সাহেবের পরিবার নেই, দিনভর বাইরে বাইরে থাকে, দুপুরে আপিসে খায়, চাপরাশি পাঠিয়ে দেয়, আমি রেঁধে-বেড়ে টিপিনকারিতে গুছিয়ে দিই, সাদা ঝাড়নে পিলেট কাঁটা চামচ বেঁধে দিই ; ওদিকে সৌখীনও ছিল মন্দ না। আর সারাটা দিনমান বাড়ি আগলাই ঝাড়-পোঁচ করি, খাই-দাই। আবার বিকেলে রাতের জন্য রাঁধাবাড়া করি, সাহেবের চানের জল গরম করে রাখি। রাত নটা দশটার সময় সাহেব আসে, প্রায়ই দুটো-একটা বন্ধুবান্ধবও সঙ্গে আনে, তারাও খায়-দায়।

"সারাদিন বেশ যেত মা, ঐ রাতেই যত মুশকিল। সাহেব লোক খুব মন্দ ছিল না, মা, দয়ামায়াও ছিল, আমায় এটা ওটা দিত, দেশের চিঠিপত্তর এল কি না জিজ্ঞাসা করত। কিন্তু বোধ হয় নেশা-ফেশা করত ওরা সবাই, নিশ্চয় করত, নইলে হঠাৎ হঠাৎ এমন সব অদ্ভুত ফরমায়েস করত যে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যেত।

রাতে কিরকম গুম্ হয়ে থাকত। আমার দিকে চাইত যখন চোখ দুটোকে দেখে মনে হত, যেন ছেলেদের খেলার দুটো গোল গোল মার্বেল। কিরকম একদৃষ্টে চেয়ে থাকত, কথা বলত না, আমার বুকটা টিপ্‌টিপ্ করতে থাকত। ভাবতাম চলে যাই, আবার দেশের বাড়ির অভাব অনটনের কথা মনে করে থেকে যেতাম। অন্য সময় সত্যি লোক ভালোই ছিল। রাতে বদলে যেত।

"আমরা মিশিন রো'র ঐ আদ্যিকালের পুরোনো বাড়িটার তিন তলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকতাম। রান্নাঘরের পাশে চাকরদের সিঁড়ি, তারই ওধারে পাশের ফ্ল্যাটের রান্নাঘরের দরজা। তাইতেই আমার সুবিধা হয়ে গিয়েছিল। ঐখানে এমন ভালো এক মেম থাকত মা, আধ বুড়ি, সবুজ চোখ, লাল চুল, দিব্যি বাংলা বলে, আর মা, দয়ার অবতার।" বলে নটরাজ বোধ হয় তারই উদ্দেশ্যে বার বার নমস্কার করল।

"বিপদে পড়লেই আমাকে বাঁচাত। দোরগড়ায় একবার দাঁড়ালেই হল। কি করে যেন টের পেয়ে যেত, অমনি দরজা খুলে বেরিয়ে আসত।

" 'আজ আবার কি চায়? সাদা সির্কা? তা অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? এই নে।' বলে হয়তো একটা গোটা বোতলই দিল আমার হাতে। কাজ শেষ হলে কিছু বাকি থাকলে ফিরিয়ে দিতাম।

"কিম্বা হয়তো "কি হল আবার? গুলাস্? আয় আমার সঙ্গে।'

ওদের রান্নাঘরটি মা সাক্ষাৎ স্বগ্গ! কি ছিল না সেখানে? যা দরকার দেরাজ খুলে, ডুলি খুলে বের করে দিত। সব ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করত। বাসনের পিঠে মুখ দেখা যেত। ঐখানেই মা ওনার কাছেই আমার রান্না শেখা, সকালে কি দিনেরবেলায় কত যত্ন করেই যে শেখাত, মা। নইলে আর পাড়াগাঁয়ের মুখ্যু ছেলে আমি, এত সব জানব কোত্থেকে!

"তাই বল নটরাজ, আমি বলি এত ট্রেনিং কোথায় পেলি? তাপ্পর, ও চাকরি ছাড়লি কেন?"

"ছেড়েছি, কি আর সাধে, মা। একটি বচ্ছর এক নাগাড়ে কাজ করেছিলাম, একবারও দেশে যাই নি। কলকাতায় ঐ এক নকুড়মামাকে চিনি, তা সেও আমাকে চাকরিতে ঢুকিয়ে দিয়ে এমনি ডুব মারল যে বচ্ছরান্তে তার আর পাত্তা পেলাম না। কেউ আমার সঙ্গী-সাথী ছিল না, মা। বয়সটাও বেশি ছিল না, এমনি দারুণ মন খারাপ হয়ে যেত, মা, সময়ে সময়ে, যে মাঝে মাঝে দুপুরে হাঁটুর উপর মুখ গুঁজে কান্নাকাটি করতাম!

"একদিন মেম টের পেয়ে আমাকে একটি সুন্দর ছবির বই দিয়ে গেল বিলেত দেশের কত ছবি। পেরথম পাতায় মেমের নাম ছিল, সে তো আমি পড়তে পারি নে, বলেছিল ওটা কেটে আমার নাম লিখে নিতে। করেছিলামও তাই। কিন্তু ও চাকরি আমার আর বেশিদিন টিকল না।

"একদিন রাত্রে সাহেবকে খাইয়ে-দাইয়ে রান্নাঘরে এসে বইটা ঘাঁটছি, আর থেকে থেকে মেমের দরজার দিকে তাকাচ্ছি, ভোরের চায়ের দুধ ছিঁড়ে গেছে, তাই ও আমায় এক কাপ দেবে বলেছিল। এমনি সময় বোধ হয় আমাকে ডাকাডাকি করে কোনো সাড়া না পেয়ে, সাহেব এসে হাজির।

আমার তো হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছেন। রাগে সাহেবের মুখ লাল হয়ে উঠেছে, রাতে ঐরকম সামান্য কারণেই রেগে চতুর্ভুজ হয়ে উঠত। কি একটা বলতে যাবে, এমনি সময় বইটার উপর চোখ পড়ল!

"অমনি কি বলব মা, ওর মুখটা দেয়ালের মতো সাদা হয়ে গেল, দেহটা কাঁপতে লাগল। পাগলের মতো ছুটে এসে আমার গলা টিপে ধরে ঝাঁকাতে লাগল, 'বল হতভাগা, ও বই কোথায় পেলি?' অনেক কষ্টে বুঝিয়ে বলাতে, কিরকম অদ্ভুত করে হেসে বলল, 'আমার সঙ্গে চালাকি! ওখানে মেম থাকে না আরো কিছু! ওটা আগাগোড়া গুদোমখানা,

মেমটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে, সাহেবের হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে...

আমাদেরই অফিসের গুদোমখানা, কেউ থাকে না। বল্ কে তোকে এ-সব শিখিয়েছে? নইলে মেরেই ফেলব। জানিস দরকার হলে মানুষ মারতেও আমার বাধে না।'

"ভয়ে কেঁদে তার পায়ে পড়ছিলাম, মা। বার বার বলতে লাগলাম ঐ রান্নাঘরে খোঁজ করতে, মেম নিশ্চয় স্বীকার করবে ও বই ও-ই দিয়েছে। তাই শুনে রাগে অন্ধ হয়ে সাহেব ছুটে গিয়ে দরজায় দমাদম্ কীল মারতে লাগল। কীলের চোটে দরজার ভিতরকার ছিটকিনি খসে গেল, দরজা খুলে গেল।

অবাক হয়ে দেখলাম, কোথায় ঝক্‌ঝকে রান্নাঘর! এ ঘরের ছাদ থেকে মেজে অবধি পোকা খাওয়া কাগজপত্রে ঠাসা।

সাহেব আমাকে ঘাড় ধরে এ ঘর থেকে ও ঘর নিয়ে ঘুরিয়ে আনল। কোথাও মানুষের বাসের কোনো চিহ্নই নেই মা, শুধু খাতাপত্র, কাগজের তাড়া।

তার পর আবার ফিরিয়ে এনে, ওদের রান্নাঘরের দরজা ভেজিয়ে, আমাকে তেমনি করে ধরে আমাদের রান্নাঘরে এসে ঢুকল। এতক্ষণ একটি কথাও বলে নি। কিন্তু মা, তার ঐ মার্বেল পাথরের মতো চোখের কথা মনে করে এখনো গা শিউরে ওঠে। ঐরকম অদ্ভুত করে আমার দিকে চেয়ে, বইটাকে আমার মুখের কাছে তুলে ধরে, চাপা গলায় বলল, 'শেষবারের মতো জিজ্ঞাসা করছি, কে তোকে আমার পেছনে লাগিয়েছে? এ বই কোথায় পেলি? মেমের কথা কে বলেছে?' সত্যি বলব মা, তখুনি আমি ভয়ের চোটেই মরে যাচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময়, ক্যাঁচ্ করে অন্য রান্নাঘরে দরজাটা খুলে গেল; সবুজ চোখ, লাল চুল আধা বয়সী মেমটি আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসে, সাহেবের হাত থেকে বইটা টেনে নিয়ে আমার দিকে চেয়ে একটু হেসে আস্তে আস্তে আবার ঐ রান্নাঘরে ঢুকে গেল, দরজাটা আবার ক্যাঁচ্ করে বন্ধ হয়ে গেল। আর সাহেবও গোঁ গোঁ শব্দ করে অজ্ঞানই হয়ে পড়ে গেল, না মরেই গেল সে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম না; হুড়্‌মুড়্ করে ঐ পিছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সোজা হাওড়া স্টেশনে গিয়ে বিনা টিকিটে একেবারে দেশে চলে গেলাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, "তার পর সাহেবের খবর নিলি না?'
নটরাজ বললে, "ও বাবা! আমি আর সেখানে যাই! পাঁচ বচ্ছর দেশে বসে রইলাম। রোজই ভয় হত ঐ বুঝি পুলিশ এল সাহেব কি

করে মন্ত্র জিজ্ঞাসা করতে। কিন্তু সে মরে নি নিশ্চয়।

তার পর দেশে খাওয়া জোটে না মা, তাই আবার এলাম কাজ করতে। এইখানেই মন বসে গেছে মা, যদি একটা বড় দেখে কুকুর রাখেন তো থেকেই যাই।

আমি চিন্তিত হয়ে বললাম, "কুকুরে কি ওনাদের ঠেকাতে পারে রে।" নটরাজ জিব কেটে বললে, "ছি ছি। ও কথা ভাবলেও পাপ। ওনাদ্র জন্য কুকুর নয়, বলি কি সাহেবটা যদি আমার খোঁজ পায় তাই।"

কর্তাদাদার কেরদানি

ছোটবেলা থেকে আমার মেজো কর্তাদাদামশায়ের গুণগান শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যেত। ছুটি-ছাটাতে যখনি ডায়মণ্ডহারবারে বাবাদের বিশাল পৈতৃক বাড়িতে যেতাম বুড়ো-ঠাকুমা, ঠাকুমা আর মা-পিসিমাদের মুখে মেজো কর্তাদাদামশায়ের প্রশংসা আর ধরত না। ঐ অত বড় বাড়ি, বাড়ি ভরতি কালো কালো কাঠের বিশাল বিশাল আসবাব, দেয়াল জোড়া চটা ওঠা গিল্‌টি ফ্রেমের বিরাট আয়না, একশো বিঘে জমি, তার মধ্যে পাঁচটা কালো জলে ভরা প্রকাণ্ড পুকুর, তাতে মাছ কিল্‌বিল্‌ করত, আম-কাঁঠালের বন, নারকেল বাগান, বাঁশ-বন, সবই ছিল যেন সোনার খনি আর সবই নাকি হয়েছিল ঐ মেজো কর্তাদাদামশায়ের দয়ায়। প্রশংসা করবে না কেন লোকে? ছেলেপুলে ছিল না যে ভাগ বসাবে। বিয়েই করেন নি যে শ্বশুর বাড়ির লোকরা এসে হাঙ্গামা বাধাবে। তিন পুরুষ ধরে সবাই মিলে নিশ্চিন্তে নির্বিঘ্নে, ছাপর খাটে অষ্টপ্রহর হাত-পা মেলে, কেবল খেয়েছে আর ঘুমিয়েছে আর লোহার সিন্দুক থেকে নগদ টাকা বের করে নিয়ে খরচ করেছে।

অবিশ্যি এক পুরুষ পেরোবার আগেই লোহার সিন্দুকের টাকাকড়ি চাঁচাপোঁছা, তখন আরো লোহার সিন্দুক থেকে গয়নাগাঁটিগুলো বের করে ওয়ারিশদের মধ্যে পঞ্চায়েতের মোড়ল এসে সমান-সমান ভাগ করে দিয়ে গেল। তবু কি আর সবাই খুশি হল। আমাদের বুড়ো-ঠাকুমা বলতেন কিন্তু

ঐ থেকেই কান্তি মোড়লের আত্মার সদ্গতিও হয়েগে ছিল। কারণ ঐ গয়নার ডাঁই দেখে অবধি তার চোখ থেকে রাতের ঘুম বিদায় নিয়েছিল। তা ছাড়া কোনো কোনো ছোকরা ওয়ারিশ ভাগাভাগিতে অসন্তুষ্ট হয়ে বাঁশপেটা করে বুড়োকে গাঁ ছাড়া করবে বলেও হয়তো ভয় দেখিয়ে থাকবে। মোট কথা শেষপর্যন্ত সে বিষয়-আশয় ছেলেপুলেদের বুঝিয়ে দিয়ে লোটা-কম্বল ও গিন্নিকে নিয়ে কাশীবাসী হয়েছিল। বলা বাহুল্য সেখানে কিছু পয়সাকড়ি ও গঙ্গাতীরে ছোট একটা বাড়ি আগে থাকতেই মজুত করা ছিল।

সে যাই হোক গে, গয়নার্গাটিও কারো চিরকাল থাকে না। শেষে এমন দিন এল যখন একটা একটা করে সেগুলো বেচে বেচে, তারও কিছু অবশিষ্ট রইল না। তখন ফলের বাগান, পুকুরের মাছ জমা দেওয়া ছাড়া গতি রইল না। তার পর সেগুলোকেও একে একে বেচে দিতে হল। মোট কথা আমরা যখন ছোটবেলায় ছুটি-ছাটাতে ডায়মণ্ডহারবার যেতাম তখন দেখতাম আমাদের বলতে আছে শুধু বিশাল এক পোড়ো বাড়ি, তার মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সব কালো হয়ে যাওয়া খাট আলমারি, যা কেউ কিনতে তো রাজি হয়ই না, দিতে চাইলেও নিতে চায় না, কারণ কারো দরজা দিয়ে ও-সব ঢুকবে না।

আর ছিল দেয়াল জোড়া রঙচটা আয়না, যাতে মুখ দেখে কারে সাধ্যি, আর একটা পুকুর, তাও শ্যাওলাতে ঢাকা, কিন্তু নাকি হাঙরের মতো বড়-বড় মাছে ভরা। আর ছিল বিশাল পোড়ো বাড়িটাকে ঘিরে শতখানেক আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, বাতাবিলেবু, তেঁতুল, নারকেল, জামরুলের গাছ আর আগাছায় ভরা বিঘে পাঁচেক জমি। সেগুলো নাকি এমনিভাবে দলিল দিয়ে লেখাপড়া করা যে কোনোকালে কেউ বেচতে পারবে না। বুড়ো-ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, তা না হলে ওগুলোরও ল্যাজের ডগা বাকি থাকত না। অথচ মেজো কর্তাদাদামশাই নাকি মহা পাজি ছিলেন। পড়াশুনোর নাম নেই; দিনরাত পাড়ার যত ডানপিটে বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো ছোকরা জুটিয়ে, আজ এর পুকুরে মাছ মারা, কাল ওর আম বাগান সাফাই করা আর যেখানে যত কুস্তির আখড়া আর গান-কেত্তন, যাত্রা-নাটকের আস্তানায় গিয়ে পাল্লা দেওয়া। তারই মধ্যে হঠাৎ একদিন ওদের দলকে দল নিখোঁজ হয়ে গেল। দুদিন একটু সোরগোল, মা-ঠাকুমাদের অল্প একটু আপসোস, তার পর গাঁয়ে এমনি

গভীর শান্তি বিরাজ করতে লাগল যে শোক-দুঃখ ভুলে দুবেলা সবাই শিবঠাকুরকে দুহাত তুলে ধন্যবাদ জানাত।

গাঁয়ের দেবতা বুড়ো-শিবতলার শিবঠাকুর। সেকালে প্রতি বছর পুজোর সময় ঘটা করে শিবতলায় আলাদা করে ঐ শিবঠাকুরের পুজো হত। 'শিবঠাকুরের বিয়ে' নাটক হত। গাঁয়ের মাতব্বররা অভিনয় করতেন। তাই নিয়ে মেজো কর্তাদাদামশাইয়ের কি রাগ। নারদের পার্ট কখনো ঐ আধবুড়োরা করতে পারে নাকি? নারদ সাজত কান্তি মোড়লের ঠাকুরদা জগা মোড়ল। সে কি নাচতে পারে, না গাইতে পারে? নারুদে চেহারা ছিল একটারও? মোটকথা মেজো কর্তাদাদামশায়ের নারদ সাজার বড় সখ ছিল। তিনি ফেরারি হবার পর তাই নিয়ে দু-চারজনাকে আক্ষেপ করতেও শোনা যেত। নাকি অদ্ভুত ভালো অভিনয় করতে পারতেন। চমৎকার দেখতে ছিলেন, খাসা গানের গলা ছিল আর নাচতেন যেন কার্তিকের ময়ূরটি। বছরের পর বছর কেটে যেতে লাগল, মেজো কর্তাদাদামশাইয়ের কথা লোকে একরকম ভুলেই গেল। তাঁর কপালের মাঝখানে যে তৃতীয় নেত্রের মতো একটা বড় তিল জ্বল্‌জ্বল্‌ করত তা পর্যন্ত কারো মনে রইল না। তার মধ্যে আমাদের বাড়ির অবস্থা ক্রমে পড়তে পড়তে আর কিছুই রইল না। ঐ যে কান্তি মোড়লের কথা বললাম, তার ঠাকুরদা জগা মোড়লের তখন তেজারতি ব্যবসার ভারি বোলবোলা। আমাদের বাড়ির অর্ধেক জিনিসপত্র তারই কাছে বাঁধা দেওয়া, মায় আমাদের ও গ্রামের অর্ধেক লোকের জমিজমার দলিলপত্র সুদ্ধ। থেকে থেকে জগা বুড়ো ভয় দেখাত, টাকা শোধ না করলে সম্পত্তি অধিকার করবে।

এমন সময় কথা নেই বার্তা নেই, একদিন পুজোর সময় 'শিব-ঠাকুরের বিয়ে' নাটক দেখতে সকলে ব্যস্ত, এমন সময় জগা মোড়লের বাড়িতে ডাকাত পড়ল। তারা সিন্দুক ভেঙে গয়নাগাঁটি, আর তার চেয়েও সাংঘাতিক কথা, ইস্টিলের ক্যাশ বাক্স বোঝাই বন্ধকী দলিলপত্র নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। আর কোনোদিনও তাদের টিকিটিও দেখা গেল না। জগা সেই যে শয্যা নিল, আর উঠল না। কিন্তু গ্রাম সুদ্ধ সবাই বুড়ো শিবঠাকুরকে বিশেষ পুজো দিয়ে এল। আমাদের সকলের জমিজমা বেঁচে গেল। ও-সব যে বাঁধা দেওয়া জিনিস তার কোনো প্রমাণই রইল না।

আরো কয়েক বছর পরে ঘোড়ার ডাকে মাসে মাসে আমাদের গাঁয়ের ফেরারি ছেলেদের সবার বাড়িতে পয়সাকড়ি আসতে লাগল। একবার আমার বুড়ো-ঠাকুমার নামে এক ছড়া মুক্তোর মালা আর একটি চিঠি এল। তাতে লেখা মেজো কর্তাদাদামশাই জাহাজে নাবিক হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নৌকোডুবি হয়েছিলেন। কিন্তু রাখে হরি মারে কে, একটা ভাসমান নারকেল গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে জোয়ারের জলের সঙ্গে তিনি একটা নির্জন দ্বীপে গিয়ে পড়লেন। দ্বীপের উপকূলে ঝিনুকের ছড়াছড়ি। একেকটা খোলেন আর ভিতর থেকে এই বড় একটা করে মুক্তো বেরোয়। খিদের চোটে পোকাটাকে খেয়ে ফেলেন আর মুক্তোটিকে কোঁচড়ে বাঁধেন। এমনি করে দুটি বছর কাটাবার পর আরেকটা জাহাজ তাঁকে উদ্ধার করে। মুক্তোর কথা কাউকে বলেন নি। দেশেও ফেরেন নি। কিন্তু পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে মুক্তো বেচার টাকা বাড়িতে পাঠিয়েছেন। এর বেশি যেন কেউ আশা না করে। এখনো কি জগা মোড়ল নারদ সাজে? ইতি···

ঠাকুমা বললেন চিঠিটা যে জাল নয়, তার প্রমাণ চিঠির ঐ শেষের লাইনটি। নইলে, মেজো কর্তা কি আর লিখতে শিখেছিল যে অতবড় একখানা চিঠি ফাঁদবে। কাউকে দিয়ে লিখিয়েছিল।

সেবার আমরা ঠিক করলাম 'শিবঠাকুরের বিয়ে' নাটক আমরা করব। হলদে হয়ে যাওয়া নাটকের পালার কপি খুঁজে বের করলেন ঠাকুমা। পোড়ো বাড়ির আগাছা কিছু পরিষ্কার হল, পুরোনো পুজোমণ্ডপ ঝাড়া ঝোড়াই হল, সেখানে সেকালে যেমন হত, সেইভাবে নাটক করা হবে। তবে বুড়োদের অভিনয় করতে দেওয়া হবে না। অনেক বছর পরে আবার ঘটা করে শিবতলার বুড়োশিবের পুজো হচ্ছে, বুড়োরা সেটা হাতে নিক কিন্তু নাটক করব আমরা। অর্থাৎ ছেলে-ছোকরারা। মেয়েদের পার্টও ছেলেরা করবে। গানের দলে মেয়েরা থাকবে। পয়সাকড়ি আমরা জোগাড় করলাম, কাজেই কেউ আপত্তি করল না।

সবই হল, খালি নারদের পার্ট করার লোক পাওয়া গেল না। নাচবে, গাইবে দেখতে ভালো হবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। শেষটা ঠাকুমাই বললেন, "আরে, আমার ভাগ্নী দুল্টুর জামাই কৃষ্ণ কর কলকাতার নামকরা অভিনেতা। ওকে আনিয়ে নে না, যেমনি দেখতে তেমনি নাচে গায়। তোদের সবাইকে ওর পাশে একেকটা দাঁড়কাগের মতো দেখাবে।

বলিস তো আমিই সব ব্যবস্থা করে দিতে পারি।" দাঁড়কাগের কথাটাতে কেউ খুশি না হলেও, রাজি না হয়েও পারল না।

তাই ঠিক হয়ে গেল ; কৃষ্ণ কর নারদ সাজবে। তবে ব্যস্ত মানুষ, রিহার্সাল দিতে পারবে না। নাটকের এক কপি ওকে পাঠিয়ে দিলে, নিজেই তৈরি হয়ে নেবে। নাটকের দিন বঙ্কুদা ওকে গাড়ি করে নিয়ে আসবেন। আমবাগানের পিছনে বঙ্কুদাদের ছোট্ট অতিথিশালায় যেন ওর ড্রেস রেডি থাকে। ও সন্ধ্যার মধ্যে সাজ বদলে, নাটক শুরু হবার দশ মিনিট আগে মণ্ডপে উঠবে। কারো কারো একটু মন খুঁৎ খুঁৎ করলেও, বঙ্কুদা বললেন, "কৃষ্ণ করের কথার কখনো একচুল নড়ন-চড়ন হয় না।" তাইতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হল।

ষষ্ঠীর আগে বুড়োশিবের মন্দিরে পুজো হল। ষষ্ঠীর দিন নাটক হল। নিজেদের প্রশংসা করা উচিত নয় জানি, তবু সত্যের খাতিরে বলতে বাধ্য হলাম যে অমন নাটক ইহলোকে খুব কম দেখা যায়। স্টেজ সাজানো, পার্ট মুখস্থ, ড্রেস্ পরা, সামিয়ানার নীচে লোক ধরে না। পুরোনো পুজোমণ্ডপ আমাদের বাড়ির লাগোয়া। গ্রীন রুমটা বাড়ির একতলার একটা ঘরে। তার একটা দরজা থেকে মণ্ডপে যাবার পথ, সেটা দরমা দিয়ে ঘেরা। আরেকটা দরজাও আছে, বাইরে থেকে যাওয়া আসার জন্য।

বিকেলেই বঙ্কুদা এসে জানিয়ে গেলেন, কৃষ্ণ কর এসে গেছেন। অতিথিশালায় বসে বঙ্কুদার সঙ্গে একবার মহড়াও দিয়েছেন। এখন বিশ্রাম করছেন, একেবারে সেজেগুজে স্টেজে উঠবেন। আমরা কেউ যেন ঝামেলা না করি। অনেকেই বলেছিল এ-সব চাল ছাড়া আর কিছু নয়। যাই হোক অত নামকরা অভিনেতা বিনি পয়সায় অভিনয় করে যাচ্ছেন, সেই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

সন্ধ্যা এগিয়ে এল, সবাই রেডি। অথচ কৃষ্ণ করের দেখা নেই। আমার ভাই অমি বড্ড মোটা বলে তাকে কোনো পার্ট দেওয়া যায় নি। তার কাজ ছিল গ্রীন রুম আগলানো। শেষটা বঙ্কুদা তাকেই বললেন, "যা তো, একটু এগিয়ে দেখ। হয়তো অন্ধকারে আমবাগানে পথ হারিয়েছে। যা জঙ্গল তোমাদের বাড়িতে। আমরা এদিকে শুরু করে দিচ্ছি। প্রথম সীনে তো আর নারদ নেই।"

মণ্ডপের পেছনে প্যাঁ করে ক্লারিয়োনেট বেজে উঠল, অমি আর আমি

কৃষ্ণ করের খোঁজে বেরুলাম। বেশি দূর যেতেও হল না, আমরা গ্রীন-রুমের দরজা খুলেই দেখি নারদের বেশে কৃষ্ণ কর সিঁড়ির ছোট ধাপটাতে দাঁড়িয়ে। কি ভালো দেখতে কি বলব। রঙ-টঙ মেখে মাথায় জটার ওপর জরির কাঁটা বেঁধে এমনি রূপ খুলেছিল যে সত্যিকার নারদ যদি একবার দেখতেন তো নিশ্চয় বলতে পারি হিংসায় জ্বলে যেতেন। সে কি রূপ। কপালে চিত্র করেছেন, সেটা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। যাক সবাই নিশ্চিন্ত হল।

ততক্ষণে প্রথম সীন্‌ও শেষ হয়ে এসেছে, কৃষ্ণ করও আর বিলম্ব না করে মণ্ডপে উঠে পড়লেন। সে যে কি অদ্ভুত অভিনয়, যারা দেখেছিল সবাই একেবারে হাঁ। কৃষ্ণ কর নিজেও নাকি কখনো এত ভালো অভিনয় করেন নি। সীনের পর সীন হয়ে যেতে লাগল। কৃষ্ণ করের দেখাদেখি অন্য সকলেও বেজায় ভালো অভিনয় করতে লাগল। ইন্দ্রজালের মতো নাটক চলতে লাগল। দ্বিতীয় অঙ্কের পর আর নারদের পার্ট ছিল না। তাঁর শেষ সীন্‌টি এবার শুরু হবে, এমন সময় কৃষ্ণ কর অমিকে কানে কানে বললেন, "পেছনের দরজায় আমার শত্রু এসেছে। যেমন করে পার ঠেকাও, আমার পালাটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত, তার পর যা হয় হোক।" এই বলে তিনি মণ্ডপে উঠে গেলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে যাবার ছোট দরজাতে আস্তে আস্তে কে টোকা দিতে লাগল। আমরা কেউ কান দিলাম না। অমি জানলা দিয়ে উঁকি মেরে কাকে যেন এক ধমক দিয়ে, আবার এসে বসল। জিজ্ঞাসা করাতে বলল, "ঢং করার জায়গা পায় নি, ব্যাটা, কলাপাতা জড়িয়ে সঙ সেজে, ভয় দেখাবার তালে আছে।" আমি কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও লোকটার দেখা পেলাম না।

দ্বিতীয় অঙ্ক শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণ কর বিপুল হাততালিতে কানে তালা লাগিয়ে গ্রীনরুমে এসে অমিকে বললেন, "বাঃ ব্যাটাকে খুব ঠেকিয়েছ দেখছি। তোমার জন্য কি করতে পারি বল দিকিনি? বড্ড আনন্দ দিয়েছ। আচ্ছা, পুকুরটাকে সাফ করিয়ে একটু জল ছেঁচে ফেলার ব্যবস্থা কোরো।" এই বলে দরজাটা একটু ফাঁক করে অন্ধকার পথে বেরিয়ে পড়লেন। সেখানে শত্রু আছে বলে এতটুকু ভয় দেখলাম না।

অভিনয় শেষ হয়ে গেল। সবাই কৃষ্ণ করকে খুঁজতে লাগল। অথচ

তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না বঙ্কুদারা কয়েকজন শেষপর্যন্ত আমবাগানের অতিথিশালায় গিয়ে হাজির হলেন। দেখেন বাইরে থেকে তালা দেওয়া, যেমন কৃষ্ণ করকে বলে দেওয়া হয়েছিল। সবাই অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগল। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল "কে? কে? ওটা কে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছে?"

সবাই মিলে তাকে হিড়্হিড়্ করে টেনে আলোর সামনে আনতেই দেখা গেল কিম্ভূতকিমাকার এক মূর্তি, পরনে কলাপাতা ছাড়া আর কিচ্ছু নেই, চোখে মুখে প্রচুর মেক্-আপ লেপটে রয়েছে। বঙ্কুদাকে দেখেই সে তাঁকে জাপটে ধরে বলল, "দাদা, এই বিপদে ফেলবার জন্যই কি আমাকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন?"

বঙ্কুদার দু চোখ কপালে উঠে গেল। "সেকি! কেষ্ট, তুমি? তবে কে অভিনয় করে গেল?" লোকটা হতাশভাবে মাথা নাড়ল। "তা তো জানি না, আমবাগানের সব চেয়ে অন্ধকার জায়গায় ড্রেস্-ট্রেস পরে যেই পৌঁচেছি অমনি বাঘের মতো আমার ঘাড়ের উপর পড়ল। কোনো কথা বলল না, খালি আমার ড্রেস্ খুলে নিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি কি করি, সেই ইস্তক কলাপাতা জড়িয়ে বেড়াচ্ছি এটা কি খুব ভালো কাজ হল?"

বঙ্কুদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "কি আশ্চর্য, নাহয় কলাপাতা পরেই গ্রীনরুমে যেতে। দরজাটা তো দেখিয়ে দিয়েছিলাম।" "গেছিলাম। কিন্তু একজন ষণ্ডামতো ভদ্রলোক এমনি তেড়ে এলেন যে পালাবার পথ পাই নে।"

"আহা, এখানে ফিরে এসেও তো অন্য কাপড় পরে গিয়ে আমাদের খবর দিতে পারতে। জাল নারদকে তা হলে ধরা যেত।" কী করে ঢুকব। দরজায় তালা দেওয়া, চাবিটা পাছে হারায় বলে মাথার ফাট্টার সঙ্গে সেপ্টিপিন দিয়ে আঁটা। মাথার ফাট্টা তো তার মাথায়।"

সত্যি বলব কি, সবাই তাজ্জব বনে গেল। খোঁজা-খোঁজা করেও সে লোকটাকে পাওয়া গেল না। ড্রেস্ সুদ্ধ একেবারে হাওয়া। শেষপর্যন্ত তালা ভেঙে ঘরে ঢুকে সবাই একেবারে থ'। ঘরের মেজেতে নারদের ড্রেস্ পড়ে আছে, যেন কেউ এইমাত্র ছেড়ে গেছে। মাথার জরির ফাট্টার সঙ্গে চাবিটা সেপ্টিপিন দিয়ে আঁটা। অথচ দরজাটা বাইরে থেকে যেমন তালাবন্ধ করা হয়েছিল, তেমনি ছিল।

অনেক কষ্টে সেদিন কৃষ্ণ করকে ঠাণ্ডা করতে হয়েছিল। ঠাকুমা নিজে এসে তার পায়ে ধরাতে তবে তার রাগ পড়েছিল। পরদিন লোক ডেকে পুকুর ছাঁচা হল; কি জানি জলে ডুবে-টুবে গিয়ে থাকে যদি। কিচ্ছু উঠল না, শুধু রাশি রাশি মাছ আর কচ্ছপ, শ্যাওলা আর কয়েকটা সেকালের ঘটি ঘড়া আর ইস্টিলের একটা মকরের নকশা দেওয়া ক্যাশবাক্স। শ্যাওলা জমে তার দফা শেষ। ঢাকনা খুলতেই ভিতর থেকে কতকগুলো কাগজপত্র আর একটা হীরের কণ্ঠি মাটিতে পড়ল।

তাই দেখে আমার বুড়ো-ঠাকুমা বলে উঠলেন, "আরে, এযে বুড়ো-শিবতলার শিবঠাকুরের হারানো গলার কণ্ঠি। আমার শাশুড়ি বলতেন পুরুতঠাকুর ওটাকে সরিয়ে জগা মোড়লের কাছে বন্ধক দিয়ে গাঁজার পয়সা জোগাড় করেছিল।"

তখন সকলের খেয়াল হল। কে যেন বলল, "তাইতো, তাইতো, এই ভাঙা ক্যাশবাক্সটাও তবে বুড়োর সেই দলিলপত্রের হারানো ক্যাশবাক্স। তার উপরেও তো এইরকম মকর নকশা তোলা ছিল বলে শোনা যায়। আর ঐ পচা-ধচাগুলো তা হলে কি"—অমনি পাঁচজনে তাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিল, "দূর, দূর, বাজে বকিস নে। আমাদের দলিল-টলিল ঠিক আছে।"

হীরের কণ্ঠিটাকে শুদ্ধি করে নিয়ে আবার শিবঠাকুরের মাথায় পরানো হল। সেই উপলক্ষে রাতে আমার ঠাকুমা সবাইকে খুব মাছ কচ্ছপ খাওয়ালেন। শোবার আগে বার বার বলতে লাগলেন "যাক্ যেখানকার যা সব ভালোভাবে শেষ হল। শিবঠাকুর তাঁর কণ্ঠি ফিরে পেলেন।"

বুড়ো-ঠাকুমা ফিক্ করে হেসে বললেন, "আর মেজো কর্তা-দাদামশায়ের নারদ সাজার সখও মিটল। ওর কাছে কৃষ্ণ কর। কিসে আর কিসে, সোনায় আর সীসে। কপালের মধ্যিখানে কালো কুচ্‌কুচে তৃতীয় নেত্রটি দেখেই আমি তাঁকে ঠিক চিনে ফেলেছি।"

তাই-না শুনে তিন-চার জন ধুপ্‌ধাপ্ মুচ্ছো গেল।

আকাশ পিদ্দিম

আকাশ পিদ্দিমটা জ্বেলে কাচের ডোমে পুরে বাঁশের ডগায় তুলতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। ততক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। এ-পাড়ায় থেকে থেকেই বিজলি বন্ধ, কাজেই ছাদটা দিব্যি ঘুট্‌ঘুটে। চিলেকোঠার দোর অবধিও পৌঁছয় নি, পেছন থেকে খোনা গলায় কে ডাকল, "এ্যাঁই!" ফিরে দেখি পাশের বাড়ির ছাদে থুত্থুড়ে এক বুড়ি। মাথা থেকে পা অবধি সাদা কাপড়ে ঢাকা।

গুপে বলল, "আমাদের বলছেন?"

বুড়ি চটে গেল, "তোদের বঁলব না তো কাঁকে বঁলব রে ছোঁড়া? তোঁরা ছাঁড়া এঁখানে আঁছেটা কেঁ? তাঁ ছাড়া তোঁরাই তো আঁলো দিঁলি।"

বক্কু বলল, "ইয়ে মানে ঠাকুমা বললেন সারা আশ্বিন মাস আলো দেখাতে হয়, তা হলে দেবতাদের নেমে আসতে সুবিধা হয়।"

"ওঁ তাঁই বুঁঝি? তা আঁমিই বাঁ দেঁবতাদের চেঁয়ে কঁম কিঁসে শুঁনি? ওঁরা বঁর দেঁবে এঁই তাঁলে আঁছিস তোঁ? আঁমিও তো আঁলো দেঁখেই নেমেছি। অঁবিশ্যি দেঁখছি ভুঁল ছাঁদে নেঁমেছি, তাঁতে কি হঁয়েছে রে? তোঁরা তো তিঁনটে অঁঙ্ক দিলে দুঁটো ভুঁল কঁরিস। এঁখন বাঁজে কঁথা রেঁখে, কি বঁর চাঁস বঁল। নে, নে, তাঁড়াতাঁড়ি কঁর, আঁমার ঢেঁর কাঁজ।

গুপে, বক্কু, তোতা তাই শুনে হাঁ। তার পর গুপে বলল, "আমি দুটো স্টিলের পেনসিল-কাটা চাই।"

বক্কু বলল, "আমি একটা ভালো ডট্‌পেন আর ছটা রিফিল চাই।"

সঙ্গে-সঙ্গে বুড়ি কোঁচড় থেকে দুটো স্টিলের পেনসিল-কাটা আর একটা ডট্‌পেন, আর ছটা রিফিল বের করে দিয়ে বলল, "নে, আঁলগোছে ধঁর, তোঁদের ছুঁলে আঁমাকে নাইতে হঁবে। বঁলিহারি, তোঁদের পঁছন্দ এঁইজন্য শূঁন্যি থেঁকে আমায় নাবানো। এঁ তো মঁন্টুর দোঁকান থেকে যেঁ কোনো সঁময় তুঁলে আঁনতে পাঁরতিস। আঁমিও তাঁই এঁনেছি। এঁকটা ভাঁলো বঁরও চাইতে জানিস না, স্টুঁপিড!"

তার পর তোতার দিকে ফিরে বলল, "বলি, ছোট খোকা, তুমিই-বা কেন চুপ? ওদের মতো একটা কিছু চাও।"

তোতা বলল, "বেশ, আমি আলাদীনের প্রদীপ চাই।"

বুড়ি ভয়ঙ্কর চটে গেল। "তোঁ-তোঁ-তোঁ—চালাকি নাকি—আর কিছু চা।"

তোতা বলল, "থাক্ তা হলে, কিছু দিতে হবে না। বুড়ি চোখ পাকিয়ে বলল, "দিতে হবে না আবার কি? দেবতারা দিতে পারে আর আমি পারি না? ঐ দ্যাখ, পিদ্দিমের নীচে!"

ওরা তাকিয়ে দেখে সঙ্গে-সঙ্গে পিদ্দিমের বাঁশ বেয়ে সড়্সড়্ করে নীচে নেমে এল একটা টিনের টেমি বাতি। দেশের বাড়ির রান্নাঘরে যেমনি জ্বালায়, ঠিক তেমনি। ঠুং করে মাটিতে পড়তেই তোতা তুলে নিয়ে, ফিরে দেখে বুড়ি তখন অন্তর্ধান করেছে।

চিলেকোঠার আলোয় দেখা গেল পুরোনো লম্প, ঝুলকালি মাখা, কার রান্নাঘরে ব্যবহার হত কে জানে। তোতা সেটার গায়ে আঙুল ঘষতেই হুপ্ করে খানিকটা আলো জ্বলে উঠল আর একটা বেঁটে বামুন দেখা দিয়ে বলল, "কি চাই মাস্টার?"

তোতা অমনি বলল, "গুপেদার চেয়ে আরো বড় চারটে স্টিলের পেনসিল-কাটা, দুটো আরো ভালো ডট্‌পেন, আরো বারোটা রিফিল।"

বেঁটে বামুন পকেট থেকে চারটে বড় স্টিলের পেনসিল-কাটা, দুটো ভালো ডট্‌পেন আর বারোটা রিফিল বের করে তোতার সামনে মাটিতে ফেলে দিল। তোতা যেই-না নিচু হয়ে সেগুলো তুলতে যাবে, অমনি বেঁটে বামুন বলল, "একটা ভালো বরও চাইতে পারিস না, তুই এটার যোগ্য নোস!" এই বলে টেমিটাকে ছিনিয়ে নিয়ে অন্তর্ধান করল।

ওরা সখের জিনিসগুলি পকেটে পুরে গুটি গুটি নেমে এল, কাউকে কিছু বলল না।

চেতলায়

চেতলা, কালীঘাট, আদিগঙ্গা যতই পবিত্র স্থান হোক-না-কেন, ও-সব জায়গা মোটে ভালো না। আর লোকের মুখে মুখে কি-সব অদ্ভুত গল্পই যে শোনা যায় তার লেখাজোখা নেই। তা ছাড়া মশামাছি তো আছেই। চিল্‌তে চিল্‌তে সব গলি, তাতে মান্ধাতার আমলে তৈরি ঝুরঝুরে সব বাড়ি, তায় আবার প্রায় সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির উঠোন দেখা যায়। এক ফালি উঠোনের মধ্যে এই বড়-বড় সব গাছ, তালগাছ, আমগাছ, বটগাছ; তাদের ডালপালা বেয়ে, ঝুরি ধরে ঝুলে যে কোনো বাড়ি থেকে যে-কোনো বাড়িতে চলে যাওয়া যায়। বিপদ বুঝলে একটা হাঁক দিলেই হল। সবাই সাত পুরুষ ধরে সবার চেনা, পুরোনো সব ঝগড়াও আছে তার কারণ নিজেরাই ভুলে গেছে, তবু এখনো কথাবার্তা বন্ধ। মুখ-দেখা আর কি করে বন্ধ করে, নড়্‌বড়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেই, সব বাড়ি থেকে সব বাড়ির রান্নাঘরের ভিতর পর্যন্ত দেখা যায়, কার বাড়িতে কি রান্না হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে সবাই জানতে পারে। একটা টিকটিকি লুকোবার কোথাও জায়গা নেই, চোর-ছ্যাঁচড়, খুনে দুষ্কৃতকারীদের কথা তো ছেড়েই দিলাম। কার ঘরে চুরি করার মতো কি আছে এবং কোথায় আছে তাও সবাই জানে, নেই-ও অবিশ্যি কারো কিছু। সেদিক দিয়ে জায়গাটাকে চোরদের গোবি মরুভূমিও বলা যায়।

আমার বন্ধু বটুর বড় কাকা ওখানকার থানার মেজো দারোগা। তা ছাড়া ওদের সাত পুরুষের বাড়িও ওখানে। নাকি বাড়ি হবার সময় ক্লাইভ জন্মায় নি। বটু জায়গাটার নাম দিয়েছে 'মিসার হতাশা'। শুনে বড় মামা খুবই মুষড়ে পড়েছেন, দুষ্কৃতকারীরাই যদি একটু সুযোগ না পেলে তা হলে ওঁর হেড-আপিসে উন্নতি হয় কি করে? অবিশ্যি ও-সব সাধারণ জিনিসের চাইতেও অন্য এবং ভয়ের, জিনিস আছে, ঐ তিনটে পাড়াসুদ্ধ সবাই সন্ধে হতেই যার.ভয়ে জুজু। অধিকাংশই ওপর হাতে এক গোছা শঙ্কটতারিণী মাদুলী বেঁধে নিরাপত্তা রক্ষা করেন। কারণ পুলিশে আর কিই-বা করতে পারে?

বটুদের উঠোনের আম পাকলে বটু আমাকে তিন দিনের জন্য ধরে নিয়ে গেছিল। ঐ তিন দিনে আমি যতগুলো সত্যিকার ভূতের গল্প শুনলাম, সারা জীবন ধরে অত শুনি নি। সবাই সবার পাশের বাড়িতে অশরীরীদের দেখে। কি বড়-বড় সবুজ রঙের চিংড়িমাছ নিয়ে একটা তাকে বিক্রি করতে এল। চিলেকোঠায় পুজো করতে বসে তাকে দেখেই বটুর ছোট্-ঠাকুমা চ্যাঁচাতে লাগলেন, "না বাছা, এখানে ও মাছ কেউ খাবে না। তুমি অন্য জায়গায় দেখ। বটু তো চটে কাঁই, কি ভালো ভালো চিংড়িমাছ। ছোট্-ঠাকুমা নেমে এসে বললেন, "ব্যাস্, মাছ দেখেছিস তো অমনি হয়ে গেল! আরে ওকি সত্যিকার মাছ? অত বড় চিংড়ি কখনো চার টাকায় দেয় কেউ? আবার বলছে পরে নেবে। বটু বলল "আহা, বলল যে বিক্রি না হলে পচে যাবে!"

কাষ্ঠ হেসে ছোট্-ঠাকুমা বললেন, "তুইও যেমন। তা ছাড়া ওগুলো মাছও নয়, ঐ জেলের পো-ও মানুষ নয়, সব ইয়ে।" এই বলে ছোট্-ঠাকুমা জল খেতে বসলেন। বটুও বলল, "তা সত্যিও হতে পারে, মুখটা কেমন কেমন মিচ্‌কে মতো দেখলি না।" আমি বললাম, "যাঃ! ভূতের হাঁটু উলটো দিকে থাকে আর ওদের ছায়া পড়ে না।" ছোট্-ঠাকুমা শুনতে পেয়ে ডেকে বললেন, "ইদিকে এখনো রোদ আসে নি বাবা, ছায়া দেখবি কি করে? সে যাই হোক, আদিগঙ্গার বটগাছের তলায় যেন কখনো যাস নে। জায়গাটা ভালো নয়।" গিজ্‌গিজে সব বাড়ি, বট-গাছ তলায় যেতে হলে সারকাস্ করতে হয়। অথচ সেখানে নাকি কারা কাপড় কাচে, ঝগড়া করে, মাছ ধরে।

ততক্ষণে সূর্য ডুবে গেছে, সামনের দোতলার লট্‌খটে বারান্দায় দুজনে গল্প করছি। ছপ্ করে কি একটা পায়ের কাছে পড়ল। আর সে কি সুগন্ধ ভুর্-ভুর্ করতে লাগল। তুলে দেখি কলাপাতায় মোড়া বড়-বড় চিংড়িমাছ ভাজা। নীচের দিকে চেয়ে দেখি সেই মিচ্‌কে লোকটা মিট্-মিট্ করে হাসছে। মোটা মোটা কান, নাকে মস্ত আঁচিল। একতলার বৈঠকখানা থেকে বটুর পিসেমশাই ডেকে বললেন, "কে? কে ওখানে? সঙ্গে-সঙ্গে কেউ কোথাও নেই। খেয়ে ফেললাম দুজনে মিলে সব কটা চিংড়ি মাছ। যদি ওগুলো চিংড়িমাছ না-ও হয় তবু খেতে বেজায় ভালো।

ভিতর দিকের উঠোনে আমগাছের গায়ে লাগা বুড়ো তালগাছ।

ছোট্-ঠাকুমা সাদা পাথরের রেকাবি করে খোয়া ক্ষীর, চিঁড়ের মোয়া আর বড়-বড় মনাক্কা নিয়ে, তালগাছের কোটরে রেখে, ভক্তিভরে গলায় কাপড় জড়িয়ে প্রণাম করলেন। ছোট্-ঠাকুমা চলে যেতেই বটু বলল, "ব্রহ্মদত্তিকে তোয়াজ করা হচ্ছে। তালগাছে সে বাস করে—" আরো কি বলতে যাচ্ছিল বটু, ছোট্-ঠাকুমা পিছন থেকে বললেন, "অমন অছ্‌দ্ধা করিস নে, বটা। উনি আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহের ছোট ভাই। চটিয়ে দিলে সব্বনাশ করবেন, খুশি রাখলে আমাদের জন্য না করতে পারেন এমন জিনিস নেই।" ঐ বিদ্যেবুদ্ধি নিয়ে যে বছরে বছরে পাশ করে যাচ্ছিস্, সেটা কি করে সম্ভব সে কথা কখনো ভেবেছিস ? হুঁঃ!" এই বলে ছোট্-ঠাকুমা গীতা পড়তে ঘরে গেলেন। যাবার সময় আরো বলে গেলেন, "তোরা বিশ্বাস না করতে পারিস, কিন্তু রোজ উনি এই জিনিস গ্রহণ করেন আর তার বদলে একটি আশীর্বাদী—" আর বলা হল না কারণ সেই সময় বড় কাকা বাড়ি এলেন।

বড় কাকা খুব চটে ছিলেন। চা আর চিঁড়ের মোয়া খেতে খেতে এক্ষুনি আবার বেরোতে হবে। বাজারের লোকদের নালিশের জ্বালায় বললেন, "আর টেকা যাচ্ছে না। গোল-বাড়িতে রাতে তদন্তে যেতে হবে।"

তাই শুনে বড় কাকি এমনি চমকে গেলেন যে হাতের দুধের হাতা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে পড়ে গেল। চোখ গোল গোল করে ফ্যাকশা মুখে বললেন, "কিন্তু—কিন্তু—" বড় কাকা কাষ্ঠ হাসলেন, "কিছু কিন্তু কিন্তু নয়। এর ওপর আমার প্রমোশন নির্ভর করছে। কোনো ভয় নেই, ছটা ষণ্ডা লোক সঙ্গে থাকবে।"

বটার কাছে শুনলাম যে, বাড়িটাতে একশো বছর কেউ থাকে না। বড়ই দুর্নাম। নাকি ওটা চোরাচালানকারীদের গুহ্য আড্ডা। মাটির তলায় সুড়ঙ্গ আছে, বুড়ি-গঙ্গায় তার মুখ। অনেকে দেখেছে। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে সোনাদানা বে-আইনী জিনিস বস্তা বস্তা পাচার হয়। বাজারে নাকি ওদের চর ঘুরে বেড়ায়, কখনো জেলে সেজে, কখনো পুরুতঠাকুর সেজে এটা-ওটা কিনতে চায়, চা খেতে চায়, অচল পুরনো পয়সা দিয়ে দাম দিতে চায়। তা লোকে শুনবে কেন। দিয়েছে নালিশ করে।

বড় কাকা বলেছিলেন, "লোকটাকে ধরা যায় না, ফুস্‌ফাস্ করে এখান দিয়ে ওখান দিয়ে গলে পালায়। কোনো দোকানদারের সঙ্গে ষড়্‌ও থাকতে পারে, শুনেছি চেহারা দেখেই সন্দেহ হয়, কিরকম মিচ্‌কে

মতো, মোটা মোটা কান, নাকের ডগায় আঁচিল।"

শুনে আঁতকে উঠেছিলাম, বটা কনুয়ের গুঁতো মেরে থামিয়ে দিয়েছিল। আটটা বাজতেই মহা ঘটা করে আটজন সশস্ত্র লোকজন নিয়ে বড় কাকা তদন্তে চলে গেলেন। ছোট্-ঠাকুমা তাঁর গলায় হলদে সুতো দিয়ে একটা বেলপাতা ঝুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যাস্, আর ভয় নেই। সেখানে গিয়ে কেউ কিছু দিলে খাস নে যেন। দুগ্গা! দুগ্গা!" বড় কাকা চলে গেলে বললেন, "কামান দেগে হাওয়া ধরা। হুঁঃ!"

আমরা ছাদে গিয়ে বুড়ি-গঙ্গায় স্পষ্ট জোয়ার আসা দেখতে লাগলাম। বটু বলল, "ঐ গোল-বাড়িটা আমার ঠাকুরদার অতি-বৃদ্ধ প্রপিতামহের ছোট ভাই পেয়েছিল। ব্যাটা মহা লক্ষ্মীছাড়া ছিল, লেখাপড়া শেখে নি, কাজকর্ম করত না, খালি মাছধরার বাই ছিল আর চীনে ব্যবসাদারদের কাছ থেকে চায়ের নেশা ধরেছিল। সুদিনে বাড়ির সব ঝাড়বাতি, আসবাবপত্র, রুপোর বাসন বেচে-বুচে সাফ করে দিল। ওর বুড়ি মা নাকি খুচরা পয়সাকড়ি এমনি লুকিয়ে রেখে চোখ বুজেছিল যে ব্যাটা খুঁজেই পায় নি—এখনো নাকি খুঁজে বেড়ায়। তাই ও-বাড়িতে কেউ রাত কাটায় না। সেইখানে গেছে বড় কাকা তদন্ত করতে। খুচরা টাকাকড়ির বাক্সটা পেলে মন্দ হয় না। আমরাই তো ওর ওয়ারিশ। সে ব্যাটা তো বিয়েই করে নি। নাকি বিশ্রী দেখতে ছিল, শুঁটকো, কালো, চাকর-চাকর চেহারা। গেঞ্জি গায়ে ঘাটে বসে অষ্টপ্রহর বুড়ি গঙ্গায় মাছ ধরত—কে? কে ওখানে?"

খচ্মচ্ করে তালগাছ থেকে আমগাছ, আমগাছ থেকে নড়্বড়ে বারান্দা কাঁপিয়ে মিচ্কে লোকটা হাসি হাসি মুখ করে উঠে এসে, নাকের ফুটো ফুলিয়ে ফোঁস্ ফোঁস্ করে নিশ্বাস নিয়ে বলল, "চা চা গন্দ পাচ্চি মনে হচ্ছে।" সত্যিই ছিল চা-দোকানের কেতলিতে একটু চা, একটা মাটির ভাঁড়, বটু লুকিয়ে এনেছিল সামনের দোকান থেকে। নীচে নামতেও হয় নি, ওদের ছোকরা তেঁতুলগাছে চড়ে, হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল, রোজকার মতো। চা পেয়ে লোকটা আহ্লাদে আটখানা, মিচ্কে মুখ যেন ভাঁজ হয়ে গেল। বললাম, "পেঁয়াজি খাবে নাকি?" জিব কেটে বলল, "এ্যা, ছি ছি, ও নাম করবেন না। আমার বরাদ্দ রোজকার মতো খেয়ে এসেছি, চিঁড়ের মোয়া, খোয়া ক্ষীর, মেওয়া—" বটা আর আমি এ ওর দিকে তাকালাম, কিছু বললাম না।

মিচ্‌কে লোকটি বলল, "বড়-কর্তা আমাদের ওখানে এমন হাঁকডাক লাগিয়েছেন যে টিকতে না পেরে ওনার এখানে গা-ঢাকা দিতে এসেছি। দেখ দাদা, তালগাছের মুড়োয় তোমাদের জন্য একটা দ্রব্যি রেখে গেলাম। আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি। সেখানে মা অমৃতি বানায়।"

বটু ব্যস্ত হয়ে বলল, "কেন চলে যাবে ? এখানে বুঝি খেতে পাও না ?" ফিক্ করে হেসে মিচ্‌কে লোকটা বলল, "দু বেলা নৈবিদ্যি পাই আবার কষ্ট কিসের। ঐ এল বলে। আমি উঠি।" বলেই হাওয়া। নীচে বড় কাকাদের রাগ-রাগ গলায় হাঁক ডাক শোনা গেল, নিশ্চয় কিচ্ছু দুষ্কৃতিকারী-টারি ধরতে পারেন নি। সঙ্গে-সঙ্গে হুড়্‌মুড়্ করে আদ্যি-কালের তালগাছটা ভেঙে পড়ল। পোকা ধরা, পুরোনো গুঁড়ি ভেঙেচুরে একাকার! তার মধ্যে দেখা গেল বেশ বড় একটা কাঠের হাতবাক্স, পুরোনো টাকাকড়িতে তার অর্ধেক ভরতি। আর চাঁচাপোঁছা নৈবেদ্যের রেকাবিটা, তিন টুকরো হয়ে পড়ে আছে। বড় কাকার রাগ ঠাণ্ডা।

পর দিন বড় কাকা বললেন, "আশ্চর্যের বিষয়, সুড়ঙ্গের মধ্যে একটা খোপে ঐ বাক্স রাখার স্পষ্ট দাগ দেখলাম। সেই বুড়ি ঠাকরুন তা হলে বাউণ্ডুলে ছেলের হাত থেকে ওটাকে বাঁচাবার জন্য, এইখানে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এটাও তো তাঁদেরই বাড়ি।"

ছোট্‌-ঠাকুমা শূন্যে নমস্কার করে বললেন, "কত বাঁচিয়ে ছিলেন সে তো বোঝাই যাচ্ছে! ও বটা, নিজে পড়িস দাদু, সে তো গেল।" ফোঁৎ ফোঁৎ করে একটু কেঁদেও নিলেন। বড় কাকা তো অবাক।

পিল খানা

মন-টন খুব খারাপ। তা আর হবে না ? পুজোর সময়ে হাওড়ার এই গলিতে আটকা আছি। আটকা কেন, একরকম বলতে গেলে কয়েদি আসামী হয়েই আছি। জেলখানার বন্দীরাও এর চেয়ে খারাপভাবে থাকে না। বেরুতে দেয় না, কথা বলবার লোক নেই, দেয়ালের ঐ ছোট চার কোনা জানলাটা খুলে দিনে তিনবার আমার খাবার ঢুকিয়েই, আবার দড়াম্ করে বন্ধ করে দেয়, পাছে আমার গায়ের জল-বসন্তের

বীজ ওদের গায়ে লেগে যায়। বাড়িতে তো দেখে এলাম, মা রোজ রাতে বুন্টির সঙ্গে এক খাটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

নাকি আমার পড়ার ব্যাঘাত হতে পারে। গায়ে গুটি গুটি মতো বেরুলে পড়ার কী করে ব্যাঘাত হয় বুঝলাম না। আর পুজোর ছুটিতে কেউ পড়ে নাকি? তা কে শোনে। অমনি বলা নেই কওয়া নেই, আমাকে বগল-দাবাই করে এনে খুড়ো-দাদু এইখানে পুরেছে। কী খারাপ খেতে দেয় কী বলব। সবটাতে তেঁতুল-গোলা। তা হলে নাকি জল-বসন্ত হয় না। যত সব বাজে কথা।

এখন সন্ধে হয়ে গেছে, আজ ষষ্ঠী, দূরে কাদের বাড়িতে পুজো হচ্ছে, কাছেও পুজো হচ্ছে, সব জায়গায় হচ্ছে, বাজনা বাজছে। কিচ্ছু দেখতেও পাচ্ছি না। আমার জানলার নীচের গলিটা আসলে এই বাড়ির নিজস্ব গলি। বেশ চওড়া। ও দিকের বাড়ির সব জানলা ইঁট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করা। নাকি একশো বছর আগে দুই শরিকে হাতি ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়া হয়েছিল। সায়েব হাকিম এসে এই ব্যবস্থা করেছিল। তাই ওদের নাকি এখনো রাগ আছে, বলে সায়েব ঘুষ খেয়েছিল। এদের সঙ্গে কথা বন্ধ।

এই বাড়িটা নাকি দুশো বছরের পুরোনো। এই পাড়াটাই দুশো বছরের হবে, খোলা খোলা নর্দমা, রাস্তা থেকে বাড়িতে ঢুকতে সিঁড়ি দিয়ে না-উঠে, এক ধাপ করে নামতে হয়। সেদিন খুব বৃষ্টি হল আর রাস্তার সব জল সকলের বাড়ির একতলায় গিয়ে জমা হল। জিনিসপত্র সব উঁচু-উঁচু তক্তপোষে তোলা, পা উঠিয়ে বসে যে যার কাজ করে যেতে লাগল, কারো কোনো অসুবিধা হল না। দুশো বছরের অভ্যেস। বাড়িতে এই সময়ে আমরা খাই। গরম গরম হাতরুটি করে দেয় পিসিমা, আমরা ছক্কা দিয়ে আলুরদম দিয়ে খাই। তার পর একটা বড় কলা, কিম্বা আম, কিম্বা আতা খাই। এই গলিটার ভিতর দিকে একটা আতাগাছ দেখতে পাই, তাতে বড়-বড় আতা পেকেছে। মা থাকলে···। যাক গে আমার এগারো বছর বয়স হয়ে গেছে, আজকাল আমি আর কাঁদি-টাদি না। কিন্তু এরা রাতে আমাকে চিনি না-দিয়ে দুধসাবু দেয়, তা নইলে নাকি আমার জল-বসন্ত হবে। সে কখন খাওয়া হয়ে গেছে, আবার আমার খিদে পেয়েছে।

আমি আসবার আগে পিসিমা বলেছিল এটাই নাকি আমাদের

পৈতৃক বাড়ি। দুশো বছর ধরে আমরা সবাই এখানেই জন্মেছি, এখানেই মরেছি। ভাব একবার। একতলার ছাদ বেজায় নিচু, কিন্তু দোতলা-তিনতলার ছাদগুলো এমনি উঁচু যে রাতে ভালো করে দেখা যায় না। দেয়ালে লাগানো-আলো অতদূর পৌঁছয় না। যা-কিছু ওখানে আঁকড়ে-মাকড়ে ঝুলে থাকতে পারে, তার পর এক সময় সুবিধা বুঝে ঝুপ্ করে আমার ওপর প'লে, আগে থাকতে আমি টেরও পাব না। এ ঘরের সঙ্গে লাগা স্নানের ঘর। ঘরের দরজা বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া থাকে। নইলে বাড়ির অন্য ছেলেদের মধ্যে দিয়ে রোগ ছড়ায়। খুড়ো-দাদু একবার করে এসে আমাকে পড়ায়। রাতে ঘরটা অন্ধকার হয়ে যায়, গলিতে বাতি নেই। ছিল একসময় নিশ্চয়, দেয়ালে মস্ত একটা ব্র্যাকেট গাঁথা ছিল। রাতে আমার ভয় করে ঘুম ভেঙে যায়। বলেছি না। মন-টন খুব খারাপ। বাবাকে একটা চিঠি লিখতে পারলে হত। এই আলোতেই লিখতে পারতাম, যদি একটা পোস্টকার্ড পেতাম।

আমার আবার কম মন খারাপ হলে ঘুম আসে না, বেশি মন খারাপ হলে বেজায় ঘুম পায়। ঘুমিয়েই পড়েছিলাম প্রায় কারিকুরি-করা উঁচু খাটটার ওপর, এমন সময় মনে হল কোথায় টুংটাং করে আস্তে আস্তে অনেকগুলো ঘণ্টা বাজছে আর নাকে এল কেমন একটা অদ্ভুত জানোয়ার-পানা গন্ধ। নিশ্চয়ই বুড়ো চৌধুরী এ-বছর পুজোয় যাত্রার বদলে সারকাসের ব্যবস্থা করেছেন। আমাকে অবিশ্যি কোনোটাই দেখতে দেবে না। এক যদি বাবা কোনোরকমে টের পেয়ে—নাঃ, শব্দটা বড্ড বেশি কাছে এসে পড়েছিল।

অমনি উঠে পড়ে ছুটে গেলাম জানলার কাছে। বাইরে তাকিয়ে আমার চক্ষুঃস্থির। একটা-দুটো নয়, গলি দিয়ে একটার পর একটা কুড়িটা হাতি আসছে, প্রত্যেকের ঘাড়ে মাথায় ফাট্টাবাঁধা মাহুত আর গলায় ঘণ্টা। দেয়ালের পুরোনো ব্র্যাকেটে কে একটা সেকেলে লণ্ঠন ঝুলিয়েছিল, তারই আলোতে হাতিগুলো সাবধানে এগুচ্ছিল, পা-ফেলার কোনো শব্দ হচ্ছিল না, কিন্তু গলার ঘণ্টাগুলো একটু একটু দুলছিল, তাই শব্দ হচ্ছিল।

"হেই! হেই!" প্রথম হাতিটা আমার জানলার নীচে পৌঁছেই থেমে গেল। এ-বাড়ির একতলাটা এত নিচু আর হাতিটা এত উঁচু যে, মাহুত আর আমি একেবারে মুখোমুখি হয়ে গেলাম। দেখলাম বুড়ো-

মতো, গায়ে গেঞ্জি, কানে মাকড়ি। চোখোচোখি হতেই সে বলল, "ও কী! চোখে জল কেন ছোটকর্তার? কেউ কিছু বলেছে?"

আমি চোখ মুছে বললাম, "জল কোথায়? ও তো ঘাম বেরুচ্ছে। আমার খিদে পেয়েছে।"

লোকটা হাসতে লাগল, "খিদে পেয়েছে তো হুকুম করুন। চোদ্দো-পুরুষের গোলাম হাজির থাকতে ভাবনা কী? এই মোতি, কী নিয়েছিস মোড়ের মাথার বাগান থেকে, দিয়ে দে বলছি।"

হাতিটা শুঁড় তুলে আমার কোলে এই বড়-বড় দুটো পাকা আতা দিয়ে চোখ মিট্‌মিট্‌ করতে লাগল, ঠিক যেন হাসি পেয়েছে।

আমি খুশি হয়ে বললাম, "তোমরা বড় ভালো। তোমার নাম কি? কোথা থেকে আসছ?"

সে বলল, "আমি হাইদার, ছোটকর্তা, ঐ যে গলির ও মাথাটা এখান থেকে দেখা যায় না, ঐখানে আমাদের পিলখানা। সেখানে কুড়িটা হাতি থাকে। রোজ এই সময় বড় পুকুরে জল খাওয়াতে নিয়ে যাই। এই সময় পথঘাট ফাঁকা থাকে। দুটো-একটা হাতি আছে ভীড় দেখলে এখনো ঘাবড়ায়। এরা সব বর্মী হাতি কিনা, আগে কখনো শহর দেখে নি। এবার চলি, কেমন? আতা ধুয়ে খেও, মোতি শুঁড়ে করে এনেছে তো।"

আমি বললাম, "কাল আবার আসবে তো?"

হাইদার বলল, "রোজ রোজ আসব, এই সময়। তুমি কিন্তু মন খারাপ কোরো নি। পালঙ্কের তলায় ঐ কাঁঠাল-কাঠের তোরঙ্গটা খুলে দেখ-না কেন, তোমাদের চোদ্দো পুরুষের জমিয়ে রাখা কত মজার মজার জিনিস আছে ওতে।"

আমি বললাম, "তাই নাকি? কেউ কিছু বলবে না তো?"

হাইদার বলল, "তোমার জিনিস তুমি ঘাঁটবে, কে আবার কী বলবেটা শুনি? এই বাড়িতে একশোটা ঘর, একশোটা শরিক। এ-ঘরটা তোমাদের তা জানতে না?"

হাতির সারি চলতে শুরু করল, গুনে দেখলাম মাঝে-মাঝে একটা করে বাচ্চা হাতি, সব নিয়ে কুড়িটা। আতা দুটো ধুয়ে খেয়ে ফেললাম। কী ভালো যে কী বলব।

হাতিটা শুঁড় তুলে আমার কোলে এই বড়-বড় দুটো পাকা আতা দিয়ে
চোখ মিট্‌মিট্‌ করতে লাগল, ঠিক যেন হাসি পেয়েছে।

পরদিন সকালে উঠে গলি দেখে বুঝবার জো ছিল না যে, রাতে ওখান দিয়ে কুড়িটা হাতি গেছে। তারা কখন ফিরেছিল, কে জানে। লণ্ঠনটাকেও দেখলাম নামিয়ে রেখেছে। একবার ভাবলাম খুড়ো-দাদুকে হাতির কথা জিজ্ঞাসা করব। তার পরই মনে পড়ল বুড়ো চৌধুরীর সঙ্গে খুড়োদের একশো বছর কথা বন্ধ। তাদের ভাড়া করা হাতি রাতে খুড়োদের গলি দিয়ে খুড়োদের বড় পুকুরে জল খেতে যায় শুনলে খুড়ো তো রেগে চতুর্ভুজ হবেন, তার ওপর হয়তো এ পথটাও বন্ধ করে দেবেন। তা হলে হাইদারের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

ভারি খিট্‌খিটে খুড়ো-দাদু, হাতির কথা তাঁকে কোনোমতেই বলা যায় না। তবু পড়তে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "গলির ও-মাথায় কারা থাকে খুড়ো-দাদু?"

বেজায় রেগে গেলেন, "তোর তাতে কী দরকারটা শুনি? পড়া-শুনোয় মন নেই, কেবল চার দিকে চোখ।" বলে এমনি হাঁড়িমুখ করে বসে রইলেন যে, আমি তখন কিছু বলতে সাহস পেলাম না।

উনি চলে যাবার সময় শুধু বললাম, "একটা পোস্টকার্ড দেবেন খুড়ো-দাদু? বাবাকে একটা চিঠি লিখব।"

"ওঃ! আমার বাপের ঠাকুরদা এলেন। যা খবর নেবার আমিই নিয়ে থাকি। সবাই ভালো আছে। তাই নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না।"

বললাম, "বাইরে থেকে ছিটকিনি দেবেন না। আমি বেরোব না।" খুড়ো-দাদু বললেন, "তার পর নিখোঁজ হয়ে গেলে তোর বাবাকে কী বলব শুনি?" এই বলে বাইরে থেকে ছিটকিনি দিয়ে চলে গেলেন।

দুপুরে খাটের তলার তোরঙ্গটা টেনে বের করে খুললাম। আশ্চর্য সব জিনিসে ভরতি। পুরোনো বাঘবন্দী খেলার ছক-কাটা বোর্ড, রবার-ছেঁড়া গুলতি, হলদে হয়ে যাওয়া পড়ার বই, ছেঁড়া কাপড়-চোপড়। আমার একটা ফোটো। দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমার এত পুরনো ফোটো কি করে হবে? পিছনে আমার মতো হাতে লেখা মনি রায়। বাবার নাম। তা হলে বাবার ফোটো। এ-ঘরে বাবা কি ছোটবেলায় থাকতেন? সারাদিন বসে অনেক পড়াশুনো করে ফেললাম।

কী করে বাবাকে একটা চিঠি লেখা যায়?

সন্ধের আগেই আমার দুধসাবু পৌঁছে দিয়ে, খুড়ো-দাদুরা সপ্তমী

পুজো দেখতে গেলেন। তখন আমি জানলার কাছে বসে খুব খানিকটা কেঁদে নিলাম।

"হেই! হেই!—এই দেখ! এ কী কাণ্ড!"

মুখ তুলে দেখি একেবারে নাকের সামনে হাইদারের মুখ। আজ মোতি হাতিকে কিছু বলতে হল না, শুঁড় বাড়িয়ে নিজের থেকেই আমার হাতে আতা গুঁজে দিল। ওর শুঁড়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম কী নরম, কী মোলায়েম। মোতি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মিট্‌মিট্ করে হাসতে লাগল। তার পিছনে হাতির সারি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুলতে লাগল।

হাইদার বলল, "কী হয়েছে বলবে নি?"

অমনি তাকে সব কথা বলে ফেললাম। শুনে হাইদার একটুক্ষণ চুপ করে বলল, "পোস্টকার্ট আবার কী?"

মুখ্যু বেচারি পোস্টকার্ট জানে না। জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমরা বাড়িতে চিঠি লেখ না? তাকেই বলে পোস্টকার্ট।"

হাইদার বলল, "চিঠি? "চিঠি কে নিয়ে যাবে কর্তা? বছরে একবার নিজেই চিঠি হয়ে চলে যাই। কিন্তু তোমার জন্য তো একটা কিছু করতে হয়। আচ্ছা যদি ঘর থেকে ছেড়ে দিই, একা-একা বাড়ি যেতে পারবে?"

"খুব পারব, নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু ওরা তো সদর দরজায় তালা দিয়ে গেছে, কী করে খুলবে?"

হাইদার হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "শুনলি তো মোতি? কই, লাগা দিকিনি! জানলা থেকে সরো কর্তা!"

সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল মোতি হাতি হাঁটু দিয়ে একতলার দেয়ালটা একটু ঠেলে দিল, আর অমনি পড়্-পড়্ মড়্-মড়্ করে দেয়াল ভেঙে, জানলা ভেঙে, নীচের রাস্তা অবধি দিব্য একটা সাঁকোর মতো হয়ে গেল। আমি আর অপেক্ষা করলাম না, অমনি পড়ার ব্যাগটা বগলে পুরে এক দৌড়ে নেমে এলাম। হাতির লাইন সুদ্ধু হাইদার ততক্ষণে হাওয়া। কোথাও ওদের দেখতে পেলাম না।

আমি ছুটে মোড়ের মাথায় গিয়ে বাস ধরলাম। যখন বালিগঞ্জে আমাদের বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন হয়তো রাত নটা, বাবাদের খাবার দিচ্ছিল। আমাকে দেখে বাবার চক্ষু চড়কগাছ। মা হয়তো বকবেন বলে তৈরি হচ্ছিলেন, আমি ছুটে গিয়ে বাবার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে-কেটে একাকার করলাম।

আমার গলার আওয়াজ শুনে বুল্টিও ঘর থেকে বেরিয়ে এল, কিছুতেই আর গেল না, বলল, "আমি সেরে গেছি, কেন যাব?" বলে হাউমাউ করে সেও বাবার কোলে মুখ গুঁজে কান্না জুড়ে দিল। ভারি ছিঁচকাঁদুনে হয়েছে মেয়েটা।

ঠিক তখনি আমাদের জন্য পুতুল, হকি-স্টিক, বেলুন, মুড়ি-ল্যাবেঞ্চুশ, শোনপাপড়ি নিয়ে জ্যাঠামশাই এলেন। আমরা বাবার গেঞ্জিতে চোখ-টোখ মুছে ফেললাম।

অনেক রাতে বাবার পাশে শুয়ে ঘরে বন্ধ থাকার কথা, হাইদার আর মোতি হাতির কথা বাবাকে বললাম।

বাবা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললেন, "তোর জ্যাঠামশাই যখন তোর মতো, আমি একটু ছোট, আমাদের মা-বাবা বর্মা থেকে আসার পথে জাহাজসুদ্ধ নিখোঁজ হয়ে যান। ঐ ঘরে আমরাও মাস তিনেক ছিলাম। বড় দুঃখেকষ্টে ছিলাম রে। তখনো রোজ রাতে হাইদার আসত, হাতির সারি নিয়ে। আমাদের ফল-টল খেতে দিত। একদিন হঠাৎ বলল কাল তোমাদের মা-বাবা আসবে দেখো। ওমা, সত্যিই তাই। ঝড়ে পড়ে জাহাজ আসতে দেরি হয়েছিল। সবাই ভেবেছিল জাহাজডুবি হয়েছে। আরো কিছুদিন ছিলাম ঐ বাড়িতে, কিন্তু হাইদার আর হাতিরা আর আসে নি।"

আমি বললাম, "তোমরা কেন গলি দিয়ে পিলখানায় গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করলে না?"

বাবা আস্তে-আস্তে বললেন, "পিলখানা? পিলখানা কোথায় পাব রে? সে তো আরো একশো বছর আগেই ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছিল।"

বললাম, "আর দেখো নি, বাবা?"

বাবা বললেন, "না রে শুধু দুঃখী লোকেরা ওদের দেখতে পায়।"

গোলাবাড়ির সার্কিট হাউস

যারা শহরে বাস করে তারা দু চোখ বুজে জীবনটা কাটায়। কোনো একটা বিদেশী তেল কোম্পানির সব থেকে ছোট সাহেব অরূপ ঘোষের মুখে এ কথা প্রায়ই শোনা যেত। সাহেব বলতে যে বাঙালী সাহেব বোঝাচ্ছে, আশা করি সে কথা কাউকে বলে দিতে হবে না। বিলিতি বড় সাহেব আজকাল যদি-বা গুটিকতক দেখা যায়, ছোট সাহেব মানেই দিশি! তবে অরূপের বুকের পাটাও যে কারো চেয়ে নেহাত কম, এ কথা তার শত্রুরাও বলবে না।

সমস্ত বিহার, ওড়িষ্যা আর পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে অজস্র গাড়ি চলার ভালোমন্দ পথ আর অগুন্তি রাত কাটাবার আস্তানা আছে, এ বিষয়ে যারা ও-সব জায়গায় না গিয়েছে, তাদের কোনো ধারণাই নেই। অদ্ভুত সব অভিজ্ঞতার গল্প বলে তারা। বিশেষ করে কোনো নির্জন আস্তানায় দু-চার জনা যদি অতর্কিতে একত্র হয়। সেদিন যেমন হয়েছিল। বলাবাহুল্য অরূপ ছিল তাদের একজন।

বিদেশী তেল কোম্পানীর ছোট বড় সাহেবদের তিন বছরের বেশি পুরোনো গাড়ি চড়ে বেড়ানো নিতান্ত নিন্দনীয়। কাজেই অরূপের গাড়িটা খুব পুরোনো ছিল না। কিন্তু হলে হবে কি, দুর্ভোগ কপালে থাকলে তাকে এড়ানো সহজ কথা নয়, কাজেই এই আস্তানায় পৌঁছতে শেষ বারো মাইল আসতে, তার দেড় ঘণ্টা লেগেছিল এবং পঁচিশবার নামতে হয়েছিল। ফুয়েল পাম্পের গোলমাল, সেটি না সারালেই নয়। অথচ ক্ষুদে অখ্যাত বিরামাগারের সামনের নদীর মাথায় কোথাও প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে থাকবে, তার ফলে নদী ফেঁপে ফুলে একাকার। পুরোনো লড়ঝড়ে পুল থরহরি কম্পমান। আত্মহত্যা করতে ইচ্ছুক ছাড়া কেউ তাতে চড়তে রাজি হবে না।

তবে এর চাইতে অনেক মন্দ জায়গাতেও রাত কাটিয়েছে অরূপ। সেই কথাই হচ্ছিল। ম্যানেজার ছাড়া, শুধু একটা চাকর। তা ছাড়া তিনজন আগন্তুক; অরূপকে নিয়ে চারজন। ম্যানেজার মানে

কেয়ার-টেকার। এখানে কেউ থাকেও না, খায়-দায়ও না। হয়তো দৈবাৎ অসুবিধায় পড়লে রাত কাটিয়ে যায়। নিজেদের খাবার-দাবার খায়।

বনবিভাগের ইন্‌সপেক্টর কাম্রো সাহেব ডি-সিল্‌ভা বলল, "আরে তোমরাও তো খাও-দাও, ঘুমোও।" তা খায় সত্যিই। কেয়ার-টেকার খৃশ্চান; যে বেয়ারা রাঁধে সে কেয়ার-টেকারের হুকুম পালে বটে; কিন্তু তার হাতে খায় না। নদীর ওপারে মাইল দেড়েক দূরে রবি গাঁও থেকে রসদ কিনে আনতে হয়। আজ আর কেউ নদী-পার হতে পারে নি। ভাঁড়ার ঠন্‌ঠন্‌। তা ছাড়া এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন আর যে-কেউ এসে উঠলেই অমনি তার নফর হতে হবে, এমন যেন কেউ আশা না করে।

ডি-সিল্‌ভা পরিষ্কার বাংলা বলে, তার আদি নিবাস ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। এবার সে রেগে উঠল। "মাই ডিয়ার ফেলো, আমি তোমাদের মতো নই, আমি ইউরোপিয়ান, তোমাদের রাঁধাবাড়ার তোয়াক্কা রাখি না। আমার রসদ আমার সঙ্গে থাকে। আমি শুধু জানতে চাই এ জায়গাটা রাত কাটাবার পক্ষে নিরাপদ কি না।"

অরূপ না হেসে পারল না। "বনের মধ্যে যার কাজ তার অত ভয় কিসের?"

তৃতীয় ব্যক্তির নাম নমসমুদ্রম কি ঐ ধরনের কিছু। বোধ হয় পুলিশের লোক। ডি-সিল্‌ভার সঙ্গেই এসেছিল। সে সর্বদা ইংরেজি ছাড়া কিছু বলে না। এবার সে ব্যস্ত হয়ে বলল, "না, না, সেরকম ভয়ের কথা হচ্ছে না! আর হবেই-বা কেন? তোমাদের মতো উৎসাহী ইয়ংমেন তো এ-সব বনের শ্রেষ্ঠ-সম্পদ বন্য জন্তু মেরে-কেটে সাবাড় করে এনেছে! ও অন্য ভয়ের কথা বলছে।"

অরূপ জুতোর ফিতে ঢিলে করে, মোজাসুদ্ধ পা টেনে বাইরে এনে, আঙুলগুলো নেড়ে একটু আরাম বোধ করে বলল, "তা হলে কিরকম ভয়ের কথা মশাই?" সে তেল কোম্পানির কর্মী, রাষ্ট্রভাষা তার মুখে সহজে আসে। শুনে চতুর্থ ব্যক্তি দাড়ি নেড়ে বলল, "ঠিক, রাইট।" নমসমুদ্রম কাষ্ঠ হাসল—"এমন সব ভয়ের ব্যাপার যা বন্দুকের গুলিতে বাগ মানে না। ঠিক কি না?" ডি-সিল্‌ভা বলল, "অবিশ্যি আমার তাতে এসে যায় না। ইউরোপের লোকেরা এ-সব

বিষয়ে অনেকটা উদার। তা ছাড়া আমার পীরের দরগায় মানত করা আছে। আমার ক্ষতি করে কার সাধ্যি।"

সরদারজি বললেন, "তবে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে বৈকি। এই যেমন গত বছর সবাই পই-পই করে বারণ করা সত্ত্বেও আমাদের ট্রাক দুর্ঘটনার অকুস্থলে যাবার পথে মোপানির ডাক-বাংলায় রাত কাটালাম। বেশ ভালো ব্যবস্থা, আমার ড্রাইভারটি আমার সঙ্গে থাকে, চৌকিদারটিও ভদ্র। আমার ঘর দেখিয়ে দিয়ে আর স্নানের ঘরে জল আছে কি না অনুসন্ধান করেই সে হাওয়া হয়ে গেল। আমিও ক্লান্ত ছিলাম, মনে যথেষ্ট দুর্ভাবনাও ছিল, তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। মাঝরাতে উঠতে গিয়ে খাটের পাশে ঠ্যাং ঝুলিয়ে, ও হরি, তল পাই না! কিছুতেই আর মেজেতে পা ঠেকল না। নামাও হল না। কখন আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি যে-কে সেই। খাটের পাশে ঐ তো চটিজোড়া রয়েছে, কেউ ছোঁয়ও নি। ভালো করে ঘরটা পরখ করলাম, কেউ যে দড়ি বেঁধে কি অন্য উপায়ে খাটটাকে শূন্যে তুলবে, তার কোনো চিহ্ন নেই। ভাবলাম দুঃস্বপ্ন দেখেছি। কাপড়-চোপড় পরে চায়ের জন্য বসে বসে হয়রান হয়ে, চৌকিদারের ঘরে গিয়ে তাকে টেনে বের করলাম। আমাকে দেখে সে অবাক! 'সাহাব, আপনি—আপনি—! ও বাংলোতে তো কেউ রাত কাটায় না। কাল সেই কথাই বলতে চেষ্টা করছিলাম, আপনি কানও দিলেন না।'

"হাসলাম। আমার কনুই-এর ওপর কালীঘাটের মাদুলী বাঁধা সে কথা আর ব্যাটার কাছে প্রকাশ করলাম না। অবিশ্যি বলা বাহুল্য জায়গাটার নাম মোপানি নয়। সরকারের ক্ষতি করতে চাই না বলে নামটা পাল্টে দিলাম।"

নমসমুদ্রম বলল, "ডি-সিল্ভার আর আমার গত বছর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। তরাইয়ের এক চা বাগানে এক বন্ধুর বাড়িতে অতিথি হয়েছিলাম। বাগানও দেখব, ডি-সিল্ভা কি-সব গাছের নমুনা সংগ্রহ করবে আর আমার একটা তদন্তের কাজও ছিল। সন্ধে থেকে চা-বাগানে কেমন একটি অস্বস্তি লক্ষ্য করলাম। অন্ধকারের আগেই আপিস-সেরেস্তার কারখানা-গুদোমখানার দরজা-জানলা দুম্‌দাম্‌ বন্ধ হয়ে গেল। কর্মীরা যে যার কোয়ার্টারে দোর দিল।

"অথচ এখানে এমন কিছু একটা শীত পড়ে নি। আকাশে ফুট্‌ফুট্‌ করছে চাঁদ। সকালসকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে, চা-বাগানের মালিকও নিজের শোবার ঘরের দিকে রওনা হলেন। আমাদের বললেন, 'শুয়ে পড় তোমরা, এ সময়টা এ-সব জায়গায় খুব ভালো নয়। শিকার? কাল সকালে ভালো শিকারের বন্দোবস্ত করেছি।' কিন্তু এত সকালে শোব কি! বন্দুক নিয়ে দুজনে বাথরুমের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

"চা-বাগান গিয়ে ঘন বনে মিশেছে। মাঝখানে শুধু একটা উঁচু সেতু। সেটা পেরুনো আমাদের কাছে কিছুই নয়। পূর্ণিমায় কখনো বনের মধ্যে বেড়িয়েছেন? চাঁদের আলো পাতার ফাঁক দিয়ে কুচিকুচি হয়ে, এখানে ওখানে পড়ে, হীরের মতো জ্বলে। কোথাও অন্ধকার জমে থক্‌-থক্‌ করে। মনে হয় গাছগুলো জেগে উঠে চোখ মেলে চেয়ে দেখছে। গা শির্‌শির্‌ করে। কোথাও সাড়া-শব্দ নেই।

"হঠাৎ দেখি আমাদের থেকে দশ হাত দূরে প্রকাণ্ড নেকড়ে বাঘ। এত বড় নেকড়ে এ-দেশে হয় জানতাম না। তার চোখ দিয়ে আলো ঠিকরোচ্ছে, মুখটা একটু হাঁ করা, বড়-বড় দাঁতের ফাঁক দিয়ে লালা ঝরছে। মাথাটা একটু নিচু করে, বিদ্যুৎবেগে সে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আর গায়ের চাপে ঝোপ-ঝাপগুলো সরে সরে যাচ্ছে।

"আমার সারা গা হিমের মতো ঠাণ্ডা ঘামে ভিজে গেল। বন্দুক তুলবার জোর পাচ্ছিলাম না। অথচ ডি-সিল্‌ভা নির্বিকার। যেই জানোয়ারটা আমাদের পার হয়ে গেল, মনে হল এমন সুযোগ আর পাব না। অমনি সম্বিৎ ফিরে এল। বন্দুক তুলে ঘোড়া টিপলাম। খুব বেশি হলে জন্তুটা তখন আমাদের কাছ থেকে সাত-আট হাত দূরে। আমার অব্যর্থ লক্ষ্য। গুলিটা তার গা ফুঁড়ে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরদিন একটা গাছের গায়ে সেটাকে বিঁধে থাকতে দেখা গেছিল।

"নেকড়েটা ভ্রূক্ষেপও করল না। যেমন যাচ্ছিল তেমনি নিমেষের মধ্যে চোখের আড়াল হয়ে গেল। আমার কেমন মাথা ঘুরে গেল, ডি-সিল্‌ভা না ধরলে পড়েই যেতাম।" অরূপ বলল, "ভারি অদ্ভুত তো!"

ডি-সিল্‌ভা চুপ করে শুনছিল। এবার সে মুখ থেকে সিগারেট বের করে বলল, "অদ্ভুত বললে অদ্ভুত! আমি তো ওর পাশে দাঁড়িয়েও নেকড়ে-ফেকড়ে কিছু দেখলাম না, খালি একটা বুনো গন্ধ নাকে এল। একফোঁটা রক্তও মাটিতে দেখা গেল না। পরদিন ভোরে বাগানের মালিক শিকারের প্ল্যান বাতিল করে দিয়ে, একরকম জোর করেই আমাদের রওনা করে দিলেন। খুব বিরক্ত মনে হল। তবে এ-সব ব্যাপারে কোনো এক্সপ্ল্যানেশন খুঁজবেন না, মশাই। নেহাত সমুদ্রের মা গুরু-বংশের মেয়ে, নইলে আর দেখতে হত না।"

অরূপ খুবই অস্বস্তি বোধ করছিল। এদের যত সব গাঁজাখুরি গল্প। ইণ্টেলিজেন্সের অপমান। ডি-সিল্‌ভা বলল, "কি হল? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? বনে-জঙ্গলে, নির্জন জায়গায় আমাদের মতো ঘুরে বেড়ান কিছুদিন, তার পর দেখবেন সব অন্যরকম মনে হবে।"

সরদারজিও হাসলেন। বললেন, "বিশেষ করে যদি গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসে একবারটি রাত কাটাতে হয়।" পরিবেশটি যে এইরকম একটা আলোচনারই যোগ্য সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না। এক দিকে ক্ষুব্ধ নদীর জল ফুঁসছে, অন্য দিকে বনের গাছপালায় বাতাসের আলোড়ন, তার উপর মেঘলা আকাশের নীচে চার দিক থেকে এরই মধ্যে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। বাতাসটা থম্‌থমে।

তবু, গোলাবাড়ির সার্কিট হাউসের নাম শুনে অরূপের হাসি পেল। সে উঠে বসে জিজ্ঞাসা করল, "কেন সেখানে কি হয়?" সরদারজি যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "সেকি! আপনি থাকেন কোথায় যে অমন একটা সুখ্যাত জায়গার কথা জানেন না? ভাবতে পারেন সেখানে টাকা দিয়েও সরকার কখনো একটা চৌকিদার কি বেয়ারা রাখতে পারে নি। কেউ রাজি হয় নি। এটা একটা হিস্টরিকেল ফ্যাক্ট। বনের মধ্যে খাঁ-খাঁ খালি বাংলো পড়ে থাকত। নাকি সন্ধের পর জন্তু-জানোয়ারও তার ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না।"

অরূপ আবার হেসে উঠল। "তাই নাকি? অথচ আমি সেখানে পরম আরামে গতকাল রাত্রিবাস করে এলাম। চৌকিদারের আপ্যায়ন আর বাবুর্চির রান্নার তুলনা হয় না। কোত্থেকে যে ঐ ব্যাক-অফ-বিয়ণ্ডে আমার জন্য মাশরুম আর অ্যাসপ্যারাগাস জোগাড় করে

তার পরেই সব ছায়া-ছায়া হয়ে গেল।...সরদারজি অরূপকে সঙ্গে টেনে নিলেন।

খাওয়াল তা ওরাই জানে। জানেন ফেদার-বেডে রাত কাটালাম। পোর্সিলেনের বাথ-টাব ভরে গরম জল দিল। একটা পয়সা নিল না দুজনার একজনও। কত মন-গড়া গল্পই যে আপনারা বিশ্বাস করেন তার ঠিক নেই। তবে এ কথা সত্যি যে আমার গাইড বুকে ওটার নামেও পাশে লেখা আছে, অ্যাবাণ্ডনড্ ১৯০০ এ. ডি.। গাইড-বুকের লেখকও তেমনি। নিশ্চয় আপনাদের কারো কাছ থেকে ঐ তথ্য সংগ্রহ করেছিল!" বলে অরূপ খুব হাসতে লাগল। "আর তাই যদি বলেন, গাইডবাবুকে আমাদের আজকের এই আস্তানারও নাম নেই, তা জানেন? এটাই-বা এল কোত্থেকে?"

অরূপ হাসলেও বাকিরা কেউ হাসল না। তারা বরং ত্রস্ত চঞ্চল হয়ে উঠে, "ম্যানেজার! ম্যানেজার!" বলে চেঁচাতে লাগল। এলও ম্যানেজার এক মুহূর্তের জন্য, বেয়ারাটাও এল। কি যেন বলবারও চেষ্টা করল। তার পরেই সব ছায়া-ছায়া হয়ে গেল। ঘর বারান্দা কিছুই রইল না। শুধু সামনে অন্ধকার বন আর পিছনে নদীর ফোঁস্-ফোঁসানি। ওরা ধুপ্‌ধাপ্ করে যে যার গাড়িতে উঠে পড়ল। সরদারজি অরূপকে সঙ্গে টেনে নিলেন। পনেরো মাইল ফিরে গিয়ে ছোট শহরে ওরা রাত কাটিয়ে সকালে যে যার পথ দেখল। কারো মুখে কোনো কথা নেই।

খালি অরূপকে জীপ ও লোকজন নিয়ে একটু বেলায় গিয়ে গাড়িটা উদ্ধার করতে হল। তখন নদীর জল কমে গেছে, পুল আর কাঁপবে না। গাড়ি সারানো হলে অরূপ পুল পার হয়ে ওদিকের পথ ধরল। তার আনা লোকগুলোর পাওনা চুকিয়ে জিজ্ঞাসা না করে পারল না, "নদীর তীরে গাছের নীচে শুকনো ফুল কেন?" তারা হেসে বলল, "গাঁয়ের লোকের কুসংস্কার মশাই। মাসে একবার এখানে বুনকিদেওর পুজো দেয়। তিনি নাকি বিপন্ন যাত্রীদের রক্ষা করেন।" অরূপ বলল, "গোলাবাড়ি সার্কিট হাউসের ব্যাপারটা কি?" তারা অবাক হয়ে বলল, "সে তো কবে ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে গেছে।"

অশরীরী

এখন আমি একটা সাধারণ খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও, এক বছর আগেও একটা সাংঘাতিক গোপনীয় কাজ করতাম। সে কাউকে বলা বারণ। বললে আর দেখতে হত না, প্রাণটা তো বাঁচতই না, তার ওপর সব চাইতে খারাপ কথা হল যে চাকরিটাও চলে যেত। তবে এটুকু বলতে দোষ নেই যে কাজটা ছিল খবর সংগ্রহ করা। কোথায়, কেন, কার জন্য, সে-সব তোমরাই ভেবে নিয়ো।

আমার বয়স তখন বাইশ; নামটা আর বললাম না। আমাদের পাড়ার হরিশ খুড়ো চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনেই আমার বড় সায়েব—সায়েব হলেও তিনি কুচ্‌কুচে কালো—আমাকে বলেছিলেন, "দেখ সর্বদা 'নেই' হয়ে থাকবে। তুমি যে আদৌ আছ সে কথা টের পাওয়া গেলে চলবে না। তোমার আলাদা একটা চেহারা, কিম্বা চলা ফেরা, কিম্বা কথা বলার ধরন গজালেই চাকরিটা যাবে। পানাপুকুরে এক ফোঁটা ময়লা জল হয়ে থাকবে, সমুদ্রের ধারে এক কণা বালি হবে, এক কথায় স্রেফ অশরীরী হয়ে যাবে। কথা বললে কি বলছ এটুকু বোঝা যাবে, কিন্তু আলাদা করে গলার আওয়াজ মালুম দেবে না। আর সব চাইতে বড় কথা হল যে নিজের চেহারা বলে কিছু রাখতে পাবে না, যাতে তুমি মরে গেলেও তোমাকে সনাক্ত করা না যায়। ওরকম করে তাকাচ্ছ কেন, এ কিছু শক্ত কাজ নয়, কিছু করতে হবে না, স্রেফ 'নেই' হয়ে থাকতে হবে। বেশি লেখাপড়া জানারও দরকার নেই। বলো, পারবে তো?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সার।"

বড় সায়েব বেজায় রেগে গেলেন, "ফের কথার ওপর কথা। চুপ করে থাকতেও কি শেখাতে হবে না কি? কি নাম তোমার?"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

সায়েব খুব খুশি হয়ে বললেন, "খুব ভালো। মাইনে নেবার সময়

নাম লিখবে না, টিপ-সই দেবে না। নাম তো ভাঁড়ানো যায়, কিন্তু টিপ-সই দিয়ে সবাইকে চেনা যায়। দুনিয়ার কোনো দুজন লোকের একরকম আঙুলের ছাপ হয় না। ১লা তারিখে আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাবে, খাতায় লেখা হবে 'নষ্টামি বাবদ দুইশো টাকা।' আচ্ছা, যেতে পার।"

আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে তিনটে আঙুল দেখালাম। বড় সায়েব হেসে, বললেন, "আচ্ছা, তিনশো টাকাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, বিপদে পড়লে আমরা বলব তোমাকে চিনি না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম শুনলাম আমার নতুন নাম ইংরিজি হরপের 'কিউ'। যেখানে যত সন্দেহজনক খবর শোনা যেত, নিজে দেখে এসে আপিসের পাশের গলিতে ভাঙা টাইপ-রাইটার ভাড়া খাটত, তাতে টাইপ করে জমা দিতে হত। তার পরের ছয় মাসে কোথায় যে না গেলাম, কি যে না দেখলাম, তার ঠিক নেই। অথচ আমাকে কেউ দেখতে পেত না। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে যেতাম। যেখানে ভিড় নেই শুধু ভাঙা দেয়াল, সেই দেয়ালে একটা দাগ হয়ে মিশে থাকতাম। একবার একটা চোরাই গুদোমে সারাদিন শ্রমিকদের একজন হয়ে গিয়ে রাশি রাশি গোপন খবর এনে দিয়েছিলাম। বড় সায়েবের মাইনে বেড়ে গেছিল। আরেকবার একটা বিদেশী মাল-জাহাজে সারাদিন একটা পিপে হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা খুঁজিয়ে পাইয়ে দিলাম। সেইজন্য খবরের কাগজে বড় সায়েবের সে কি প্রশংসা।

সে যাই হোক শেষবারের কাজটার কাছে ও-সব কিচ্ছু না। নাকি গড়িয়ার দিকে এতকাল কোনো বে-আইনি কাজ হয় নি যে সকলের সন্দেহ হল নিশ্চয় কোনো গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। তার ওপর সব বাংলা কাগজে যখন ছোট্ট একটা নোটিশ বেরুল টিপ-বোতাম পরিষদের প্রথম সভা শু-শু-৭, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে গড়িয়াতে, শুক্রবার সাতটায় গোপন সভা বসবে।

বড় সায়েবের ঘর থেকে প্রায় অদৃশ্যভাবে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাঁর পেয়ারের বেয়ারা বলল, "টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেবে না।" রুমাল জড়িয়ে হাত পাতলাম। সে এক কুচি লাল কাগজ বের করে বলল, "দু টাকা।" একটা আঙুল দেখালাম। তাকে টাকা দিয়ে টিকিট পকেটে ফেলে চলে এলাম।

শুক্রবার পাঁচটায় যখন বাসে সব চাইতে ভিড় হয়, তখন, বেছে বেছে সব চাইতে ভিড়ের বাসে উঠলাম। উঠে চারটে লোকের মধ্যিখানে এমন 'নেই' হয়ে রইলাম যে কণ্ডাক্টার টিকিট চাইল না। চাইবে কেন, আমার তো আর শরীর-টরীর নেই যে বাসের জায়গা জুড়ে থাকব।

গড়িয়াতে নেমেই একটা চায়ের দোকানে ভিড় দেখে, সটান সেখানে গেলাম। এক ভাঁড় বেজায় হালকা, বেজায় গুড়ের চা নিয়ে, তক্তার ওপর দশ পয়সা ফেলে দিলাম। সস্তা তো হবেই, শুকনো শালপাতা দিয়ে এ-সব চা বানাতে হয়, চা-পাতা দিলে আর ঐ দামে দিতে হত না।

ভাঁড় নিয়ে একটা বাঁশের খুঁটির পিছনে গুম্ হয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে হাসাহাসি হচ্ছিল ঐ শুক্রবার নিয়ে নাকি চারদিন পকেট-মার হয় নি। চট্ করে বুঝে নিলাম সভা তা হলে পকেটমারদের। একটা চিম্‌ড়ে লোক চায়ের ভাঁড় শেষ করে, সামনের বাঁশবাগানের দিকে পা বাড়াতেই, বাকি সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল—"মশাই অমন কাজও করবেন না! ঐ বাঁশবাগানের পথ দিয়ে একটিমাত্র জায়গায় যাওয়া যায়, সেটি হল গোরে-বাড়ির ভাঙা কেল্লা, ভূতদের থান। দিনের বেলাতেও ও-পথে কেউ যায় না। কাগ-চিল, কুকুর-বেড়ালও না।"

লোকটা ভয়ে ভয়ে ইদিক-উদিক তাকিয়ে উল্টো দিকের মাঠের পথ ধরল। সকলে হাঁপ ছেড়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল। আমিও সেই সুযোগে ঐ লোকটির পিছন পিছন চললাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মাঠ ভেঙে ঘুরে সে আবার বাঁশ বাগানের ও-পারে, সেই রাস্তাটাই ধরল। আমি তার পিছনে 'নেই' হয়ে চললাম। শুকনো পাতার ওপর এতটুকু পায়ের শব্দ হল না, নইলে এতদিন কি শিখলাম!

তার পরেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। সামনেই একটা প্রকাণ্ড ভাঙা কেল্লা। সেখানে পৌঁছে পথটাও শেষ হয়ে গেছে। কেল্লার চুড়োটা শুধু দেখা যাচ্ছে, চারি দিকে এমনি ঘন বন হয়ে গেছে, যে তার বেশি কিছু ঠাওর হল না। লোকটা একটুও দাঁড়াল না, সটাং বনের মধ্যে দিয়ে সেঁদিয়ে গিয়ে, কেল্লার লোহা-বাধানো প্রকাণ্ড সদর দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশে ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। আমিও তার সঙ্গে-সঙ্গে ভিতরে সেঁদিয়ে গেলাম; সে কিছু টেরই পেল না।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ, তার ও-ধারেই মস্ত ঘরে সভা বসেছে। সে কী ভিড় আর কী ভয়ঙ্কর তর্কাতর্কি! ঘরে একটা জানলা নেই, উঁচু ছাদে কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস আসে, তাও এমন আড়াল করা যে বাইরে একবিন্দু আলো যাচ্ছে না। যদিও ঘরে কয়েকটা ডে-লাইট বাতি জ্বলছে, তাতে ঘরের অন্ধকার কাটছে না, ঘুপ্‌সি ঘুপ্‌সি ভাব, একটা সোঁদা গন্ধ, পায়রার, নাকি বাদুড়ের বা অন্য বিকট কিছুর কে বলতে পারে।

সেই অন্ধকারের সঙ্গে আমি মিশে যেতে যেতে বুঝলাম যে কেউই আলো চায় না; কারো মুখ চেনা যাচ্ছে না; সকলের একরকম কাপড়চোপড়, চেহারা, ঘাড় গুঁজে বসার আর আড়চোখে চাওয়ার অভ্যাস। এদের সঙ্গে আমার এতটুকু তফাত নেই দেখে, নিশ্চিন্তে অদৃশ্যভাবে একটা থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালাম। দরজার কাছে। বেরুবার পথ ঐ একটি, আর সব বন্ধ, হয়তো একশো বছর খোলা হয় নি, খোলা যায়-ও না।

ফ্যাঁস্‌ফেঁসে বেড়ালে গলায় যা বলা হচ্ছিল তার কতক কতক বুঝতে পারলাম। এরা ইউনিয়ন করতে চায়, কিন্তু শত্তুরদের জ্বালায় কিছু হয়ে উঠছে না। আজকের ঐ কুখ্যাত নির্জন জায়গায় কারো অনধিকার প্রবেশের কোনো সম্ভাবনাই নেই—হঠাৎ চমকে উঠলাম। একটা থামের পাশের সব চাইতে অন্ধকার কোণ দিয়ে সর্‌-সর্‌ করে কেউ ছাদের অস্পষ্টতা থেকে নেমে এসে, আমার থামের ও-পাশে দাঁড়াল। আমার গা শিউরে উঠল।

বক্তা তাঁর সরু সরু হাত-পা নেড়ে বলে চললেন, "সাধারণ-নাগরিকদের অধিকার থেকে কেন আমাদের বঞ্চিত করা হবে? জনতা থেকে আমরা অভিন্ন, আলাদা করে চিনুক তো কেউ! বলুক দেখি আমরা কেমন দেখতে, কেমন গলার আওয়াজ! আমাদের—" আমার গা শিউরে উঠল! আরো গোটা দশেক ছায়া ছায়া মতো এ-কোণ থেকে ও-কোণ থেকে বেরিয়ে এসে আবছায়াতে মিশে রইল।

বক্তা একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমাদের একটা আস্তানার দরকার ছিল, এর চাইতে ভালো আস্তানা কোথায় পাওয়া যাবে? আমরাই তো আসল অশরীরী, সকলের চোখের কাজ করি, কেউ আমাদের দেখতে পায় না। এই ছোট ইঁটের টুকরো ফেলে আজ এখানে

আমাদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা—" এই অবধি বলে ইঁটটা হাতে করে তুলেছে অমনি ঘরে, একটা শোরগোল উঠল, না, না, না, ন্‌—তার পরেই মনে হল ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে পঁচিশ-ত্রিশটা ছায়ামূর্তি বক্তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি অদৃশ্যভাবে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। বক্তা একটা কোঁক্ শব্দ করে বসে পড়ল।

হঠাৎ বক্তার পাশে বসা ছুঁচোমুখো একটা লোক গর্জন করে উঠল, "নটে! ভজা! কাতিক! কি কচ্ছিসটা কি? এই সম্‌সা!" সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য ভাব ছেড়ে দিয়ে গোটা পঞ্চাশেক ছোকরা খালি হাতেই মঞ্চের উপর উঠে পড়ে। ওরে বাপ্ রে! সেই ছায়ামূর্তিগুলোকে পেল্লায় পেটাতে লাগল। সেই ফাঁকে বক্তা উঠে পড়ে দে দৌড়।

আমি এমন পেট্‌নাই জন্মে দেখি নি। আগন্তুকদের আগাপাশতলা ধাঁই-ধড়াক্কা মার। তার মধ্যে কে রব তুলল, "ব্যাটারা সব পুলিশের চর, অশরীরী সেজে এয়েচেন। লাগা! লাগা! ভজা, দেখছিস কি?" ভজা বললে, "পেছলে যাচ্ছেন যে!"

শেষটা তাদের পৃষ্ঠভঙ্গ দিতেই হল। সুড়ুৎ সুড়ুৎ করে মঞ্চ থেকে নেমে, স্রেফ জলের স্রোতের মতো ভিড়ের মধ্যে দিয়ে গলে, ঘরের একটি মাত্র দরজা দিয়ে সব নিমেষের মধ্যে বেরিয়ে পড়ল! ধন্যি পুলিশের ট্রেনিং!

হয়তো একটু অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখবার জন্য বোধ হয় ভিড় থেকে কিঞ্চিৎ আলাদা হয়ে পড়েছিলাম। কারণ পালাতে পালাতে শেষের লোকটা আমাকে দেখতে পেয়ে একরকম কোল-পাঁজা করে তুলে ধরে বাইরের জঙ্গলের মধ্যে এনে ফেলে বলল, "চঁলে চঁল্! চঁলে চঁল্! দেঁখছিস কিঁ!" বলে একটা শ্যাওড়া গাছের ডাল বেয়ে উঠে পড়ল।

ততক্ষণে ডে-লাইট হাতে নিয়ে নটে ভজারাও দোর-গোড়ায় দেখা দিয়েছে। সেই আলোতে দেখলাম যে লোকটা গাছে চড়ছে, তার গোড়ালি দুটো সামনের দিকে। তক্ষনি গাছ-গাছড়ার সঙ্গে মিশে গিয়ে মুচ্ছো গেলাম। ওরা বোধ হয় আমাকে খুঁজে পায় নি। অবিশ্যি আমি যে আছি, তাও ওরা জানত না। খুঁজবে কাকে?

বড় সাহেবের কাছে আর যাই নি। আজকাল খবরের কাগজের জন্য সংবাদ সংগ্রহ করি। অবিশ্যি একেবারে 'নেই' হয়ে।

নটের বেশি সাহস। সে বলল, "কি যে বলিস, গুরু। লোকে বলে তেপান্তরের মাঠ জায়গা ভালো নয়। তোর যেমন কথা। আরে, লোকে তো এও বলে যে নটে-গুরু ছেলে ভালো নয়।" বলতেই গুরু ফিক্ করে হেসে ফেলল।

তা ছাড়া একেবারে দশ-দশটা টাকা কেই-বা দিচ্ছে কাকে? ওখানে এক রাত্তির বাস করলেই বাড়ির মালিক যদি ঐ অতগুলো টাকা দেয়, তা হলে থাকবে নাই-বা কেন? নাকি একশো বছর কেউ ওখানে রাত কাটায় নি। মনে পড়তেই গুরু অবাক হল, "হ্যাঁরে নটে, সত্যি কেউ রাত কাটায় না?"

"কেউ না, কেউ না, উদ্বাস্তুরাও তেপান্তরের মাঠ পার হয় না।"

আড়চোখে গুরুর দিকে চেয়ে নটে বলল, "কেউ কিছু বললে নাহয় পালিয়ে আসব। তাই বলে এমন একটা সৎ-কাজ করব না?"

তাই বটে। ওখানে রাত কাটাতে পারলে, বাড়িওলার বাড়ি বিক্রি হবে, কল্যাণ সঙ্ঘ সস্তায় ওটা কিনবে, কিনে ভেঙে ফেলবে, এক দঙ্গল লোক মজুরি পাবে। উদ্বাস্তুরা মিনি-মাগনায় ইঁট-কাঠগুলো পাবে, নতুন বাড়ি উঠবে, মুটে, মজুর, মিস্ত্রি, ঠিকাদার, সক্কলের কম-বেশি রোজগার-পাতি হবে। যাদের কেউ নেই তারা সেখানে থাকবে, ইস্কুল হবে, কাঠের আসবাবের কারখানা হবে, বই বাঁধাইয়ের দোকান হবে, হাঘরেরা চাকরি পাবে, আর—আর নটে-গুরুও দশ টাকা পাবে।

বাড়ির মালিক কালো চশমার ভিতর দিয়ে ওদের মাথা থেকে পা অবধি দেখে নিয়ে বললেন, "খারাপ জায়গা হলে থাকতে বলব কেন? আমার নিজের ঠাকুরদার বাবার তৈরি, চার দিকে আম জাম কাঁঠাল নারকোলের গাছ, তার বাইরে এক মানুষ উঁচু পাঁচিল। অথচ কেউ না থাকলে কল্যাণ সঙ্ঘের বাবুরা কিনবে না। শোনো একবার কথা! অমন ভালো বাড়ি, পুব-দক্ষিণ খোলা, আদি গঙ্গার ধারে।"

নটে বলল, "আপনি নিজে গিয়ে একরাত থেকে ওদের দেখিয়ে দিন

না কেন ? আপনার দশ টাকা বেঁচে যায়।"

মালিক বললেন, "দশ টাকা বেঁচে যায় ? দশ টাকাকে আমি নস্যির মতো মনে করি। তোরা একটি রাত কোনোরকমে থাক-না বাপ্, দশ কেন পনেরো টাকা দেব। আজ রাতেই যা।"

তাই শুনে গুরু নটের দিকে তাকাতেই মালিক বললেন, "কচুরি আলুর চাট, মিঠে গজা আর লিম্‌নেট টিপিন দেব সঙ্গে। কিন্তু সব ঘরের, দেয়ালে হরিনাম লিখে আসতে হবে। তবেই কল্যাণ সঙ্ঘ বিশ্বাস করবে অপদেবতা-টেবতার বাস নয় ও বাড়ি। বলে কিনা আমার অতি বড় বৃদ্ধ প্রপিতামহ দুই সন্ধে শিবপুজো করতেন।"

নটে-গুরু চলে গেলে, মালিকের বউ আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তেরিয়া হয়ে বলল, "একটু দয়া-মায়াও নেই শরীলে ? দুধের বাছাদের দিলে পাঠিয়ে ভূতের খপ্পরে! বলি, তুমি কি মানুষ ?"

শুনে মালিক অবাক, "কাকে দুধের বাছা বলছ ? ওদের দেখলে দুধ কেটে ছানা বেরোয়। ওরা হল গিয়ে কালীঘাটের মার্কামারা ছোঁড়া! বাড়িটা বিক্রি হয় তুমি চাও না ? ভূত ভাগাতে ওরাই পারবে। উপরন্তু টাকাও পাবে।'

এর ওপর আর কথা চলে না।

পরে গুরু বলল, "সন্ধে অবধি অপেক্ষা করে কাজ নেই, রোদ থাকতে থাকতেই চল্, তেপান্তর পেরিয়ে ওখানে গিয়ে আড্ডা গাড়ি। টিপিন তো বুড়োই দেবে বলেছে। অন্ধকারে তেপান্তরে গা ছম্-ছম্ করবে।"

যেমন কথা তেমনি কাজ। পাঁচটা না বাজতেই মালিকের বউয়ের রান্নাঘর থেকে পুরোনো একটা চুপড়ি ভরে কচুরি, আলুর চাট, জিবে গজা, কাঁচকলার আচার আর থলিতে চার বোতল লেমোনেড নিয়ে, বিকেলের পড়ন্ত রোদে নটে-গুরু তেপান্তরের ওপর দিয়ে পুবমুখো হাঁটা দিল। ওদের সামনে সামনে সরু লম্বা হয়ে ওদের ছায়া দুটোও চলল। গুরু থমকে দাঁড়িয়ে নটেকে বলল, "হ্যাঁরে, সত্যি আমাদেরই ছায়া তো ? মানে আর কিছু যদি সঙ্গে—" নটে ওর কান টেনে, ঘাড়ে রদ্দা মেরে দেখিয়ে দিল ওদেরই ছায়া বটে।

খুব বড় মাঠের জায়গাই-বা হবে কোত্থেকে ঐ এলাকায়। দেখতে দেখতে ডাঙা পেরিয়ে ওপারের রাস্তার কাছাকছি পেঁৗছে ওদের চক্ষুস্থির!

বলে নাকি একশো বছর কেউ বাস করে নি ও বাড়িতে। নটে-গুরু দেখল বাড়ি লোকজনে গম্‌গম্‌ করছে। আশে-পাশের যত উদ্বাস্তুদের সব চাইতে বদমাইস ছেলেমেয়েরা ঐ বাড়ির বাগানে জমায়েত হয়ে, সে কি হুল্লোড় লাগিয়েছে। সিকি কিলোমিটার দূর থেকে তাদের হৈ-চৈ, হ্যা-হ্যা হাসি, চ্যাঁ-ভ্যাঁ কান্নায় কানে তালা লাগার জোগাড়।

এ আবার কি গেরো রে বাবা। ওরা যে কাউকে ও-বাড়ির ত্রিসীমানায় এগোতে দেবে তা তো মনে হল না। আম-কাঁঠাল গাছের পাতা দেখা যাচ্ছে না, ফটকে চড়ে কম করে কুড়িটা ছেলেমেয়ে দোল খাচ্ছে। কেউ গেঞ্জি পরা, কেউ জাঙিয়া পরা, কেউ উদোম গায়ে কুচ্‌কুচে কালো রঙ, উস্কোখুস্কো মাথার চুল, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে। কারো হাতে ঢিল, কারো হাতে চ্যালা কাঠ! এগোয় কার সাধ্যি!

নটে বলল, "থামলি যে বড়? বাড়ির ভিতর ঢুকে দ্যালে হরিনাম লিখতে হবে না? বাড়ি তো বন্ধ দেখছি, চাবি-টাবিও দেয় নি বুড়ো। নাকি কোন কালে হারিয়ে গেছে।"

ছোট-ছোট এক রাশি পাথরের কুচি ওদের পায়ে মাথায় এসে পড়ল। রাগলে গুরুর জ্ঞান থাকে না, চটে-মটে বলল, "কি হচ্ছেটা কি?" একটা টিঙটিঙে রোগা ছেলে আঙুল দিয়ে চুপড়ি দেখিয়ে বলল, "কি আছে রে ওতে?"

"আমাদের টিপিন। এই বাড়িতে রাত কাটাব, তাই টিপিন এনেছি।" অমনি বিচ্ছুগুলো বলে কি না, "এ্যাঁ। তাই নাকি? তা টিপিনটা কি জিনিস বাপ্?"

নটে বলল, "কচুরি, আলুর চাট, জিবেগজা, কাঁচকলার আচার।" তাই শুনে আমগাছের ওপর থেকে বিশ-পঁচিশটা একসঙ্গে বলে উঠল, "বলিস কিরে! তা আমরাও তো এখানে রাত কাটাব। দে দে আমাদেরও ভাগ দে। এই-না বলে একটার ঠ্যাং আরেকটা ধরে ঝুলতে ঝুলতে বিশ হাত লম্বা একটা দুষ্টু ছেলের মালা বানিয়ে নটের হাত থেকে টিপিনের চুপড়িটা ছিনিয়ে নিয়ে, ঢাকনি খুলে, এক খাবলা এ খায় তো আরেক খাবলা ও খায়, এক নিমেষে চুপড়ি খালি করে ফেলে দিয়ে, ফটক হাট করে খুলে দিয়ে বলল, "আয় বাপ্, ভিতরে আয়, আমাদের এত খাওয়ালি, তোরা আমাদের বন্ধু।"

নটে-গুরুর মুখে কথাটি নেই। তবে বদমাইশ দেখে ভড়কাবার

মাত্র ওরা কেউ ছিল না। ওরা ভাবছিল এই তো ভালো হল, খাবারটা চললে তার আর কি করা যাবে। এমন তো আর নয় যে না খেয়ে রাত কাটিয়ে ওদের অভ্যাস নেই। এবার এদের দিয়েই বাড়ি খুলিয়ে দেওয়ালে হরিনাম লিখিয়ে কোনো মতে রাতটাকে ভোর করতে পারলেই হয়ে যাবে। তার পর কল্যাণ সংঘ এসে উদ্বাস্তু তুলুক, কিম্বা যা-খুশি করুক নটে-গুরুর কোনো আপত্তি নেই।

ওদের ঘিরে দাঁড়াল ছেলেমেয়েগুলো, "বল্ তোদের জন্য আমরা কি করতে পারি? তোদের মতো কেউ হয় না রে, বাপ্!" নটের সাহস বেশি, সে বলল, "তবে শোন, আমরা কেন এইচি বলি। এই বাড়িতে রাত কাটালে, বাড়ির মালিক আমাদের পনেরো টাকা দেবে বলেছে!" শুনে ওদের কি হাসি। "ধেৎ! তাই কখনো দেয়। বলে দোর-গোড়ায় মলেও মুখে একমুঠো গরম ভাত কেউ দেয় না!" অমনি সকলে চাকুম্-চুকুম্ ঠোঁট চেটে বলল, "ই-ই-স্! গরম গরম ভাত কি ভালো জিনিস রে বাবা!"

ওদের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা, সব চেয়ে রোগা, সব চেয়ে কালো যে তার নাম নাকি ঢ্যাঙা। সেই ঢ্যাঙা বললে, "তা বললে তো হবে না, চাঁদ। মিছিমিছি পনেরো টাকা দেবে কেন? একসঙ্গে পনেরো টাকা তো আমরা কেউ চক্ষেও দেখি নি।" গুরু বলল, "মিছিমিছি নয়। এখানে কেউ রাত কাটাতে পারলে, কল্যাণ সংঘের বাবুরা বাড়িটা কিনবে, আশ্রম বানাবে, ইস্কুল করবে, ছুতোরের দোকান করবে, বই বাঁধাবার কারবার করবে—"

হেঁড়ে গলায় ঢ্যাঙা বলল, "তা ঐ আশ্রমে কে থাকবেটা শুনি?" "কেন যাদের কেউ নেই বাড়িঘর নেই, তারা থাকবে।" হি হি করে হেসে একদল বলে উঠল, "আমাদের তো বাড়িঘর নেই, কেউ নেই। তা হলে আমাদের মতো ছেলেমেয়েরা থাকবে বলছিস? ভাত রাঁধা হবে তাদের জন্য? রোজ রোজ ভাত, রুটি, খিচুড়ি এই-সব হবে। সদরের তালাটা খুলে দিতে পার?" দেখা গেল উদ্বাস্তু ছেলেমেয়েগুলো লোক খারাপ নয়। অমনি ওরা হাঁক পাড়ল, "গিরগিটি রে, ওরে গিরগিটি, কোথা গেলি?" বলতে বলতে একটা হিল্‌হিলে রোগা ছেলে এসে বলল, "কেন, কি করতে হবে?'

"কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, শুধু দেয়াল বেয়ে তিন তলার ছাদে উঠে,

চিলেকোঠার ছিকলি খুলে বাড়ির সব দোর-জানলা খুলে দে।"

ব্যস্, আর বলতে হল না। যেমন কথা তেমনি কাজ। সত্যিকার গিরগিটির মতো সর্-সর্ করে দেয়াল বেয়ে ছেলেটা ওপরে গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব দরজা-জানলা খুলে হাট করে দিল। শুধু তাই নয়, কোত্থেকে সব কাঠকয়লার টুকরো, ভাঙা ইঁটের কুচি এনে, এর পিঠে ও চেপে, দেখতে দেখতে প্রত্যেক ঘরের ছাদ থেকে নীচে পর্যন্ত হরিনাম লিখে ফেলল! নটে-গুরু হাঁ।

এর মধ্যে কখন সূর্য ডুবে গেল, চারি দিকে অন্ধকার নেমে এল, শুকনো কাঠের মশাল জ্বালা হল, বোধ হয় গাছ নেড়িয়ে কাঁচা আমের গুটি তুলে এনে কচ্কচিয়ে টিপিন খাওয়া হল আর সে কি চ্যাঁচামেচি, গান, তিড়িং-বিড়িং নাচ আর হ্যা-হ্যা হাসি! এরকম ছেলেমেয়ে বাপের কালে কখনো ওরা চোখে দেখে নি। কখন যে কোন ফাঁকে রাত কেটে ভোর হয়ে এল তা-ও ওরা টের পেল না। শেষে এক সময় ছেলে-মেয়েগুলো ওদের ঠেলা দিয়ে বলল, "ওকি! ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, আগে কথা দাও হক্ক-বঙ্করা সত্যি সত্যি এখানে ইস্কুল করবে, রোজ ভাত রেঁধে ছেলেদের খাওয়াবে। নইলে সব পণ্ড করে দেব। বাড়ি ছেড়ে এক চুল নড়ব না।"

নটে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ হবে, হবে। তোদের তখন এ-বাড়িতে আর হুল্লোড় করা হবে না। বলিস তো লিখে দিচ্ছি!" শুনে ওদের সে কি খিল্ খিল্ হাসি! "পড়তেই জানি না তো লিখবি কি রে! আচ্ছা, তোদের মুখের কথাতেই হবে।"

এর পর ওরা ঘুমিয়ে পড়ে থাকবে। জাগল অনেক বেলায়, চার দিক ভোঁ-ভোঁ, কারো টিকির দেখা নেই, গেছে সব নিশ্চয় ওদের উদ্বাস্তু কলোনিতে। দুপুরে এসে আবার নিশ্চয় আমগাছের ডাল ভাঙবে। ভাঙুক তো, ওদের কথা মালিককে বলে দরকার নেই। শেষটা যদি কলোনিতে গিয়ে মালিক গোল বাধায়।

মালিকের কাছে কল্যাণ সঙ্ঘের বাবুরাও বসেছিল, নটে-গুরুর সঙ্গে তারাও চলল বাড়ি দেখতে। দেয়ালে কেমন হরিনাম লেখা হয়েছে দেখা দরকার। তবেই প্রমাণ হবে ভূত-টুত সব বাজে কথা।

তেপান্তরের মাঠ শেষ হয়ে এসেছে, দূর থেকে হৈ-হল্লোড়ের শব্দ আসছে। গুরু নটের দিকে তাকাল। কি সাংঘাতিক! বিচ্ছুগুলো

এরই মধ্যে আবার শুরু করে দিয়েছে নাকি! কিন্তু আরেকটু কাছে যেতেই দেখা গেল তা নয়, ওদের সাড়া পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা পাখি কিচির্‌-মিচির্‌ করতে করতে নীল আকাশে উড়ে পড়ল।

আর কি বাকি রইল? কল্যাণ সংঘ বাড়ি কিনল, আশ্রমও হল, একপাল হাঘরে ছেলেমেয়ের থাকবার জায়গা হল, রোজ বড়-বড় হাঁড়ায় তাদের জন্য ভাত রান্না হয়। বাড়ির মালিক খুশি হয়ে নটে-গুরুকে পনেরো টাকা দিয়েছিল! কথাটা জানাজানিও হয়েছিল। নানা লোকে নানা কথা বলেছিল। অন্য লোক টাকা পেলে ওরকম তো বলবেই! খালি গুরুর বাউণ্ডুলে ছোট্‌দাদু একটু অদ্ভুত কথা বলেছিলেন। ষাট বছর আগেও ঐ বাড়ি খালি পড়ে থাকত। উনি নাকি একবার পিট্টির ভয়ে সন্ধেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে ঐ বাড়িতে গা-ঢাকার তালে ছিলেন। তা বিচ্ছুগুলো ওঁকে ঢুকতেই দেয় নি। মহা বদমাইস্‌ ছেলেগুলো, বিশেষ করে ঢ্যাঙা বলে একটা লম্বা কালো ছেলে আর গিরগিটি বলে একটা হিল্‌হিলে ছোকরা, সে ব্যাটা সটাং দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে গিয়ে ঢিল ছুঁড়তে আরম্ভ করেছিল!

তবে ওরা আর কখনো আসে নি।

হানাবাড়ি

হানাবাড়ির দোতলার মাকড়সার জালে ঘেরা জানলার ভাঙা পাল্লার ফাঁক দিয়ে পরেশবাবু অনিমেষের আগমন লক্ষ্য করলেন। উত্তর রাধাপুর ইউনিয়ন ক্লাবের আরো তিনজন সভ্য, অর্থাৎ স্বয়ং দারোগাবাবু। বড়বাবুর বড় শালা বটুকবাবু আর হেডমাস্টার ওর সঙ্গে এসেছিলেন। এইরকমই কথা হয়েছিল; বাইরের তিনজন গণ্য-মান্য ব্যক্তি সাক্ষী থাকবেন। তাঁরাই অনিমেষকে পৌঁছে দেবেন, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়ার পর রাত আটটায়। আবার ভোর পাঁচটায় তাঁরাই এসে তাকে নিয়ে যাবেন। তবে ভূতের বাড়ির ভিতরে কেউ পা দেবেন না সকালের আগে।

উত্তর রাধাপুর ইউনিয়ন ক্লাবের চৌকিদার নকুল—তাকে চৌকিদারও

বলা যায়, ফরাসও বলা যায়, চাকরও বলা যায়, আবার পেয়ারের গুরুঠাকুরও বলা যায়, ক্লাবের গোড়াপত্তন থেকে আছে বলে আজকাল তার বড়ই বাড় বেড়ে গেছে, বর্মা থেকে এসে অবধি পরেশবাবু এটা লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আর পাঁচজন গণ্য-মান্য সভ্যরা যখন কিছু বলেন তো না-ই, বরং তার বে-আদবি দেখে বেশ মজাই পান, তখন নবাগত পরেশবাবুর কিছু বলা শোভা পায় না, এই ভেবে তিনিও কিছু বলেন না। অনিমেষ হল গিয়ে ঐ নকুলের ঘোড়া।

অবিশ্যি অনিমেষ কিছু সত্যিকার ঘোড়া নয়, বরং অনেকেরই মতে সে একজন সুস্থ স্বাস্থ্যবান সুশিক্ষিত সুদর্শন ল' পরীক্ষা পাশ করা যুবক, সবে মুন্সেফ হয়েছে, এবং সব চেয়ে বড় কথা সে হল গিয়ে নকুলের স্বর্গগত পুরোনো মুনিবের একমাত্র ছেলে। নকুলের চোখে সে একটি ভগবান বিশেষ, তার কোনো দোষ সে দেখতে পায় না। সে যাক্ গে, এ বিষয়ে বেশি বলতে গেলে লোকে ভাবতে পারে পরেশবাবু অনিমেষকে হিংসে করেন। মোট কথা অনিমেষকে নিয়েই যখন বাজি আর নকুল যখন তার সব চেয়ে বড় সাপর্টার, তখন তাকে নকুলের ঘোড়া বললে দোষ হয় না।

তা ছাড়া, পরেশবাবুর পঞ্চান্ন বছর বয়স, ব্যবসা করে বর্মায় বেশ নামডাক পয়সাকড়ি করেছিলেন, এখন ভাগ্যের দোষে সে-সবই প্রায় খুইয়েছেন, কিন্তু তাই বলে অনিমেষের মতো একটা চ্যাংড়া ছোকরাকে তিনি হিংসে করতে যাবেন কোন দুঃখে? আসল কথা হল ঐ নকুলটির আর অনিমেষের দুইজনেরই একটু শিক্ষা দরকার হয়ে পড়েছে। ক্লাবের আর সকলেই যখন অনিমেষের রূপ-গুণ দেখে অজ্ঞান আর নকুলের ভাঁড়ামিতে আহ্লাদে আটখানা, তখন পরেশবাবুকেই সেই শিক্ষাটুকু দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। হাজার হোক, অনিমেষের বাবা অজ্ঞানেশ তো একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পরেশবাবুরই বন্ধু ছিলেন। তাঁরা একসঙ্গে বর্মা গেলেন, ব্যবসা শুরু করলেন, পরেশবাবু ফেঁপে উঠলেন। আর অজ্ঞানেশ দেউলে হলেন, শেষটা পরেশবাবু জলের দরে তাঁর ব্যবসাটি কিনে নিলেন—এর জন্যে পরেশবাবুর নিন্দা না করে বরং তারিফই করতে হয়। অথচ নকুলটা এমন ভাব দেখায় যেন পরেশবাবুই অজ্ঞানেশের ব্যবসাটি লাটে তুলে দিয়েছিলেন। আরে বাপু, ব্যবসা করতে গেলে সবাই অমন অল্প-বিস্তর চালাকি করে থাকে; তাই

করতে হয়, নইলে অজ্ঞানেশের মতো ব্যবসা তুলে দিতে হয়। সেই যে দেউলে হয়ে অজ্ঞানেশ দেশে ফিরে গেল আর পরেশবাবুর সঙ্গে দেখা হয় নি ; মরলও অকালে।

একরকম বর্মীই হয়ে গেছিলেন পরেশবাবু, তার পর অদৃষ্টের ফেরে প্রায় খালি হাতে দেশে ফিরেছেন। মজার কথা হল যে, হানাবাড়িটা আসলে অনিমেষদেরই পৈতৃক বাড়ি, পঁয়ত্রিশ বছর খালি পড়েছিল, নাকি ভূতের উপদ্রব! কেউ বাস করতে তো রাজি নয়ই, এমন-কি, সন্ধের পর ঐ দিকে যেতেও চায় না। অনিমেষ মামাবাড়িতে মানুষ, পৈতৃক বাড়ির ধার ধারে না, ইদানিং এখানে পোস্টেড হয়েছে, কোয়ার্টারে থাকে, ক্লাবে আড্ডা দেয়। অনিমেষের সেইখানেই পরেশবাবুর সঙ্গে আলাপ। আগে বাপের কাছে তাঁর নাম শুনেছিল বটে, কিন্তু দেখে নি কখনো। পরেশবাবু প্রায় ত্রিশ বছর পরে বর্মা থেকে ফিরে মাসতুতো ভাইয়ের বাড়িতে উঠেছেন। এইখানেই ছোটোখাটো একটা ব্যবসা ফাঁদবেন বলে কিছু মূলধনের চেষ্টায় আছেন। এমন সময় এই সুযোগটি, বলতে গেলে ভগবানই জুটিয়ে দিলেন। অনিমেষ বলে বসল যে ভূতে বিশ্বাস করে না, ও বাড়িতে ভূতের উপদ্রব আছে এ কথাও সে বিশ্বাস করে না, এমন-কি, কেউ যদি বাজি ধরে তো ভূতের বাড়িতে একলা এক রাত কাটিয়ে সে এ কথা প্রমাণ করে দিতেও প্রস্তুত।

বাস্, ক্লাবে যেমন কথায় কথা বেড়ে থাকে, দেখতে দেখতে পরেশবাবুর সঙ্গে অনিমেষের পাঁচশো টাকা বাজি ধরা হয়ে গেল।

অনিমেষ ভূতে বিশ্বাস না করলেও, দেখা গেল যে নকুল যথেষ্ট করে। সে হাঁউমাউ করে বলে উঠল, "ফট্ করে যে বাজি ধরছ অনিদাদা আছে তোমার পাঁচশো টাকা?" ক্লাবের বাবুরা অমনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "আরে আমরাই নাহয় ধার দেব, তুই ভাবিস নে নকুল।" অনিমেষ বললে, "তুমিও যেমন নকুলদা, আগে বাজি হারি, তবে তো টাকা দেবার কথা উঠবে। বিছানা বালিশ নিয়ে গিয়ে কেমন দিব্যি নিশ্চিন্তে সেখানে রাত কাটিয়ে, পরেশকাকার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা বাগাই, দেখো!"

নকুল তবুও ক্যাঁও ম্যাও করতে থাকে—"আজ তোমার মা বেঁচে থাকলে, ভূতের বাড়িতে রাত কাটাতে দিত তোমাকে? শেষটা যদি সত্যিই ভূতে ধরে? একগাল হেসে অনিমেষ বললে—"দু! দু! কি যে বল! ভূতটি নাকি আমার বাবার পিসি, তার বিয়ের রাতের লাল

চেলি আর এক গা গয়না পরে দেখা দেয়; পরদিন, ভোর থেকেই তাকে আর কেউ নাকি দেখে নি। নতুন বরটিও অমনি দানের জিনিস, পণের টাকা নিয়ে পাশের গাঁয়ে আবার বিয়ে করেছিল। সাক্ষাৎ বাপের পিসি, সে কি আমার কোনো অনিষ্ট করতে পারে নাকি যে, তাকে দেখে ভয় পেয়ে বাড়ি ছেড়ে পাঁচশো টাকা বাজি হারব। তোমার কোনো ভয় নেই। অন্য ভয় আমারই বরং একটু আছে; ও পরেশকাকা, আছে তো আপনার পাঁচশো টাকা?—শেষটা মিনি-মাগনায় আজকে ভূতের বাড়িতে রাত্রিবাস করাবেন না তো?"

তাই শুনে ক্লাবের সকলের কি হাসি, যেন ভারি মজার কথা বলেছে। ঝপাং করে টেবিলের উপর মনিব্যাগ ফেলে দিয়েছিলেন পরেশবাবু। পাঁচশোই আছে তাঁর, তা ছাড়া সামান্য কিছু জমানো টাকা। বলেছিলেন—"তোমার পাঁচশো পেলেই, আমার ব্যবসাটি শুরু করে দেব। আপনাদের সব হালখাতার নেমন্তন্ন রইল, তুমিও যেয়ো অনিমেষ।"

পরেশবাবুও ভূত-টুত মানেন না। তবু বাছাধনকে যে পৈতৃক বাড়িতে রাত কাটাতে হচ্ছে না, সে বিষয়ে তাঁর মনে কোনো সন্দেহটুকু নেই, তার কারণ হল অতি উত্তম ফরমায়েসি ভূতের ব্যবস্থা হয়েছে। বর্মার সেকালের গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটারের বটকেষ্ট যেমন খাসা ভূত হতে পারে, সত্যিকারের ভূত বলে যদি কিছু থাকত তো তারাও অত ভালো হত না। এমন মেয়ের সাজ করতে পারে বটকেষ্ট যে নিজের চোখকেও বিশ্বাস করা যায় না। আজ রাতে সে লাল চেলি পরবে, গা ভরা গিলটি গয়না পরবে, গা থেকে অদ্ভুত আলো বেরুবে, আবার দপ্ করে নিবে যাবে, অমনি ভূত অদৃশ্য হয়ে যাবে। হরেকরকম ভুতুড়ে আওয়াজও দেবে বটকেষ্ট; তার কতক কতক শুনেও এসেছেন পরেশবাবু। বাবাঃ, দিন দুপুরে কেষ্টনগরের এক হাট লোকের মাঝখানেও তাই শুনে পিলে চমকে গেছিল। সে কথা মনে করে এখন আবছা অন্ধকারে নিশ্চিন্ত মনে অনিমেষকে হানাবাড়িতে ঢুকতে দেখে, অনেক কষ্টে পরেশবাবু হাসি চাপলেন।

এ বাড়িতে যে ভূত-টুত নেই, সব যে গাঁয়ের দুষ্টু লোকের কল্পনা, সেটুকু জানতে পরেশবাবুর বাকি ছিল না, যেহেতু বর্মা থেকে ফিরেই, প্রথম রাতটি কিছু না জেনেশুনে, এই বাড়িতেই নিশ্চিন্ত না হলেও,

একেবারে নিবিঘ্নে ঘুমিয়ে কাটিয়ে ছিলেন। তার পর সকালে মাসতুতো ভাইটিকে খুঁজে বের করেছিলেন। অবিশ্যি ভূত না থাকলেও, বাড়িটা যে যথেষ্ট ভুতুড়ে সে কথা মানতে হবে। ছাদ থেকে লম্বা লম্বা ঝুল ঝোলে; আচমকা যখন নরম একটি ছোঁয়া লেগে যায় কপালে, আঁতকে উঠতে হয়। দরজা জানলার কব্জা ভাঙা, সে যে কতরকম ক্যাঁচ্‌কোঁচ্ শব্দ হয় সে ভাবা যায় না। তার ওপর ঘুলঘুলির মধ্যে দিয়ে খালি বাড়িতে হাওয়া ঢুকে কিরকম একটা হু হু শব্দ করে যে শুনলে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সত্যি কথা বলতে কি, ভূতে অবিশ্বাস এবং ফুঙ্গির দেওয়া ভূতের মাদুলি না থাকলে, ভূতের কথা না জেনেও, পরেশবাবু ও বাড়ি রাত কাটাতে পারতেন কি না সন্দেহ।

আজকে এ-সবের উপরে বটকেষ্ট ভূত তো আছেই। তাকে পই-পই করে বলে দেওয়া হয়েছে যেন লোমশ হাত দুটোকে চেলি দিয়ে ঢেকে রাখে। মুখে সে এমনি মেক্‌-আপ দেবে যে কারো বাবার সাধ্যি নেই নকল ভূত বলে টের পায়।

অনিমেষ সঙ্গে করে বিছানা এনেছে, তা ছাড়া একটা গামছা না কি যেন এনেছে, মাটিতে বিছানা পাততে হবে, বাবু তাই মেজেটাকে বোধ করি ঝেড়ে-ঝুড়ে নেবেন। একটা টর্চও এনেছে নিশ্চয়, মোমবাতি, দেশলাইও এনেছে হয়তো। সেটি জ্বেলে শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত সব শব্দ শুনবে ব্যাটাচ্ছেলে, আর গায়ের রক্ত হিম হয়ে উঠতে থাকবে। তার পর আড়ালে দাঁড়িয়ে বটকেষ্ট একটা বেলুন থেকে কি একটা গ্যাস্ ছাড়বে। অমনি নাকি মোমবাতির আলো বেড়ে এক হাত উঁচু হয়ে উঠবে। চমকে ব্যাটা উঠে বসবে, আর সেইরকম হু-হু শব্দ করতে করতে পিসির ভূত দেখা দেবে। তার পর মোমবাতিটা যেই কমতে কমতে একেবারে নিবে যাবে, পিসির ভূতও অদৃশ্য হবে আর অনিমেষ-বীরও চোঁ-চাঁ দৌড় লাগাবে। উঃ, ভেবেও কি সুখ! এই সুখ ভোগ করবার জন্যেও অনিমেষ যাতে কোনো চালাকি না করে, তাই পরেশবাবু এখানে আজ লুকিয়ে বসে আছেন। সিঁড়িতে একটা খস্ খস্ শব্দ শুনে চমকে ফিরে আঁতকে উঠলেন পরেশবাবু! কি চমৎকার ভূত সেজেছে বটকেষ্ট! আরেকটু হলে তিনি নিজেই নিজের ভাড়া করা ভূত দেখে, মাদুলি সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও নির্ঘাৎ মূর্চ্ছা যেতেন। সড়্ সড়্ করে নিঃশব্দে লাল চেলি পরা মূর্তিটা সিঁড়ি দিয়ে নেবে গিয়ে নীচের হল

তারপর দু হাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে পরেশবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ঘরে ঢুকল। সেইখানে অনিমেষ শুয়ে আছে। উত্তেজনায় পরেশবাবুর দম বন্ধ হয়ে আসবার জোগাড়। বাবা, কি ওস্তাদ ঐ বটকেষ্টটা এমনি নিঃশব্দে কাজ করে যে কখন যে এসে পৌঁছল এতটুকু টের পান নি পরেশবাবু। এমন-কি, মনে মনে একটা ভয়ই হচ্ছিল যদি কেষ্টনগর থেকে এতটা পথ আসতে গিয়ে, কোনো দুর্ঘটনা হয়ে থাকে! যাক, এবার সব ভাবনা ঘুচল, কাল হাতে-নাতে পাঁচশোটি টাকা পাওয়া যাবে।

নৈঃশব্দ্য ভেদ করে বিশ্রী একটা হু-হু শব্দ কানে এল; গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল পরেশবাবুর। উঃ, কি বাড়াবাড়িটাই করতে পারে বটকেষ্ট পঁচিশ টাকার জন্যে। অনিমেষের কোনো সাড়া-শব্দ নেই? কেন? যদি—যদি ভয়ে হার্টফেল্ করে মরেই যায়? এমন তো শোনা গেছে কত সময়। পরেশবাবুর বুকটা এতটা ঢিপ্‌ঢিপ্ করতে লাগল! তা হলে তো এত কষ্ট, এত খরচ করেও সব পণ্ড হয়ে যাবে। টাকা দেবে কে?

হঠাৎ চেয়ে দেখেন দোর গোড়ায় বটকেষ্ট, অর্থাৎ লাল চেলি পরা মূর্তিটি, তার গা থেকে কেমন একটা সাদা আলো বেরুচ্ছে, ফস্‌ফরাস্ না কি যেন। এইরকমই কথা ছিল, অনিমেষকে ভাগিয়ে বটকেষ্ট উপরে এসে পরেশবাবুকে ডেকে নিয়ে যাবে, যাতে অনিমেষের পলায়নের আরেকজন বাইরের সাক্ষীও থাকে। কিন্তু বটকেষ্ট অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে কেন? গলা খাঁকরে পরেশবাবু বললেন—"কি, বটকেষ্ট? কথা বলছ না কেন?"

মূর্তিটি হেসে উঠল, খিল্ খিল্ করে মেয়েলি সুরে; তার পর দুহাত বাড়িয়ে নিঃশব্দে পরেশবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। পরেশবাবুর সর্বাঙ্গ বেয়ে বরফের মতো ঠাণ্ডা ঘাম ঝরতে লাগল। সেই সাদা আলোতে স্পষ্ট দেখতে পেলেন এ তো বটকেষ্ট নয়, এর হাতে ঘন কালো লোম নেই, যেন মাখনের তৈরি ফরসা সুন্দর ছোট্ট দুখানি হাত!

অজ্ঞান হয়ে পড়তে পড়তে সামলিয়ে নিলেন পরেশবাবু, গলা দিয়ে স্বর বেরুল না, হঠাৎ ফিরে দুড়্‌দাড়্ করে পেছনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে, বন-বাদাড় ভেঙে দূরে যেখানে গাঁয়ের বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে সেদিকে ছুটলেন।

পরদিনটি রবিবার। সকালে গাঁসুদ্ধু লোকের মুখে শোনা গেল

পরেশবাবু বাজি হেরে রাতারাতি কোথায় সরে পড়েছেন। তাঁর মাসতুতো ভাই কেদার মিত্তির নাকি চার দিকে তাঁর খোঁজ করছে শুনে ক্লাবে মহা হৈ চৈ, এদিকের ফিস্টির ফর্দ তৈরি ; এগারোটায় সকলের ক্লাবে জমায়েত হবার কথা : নকুলের সেকি রাগ। "এ কিরকম ভদ্রলোক! বাজি হেরে ফাঁকি দিয়ে পালানো! না, ওনাকে ছাড়া হবে না, যেখান থেকে হোক, চ্যাংদোলা করে ধরে আনা হবে। কি অনিদাদা, তুমি কেন চুপ, লোকসান তো তোমারই।"

অনিমেষ একটু হেসে বললে—"না, নকুলদা, সত্যি কি আর ওঁর টাকা নিতাম আমি, ঐটুকুই ওঁর সম্বল। শুধু একটু জব্দ করার ইচ্ছে ছিল। তা উনি করেছিলেন কি, গ্রেট বেঙ্গল থিয়েটারের বটকেষ্ট কাকাকে ভূত সাজিয়ে আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে টাকা দিয়ে এসেছিলেন। বটকেষ্টকাকা বাবাকে বড় ভালোবাসতেন; উঠিপড়ি করে কেষ্টনগর থেকে ছুটতে ছুটতে আমাকে খবরটা দিয়ে গেলেন। তা ছাড়া এও বলে গেলেন যে, রাত-দুপুরে ভূতের বাড়িতে একা যাবার ওঁর সাহস নেই, যদিও পরেশকাকাও সেখানে থাকবেন, তবু বটকেষ্টকাকা সাদুকাকিকেও সঙ্গে নেবেন। টাকা নিয়েছেন, কাজেই উনি আমাকে নিশ্চয়ই ভয় দেখাবেন ; সাদুকাকিও সেই সময়টি নষ্ট না করে ঠিক একইরকম সাজ করে পরেশকাকাকে ভয় দেখাবেন। বিনি পয়সায়, যাতে কেউ না বলতে পারে আমিও ভূত ভাড়া করে চালাকি করছি। দারুণ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছেন নাকি পরেশকাকা, সাদুকাকির কাছে শুনলাম। কিন্তু এখন ভয় হচ্ছে কোনো বিপদে পড়েন নি তো? নিখোঁজ কেন?"

কেদার মিত্তির কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে—"বিপদে পড়লে তার সুটকেস আর আমার নতুন আলোয়ান নিয়ে অদৃশ্য হতেন না। তুমি নিশ্চিন্ত হও। সে কলকাতায়, ভূতের হাত থেকেও বেঁচেছে, পাঁচশো টাকাও বেঁচেছে। এখন ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমাকে কি খাওয়াবে, খাওয়াও।

নানা নিবন্ধ

সূচীপত্র

রত্নখোঁজা	২৯১
তিনটি গাছ	২৯২
শান্তিনিকেতন	২৯৫
প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ	২৯৮
মানুষ তৈরি	৩০২
ওস্তাদ	৩০৭
খ্রীস্ট-উৎসব	৩০৯
গান্ধীজির সবুজ পাতা	৩১৩
অবনীন্দ্রনাথের একশো বছর	৩১৭
বিবিদিকে	৩২০
মর্মর প্রাসাদ	৩২২
ভুতনি	৩২৪
স্বেন হেদিন	৩২৬
সরোজিনী নাইডু	৩২৯
এক শুণ্ঠি	৩৩৩
সুখলতা	৩৩৭
পুণ্যলতা	৩৩৯

রত্ন খোঁজা

ছোটবেলায় কত যে রত্ন খুঁজেছি তার ঠিক নেই। শিলঙে ভাড়াবাড়িতে আরেকটি বাড়তি ঘর তৈরি হল। তার ভিত খোঁড়া হচ্ছিল। পাহাড়ের গায়ে বাড়ি, পাহাড়ের গায়ের সঙ্গে লাগা ভিতটি বেশ খানিকটা গভীর করে খুঁড়তে হল। আমরা কজনা ওত পেতে রইলাম, কখন কোদালের ঘায়ে ঠুন্‌ন্‌ শব্দ হবে। মাটির মধ্যে থেকে টেনে বের করা হবে, সীসে দিয়ে মুখ বন্ধ করা একটা ঘড়া, ঘড়ার মুখ যেই-না খোলা যাবে, ভিতর থেকে ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেরিয়ে আসবে রাশি রাশি সোনার মোহর। বলা বাহুল্য একটা বড় পিঁপড়ের বাসা ছাড়া কিছুই বেরোয় নি। কিন্তু বাসাটিও মন্দ ছিল না।

মাটির উপরে ঘাসের মধ্যে হয়তো-বা খুদে একটা গর্ত ছিল। আমরা লক্ষ্য করার আগেই তাকে মজুরেরা কুপিয়ে শেষ করে ছিল। ভিতরে থাকে থাকে অসংখ্য গলি-ঘুঁজি, ছোট্ট-ছোট কুঠরি, তাতে থাকে থাকে ডিম। সেই ডিম মুখে তুলে বড় মাথা পিঁপড়েগুলোর সেকি ছুটোছুটি। তা ছাড়া ছোট-ছোট একরকম পোকাও ছিল। বড়রা কেউ কেউ বললেন, ঐ নাকি ওদের গরু, ওর গা থেকে রস ওরা নাকি খায়।

আরেকটু বড় হয়েও ঐ রত্ননেশা যায় নি। ছোটনাগপুরে পুজোর ছুটিতে গিয়ে ছোট নদীর তীরের বালিতে কত রত্ন খুঁজেছি। শুনেছিলাম নদীর জলে সোনার গুঁড়ো, মণি-মাণিক্যের টুকরো ভেসে এসে অনেক সময়ে বালিতে আটকে থাকে। পেয়েছিলাম শুধু সাদা গোল একটা নুড়ি, তার ভিতরে কেমন করে এক চামচ জল বন্ধ হয়ে আছে। নুড়ি

ঝাঁকালে সেটি নড়ে। আর পেয়েছিলাম—পাথর হয়ে যাওয়া কোনো ছোট জানোয়ারের একটুখানি চোয়ালের হাড়।

বড়-বড় গাছ ছিল পাহাড়-দেশে। কত গল্প শুনতাম ঈগল পাখির কিম্বা দাঁড়কাগের বাসা খুঁজলে নাকি চুরি করা গয়না পাওয়া যায়। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কেবলই তাকিয়ে দেখতাম কোথাও যদি পাতার ফাঁকে চক্‌চকে কিছু দেখতে পাই। দেখলামও একদিন ঝাউগাছের মগডালে। এক দলা সোনালী কি যেন। রোদ পড়ে তাই থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে। মালিকে ধরে বলে-কয়ে অনেক কষ্টে রাজি করানো হল। সে অনেক কষ্টে নামিয়ে নিয়ে এল এক গাছের আঠা। বড়রা বলল তাকে রজন বলে। তার গায়ে ধূপধুনোর গন্ধ মাখা।

অনেকে বলত লোকের বাড়ির চিলেকোঠায় বহুদিনের পুরোনো জিনিস জমা থাকে। তার মধ্যে গুপ্তধনের নকশা পাওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়। তাও খুঁজেছিলাম। রাশি রাশি ভাঙা আসবাব, ছেঁড়া জামা-কাপড়, মলাট খোলা বই, পোকায় কাটা খাতাপত্রের মধ্যে একটা হলদে হয়ে যাওয়া খামের মধ্যে ছোট্ট একটা চিঠি পেলাম। আমার সন্ন্যাসী দাদামশাই আমার ছোট্ট মাকে লিখেছেন, 'ভালবাসা জেনো।'

তিনটি গাছ

বারো বছর বয়স পর্যন্ত শহরের প্রভাবের বাইরে একেবারে প্রকৃতির নিজের রাজ্যে কাটিয়েছিলাম। তাকে তখন এড়িয়ে যাবার জো ছিল না। সে তার হাড়-কাঁপানো শীত, তার মন-ভোলানো বসন্ত আর গ্রীষ্ম, তার আশ্চর্য বর্ষা আর ফলপাকানো শরৎ-হেমন্তের কুয়াশা, ফুলের বাহার, মেঘ, রামধনু, ছোট-ছোট বন্যার সঙ্গে মৌমাছি, গুটিপোকা, প্রজাপতি, পাখি, জোঁক, সাপ, শোঁয়াপোকা, চাম্‌চিকা, বাদুড়, শেয়াল, খ্যাঁকশেয়াল নিয়ে আমাদের চার দিকের দৃশ্যমান আর অদৃশ্য জগতে এমন ভিড় করত যে, তার মধ্যে নিজেদের পা রাখবার জায়গা খুঁজে বের করাও মাঝে মাঝে মুশকিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। কেবলই মনে হত এটা ওদেরই জায়গা, আমাদের একটু দেখেশুনে চলতে হবে।

যেই-না এই কথা মনে হওয়া, অমনি দেখলাম আমরাও দিব্যি ওদের রাজ্যে জায়গা পেয়ে গেছি। তার উপর বড়রা কেবলই সাবধান করে দিতেন—ঠ্যাং নেই, লম্বা গড়নের—ওগুলি সাপ, কামড়ালেই মানুষ মরে যায়, কাছে যাস নি। মেটে রঙের দুটো শিং-ওয়ালা পিঠে শামুক, যেখানে যায় চট্‌চটে দাগ টেনে যায়—ওকেও এড়িয়ে চলিস। আর খবরদার ব্যাঙের ছাতার ধারেকাছেও যাবি না। বিলেতে প্রতি বছর বহু লোক নাকি ব্যাঙের ছাতা খেয়ে মরে যায়, তা ছাড়া ওতে হাত দিলেই হাতে ঘা হয়। এই-সব সাবধানী কথা কানে নিয়ে প্রকৃতির রাজ্যের ঠিক মাঝখানে আমরা বাস করতাম।

গাছপালাগুলি ছিল আমাদের বন্ধু—যেমন তাদের স্নিগ্ধ ছায়া, তেমনি মিষ্টি তাদের ফল, আর সব চেয়ে মনোহর তাদের ডালপালার রহস্য। কত পাখির বাসা, কত অদ্ভুত কোটর, কত আশ্চর্য পোকার গুটি, কত সুগন্ধি আঠার টুপ্‌লি। একবার গাছে চড়লে আর নামতে ইচ্ছা করত না।

সব চেয়ে অন্তরঙ্গ ছিল আমাদের বাড়ির হাতার মধ্যে তিনটি বড়-বড় ন্যাসপাতি গাছ। সেগুলিকে সারা বছর ধরে দেখে দেখে আমাদের আশ মিটত না। কলকাতা থেকে মাসি গেলেন, তাঁকে ফলের বাহার দেখিয়ে বললাম—কলকাতায় নাকি তোমরা পয়সা দিয়ে এ-সব ফল কেন, তাও অনেক ছোট, অনেক শুকনো, অনেক কম মিষ্টি? মাসি নাক সিঁটকে বললেন—'দূর এগুলিকে আবার ন্যাসপাতি বলে নাকি, এই ঢাউস বড়, কামড়ালেই রস গড়ায়, জামায় লাগলে তার দাগ ওঠে না, চিবুতে ক্যাচ্‌-ক্যাচ্‌ করে। আসল ন্যাসপাতি দেখতে চাস, কলকাতার মার্কেটে যাস। কেমন ছোট, হলদে, লম্বাটে গড়ন, পাকলে নরম তুল্‌তুল্‌ করে। এগুলি আমাকে দিলেও খাব না।' তাঁর দেখাদেখি তাঁর মেয়েও বলল—'ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা, দিলেও খাব না।' আমরা এমনি অবাক হয়ে গেলাম যে ভালো করে কোনো উত্তর দিতেও পারি নি। তবে সত্যিই যে খেতেন না, তাও নয়। প্রত্যেক বছর ঐ গাছে ফল হত, কখনো বাদ যেত না। পঞ্চাশ বছর পরেও আজ পর্যন্ত ঐ তিনটি ন্যাসপাতি গাছ আমার মনের মাটিতে তেমনি উজ্জ্বল সরস চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এই লেখা তাদেরই বিষয়ে।

যতদূর মনে হয়, গাছগুলির গা খুব মোলায়েম ছিল না। ওখানকার

উচ্চতা ছিল পাঁচ হাজার ফুটেরও বেশি, শীতকালে এত ঠাণ্ডা হত যে, ছোট-ছোট ঢেউসুদ্ধ অনেক নদী-নালা জমে যেত। শুধু যেগুলির স্রোত বেশি সেগুলি জমত না। কন্‌কনে ঠাণ্ডা একটা হাওয়া বইত। বেজায় কষ্ট হত। কষ্টটা শুধু শরীরের ছিল না, গাছগুলির অবস্থা ভেবে মনেও বড় কষ্ট হত। মাছগুলি বরং অনেক বেশি আরামে থাকত। নদী-নালা ছোট-ছোট পুকুরের উপরে হয়তো জল জমে এক পরত বরফ হয়ে থাকত। তার নীচে দিব্যি বরফের ছাদের তলায় মাছেরা আনন্দে সাঁতার কেটে বেড়াত—এ কথা আমাদের পাহাড়ী ধাই-মারা প্রায়ই আমাদের বলত।

ন্যাসপাতি গাছগুলির কথা আর কি বলব। শীতের হাওয়া লাগতেই তাদের পাতাগুলি প্রথমে ফিকে সবুজ, তার পর হলুদ, তার পর পাট্‌কিলে, লালচে, কোনো কোনো গাছে কুচ্‌কুচে কালো হয়ে গিয়ে ঝরে ঝরে পড়ত। গাছের তলায় শুকনো পাতাগুলি স্তূপাকার হয়ে থাকত। এমন একটা সোঁদা গন্ধ বেরুত যে, স্পষ্টই বোঝা যেত ওরা সব মরে গেছে।

শুক্‌নো ঘূর্ণী হাওয়ায় মরা পাতাগুলি বাগানের ঘাস-জমিতে উড়ে উড়ে বেড়াত, চার দিক নোংরা দেখাত। মালি সেগুলিকে লম্বা বাঁশের হাতল লাগানো কাঁটা দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে এখানে-ওখানে—যেখানে হাওয়া লাগত না, এমন জায়গায় জড়ো করত। তার পর সবগুলিকে একসঙ্গে করে বাড়ি থেকে একটু দূরে প্রকাণ্ড এক ঢিপি বানাত। সন্ধ্যার আগে তাতে আগুন লাগানো হত। দেখতে দেখতে সে আগুন উঁচু হয়ে জ্বলে উঠত। মালি আর অন্য চাকরেরা বালতি করে জল, গাছের ডাল ইত্যাদি নিয়ে তৈরি থাকত, যাতে আগুন ছড়িয়ে না পড়ে আর আমরা আগুনের যতটা কাছে যাওয়া সম্ভব, ততটা এগিয়ে তাকে ঘিরে থাকতাম; কান ভরে যেত আগুনের গানে। সে গান, কাঠ-ফাটা আগুনের আওয়াজ দিয়ে তৈরি নয়, চাপা একটা গন্‌-গন্ সুর। এখনো সে আমার কানে লেগে আছে। আর কি সুন্দর গন্ধ। পাকা ফল, শুক্‌নো খড়, কিম্বা মিহি একটু কস্তুরির গন্ধ নাকে এলে—সে গন্ধের কথা মনে পড়ে।

যখন সারা মুখ আর শরীরের সামনের দিকটা তেতে আগুন হয়ে যেত, তখন সরে দাঁড়াতে বাধ্য হতাম। সকলের মুখ লাল, চোখ

চক্‌চকে। তার পর সব পাতা পুড়ে ছাই হয়ে যেত, আগুনের হল্‌কা নেমে যেত, তবু অনেকক্ষণ পর্যন্ত ছাইগুলির মধ্যে লাল্‌চে রঙ দেখা যেত। রাত বাড়লে আমাদেরও ঘরে যেতে হত। সামনেটা গরম, পিঠটা ঠাণ্ডা, সারা গায়ে পোড়া পাতার মিষ্টি গন্ধ মিশে যখন খেতে বসতাম, মনটা যেন কেমন করত।

আস্তে আস্তে ন্যাসপাতির ডাল একেবারে ন্যাড়া হয়ে যেত। নীল আকাশের গায়ে হাত-পা মেলে কতদিন গাছগুলি কেমন যেন একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। শীত এগুতে থাকত। ন্যাসপাতি গাছ তাদের এবড়ো-খেবড়ো ছালে ঢাকা গুঁড়ি আর ডালপালা নিয়ে শীতের শেষের জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। ডিসেম্বর কাটত, জানুয়ারি কাটত, ফেব্রুয়ারিতে খুব নজর করে দেখলে মনে হত—খোঁচা খোঁচা ডালপালার খাঁজে খাঁজে আর ডগায় যেন খোঁচার বদলে একটুখানি গোলভাব দেখা যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারির শেষে আর কোনো সন্দেহই থাকত না। ডালপালা আর গাছের গুঁড়িকে কালো দেখাত, কিন্তু খাঁজের আর ডালের আগায় যেন লাল্‌চে আভা। আরো কিছুদিন কাটত। মার্চের গোড়ায় আমাদের লম্বা শীতের ছুটি ফুরিয়ে যেত। রোজ ঘুম থেকে উঠে একবার গাছের তলায় গিয়ে দাঁড়াতাম। তখন আর চিনতে ভুল হত না। ছোট-ছোট ডালের আগায় গোছা গোছা কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে। প্রথমে ইঁটের মতো শক্ত, ছোট-ছোট গুটি যেন। কিন্তু ক্রমে যখন চার দিকে বসন্তকাল সাড়া দিত, শুকনো ঘাসে সবুজ দেখা যেত, তার মধ্যে সাদা গোলাপী ক্রোকাসফুল ফুটত, তখন কুঁড়িগুলিও যেন আগ্রহে অধীর হয়ে উঠত।

হয়তো মার্চের শেষে কিম্বা এপ্রিলের গোড়ায় হঠাৎ একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, রাতারাতি ন্যাসপাতি গাছের ন্যাড়া ডাল সাদা ফুলের থোপায় ঢেকে গেছে। তখন ফুল ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ত না। সে ফুলের তুলনা হয় না, ভাষায় তার বর্ণনা দেওয়া যায় না, মনের সম্পদ হয়ে থাকে সে। তার মৃদু গন্ধ গাছতলায় না গেলে টের পাওয়া যায় না। কয়েক সপ্তাহ ধরে ফুটে ফুটে সব ফুল যখন ঝরে পড়ে যেত, তখনো মন খারাপ করবার অবকাশ থাকত না। দেখতাম খুদে-খুদে গুটির মতো ছোট্ট-ছোট্ট ফল। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে। কেউ যদি-বা সাহস করে গাছে উঠে টিপে দেখত, বলত—উঃ, পাথরের

মতো শক্ত। আরো সাহস করে যদি কামড়ে দেখত, বলত বেজায় কষা।

অবশ্য দুঃখ করবার কিছু থাকত না। কারণ এই সময় আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করতাম। গাছে আরো অনেক কুঁড়ি দেখা দিচ্ছে, ছোট-ছোট ডালের থেকে একটু লম্বাটে গড়নের থাক থাক দাগকাটা কুঁড়ি। দেখতে দেখতে সেগুলিও খুলে যেত। দেখতাম হাজার হাজার কোমল কচি পাতা। চোখের সামনে পাতাগুলি বড় হয়ে সমস্ত কচি ফলকে আড়াল করে ফেলত। তখন গাছটার আরেক রকম বাহার হত।

কিন্তু অনেকদিন ধরে যেন আর কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ত না। খুব ভালো করে নজর করলে অবশ্য দেখা যেত খুদে ফলগুলি কেমন বাড়ছে। অনেকগুলি ছোট অবস্থায় খসে গিয়ে গাছতলায় পড়ে থাকত। গাছের মাথার উপর দিয়ে গ্রীষ্ম কাটত, বর্ষা কাটত। আর সে কি প্রবল বর্ষা! কিন্তু পাতার ছাতার নীচে আমাদের ন্যাসপাতি ফলগুলি নিরাপদেই থাকত।

তার পর বর্ষাও শেষ হয়ে যেত। গাছ যেন মাথা ঝাড়া দিয়ে আরো সবুজ, আরো সতেজ হয়ে উঠত। তখন আমরা খেয়াল করতাম গাছের ডালপালাগুলি মাটির কাছে এসেছে। তাকেই বলে ফলের ভারে নুইয়ে পড়া। শরৎকালের ফল দেখতে বেশ বড়, লোভনীয়ও বটে। কিন্তু তাকে বাদুড়েও খেত না, পাখিতেও ঠোকরাত না। শরতের শেষে ফলে হলদে রঙ ধরত, সুগন্ধে চার দিক ম'-ম' করত। রাতে বাদুড়েরা মহা ঝগড়াঝাঁটি করত, দিনে পাখিরা ঝাঁক বেঁধে আসত। আমরা তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে ফল খেতাম। পাখিতে ঠোক্‌রানো, বাদুড়ে আঁচড়ানো ফলগুলিই সব চেয়ে মিষ্টি লাগত। একটুও ঘেন্না হত না। জখম হওয়া জায়গাটুকু কেটে ফেলে দিতাম।

মাঝে মাঝে রাতে ধুপ করে শব্দ হত। বুঝতাম বড় একটা ফল পেকে পড়ে গেল। সকালে অমনি ছুটোছুটি। পৃথিবীতে এত আনন্দ কম জিনিসেই পাওয়া যায়।

শান্তিনিকেতন

প্রত্যেক মানুষের দুটি পরিচয় থাকে, একটি তার কাজের ক্ষেত্রে আর একটি তার হৃদয়ের ক্ষেত্রে। একটিকে চোখে দেখা যায়, ধরা ছোঁয়া যায়, ভাঙা গড়া যায়, আর একটি থাকে নিভৃতে গোপনে, হঠাৎ তাকে খুঁজে পাওয়া যে-সে লোকের কাজ নয়, এ দিকটি চিরন্তন অবিনশ্বর, এর পরিবর্তন হয় না।

লোকে যখন দুঃখ করে বলে সে শান্তিনিকেতন আর নেই, এখন আর একে চিনতে পারার জো নেই, তখন কি তারা ঐ প্রথম পরিচয়টির কথাই ভাবে? যখন এখানে কিছু ছিল না, ধূ ধূ করত ঢেউ খেলানো শুকনো খরা জমি, বেঁটে বুনো খেজুর আর ফণিমনসার ঝোপ ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়ত না, তখন পথের ধারে দুটি ছাতিম গাছের সবুজ অভ্যর্থনা দেখে একজন মনীষীর মন মুগ্ধ হয়েছিল। তার পরে কোপাই নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে।

ছাতিম গাছের কাছে শান্তিনিকেতনের সাধনাশ্রমের দোতলা বাড়ি হল, কুয়ো হল, বাগান হল, ক্লান্ত ভক্তজনরা দুদিনের জন্যে সেখানে আসতে লাগলেন, প্রাণ জুড়োবার আশায়! নতুন একটা অশান্তিময় শতাব্দীর শুরুতে সেখানে একজন কবি ব্রহ্ম-বিদ্যালয় স্থাপনা করে-ছিলেন, তার কোনো পরিবর্তন হবে না, এ কথা পরমভক্তরাও নিশ্চয়ই আশা করেন না।

শান্তিনিকেতন গৃহটিকে ঘিরে দু-তিনটি পাকা বাড়ি আর অনেকগুলি মাটির ঘর হল, বড় কুয়ো হল, ছেলেদের জন্যে পাকশাল হল, বিদ্যালয়ের আপিস ঘর হল। গ্রন্থাগার হল, শিক্ষকদের ঘরবাড়ি হল, গাছে গাছে শুকনো মাঠের মধ্যে যেন একটি কুঞ্জবন তৈরি হল।

এরকম আবার ছিল কবে? ছাপাখানা হল, বিজলীর কারখানা হল, দেখতে দেখতে দোতলার ছোট বাড়ি 'দেহলী' থেকে কবির বাস উঠে গেল, একতলার কুটীর 'কোণার্কের' পাশে রাজবাড়ির মতো 'উত্তরায়ণ' হল। উত্তরায়ণের সামনে টেনিস্ খেলার প্রাঙ্গণ হল, গোলাপ বাগান হল,

জাপানী বাগান হল, পিছনেও সৌখীন গাছ-গাছড়ার আমদানী হল। সুন্দর সুন্দর নতুন নতুন বাড়িতে চার দিক ছেয়ে গেল, উত্তরায়ণের পর কোণার্কের ভোল বদল, তার পর শ্যামলী, তার পর পুনশ্চ, তার পর উদীচী। কেবলই পরিবর্তন, কেবলই এগিয়ে চলা।

নিশ্চলতা কবির সইত না। কোনো কিছু একভাবে থাকবে এ তিনি চাইতেন না। ঘরের আসবাব এ কোণ থেকে ও কোণে, এধার থেকে ওধারে নিতেন। এ ঘরের বাস তুলে ও ঘরে যেতেন, সেখান থেকে সে-ঘরে। সব ঘর ফুরিয়ে গেলে অন্য বাড়িতে যেতেন। বাড়ি ফুরুলে নতুন বাড়ি তৈরি করে নিতেন। কখনো নিরামিষ খেতেন, কখনো আমিষ, কখনো হোমিওপ্যাথি করতেন কখনো বায়োকেমিস্ট্রি।

আশ্রমের আবহাওয়া সৃষ্টি করতে চেয়ে পরে আবার বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করলেন। প্রথমে বলতেন সব হোক বাংলায়, ইংরাজিতে কেউ যেন একটি দুটি চিঠিও না লেখে, পরে আরো দৃষ্টি ফেরালেন, পৃথিবীকে ডাক দিলেন, তখন আর বলা গেল না শুধু বাংলা চলবে। হিন্দী ভবন, চীনা ভবন হল। ব্রহ্ম-বিদ্যালয় হয়ে দাঁড়াল সংস্কৃতির পীঠস্থান বিশ্বভারতী। কলাভবন, সংগীতভবন হল, গ্রামোন্নয়ন, শিল্পবিদ্যালয়, সব হল। আশ্রমের সে রিক্ত নগ্ন রূপ গেল ঘুচে।

যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা একদা 'স্বদেশী সমাজে'র স্বপ্ন দেখেছিলেন, বিদেশী সরকারের কাছ থেকে সাহায্য চাইবার দীনতা থেকে দেশকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর সেই বিদ্যালয় এখন সরকারি নিয়মে সরকারি অর্থে চলেছে। কিন্তু তাতেও ক্ষোভ নেই, এ তো আমাদেরই স্বদেশী সরকার, এ টাকাও আমাদেরই দেশের টাকা।

নিয়ম-কানুন, পরীক্ষা, দপ্তর, এ-সবও অনিবার্য। দেশের সেই নিশ্চিন্ত নিষ্ক্রিয়তার দিন শেষ হয়েছে। যখন লোকে টাকা পয়সা রোজগার করার কথা ভেবে লেখাপড়া শিখত। সংস্কৃতি এখন আর সৌখীনদের একচেটিয়া বিলাসের বস্তু নয়, এ আমাদের দেশেরই সামগ্রী। যাদের করে যেতে হবে, এ তাদেরও। তাই ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, পাঠক্রম, দপ্তর। কবি একদিন অনিচ্ছা থাকলেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষার জন্য ছাত্র পাঠানো প্রয়োজনের খাতিরে অনুমোদন করেছিলেন, আজকের ব্যবস্থাতে যে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন, তাই বা কি করে বলা যায়?

তবে ক্ষুণ্ণ হয়তো খানিকটা হতেন, কারণ যেখানে তিনি

চেয়েছিলেন প্রাণের জোয়ারে সব বাধা ভাসিয়ে দিতে, সেখানেই সব কিছুকে নিয়মনিগড়ে বাঁধা হচ্ছে। প্রাণের অবাধ গতি না থাকলে মানুষের চারা বেশি নীচে শিকড় নামাতে পারে না। ঐ যে প্রত্যেক মানুষের দুটি পরিচয়ের কথা বলা হল, নিয়ম-কানুন তার প্রথমটিতে খাটে, দ্বিতীয়টি সব নিয়মের বাইরে।

কবি বিলাসিতাকে ঘৃণা করতেন, সেইজন্যই একদিন তরুণী স্ত্রী ছোট শিশুদের সুদ্ধ জোড়াসাঁকোর আরাম থেকে টেনে এখানকার কৃচ্ছ্র-সাধনের মধ্যে এনে ফেলেছিলেন। তবে কৃচ্ছ্র সাধনার তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অর্থাভাবের জন্য, সেটি হয়েছিল অনিবার্য। গান্ধীজির সঙ্গে এ বিষয়ে কবির মতভেদ ছিল। কবি চাইতেন ছেলেরা অনাড়ম্বর সরল জীবন-যাপন করবে, শরীরকে কর্মঠ ও অনলস করে তুলবে, কিন্তু অতিরিক্ত শারীরিক কষ্ট সইতে হলে স্বাস্থ্য হবে মন্দ আর মনের বিকাশ হবে ব্যাহত। সদাই যদি ছেলেরা ভাবে কিসে এই কষ্টটুকুর খানিকটা লাঘব হয়, তা হলে উন্নত চিন্তা করবে কখন?

এখন দেখা যায়, ঘরে ঘরে আলো, পাখা, নতুন নতুন অট্টালিকা, হলঘর, প্রদর্শশালা, এ সবেই যে কবির আপত্তি হত তাও বলা যায় না। তবে বেশি আড়ম্বর যে তাঁর অভিপ্রেত ছিল না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আবার এও সত্যি যে, যেখানকার যা যোগ্য সে বিষয়েও কবি সচেতন ছিলেন। বিদেশ থেকে আগত অতিথি ও কর্মীদের যাতে কষ্ট না হয়, সেদিকে সর্বদা তাঁর দৃষ্টি ছিল।

এখন শান্তিনিকেতনে গেলে আবার একটা নবীনের আভাস পাওয়া যায়। বেড়া তুলে, গাছের অন্তরাল ঘুচিয়ে, একটা মুক্তির নিশানা দেওয়া হচ্ছে। রুক্ষ অসুন্দর জমিকে ঘাসে ঢেকে ফুলের চারা লাগিয়ে সুন্দর করা হচ্ছে। পুরোনো বাড়ি-ঘর সংস্কার করে বিদ্যাদানের কাজে লাগানো হচ্ছে, কবির স্মৃতিরক্ষার জন্যে বিশেষভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

একবার উত্তরায়ণের বেষ্টনীর মধ্যে গেলে এই কথাই বার বার মনে হবে। 'দেহলী' হয়েছে শিশুদের পাঠশালা। তালগাছ ঘিরে মাটির বাড়ি 'তালধ্বজ' হয়েছে মেয়েদের কারু-শিল্পালয়।

যে বাড়িতে কেউ বাস করে না সে বাড়ি ধীরে ধীরে নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, এ কথা কি সত্যি? শান্তিনিকেতনের এই-সব পুরোনো বাড়িতে

আর প্রায় কেউই বাস করে না, সব তক্ তক্ করছে, রান্নাঘরে হাঁড়ি চড়ে না। কুটো পড়লেই লোকে তুলে ফেলে দেয়, কোন বাড়িতে কোন ঘরে কি হবে দপ্তর থেকে ঠিক করে দেওয়া হয়। যেখানকার চারি দিক ছেলেমানুষদের কলকণ্ঠে ভরা, সে কি কখনো প্রাণহীন হতে পারে। বিদ্যাদানের কাজ যেখানে চলে, তার নিজস্ব একটা প্রাণ থাকে।

এখনো এখানকার গাছতলায় ক্লাশ বসে, সংগীতভবনে দলে দলে ছেলেমেয়েরা গান শেখে, খেলার মাঠে ছেলের ভিড়, ঘণ্টাতলায় অষ্ট-প্রহর ঘণ্টা বাজে, ব্রতীবালকরা সারি বেঁধে হেঁটে চলে, চাঁদনি রাতে এখনো চড়িভাতি হয়। প্রাণহীন বলা যায় কেমন করে।

তবে প্রাণের কথা বলতে গিয়ে সব মানুষের ঐ দ্বিতীয় পরিচয়টির কথায় এসে পড়তে হয়। কবি চেয়েছিলেন দুটি ক্ষেত্রকে মিলিয়ে দিতে যা ছিল মনের জিনিস, তার জন্যে কাজের ঘরে ঠাঁই করে দিতে, যাতে দৈনন্দিনের গ্লানি লাগে তার মধ্যে আদর্শের রঙ ধরিয়ে দিতে। সে আদর্শ চিরন্তন, মুনি-ঋষিরা তাকে খুঁজে পেয়েছিলেন। তার নাম সত্যম শিবম্ সুন্দরম্।

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ

শান্তিনিকেতনে এক বন্ধু এসে বললেন, "শুধু মানুষদের দোষ দেওয়া কেন? প্রকৃতির মধ্যেই যা জিঘাংসা—দেখলে শিউরে উঠতে হয়। চোখের সামনে দেখলাম, বুগানভিলিয়া লতায় জাল বুনে সাদা-কালো নকশাকাটা মাথাওয়ালা মাকড়সা পাতার আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে বসে আছে। মশা, মাছি, প্রজাপতি ইত্যাদি জালে যা আটকাচ্ছে, তাকেই ধরে চুষে খেয়ে ফেলছে! এমন সময় একটা হলদে-কালো বোলতা এসে ওর পিঠের উপর বসল। মাকড়সাটা বোধ হয় হকচকিয়ে গেল, কিন্তু কিছুই করতে পারল না। বোলতা তার ধারালো মুখ দিয়ে কুট্ কুট্ করে মাকড়সার আটটা ঠ্যাং কেটে ফেলে দিয়ে সুপুরির মতো শরীরটাকে দিব্যি তুলে নিয়ে উড়ে চলে গেল! বীভৎস আর কাকে বলে!"

প্রথমটা সকলে বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। তার পর মনে পড়ল ঐ মরণ-যজ্ঞের পাশেপাশেই বাঁচবার কি আকুল সাধনা। আমাদের পাশের বাড়িতে কয়েকবছর কবি অন্নদাশঙ্কর রায় সপরিবারে থাকতেন। ওঁরা লোক বড় ভালো। বাড়ির চার দিকে জন্তুজানোয়ারের হাট। তাও কিছু নামকরা বিদেশ থেকে আমদানী করা সৌখীন জানোয়ার নয়, তবু তাদের আদর কত। ঘরে-বাইরে সাদা, কালো, পাটকিলে, পাঁচমিশালি পাতিবেড়াল গিজ্‌গিজ্‌ করছে। ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচায় রুগ্ন পায়রা। চেয়ারে মুরগি বসা। নেড়ি কুকুরদের দু-বেলা ডেকে এনে খাওয়ানো হত। দেখে দেখে মানবসমাজের উপর আস্থা জন্মাল। মাসকাবারে একবার করে শান্তিনিকেতনে যেতাম। সারা মাস তার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম। কিন্তু সব দিন তো আর একভাবে যায় না। কয়েক বছর এভাবে কাটবার পর কবি হঠাৎ ওখানকার বাস তুলে দিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। এই কয়েক বছরে ওঁরা আমাদের সকলের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র হয়ে পড়েছিলেন। চলে আসাতে বেশ বড় একটা ফাঁকা ফাঁকা বোধ হতে লাগল।

পরের বার শান্তিনিকেতনে গিয়ে দেখি দরজার বাইরে তালা ঝুলছে, চার দিক খাঁ-খাঁ করছে। ফটক হাঁ করে খোলা, গোরু-ছাগল ঢুকে গাছ খাচ্ছে। মনে পড়ল, একবার দেখেছিলাম কোন এক ফাঁকে ওঁদের বাড়িতে চারটে গাধা ঢুকে ফুলের চারা খেতে আরম্ভ করে দিয়েছে। কবি বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। গাছ খাওয়া দেখে ব্যাকুল হয়ে এক ছড়া করবীফুল ছিঁড়ে নিয়ে ওদের গায়ে মৃদু ঝাপটা দিতে লাগলেন। ওরা অবশ্য ভ্রূক্ষেপও করল না, যতক্ষণ না ওঁদের বাড়ির চাকর ডাণ্ডা নিয়ে হৈ-হৈ করে তেড়ে এল। যে নেড়িকুকুরগুলি বাড়ির সামনের মাঠে অন্য জানোয়ার নামলেই মহা সোরগোল তুলত, আজ ওবাড়ির ত্রিসীমানায় তাদের কাউকে দেখা গেল না। কোথায় গেল পায়রা, মুরগি, বেড়াল-কুল?

তাদের দেখা না পেয়ে মন বড়ই খারাপ ছিল। হঠাৎ সন্ধ্যাবেলায় আমাদের রাঁধবার লোক একটা ভাঙা পেয়ালা এনে বলল, "বেড়ালে ভেঙেছে।" আনন্দে লাফিয়ে ওঠলাম, "কোথায় বেড়াল?" সে বলল, "তাড়া দিলেও সাড়া দেয় না।" এর আগেও বেড়াল এসে ডোঙার ঢাকনি ভেঙেছিল। সন্দেশের বাক্স মাটিতে ফেলে কতক খেয়ে, কতক

খাবলে-খিমচে; বাকি ফেলে রেখে চলে গিয়েছিল। সেগুলি নেড়ি কুকুরেরা প্রসাদ পেয়েছিল। সে-সব সুখের দিনের কথা কেবলই মনে পড়তে লাগল।

রাতে চোখে ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল কোথায় যেন করুণ সুরে বেড়াল কাঁদছে। থাকতে না পেরে দু-একবার দরজা খুলে দেখেও এলাম। কেউ কোথাও নেই। ভাবলাম তবে কি যারা ওবাড়িতে অত সুখে ছিল, তাদের কথা ভেবে ভেবে ঐরকম কল্পনা করছি।

সকালে উঠে বাড়ির লোকদের জিজ্ঞাসা করে জানলাম কেউ কোনো ডাক শোনে নি। মালি বলল একটা দুষ্টু হুলো নাকি মুখুজ্জেদের মুরগির ডিম ও বাচ্চার লোভে ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়, কিন্তু জাল দিয়ে ঘেরা ঘরে ঢুকতে পারে না, ও তারই হতাশার ডাক। রাঁধবার লোক বলল, "হ্যাঁ, ঠিক ও-হুঁ পেয়ালাও ভেঙেছে।"

সারাদিন নানান কাজে কেটে গেল। রাতে যেই-না চার দিক নিঝুম হয়ে এল, অমনি শুনলাম বেড়াল কাঁদছে। পরদিন অনিচ্ছুক লোকজনদের দিয়ে আঁতিপাতি বেড়াল খোঁজালাম। কোথাও কিছু নেই। মালিরা একটু ভড়কে গেছে দেখলাম। বার বার বলতে লাগল, "কি জানি, ওনারা তো নানান রূপ ধারণ করে—শুনেছি। ভয় লাগে। একটা পূজা-টুজা লাগালে হয় না?"

সে রাতেও বেড়ালের কাতর ডাকে ঘুম হল না। সকালে উঠেই আর সইতে না পেরে খালি বাড়ির পশ্চিমে ইন্দ্রাণীদের বাড়ি গেলাম। "হ্যাঁরে, তোরা রাতে বেড়ালের ডাক শুনতে পাস?"

ইন্দ্রাণী হাতে চাঁদ পেল, "তুমিও শোন নাকি? আজ চার দিন আমি ঘুমোতে পারি না, আর ছেলেরা বলে নাকি আমার মনের ভুল। কি করা যায়, মাসিমা?" জিজ্ঞাসা করলাম, "ও-বাড়ির চাবি কোথায়?" "সুধাকান্ত দাদার কাছে।"

তখুনি চিরকুট লিখে মালিকে পাঠালাম তাঁর কাছে। মালির সঙ্গে রিক্শ চেপে চাবি হাতে রুগ্ন সুধাকান্ত দাদা নিজেই এলেন। বললেন, "তোমরা কি খেপলে নাকি? পাঁচ দিন হল আমি নিজে এসে ঘরদোর খুলে ওঁদের জিনিসপত্র খালাস করেছি। তার পর খালি ঘর ভালো করে পরীক্ষা করে, তবে তালা দিয়েছি। একটা কুটো কি তেলাপোকা নেই।

ও-বাড়িতে। তবু তোমাদের মনের শান্তির জন্যে ঘর খুলে দিচ্ছি।"

সদর দরজার চাবি খোলা হল। চার দিক শুন্‌-শান্‌, খাঁ-খাঁ করছে ঘর, একটা টিকটিকি পর্যন্ত পেলাম না। সুধাকান্ত দাদা কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "যা ভেবেছি ঠিক তাই। তোমরা ভুল শুনতে শুরু করেছ।"

চলেই যেতেন হয়তো, আমরা চেপে ধরলাম, "একবার রান্না-বাড়িটা দেখা যাক। ওর আলাদা তালা।" সুধাকান্ত দাদা বোধ করি একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, "এ তো আচ্ছা গেরো! বলছি একেবারে শূন্য ঘর, তিন মাস খোলা হয় নি। মালি, খুলেই দেখা।"

ঝনাৎ করে তালা খুলল। এক মুহূর্ত সব চুপচাপ। ঘরের জানলা এঁটে বন্ধ, ভিতরটা ভালো দেখাও যাচ্ছিল না। তার পরেই হুঁ-য়া-য়া-ও! স্যাঁৎ করে একটা সাদা গোলা তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে নিমেষের মধ্যে হাওয়া। আমরা হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না; মন থেকে দশমণি বোঝা নেমে গেল।

সুধাকান্ত দাদা বললেন, "দেখলে। তেজ তো কম নয়। পাঁচ দিন জলস্পর্শ করে নি, তবু কাবু হবার নাম নেই। ভাবছি ঢুকল কি করে? এ-ঘর তো তিন মাস বন্ধ।"

সবাই মিলে পর্যবেক্ষণ করলাম। রান্না বাড়ির পাশেই বড় শিরীষ গাছ। তারই একটা ডাল রান্নাঘরের কাছাকাছি পৌঁচেছে। অভ্যাসমত খাবারের আশায় বেড়াল নিশ্চয় ঐ ডাল থেকে এক লাফে স্কাইলাইটে, আবার সেখান থেকে এক লাফে নীচে। কোথাও কিচ্ছু নেই। বেরোবারও পথ নেই। সম্বল শুধু ম্যাও ডাক। দিনেরবেলায় অন্যান্য শব্দের মধ্যে শোনা যায় না, রাতে কানে যায়। পুরুষেরা কেউ শুনতে পায় না। কারণ ঘুমোলে তারা কালা-বোবা হয়ে যায়। এ-ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের আরেক পাঠ।

মানুষ তৈরি

প্রায় সত্তর বছর আগে যখন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাশ সাত আট বছর বয়সে প্রথম শান্তিনিকেতনে গেলেন একটু ভয়ে ভয়েই গেলেন। কারণ তাঁর সমবয়সী আত্মীয়রা দিনরাত বলত, যাও না ঠ্যাঙাড়েদের আড্ডায় মজা বুঝবে। যেমন সব বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলের দল, তেমনি তাদের দাড়িমুখো গুরু। পিটিয়ে তোকে তক্তা বানাবে দেখিস।

কিন্তু গিয়ে দেখলেন চার দিকে ধূ-ধূ করছে ঢেউ খেলানো খোলা মাঠ। এখানে ওখানে ভাঙা জমির লাল পাঁজরা বেরিয়ে আছে, বেঁটে খেজুর গাছ, মনসা ঝোপ, কেয়া-বন, তাল-বন। কোথাও কোথাও আম কাঁঠালের গাছ লাগানো হয়েছে। খড়ের ঘর, শুকনো হাওয়া, নীল দিগন্ত।

পাকা বাড়ি নেই বললেই হয়। সামনে যেটি ছিল তারই নাম শান্তিনিকেতন। দোতলার ঘরে যে সুন্দর মানুষটির সামনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল, তিনি যে কোনোদিনও কাউকে পিটিয়ে তক্তা বানাবেন না, সে বিষয়ে ছোট ছেলেটির মনে কোনো সন্দেহই রইল না।

ঐখানে গিয়ে দুরন্ত ছেলেরা দুদিনেই টের পেত যে অবাধ স্বাধীনতার মধ্যেও একটা কঠিন সংযমের ব্যাপার লুকিয়ে থাকতে পারে। গুরুদেব একবার অন্যায়কারীর দিকে তাকালেই সে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে যেত। যেন বাজপাখির চোখ, সব দেখতে পাচ্ছেন। তাঁকে খুশি করার জন্য কি না করতে পারত ওরা।

দেখতে দেখতে কষ্ট-সহিষ্ণু আর কর্তব্য-পরায়ণ বলে ওদের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। খুব ছোটবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে। শিলঙ পাহাড়ের একটা জলপ্রপাতের হিম-শীতল ধারার পিছনে ধাপে ধাপে পা রেখে, একদল সাদা ধুতি-পাঞ্জাবী পরা ছেলে দিব্যি উঠে গেল। ঘোরানো পথ দিয়ে আমরা উপরে উঠে শুনলাম ভিজে ঘাসে বসে গান গাইবার জন্য ওদের বকা হচ্ছে। তার পর সবাই বলতে লাগল, ওরা শান্তিনিকেতনের ছেলে, জলে-ঝড়ে রোদে-বৃষ্টিতে ওদের কিছু করতে

পারে না। ঐ আমার মনে ধারণা হয়ে গেল শান্তিনিকেতনের ছেলেরা ভারি মজবুত জবরদস্ত।

আরো পরে কলকাতায় শান্তিনিকেতনের সমালোচকরা আবার উলটো কথা বলতেন। ওরা নাকি বেজায় ন্যাকা, ঝোলা পাঞ্জাবী পরে, লম্বা চুল রাখে, চিবিয়ে চিবিয়ে বাংলা বলে। ওদের গুরু নাকি কোনো নাম করা পালোয়ানের মাস্‌ল কন্‌ট্রোলের খেলা দেখে বলেছিলেন, 'ওরে ও পাষণ্ডটাকে এখনি বিদায় করে দে!'

আরো শুনতাম ওখানে মারধোরের নিয়ম নেই বলে ছেলেগুলো মানুষ না হয়ে বাঁদর তৈরি হয়। তবে সেইসঙ্গেই পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনের বিখ্যাত গল্পও বলা হত, কেমন করে তিনি এক বেয়াড়া ছেলেকে শায়েস্তা করেছিলেন। সে ছেলে ক্লাসের মাঝখানে একজোড়া জুতো এনে রাখল। ক্ষিতিমোহন নতুন এসেছেন, তাঁকে একটু অপদস্থ করার ইচ্ছা। ক্ষিতিমোহন বললেন, 'পরো।' সে বলল, 'না মশাই, এখানে খালি পা নিয়ম।'

'তা হলে সরাও।' 'না মশাই, সরাতে হবে এমন কোনো নিয়ম নেই।' 'না সরালে চড় খাবে।' 'না মশাই, শান্তিনিকেতনের মাটিতে চড় মারার নিয়ম নেই!'

ক্ষিতিমোহন বললেন, 'বটে!' এই বলে তাকে কান ধরে শূন্যে তুলে ফেলে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করলেন। 'এখন আর তুমি শান্তিনিকেতনের মাটিতে নেই, তাই এতে কোনো দোষ নেই।' আর কখনো তাঁকে অসুবিধায় পড়তে হয় নি।

আমি নিজে যখন ১৯৩১ সালে প্রথম শান্তিনিকেতনে গেলাম, ছেলে-মেয়েদের নিয়ম-নিষ্ঠা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। লম্বা-চুল, ঝোলা-পাঞ্জাবী ছেলে কলকাতায় অনেক দেখেছিলাম, ওখানে মাত্র একজনকে দেখলাম, কলাভবনের ছাত্র, কিন্তু বেজায় ঠাণ্ডা, ভলি-বলের পাণ্ডা।

দেখলাম পড়াশুনোর সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় দৈনন্দিন কাজকে। চাকরবাকর কম। নিজেদের কাজ যতটা সম্ভব নিজেরা করে; ছোটদের কাজ অনেকখানি বড়রা পালা করে করে দেয়। ছাত্রের সংখ্যা অনেক কম, একটাই রান্নাঘর, সেখানেও ছেলেমেয়েরা পালা করে ডিউটি দেয়। পরিবেশন করে, বাসন ধোয়াতে হাত লাগায়। তা ছাড়া অতিথিদের দেখাশুনো করে; প্রতি বুধবার আশ্রম পরিষ্কার করে। এ-সব

কাজের জন্য ওদের পড়া থেকে ছুটি দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম মনে হত পড়ার ক্ষতি হচ্ছে না তো? পরে বুঝলাম পড়া মুখস্থটা বড় কথা নয়, আসল কথা মানুষ তৈরি।

বর্ষার দিনে সবাই মিলে বেরিয়ে পড়ত, চাঁদনি রাতে চড়িভাতি হত, বসন্ত-উৎসব, নাটক, নাচ-গান, সাহিত্য-সভা। নিজেরাই সব ব্যবস্থা করত ছেলেমেয়েরা। ফুল তুলত, মালা গাঁথত, আলপনা দিত, আসর সাজাত। প্রকৃতির সঙ্গে বারো মাসের সম্বন্ধ থাকত। ওদের গুরু বলতেন, নইলে সম্পূর্ণ মানুষ হবে কি করে, নিজের জায়গা বুঝবে কি করে? শুধু বই পড়ে কি গোটা মানুষ তৈরি হয়? 'তোতাকাহিনী'তেও এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছেন।

তবে দুষ্টু ছেলেরও অভাব ছিল না। কোথায়ই-বা আছে? তফাত এই যে মাস্টারমশাইরা তাদের সাজা দিতেন না। ছেলেদের বিচারসভা ছিল। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। রাতে সভা বসত। সাক্ষী-সাবুদ হাজির করে, দস্তুরমতো বিচার হত। আসামী দোষী সাব্যস্ত হলে, তাকে কড়া শাস্তি দেওয়া হত। কোনোমতেই পার পেত না।

নিয়মিত বার্ষিক পরীক্ষা হত। গাছে ঠেস দিয়ে বসে যে যার প্রশ্নের উত্তর লিখত। পাহারাদার চোখে পড়ত না। বই খুলে কাউকে কখনো টুকতে দেখি নি। শুধু ছাত্র তৈরি হত না ওখানে, মানুষের চাষ হত।

অনেকে নিন্দা করতেন, বলতেন কলকাতার তুলনায় শিক্ষার মান বড় নিচু। তবু এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে ওখানকার স্নাতকদের মধ্যে সেকালে অনেকেই পরবর্তী জীবনে নানান ক্ষেত্রে দেশের সেবা করে স্বনামধন্য হয়ে আছেন।

ওস্তাদ

ছবির মতো পরিষ্কার মনে পড়ে জীবনের একেকটি ঘটনা। ১৯৩৮ সাল। শান্তিনিকেতনে প্রথম গেছি, ইংরেজি পড়াই স্কুলের উপরের ক্লাসে আর কলেজে। কিছু কিছু অঙ্কও কষাই। কিন্তু তাতে প্রতিদিনের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে হয়তো রোজ চার কি পাঁচ ঘণ্টা কাটে। ঘণ্টা-খানেক কলাভবনে গিয়ে নন্দলাল বসুর কাছে একটু-আধটু ছবি আঁকা শিখি। রাতে হয়তো আট ঘণ্টা ঘুমোই।

এই তো গেল চোদ্দো ঘণ্টার হিসাব। আরো দু ঘণ্টা নিজের কাজে কাটালেও হাতে থাকত ইচ্ছে মতো উপভোগ করবার মতো পুরো আটটি সোনা বাঁধানো ঘণ্টা। স্রেফ দেখে দেখে, হেঁটে চলে, নতুন নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করে প্রতিদিনকার এই বাড়তি আট ঘণ্টা কাটত। এখন বুঝতে পারি ঐ আটটি ঘণ্টাই ছিল সারাদিনের মধ্যে সব থেকে দামী।

ওস্তাদ বলে একজন বুড়ো লোক রোজ আমাদের হাজিরার খাতায় সই জোগাড় করে বেড়াত। মাস-কাবারে সেই আবার খুঁজে খুঁজে যার যার মাইনে দিয়ে যেত। আমি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট এম. এ. বলে অনেকের চেয়ে একটু বেশিই পেতাম। অর্থাৎ মাসে মাসে পুরো পঁয়ষট্টি টাকা। এতগুলো টাকা আমার হাতে ওভাবে দিতে ওস্তাদের ইচ্ছা করত না। বার বার বলত—কি করবে এত টাকা দিয়ে? রাখবে কোথায়? আমার সবটা খরচ করবার মতলব শুনে শক্ড্ হয়ে যেত। বলত, "ছি ছি, এইভাবে লোক খাইয়ে, চাঁদা দিয়ে, চটি কিনে, কাপড় কিনে এতগুলো টাকা ওড়াবে? টাকার দাম জান না? সেকালে এখানকার লোকরাই প্রাণ হাতে নিয়ে ডাকাতি করে টাকা জোগাড় করত।"

আমরা বলতাম, "তাই-না আরো কিছু!"

ওস্তাদ রেগে যেত। বলত, "দেখতে পার ঝোপের গোড়ায় মাটির নীচে খুঁড়ে, কত মাথার খুলি বেরিয়ে পড়বে।" আমাদের বেজায় আগ্রহ হত। "কোথায়, ওস্তাদ, কোথায়?" "কেন, তোমাদের ঐ ছাতিম-

তলাও বাদ যাবে না।" শুনে আমরা শিউরে উঠতাম।

একদিন বলল, "প্রায়ই রাতে ওরা বর্ধমানে ডাকাতি করে, ভোরের বেলা ঘরে ফিরে শুয়ে থাকত। থানার লোকে খবর পেয়ে খানা-তল্লাসি করতে এসে দেখত, যে যার খোড়ো ঘরে মাদুর পেতে, ময়লা বালিশ মাথায় দিয়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে! ডাকাত ধরা পড়ত না।"

আমরা বলতাম, "হ্যাঁ, পাশের গাঁ কিনা! রাতারাতি বর্ধমানে গিয়ে ফিরে আসত, বললেই হল। কি করে যেত আসত? ট্রেনে করে?"

ওস্তাদ আকাশ থেকে পড়ত। "ট্রেনে করে আবার কি? কোথায় ট্রেন তখন! তার কত পরে ড্যালহৌসি সায়েব সুরুলের কুঠিবাড়িতে রাত কাটিয়ে, ফিরে গিয়ে ঠিক করল কোথা দিয়ে রেলের লাইন বসবে। ওরা রণ-পা চড়ে যেত। রণ-পা জানো তো? লম্বা-লম্বা বাঁশ। তাতে এক তলার ছাদের সমান উঁচুতে খাঁজ কেটে খোঁটা বাঁশ থাকত। তাতে পা বসিয়ে, বাঁশের ডগা বগলে চেপে ওরা বাতাসের বেগে যেত আসত।"

"থানার পেয়াদা রণ-পা দেখে কি বলত?"

"দেখবে তবে তো বলবে। ভোরের আগে বাড়ি ফিরে হাত-পা ধুয়ে, দিঘির জলে রণ-পা ডুবিয়ে রাখা হত। উঠে পড়ে ওস্তাদ বলত, "যাই আমার কাজ আছে। যেয়ো একদিন আমাদের বাড়িতে।"

তাই গিয়েওছিলাম একদিন দল বেঁধে। বোলপুর রেল-স্টেশনের উত্তরে একটা পুল দেখা যায়। সেই পুল দিয়ে লাইন পার হয়ে ওপারে পারুল-ডাঙায় ওস্তাদের বাড়ি। অনেকটা পথ হাঁটতে হল, যখন গিয়ে পৌঁছলাম, সূর্য ডুবতে খুব দেরি নেই। ওস্তাদের কি রাগ! "এই তোমাদের লোকের বাড়ি যাবার সময় হল? আর ঘণ্টা দুই পরেই উপাসনার ঘণ্টা পড়বে না? বউ রাঁধবে কখন, তোমরা খাবে কখন?"

অনেক কষ্টে বোঝালাম আজ ফিরে যেতেই হবে। আরেকদিন এসে খেয়ে যাব। বাড়িসুদ্ধ সকলের কি দুঃখ। সোনার মতো ঝক্‌ঝকে কাঁসার ঘটিতে ওরা আমাদের সরবতের মতো মিষ্টি জল, নিজেদের খেতের আখের গুড় আর বাগান থেকে সদ্য উপড়ানো গাছসুদ্ধ কাঁচা ছোলা এনে দিল। আর কখনো কেউ আমাকে নতুন আখের গুড় দিয়ে কাঁচা ছোলা খেতে দেয় নি। ওস্তাদের বাড়িতেও আর কখনো যাওয়া হয় নি।

খ্রীস্ট-উৎসব

আজকের এই সুন্দর দিনে যীশু জন্মেছিলেন। কোন মন্ত্রবলে মধ্য-এশিয়ার এক অখ্যাত গ্রামে, গরিব এক ইহুদী ছুতোরের ঘরে, এমন ছেলে জন্মাল যে, দু হাজার বছর ধরে পৃথিবীর সব চাইতে ধনী, সব চাইতে উন্নত দেশের, কোটি কোটি মানুষের মনের মর্মমূলে এমন করে নাড়া দিল যে, আজ পর্যন্ত তারা তাঁর নামে নিজেদের খ্রীশ্চান বলে পরিচয় দিয়ে গর্ব বোধ করে!

তার চাইতেও বড় বিস্ময় হল যে, কোনো নতুন ধর্মমত প্রচার করা তাঁর অভিপ্রায় ছিল না; তাঁর একমাত্র ধর্ম ছিল মানবতার ধর্ম, যার বলে মানুষ মানুষের মতো বাঁচতে পারে; নিজেকে শ্রদ্ধা করতে পারে; অপরকে ক্ষমা করতে, ভালোবাসতে পারে। সুখী মানুষ আর কটা আছে? এ পৃথিবী দুঃখী দিয়েই ভরা। যীশু বারে বারে তাদের কথাই বলেছেন। তাঁর কথার মধ্যে ধর্ম-ভেদের প্রশ্নই ওঠে না, যেখানে যত বঞ্চিত, ব্যথিত, উৎপীড়িত আছে, তিনি তাদের কথা বলেছেন।

ম্যাথিউ লিখিত গস্পেলের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম অধ্যায়ে মানবজাতির সব ধর্মের মূল কথাগুলি লেখা আছে। সে-সব কোনো মহান আধ্যাত্মিক রহস্য নয়, যা শুধু পণ্ডিত ও সংসার-ত্যাগীর বোধগম্য হবে। সে-সব কথা সাধারণ, দুর্বল, মূর্খ, ভ্রান্ত, দুঃখীদের জন্য বলা হয়েছে; হতাশ যারা তাদের জন্য আশার কথা বলা হয়েছে; 'গস্পেল' শব্দের মর্মই তাই।

যীশুর শিষ্যরা বেশির ভাগই গরিব অশিক্ষিত মানুষ ছিলেন। খেটে-খাওয়া শ্রমিক, জেলে। তাঁদের সকলকে যীশু বলছেন, "Ye are the salt of the earth, but if salt have last his savour, where with shall it be salted?"

তোমরা লবণের মতো, তোমরা না থাকলে সব-কিছু বিস্বাদ হয়ে যায়! কিন্তু লবণ যদি তার লবণাক্ত হারায়, তবে সে কার কোন কাজে

আসবে ? অর্থাৎ তোমাদের হৃদয়ের গুণগুলিকে রক্ষা করো।

ভক্তদের আরো বলছেন, "Ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid.

"Neither do men light a candle and put it under a a bushel, but on a candle-stick and it giveth light unto all that are in the house.

"Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your father which is in heaven."

তোমরা পৃথিবীতে আলো দেবে। পাহাড়ের চুড়োয় তৈরি যে নগর, তাকে তো আর লুকিয়ে রাখা যায় না। মোমবাতি জ্বেলে কেউ ঘেরা-টোপ দিয়ে ঢেকেও রাখে না। মোমবাতি রাখতে হয় বাতি-দানে, যাতে সে-বাড়ির সকলে আলো পায়। তোমাদের আলোও লোকের সামনে জ্বলে উঠুক, সকলে তোমাদের সুন্দর কাজ দেখুক আর তাই দেখে তোমাদের যিনি পিতা, সেই ভগবানের গুণগান করুক।"

এ-সব কোনো বিশেষ সৌভাগ্যবান সুখী লোকেদের কথা নয়, সাধারণ ঘরোয়া মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলা ; কেমন করে তারা এই কঠিন পৃথিবীতে ক্লিষ্ট জীবন কাটাবে, সেই উদ্দেশ্যে বলা কটি স্নেহের আশ্বাস। বলছেন :

"...if thou bring thy gift to the altar and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the alter and go thy way ; first be reconciled to thy brother and then come and offer thy gift."

মানুষের মতো মানুষ হওয়াটা সব সময় খুব সহজ নয়, এমন-কি, শুধু পুজো করলেও যথেষ্ট হয় না। তাই যীশু বলেছেন : ভগবানের বেদীমূলে নৈবেদ্য নিয়ে এসে যদি মনে পড়ে ভাইকে তুমি ক্ষোভের কারণ দিয়েছ, তা হলে ঐখানে নৈবেদ্য ফেলে রেখে, আগে গিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদ মিটাও, তার পর পুজো দিয়ো।

গরিবদের মাঝখানেই বড় হয়েছেন, তাদের দোষ-দুর্বলতা কত দেখেছেন ; তাদের আচার-ব্যবহারে কথায়-বার্তায় কত শিথিলতা ;

তাদের বলেছেন,

"Swear not at all...but let your communication be yea, yea, nay, nay."

মিছিমিছি দিব্যি গেল না, হাঁ বলতে হাঁ বল, না বলতে না বল, সেই যথেষ্ট।

লোক দেখানি ধর্মাচার যীশু সইতে পারতেন না। বলতেন : দান করবে যখন, কেউ যেন দেখ্তে না পায়। এমন-কি, ডান হাত কাকে কি দিল বাঁ হাত পর্যন্ত সে কথা জানতে না পারে। অর্থাৎ দানের গর্ব কোরো না।

যখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবে, লোকের মাঝখানে করবে না, নিজের ঘরে, দরজা বন্ধ করে প্রার্থনা করবে, কারণ ভগবান তো গোপনেই থাকেন।

বার বার বলবে না—হে পিতা এই দাও, ঐ দাও। তিনি পিতা তিনি তো জানেন তোমাদের কিসের প্রয়োজন, তোমরা না চাইতেই তো তিনি সে কথা জানেন।

যখন উপবাস করবে, রুক্ষ চুলে ক্লিষ্ট মুখে কারো সামনে বেরুবে না। মাথায় তেল দেবে, মুখ ধোবে। লোক দেখাবার জন্য তো উপবাস নয়, পরম পিতাকে দেখাবার জন্য; তিনি গোপনে থেকেই সব দেখছেন।

যীশুর বলা কত কথা সমস্ত খৃস্টীয় জগতে প্রবাদের মতো হয়ে গেছে, সেগুলি এত সহজ, এত সত্য যে সকলের মনের মূলে আঘাত করে। অনেকে জানেও না যে কথাগুলি বাইবেল থেকে নেওয়া। যেমন— "Man does not live by bread alone," পেটের ক্ষুধা মিটলেই হল না গভীরতর ক্ষুধা আছে; সেগুলি মেটানো অত সহজ নয়।

"Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal; but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth, nor rust doth corrupt and no thieves break through and steal : for where your treasure is, there will your heart be also."

পৃথিবীর মাটিতে তোমাদের ধনসম্পদ রেখো না, সেখানে পোকায় কাটবে, মরচে ধরবে, চোরে নেবে। স্বর্গরাজ্যে ধন রেখো, সেখানে পোকাও নেই, মরচেও নেই, চোরও নেই। কারণ ধন যেখানে রাখ, মনও সেখানে থাকে।—ঘরোয়া মানুষকে বলা ঘরোয়া সব কথা।

"Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but considerest not the beam in thine own ?" ভাইয়ের চোখে ধূলোকণাটুকু পড়লে তোমাদের চোখে পড়ে, কিন্তু সূর্যরশ্মিতে যে লক্ষ লক্ষ কণা নাচে, সে রশ্মি নিজেদের চোখে পড়লে কিছু বল না কেন ?

সাধারণ মানুষের জীবন দিন-গুজরান করতেই কেটে যায়; তত্ত্বকথা নিয়ে মাথা ঘামাবার তাদের সময়ই-বা কোথায়, বুদ্ধিই-বা কতটুকু ? যীশুর কথা সেই সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনকেই ঘিরে আছে। এ তো আর শুধু নিয়ম পালনের ধর্ম নয়, এ হল জন্ম মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিনের বাঁচার ধর্ম। সংসার এর পীঠস্থান ; সংসারকে ঘৃণা করলে চলবে কেন, সাধারণ মানুষরা তো সবাই সংসারী। ভক্তরা তাঁকে বলত ঈশ্বরের পুত্র, কিন্তু তিনি নিজের পরিচয় দিতেন মানবের পুত্র বলে। মানুষের দুর্বলতা তাঁর অজানা ছিল না। সাধারণ মানুষদের বলেছেন, "পবিত্র জিনিস কখনো কুকুরকে দিয়ো না, মুক্তো কখনো শুয়োরের সামনে ছড়িয়ো না।" আরো বলেছেন, "Whatsoever ye would that men should do unto you, do you even so to them." লোকের কাছে যেমন ব্যবহার চাও, তোমরাও তাদের সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করো।

সংসার পীঠস্থান হলেও, শুধু সংসার সংসার করে জীবন কাটালে চলবে না। পাখিরা কই কালকের জন্য তো চিন্তা করে না, ফুলরা তো সাজসজ্জা নিয়ে ব্যস্ত হয় না। কালকের কথা নিয়ে ব্যাকুল হোয়ো না, আজকের কাজ আজ সারো, আজকের দুঃখ আজ মেটাও। "Sufficient unto the day is the evil there of."

যীশুর ধর্ম প্রেমের ধর্ম, ক্ষমার ধর্ম, তাই যে-কোনো মতাবলম্বীর হৃদয়ে তাঁর জন্য একটি কোমল উষ্ণ জায়গা থাকে। প্রেমের নিয়মই আলাদা, সে তো আর যোগ্য অযোগ্য বিচার করে না, সবার জন্য কোল পেতে থাকে। যীশু বলছেন, "Ask and it shall be given unto

you. Seek and ye shall find, knock and it shall be opened unto you."

চাইলেই লাভ করবে, খুঁজলেই পাবে, করাঘাত করলেই দোর খুলে যাবে।

আজ সমস্ত খ্রীস্টীয় জগত আনন্দ-উৎসবে, বেশে-বাসে, উপহার-বিতরণে, দানে-উপাসনায় যীশুর জন্মদিন পালন করছে। কিন্তু আমাদের তো ও-সব নেই, আমরা কি-ভাবে আজ উৎসব করব? তাঁর প্রেমের বাণী, অভয় বাণী, কানে শুনব, চিত্তে ধারণ করব, তার চাইতে বেশি আমরা আর কিই-বা করতে পারি?

গান্ধীজির সবুজ পাতা

যদিও সম্ভবত ১৯১০ সালে গান্ধীজি দক্ষিণ আফ্রিকাতে নানারকম উৎপীড়নের চোটে টিকতে না পেরে, একদল ছাত্র নিয়ে দেশে ফিরে এসে, তাদের শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়ে ভরতি করে দিয়েছিলেন, তবু শেষ পর্যন্ত তাদের সরিয়েও নিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ কি করে ছেলে মানুষ করতে হয়, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি একমত ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা তার ছাত্র-ছাত্রীরা সরল স্বাভাবিক সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠুক। কাজেই ওখানকার বিদ্যালয়ের জীবনযাত্রা খুবই সাদা-সিধে হলেও তারই মধ্যে ছেলেদের যাতে বেশি কষ্ট না হয়, গুরুদেবের সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি বলতেন, শরীরটা যদি একটু আরাম না পায়, পড়াশুনো কাজকর্মেও মন বসবে না। কেবলই মনে হয় কিসে একটু আরাম পাওয়া যায়, কিসে একটু কষ্ট কমে। ওদিকে গান্ধীজি চাইতেন কঠোর সংযমের মধ্যে ছেলেরা মানুষ হোক; কষ্ট সহ্য করুক, তাতে ভালো বৈ মন্দ হবে না।

আসলে দুজনের উদ্দেশ্যই আলাদা ছিল। কবি চাইতেন এদের মন ফুলের পাপড়ির মতো খুলে যাক, যার যা স্বাভাবিক গুণ তা ফুটে উঠুক, প্রকৃতির সঙ্গে ওরা নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে জানুক, এমন সুন্দর বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এরা একে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতে শিখুক। স্বাধীনতা-

সংগ্রামীরা চাইতেন এরা সব স্বাভাবিক আমোদ-আহ্লাদ ত্যাগ করে, শুধু দেশের কাজেই ব্রতী হোক। এদের শুধু সেই দিকটাই ফুটুক যেটা দেশের কাজে লাগবে। আসলে কবিও সেই-ই চাইতেন তবে ব্যাপারটাকে অন্য দিক থেকেও দেখতেন। তিনি চাইতেন এদের সমগ্র জীবনটাই দেশের কাজে লাগানো হোক। সম্পূর্ণ মানুষেরাই তো দেশের স্থায়ী সম্পদ। এদিকে বাইরের লোকে জানত শান্তিনিকেতনের কড়া শাসনে পড়ে দুষ্টু ছেলেরাও শায়েস্তা হয়ে যায়, তাই অনেক দুরন্ত ছেলেদের অভিভাবকরা, নিজেরা হার মেনে, গুরুদেবের ঘাড়ে তাঁদের ছেলে মানুষ করার ভার চাপিয়ে দিতেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন দেখে অবাক হয়ে যেতেন। অথচ দুষ্টুগুলোকে মারধোর করা হত না, কোনো নিষ্ঠুর সাজা দেওয়া হত না, ভয় দেখানো হত না। তারা সত্যি অন্যরকম হয়ে যেত। তাদের মধ্যে অনেকেই পরে নিজেদের দেশের কৃতী সন্তান বলে নামও করেছিল। কি ছিল গুরুদেবের ছেলে বশ করার গোপন নিয়ম?

গোপন নিয়মটি আর কিছুই নয়, স্রেফ তিনি প্রকৃতির হাতে তাদের সঁপে দিতেন। তিনি দেখতেন প্রকৃতি নিজে বড় সুন্দর, বড় নিয়ম-নিয়ন্ত্রিত, বড় পরিচ্ছন্ন, বড় পবিত্র। তার চেয়ে ভালো গুরু আর কোথায় পাওয়া যাবে? পৃথিবীতে যত অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, নিষ্ঠুরতা, নোংরামি, সবই তো মানুষের তৈরি এবং বেশির ভাগই শহুরে মানুষের তৈরি। গাছপালা, এমন-কি, জন্তু-জানোয়ারও তো নিজেদের দরকারের বেশি কিছু চায় না। দুর্বলের কাছ থেকে অনেক সময় কেড়ে নেবার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু দলের মধ্যে থাকলে তাও করে না। আর মানুষের তো অনেক বেশি বুদ্ধি থাকে, তাদের তো আরো সর্বাঙ্গ-সুন্দর জীবন কাটানো উচিত।

আশ্রমে সবাই নিরামিষ খেত, খালি পায়ে থাকত, ভোরে উঠত, শীতকালেও কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে স্নান করত, নিজেদের সব কাজ নিজেরা করত। যারা খুব ছোট, বড়রা তাদের দেখাশোনা করত। সবাই অতি সাধারণ কাপড়-চোপড় পরত। কিন্তু উত্তম মানুষ হবার এইগুলোই আসল উপায় নয়। এ-সব নিয়মের অনেকখানিরই একমাত্র কারণ ছিল অর্থাভাব। অনেক কষ্টে গুরুদেবের বিদ্যালয় চলত। বাবার কাছ থেকে জায়গাটুকু আর কয়েকটা বাড়িঘর পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু চালাতে

হত নিজের খরচে। ছেলেদের কাছ থেকে যৎসামান্য টাকা নেওয়া হত। নিজের পুরীর বাড়ি বেচলেন, ওঁর স্ত্রী তাঁর গয়নাগুলিও বেচে দিলেন, চাঁদা তোলা হত, নাটক আর গানের আসর করা হত। এমনি করে খরচ চলত। তার পর কখন ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন সে টাকাগুলোও আশ্রমের পথঘাট তৈরি করতে ও অন্যান্য অভাব মেটাতে খরচ হয়েছিল। অনেক বছর পরে আশ্রমিকরা এই ঋণশোধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

অবিশ্যি কৃত্রিম বিলাসিতার স্থান ছিল না আশ্রমে। ফুলের মালা, ফলের পাপড়ি, কি বিচিত্র রঙে ছাপা কাপড়, এর চেয়ে বেশি সাজ আবার কোন মেয়ের দরকার ?

আমি যখন ১৯৩১ সালে শান্তিনিকেতনে গেলাম, তখনো দেখলাম কি সাদাসিধা জীবনযাত্রা। পুরোনো কঠোর নিয়মে খানিকটা ঢিল দেওয়া হয়েছে, কারণ তখন আর অত অর্থকষ্ট নেই। কিন্তু তখনো সবাই সাদাসিধা কাপড়-চোপড় পরে ; খালি পায়ে থাকে ; নিজেদের কাজ নিজেরা করে ; রান্নাঘরে, অতিথিশালায় পালা করে ডিউটি দেয়। স্বাবলম্বী না হলে কখনো মানুষ হওয়া যায় ? সামান্য কাজকেও শ্রদ্ধা করতে না জানলে, কেউ কখনো বড় কাজ করতে পারে ?

দেখলাম ফাল্গুন মাসে গান্ধীদিবস পালিত হল। সেদিন আশ্রমের সব ঠাকুর-চাকরদের ছুটি। তারা নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে রান্নাঘরে খেয়ে যাবে। রাঁধাবাড়া, বাসনমাজা, ঘরধোয়া সব কাজ করল ছাত্র-ছাত্রী আর তাদের মাস্টারমশাই আর দিদিমণিরা।

তখন ড্রেন পায়খানা ছিল শুধু শিশু বিভাগে আর সব জায়গায় খাটা পায়খানা। মেথরদেরও তো ছুটি, কাজেই কলা ভবনের ছেলেরা বালতি-ঝুড়ি-ঝাড়ু নিয়ে চলল পায়খানা পরিষ্কার করতে। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম কোদাল কাঁধে সবার আগে চলেছেন ওদের মাস্টারমশাই দেবতুল্য নন্দলাল বসু। 'ফাগুন লেগেছে বনে বনে' গাইতে গাইতে ওরা কাজে লেগে গেল। ভাবলাম স্বয়ং গান্ধীজিই-বা এর চেয়ে বেশি কি চাইতে পারতেন ?

আয়নায় যেমন এক দিকে কালো না লাগালে অন্য দিকে আলো ফোটে না, জীবনের বেলাও তাই। এক দিকে এই সরল জীবনযাত্রা, অন্য দিকে নাচে, গানে, নাটকে, কাব্যে, ছবিতে, মূর্তিতে, গৃহ-সজ্জায়,

প্রকৃতিকে আর প্রকৃতির অন্তরে যে মহাপ্রাণ আছে তাকে আবাহন করা, গাছের মতো ডালপালা নেড়ে তাদের গুণগান করা।

বছরের ছয় ঋতুতে উৎসব করা হত। চাঁদনি রাতকে সম্বর্ধনা জানানো হত। নীল নবঘন বর্ষাকে আবাহন করা হত। ফসল লাগানো হল, বৃক্ষ-রোপণ উৎসব হল। ফসল কাটা হল, পৌষ উৎসব হল। প্রকৃতির প্রসাদ দুই হাত পেতে, বুক ভরে নেওয়া। তার বদলে মুক্ত হৃদয়ে উদার কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা জানানো। বুঝতে শেখা যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের মধ্যে ছোট আমাদেরও একটা নিজস্ব জায়গা আছে। সেখানে আমাদের দরকারি কাজ করতে হয়, হাত পেতে প্রসাদ নিতে হয়।

এই সবাই মিলে কাজ করাটি দেখতে বড় ভালো লাগত। লক্ষ্য করতাম আপনা থেকেই কেমন একটা স্বার্থ-ত্যাগ আর সকলের সঙ্গে সহানুভূতির ভাব এসে যাচ্ছে। অথচ রুক্ষতার মধ্যে দিয়ে নয়, আনন্দের মধ্য দিয়ে।

নিয়মের যে ব্যতিক্রম হত না তা বলছি না। দুর্বল মানুষের দুর্বলতা থাকবে সে আর আশ্চর্য কি? অপরাধীকে ধরে পেটানো হত না, হেড-মাস্টারের ঘরেও ডেকে নিয়ে যাওয়া হত না। তার চেয়েও ভয়াবহ এক ব্যবস্থা ছিল। সেটি হল বিচার-সভা। রাতে বসত বিচার-সভা; বিচার করত ছেলেরা নিজেরা। মাঝে মাঝে খুব কঠিন দণ্ড দিত। কিন্তু তার চেয়েও কঠিন ছিল ঐখানে গিয়ে দাঁড়ানোর লজ্জা, বন্ধুদের নীরব ধিক্কারের আশঙ্কা! বিচার-সভাকে মানে না, এমন একটি ছেলের কথাও মনে পড়ছে না আমার।

আসল কথা হল মানুষ হতে হলে মানবজীবনকে শ্রদ্ধা করা চাই, পৃথিবীকে ভালোবাসা চাই। এই দুইটি অমূল্য রত্নই গুরুদেব দিতে চেয়েছিলেন তাঁর ভাগ্যবান শিষ্যদের। শ্রদ্ধা করার আগে চিনতে পারা চাই, ভালোবাসার আগে কাছে আসা চাই, পাশে বসা চাই।

অবনীন্দ্রনাথের একশো বছর

একেকজন লোক থাকে, তারা অল্পসময়ের মধ্যে ধ্বক্-ধ্বক্ করে উঠে সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, কিন্তু যতই থাকে কাটতে দিন, তাদের প্রতিভা যেন কেমন চোখ-সওয়া হয়ে যায়, পরে কাউকে ততটা অভিভূত করতে পারে না। আবার একেকজন থাকে যাদের দেখে প্রথমটা সকলে ততটা মুগ্ধ হয় না, কিন্তু যতই দিন কাটে, হীরের টুকরোয় নানান দিক থেকে আলো পড়লে যেমন নানান কোনা থেকে অপ্রত্যাশিত সব রঙের ছটা চোখ ঝলসে দেয়। অবনীন্দ্রনাথ হলেন সেই শেষের দলের।

রবীন্দ্রনাথের খুড়তুতো ভাইয়ের ছেলে, তাঁর চেয়ে বছর দশেকের ছোট, তাঁর পরম ভক্ত ও বন্ধু, একই জায়গায় মানুষ অথচ অনেক বেশি লাজুক, অনেক বেশি আড়ালে থাকা স্বভাব। কাকার অসাধারণ প্রতিভার পাশে অবনীন্দ্রনাথের গভীর স্নিগ্ধ স্বরূপ, কেউ তত লক্ষ্য করত না। অবিশ্যি কেউ না করলেও 'রবিকার' নজর এড়িয়ে যায় নি। দশ বছরের ছোট ভক্তটি তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে থাকত, ফাই-ফরমায়েস খাটত, স্বদেশী আন্দোলনের সময়, ঝাণ্ডা তোলা, পতাকা তৈরি করা, গানের দলে ভিড় বাড়ানো, ইত্যাদি কাজেও ভারি পটু ছিল। তা ছাড়া দুজনেই স্কুল পালানো ছেলে, মনের মিল তো গোড়া থেকেই ছিল। যদিও কাকার নতুন দেওয়া গানের সুর ভাইপো মাঝে মাঝে স্রেফ ভুলে যেত! আবার নতুন সুর দিতে হত।

এত সব সত্ত্বেও কি করে যে অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে বা লেখাতে কোথাও রবীন্দ্রনাথের এতটুকু অনুকরণ নেই, তাই দেখে অনেকে আশ্চর্য হয়েছেন। আসল ব্যাপার হল যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবেই অবনীন্দ্রনাথের স্বাধীন প্রতিভা, নিজের এমন একটা জোরালো রূপ নিতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথ অনুকরণ ভালোবাসতেন না।

অবনীন্দ্রনাথের যখন কুড়ি-বাইশ বছর বয়স, আঁকিয়ে বলে তাঁকে অনেকে জানত, কিন্তু তাঁর লেখা-টেখার দিকে মন ছিল না। সেই সময়

রবীন্দ্রনাথ মহর্ষি ভবনের এক তলায় ছোট ছেলেদের জন্য ছোট্ট একটা স্কুল খুললেন। এখন ছাত্র যদি-বা মিলল মাস্টারমশাই না হলে স্কুল কি করে চলে? বিশেষ করে বিনি পয়সার মাস্টারই-বা কোথায় পাওয়া যাবে? রবীন্দ্রনাথ তখন অন্য দু-একজনের সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথকেও মাস্টার পাকড়ালেন। এই কাকাটিকে না বলা শক্ত। এর আগে অবনীন্দ্রনাথ যখন ছেলেমানুষ ছিলেন তখন মাঝে মাঝে তাঁর আব্দারের ফলে, তাঁদের নানান প্রতিযোগিতার খেলায় রবিকাকে সভাপতি হতে, পুরস্কার বিতরণ করতে হয়েছিল। কাজেই অবনীন্দ্রনাথ মাস্টার বনে গেলেন।

ছোট ছেলেগুলোকে তিনি এমন সুন্দর গল্প বলতেন যে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধরে বসলেন ছোটদের জন্য ঠিক যেমন করে গল্প বলেন, তেমনি ভাবে গল্প লিখতে হবে। অবনীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে পড়লেন! লিখতে তিনি পারেন নাকি? কাকাও ছাড়বার পাত্র নন, কেন লিখতে পারবেন না? ভাষায় কোনো খুঁত থাকলে তিনি নিজে দেখে দেবেন। তখন অনেক ভয়ে ভয়ে শকুন্তলা লেখা হল। কি কোমল, কি মিষ্টি, কি সুন্দর সে গল্প! শুনলে পর মনের মধ্যে ছবির মতো ফুটে ওঠে।

সে বই পড়ে সবাই মুগ্ধ হয়ে গেল। রবিকার কাছে সাহস পেয়ে অবনীন্দ্রনাথের মনে হল তাঁর অন্তরের যেন একটা দরজা খুলে গেল, তিনি যেন আলো-বাতাসে বেরিয়ে এলেন। পর পর অনেকগুলো অপূর্ব বই লিখে ফেললেন। কোন কালে সে-সব বই প্রথম ছাপা হয়েছিল, আজও তারা পুরোনো, সেকেলে হওয়া দূরে থাকুক, যতই পড়া যায়, ততই যেন নতুন নতুন গুণ চোখে পড়ে। এ ধরনের লেখাকে বলে কালোত্তর। এগুলোর আদর কখনো ফুরোয় না।

১৮৯৫ সালে 'শকুন্তলা' ছাপা হল। ১৮৯৬ সালে 'ক্ষীরের পুতুল'। ১৯০৯ সালে 'রাজকাহিনী', ১৯১৫তে 'ভূতপত্‌রীর দেশ', ১৯১৬তে 'নালক'। ১৯১৯ সালে প্রকাশিত 'পথে-বিপথে' বড়দের জন্য লেখা, ১৯২১এ ছাপা 'খাজাঞ্চির খাতা' ছেলে-বুড়ো সবাই পড়ুক। মাঝখানে অনেকদিনের একটা ফাঁক। তার মধ্যে বই লেখাও হয়েছিল, ছবিও আঁকা হয়েছিল, কিন্তু ছেপে বেরুনোর হিসাব পাচ্ছি না। ১৯৪১ সালে 'বুড়ো-আংলা' বই হয়ে বেরুল, আগেই অবিশ্যি মাসিক পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল।

এ ছাড়া আরো কয়েকটি বই আছে, লেখার অনেক পরে সেগুলি বই হয়েছিল। তার মধ্যে অনেকগুলি পুস্তকরূপে রচয়িতা নিজে দেখে যান নি। এখানে 'ঘরোয়া', 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'আপন কথা' আলোর 'ফুলকি', 'মাসি', 'একে-তিন-তিনে-এক', 'মারুতির পুঁথি', 'রং-বেরং', 'চাঁই বুড়োর পুঁথি' এবং সবার শেষে 'কিশোর সঞ্চয়ন'।" এগুলির মধ্যে কোনটাকে ছোটদের বই বলব, কোনটাকে বড়দের বই বলব ভেবে পাচ্ছি না। সবাই সব পড়ুক, যে যেটুকু পারে বুঝে নিক এমন আশ্চর্য জিনিস বাংলা ভাষায় আর নেই।

এ ছাড়া জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের বইও আছে, যেমন 'ভারত-শিল্প', 'বাংলার ব্রত', 'প্রিয়দর্শিকা', 'চিত্রাক্ষর', 'বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলী', 'সহজ চিত্র-শিক্ষা', 'ভারত-শিল্পের সুড়ঙ্গ', 'ভারত-শিল্পে মূর্তি', 'শিল্পায়ন' ইত্যাদি বোঝাই যাবে এগুলি শিল্পের বিষয়ে বই। এত ভালো শিল্পের বই কম দেখা যায়। বাগেশ্বরী প্রবন্ধগুলিকে অবনীন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। ভারতীয় শিল্পের মূল কথা, মর্মের গোড়ার কথা, এমন অপূর্বভাবে কেউ কখনো বলতে পেরেছে কি না জানি না।

অবনীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকতেন, মনে হত ছবিগুলো বুঝি দর্শকের কানে কানে কথা কইছে। আবার যখন গল্প লিখতেন, মনে হত চোখের সামনে মাদুরের মতো গুটনো একটা অফুরন্ত ছবি, পাকে পাকে খুলে যাচ্ছে। কোথায় তার শুরু হয়েছিল, কোথায় তার শেষ হবে কেউ ভেবে পাবে না। সেগুলি জীবনের মতোই কোমল, মধুর, হাসি-কান্নায় মেশানো, কেবলই স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে।

পড়তে পড়তে গলার মধ্যে ব্যথা করে, বুক টিপ্ টিপ্ করে। খালি মনে হয়, এ তো আমাদেরই মনের কথা, আমাদেরই হতাশার সুরে কাতর আমাদেরই আহ্লাদে রঙিন।

অনেকে তাঁকে খামখেয়ালী বলে, তাঁর লেখাকে উদ্ভট বলে। খেয়ালী ছিলেন বৈকি আর বুঝতে না পারলে উদ্ভট তো মনে হবেই। একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না। অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, কেমন করে ছবি আঁকতে হয়? না, তুলিটাকে জলে ডুবিয়ে, রঙে ডুবিয়ে, মনে ডুবিয়ে, তবে ছবি আঁকতে হয়। আর লেখার কথায় বলেছেন যেখানে যা কিছু আশ্চর্য, অপূর্ব, অদ্ভুত, যা কিছু সুন্দর, সব মনের মধ্যে জমা করে রাখতে হয়, যাতে সৃষ্টিকাজের জন্য যখনই দরকার হবে, তখনই

খাঁটি জিনিস পাওয়া যাবে। কি লেখায়, কি আঁকায়, মিথ্যার কোনো জায়গা নেই।

অবনীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকীতে এ-সব কথা একবার মনে করা যাক।

বিবিদি

বিবিদি মানে ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী। রবীন্দ্রনাথের মেজদা সত্যেন্দ্রনাথের কন্যা আর স্বনামধন্য সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর স্ত্রী। তাঁকে প্রথম যখন দেখি তখনো আমি বেশির ভাগ সময়ই ফ্রক্ পরি। হয়তো এগারো বারো বছর বয়স হবে। অবিশ্যি আমি সে-সময়ে বা অন্য কোনো সময়ে কখনো তাঁকে বিবিদি বলে ডাকি নি। আমার এক প্রাণের বন্ধু বুবুর তিনি হতেন জ্যাঠাই মা, আরেক প্রাণের বন্ধু অলকার হতেন কাকি। তারা তাঁকে ন' মা বলত কারণ হরিপুরের চৌধুরী বাড়ির তিনি ছিলেন ন' বউ। তাদের দেখাদেখি আমিও বলতাম ন' মা। তা ছাড়া তখনো তিনি সর্বজনীন বিবিদি হন নি, খুব বেশি লোক তাঁর সঙ্গে মেশার সুযোগ পেত না।

সেই প্রথম দেখার দিনটি ছিল বোধ হয় ১৯২০ সালে। সেদিন আমার বন্ধুর জন্মদিন, ওদের মে-ফেয়ারের বাড়িতে চা-পার্টি। মেলা লোকজন এসেছিলেন। তারই মধ্যে শ্বেতপাথরের চওড়া বারান্দায়, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের চেয়ে মাথায় লম্বা, ফরসা, সুন্দর একজন মহিলাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলাম। পরণে গাঢ় রঙের রেশমী শাড়ি, বাঘের নখের পিন দিয়ে আঁটা, পরিপাটি করে চুল বাঁধা, সামান্য গয়না পরা। তবু তার মধ্যে দেখলাম ছোট একটি সোনার বো-বাঁধা ব্রূচ্ থেকে ক্ষুদে একটা সোনার ঘড়ি ঝুলছে। আর দেখলাম গোলাপী পদ্মফুলের মতো সুন্দর একজোড়া পা। দেখে দেখে আর চোখ ফেরাতে পারি নে। শুনলাম লেখাপড়ায় গানবাজনায় তিনি অদ্বিতীয়া বয়স হয়তো পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

তার পরেই কিন্তু একটা ছোট অর্গ্যানের সামনে বসে, সোজা আমার

দিদির আর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কোন গানটা গাইবে?' আমাদের তো চক্ষুস্থির। লজ্জায় মরে গেলাম। পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেল। গানের ইস্কুলে পাঁচজনের সঙ্গে ট্যাচানো গলা আমাদের লোকসমাজে প্রকাশিতব্য নয়। ভাগ্যিস আর সকলে গান ধরল, বুবু, অলকা, ন' মার দাদা সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই রূপসী কন্যা জয়া আর মঞ্জু। এরা সবাই ন' মার হাতে তৈরি; এ ধরনের জিনিসই তিনি ভালো-বাসতেন—গান-বাজনা, ছবি-আঁকা, চিত্রকর্ম, লেখাপড়া। তাঁর কাছে গুণের বড় আদর ছিল। কারো মধ্যে এতটুকু প্রতিভা দেখলে আহ্লাদে আটখানা হতেন, পাঁচজনের কাছে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করতেন। ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করতেন। দিদি আমি স্কুলে ফরাসী শিখেছি শুনে কি খুশি। কার কি ভালো আছে, প্রথম দেখা থেকেই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বের করার চেষ্টা করতেন।

ওঁরা স্বামী-স্ত্রী ছিলেন মানিক-জোড়; ছেলেমেয়ে ছিল না ওঁদের। চার দিকে একটা নৈর্ব্যক্তিক বাৎসল্যের আলো ছড়িয়ে রাখতেন। কত লোকে এসে ওঁদের কাছে জড়ো হত তার ঠিক নেই; কেউ লিখত, কেউ আঁকত, কেউ গাইত, কেউ বাজাত আর কেউ-বা শুধু বসে বসে কথা শুনত। ওঁদের বাড়িতে পূর্ণিমা সম্মেলনী হত, স্রেফ চাঁদের হাট। শহর জুড়ে জ্ঞানীগুণী জড়ো করতেন। ঐখানে একদিন বেশ কমবয়সী সুদর্শন নরেন্দ্র দেবকে দেখেছিলাম মনে আছে। সত্যেন্দ্রনাথকেও দেখেছিলাম। ন' মা তাঁকে রুপোর গ্লাসে করে ডালিমের রস এনে খাওয়ালেন।

এ-সব ঘটনার পর সুখে দুঃখে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে, প্রায় পঞ্চাশটি বছর। ন' মাকে এর মধ্যে নানান অবস্থায় দেখার সুবিধা হয়েছিল। সুখ-ঐশ্বর্যের মাঝখানে যত-না ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলাম, পার্থিব দুর্দিনে পেয়েছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি। স্বামী-স্ত্রী কেউই খুব সাধারণ ছিলেন না। আত্মীয় বন্ধুরা ওঁদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা সমীহ করলেও, ওঁদের অসাক্ষাতে একটু না হেসেও পারতেন না। বিয়ের পর নাকি সারারাত দুজনে Bach Beethoven নিয়ে তর্ক করে কাটিয়ে দিতেন। মাঝে মাঝে উত্তেজনার চোটে গলা যখন একটু উঁচুতে চড়ত, কৌতূহলী আত্মীয়রা এত উষ্মার কারণ Bach Beethoven শুনে বিস্মিত হতেন। সাধারণ সাংসারিক বিষয়ে তাঁদের কখনো বিচলিত হতে দেখি নি।

মর্মর প্রাসাদ

কলকাতার চোরবাগানে মল্লিকদের মর্মর প্রাসাদের প্রচুর খ্যাতি আছে। তাকে কলকাতার সব চেয়ে পুরোনো বাড়ির মধ্যে ধরা হয়। শোনা যায় ১৮৩৫ সালে তৈরি, অর্থাৎ সেণ্ট পলের গির্জা, জি.পি.ও. বা হাইকোর্টেরও আগে।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের বংশধররা ট্রাস্টি সহকারে আজ পাঁচ পুরুষ ধরে এ বাড়ির তত্ত্বাবধান করছেন। কারিগর বাদল পালের বংশও পাঁচ পুরুষ ধরে ওখানকার শিল্পকর্মের ভার নিয়ে আছেন। এঁরা কৃষ্ণনগর থেকে এসেছিলেন।

অসাধারণ একটা বাড়ি। সেকালের ফ্যাশান-মতো বাইরেটা গ্রীক ও কোরিন্থীয় নিয়মে তৈরি। সামনে বড়-বড় খাঁজ-কাটা থাম। বাগানে নানান শ্বেতপাথরের মূর্তি। ভিতরে আশ্চর্য এক সংগ্রহ-শালা। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে দেশী জিনিস বিশেষ কিছু দেখা যায় না, কিন্তু বহুমূল্য ইউরোপীয় শিল্পকর্ম কিম্বা তার অনুকরণ চার দিকে থরে থরে সাজানো।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য শিল্পীদের অপূর্ব সব ছবি আছে। ওঁরা বলেন যে তার মধ্যে মাত্র চারটি ছবি শিল্পীদের নিজের হাতের কাজ, বাকি সব নকল। কিন্তু এত অপূর্ব নকল যে নকল না আসল তাই নিয়ে বিশেষজ্ঞদেরও ধাঁধা লেগে যায়। ঐ চারটি আসল ছবি হল রুবেন্সের আঁকা 'সেন্ট ক্যাথারিনের বিবাহ' আর 'সেন্ট সেব্যাস্টিয়েনের প্রাণ-দান' এবং রেণল্ডসের 'হারকিউলিস ও সাপ' আর 'ভিনাস ও কিউপিড'।

নিঃসন্দেহে বলা যায় অতি মূল্যবান সংগ্রহ। শোনা যায় যে মুরিলোর ছবির নকলগুলোরই একেকটার দাম হবে পনেরো হাজার পাউণ্ডের বেশি। কয়েকটি ফুলদানি আছে, তারও একেকটার দাম দশ হাজার থেকে ত্রিশ হাজার টাকার মধ্যে।

একেবারে যে কোনো ভারতীয় ছবি নেই, তাও নয়। সেকালের

বিখ্যাত শশী হেষের ও রবি বর্মার কিছু ছবি আছে। এঁরা পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে আঁকতেন। শশী হেষ-তেল রঙ বা ক্রেয়ন দিয়ে আশ্চর্য সব প্রতিকৃতি আঁকতেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন ইতালীয়। শোনা যায় স্বামী যেমন অপূর্ব ছবি আঁকতেন, তিনি তেমনি অপূর্ব রাঁধতেন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের জন্ম ১৮১৯ সালে। জাতে ওঁরা সুবর্ণ বণিক, আদিবাস উত্তরপ্রদেশের রামগড়ে। ওঁর ঠাকুরদা ব্যবসা-বাণিজ্য করে প্রচুর জমিজমা পয়সাকড়ি করেছিলেন। রাজেন্দ্রের যখন ষোলো বছর বয়স তখন তাঁর ঠাকুরদা এই বাড়ি তৈরি করেন। ওঁর বাবা অকালে মারা যান। স্যার জেম্‌স্‌ ওয়ার হগের হাতে সম্পত্তি দেখাশুনার ভার দেওয়া হয়েছিল। সাবালক হয়েই রাজেন্দ্র নিজের হাতে সে ভার নিলেন।

ভারি বিদ্বান ছিলেন তিনি। চারুশিল্প, সংগীত, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণী-তত্ত্ব, সব-কিছুর চর্চা করেছিলেন। দুর্লভ সব জানোয়ার ও পাখির সংগ্রহ ছিল। আজ পর্যন্ত মার্বল প্যালেসের পশু ও পাখির সংগ্রহ দেখতে হাজার হাজার লোক যায়। আশ্চর্যের বিষয় হল যে দেশ-বিদেশের প্রাণী ও শিল্পসামগ্রী তাঁর বাড়িতে দেখা যায়, কিন্তু নিজে কখনো বিদেশে যান নি। বিশেষজ্ঞদের নিয়োজিত করতেন।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক এই সংগ্রহশালাটি জনগণের আনন্দের জন্য রেখে গেছেন। এ-সব দেখতে পয়সা লাগে না। সোমবার ও বৃহস্পতিবার ছাড়া যে-কোনো দিন, বেলা দশটা থেকে চারটের মধ্যে গিয়ে দেখে আসা যায়।

এ ধরনের উদার ধনী লোক শুধু আজকাল কেন, সেকালেও ছিল বলে শোনা যায় না। দেদার সম্পত্তি ছিল তাঁর। যে জমির উপরে চৌরঙ্গী অঞ্চলের স্যাটার্ডে ক্লাব, ফার্পোর রেস্তোরাঁ, টাওয়ার হাউস, তা ছাড়া নতুন বাজার তৈরি, সে-সবই মল্লিকদের ঠাকুর জগন্নাথজির দেবোত্তর সম্পত্তি। ভারি তীক্ষ্ণ বিদ্যা-বুদ্ধি ছিল রাজা রাজেন্দ্রের। উইল করে তিনি তাঁর সম্পত্তির বেশির ভাগটাই জগন্নাথের নামে দেবোত্তর করে দিয়েছিলেন। মর্মর প্রাসাদের বাগানেই ঠাকুরের মন্দির। সেখানে বিজলি-বাতি জ্বলে না। সারি সারি স্ফটিকের ঝাড়-লণ্ঠনে শত শত মোমবাতি জ্বলে। এ-সব সম্পত্তির মালিক জগন্নাথ। কিছুদিন আগেও সারা বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব মহাঘটা করে ঠাকুরের কাছে দাখিল

করা হত।

মন্দির থেকে জগন্নাথজিকে এনে প্রাসাদের মধ্যে একটা খাঁটি সোনার সিংহাসনে বসানো হত। মল্লিকরা, অছিরা, অন্যান্য কর্মীরা সকলে তাঁকে প্রণাম জানাবার পর, একে একে সব কটা হিসাব খাতা ঠাকুরের সামনে তুলে ধরা হত।

এখনো রথের দিনে মল্লিক বাড়ির জগন্নাথজিকে মন্দির থেকে বাইরে এনে, রুপোর রথে বসিয়ে বাগানের মধ্যে টেনে বেড়ানো হয়। খুব জাঁকজমক হয়, মেলা বসে, যাত্রার পালা হয়, ভিড়ে চার দিক গম্‌গম্‌ করে।

প্রায় দেড়শো বছরের পুরোনো এই মর্মর প্রাসাদ কলকাতার একটা গৌরবের বস্তু। রাজা রাজেন্দ্রের আদেশে ট্রাস্টের আয় থেকে শুধু যে বহুমূল্য শিল্প-সামগ্রী বা দুর্লভ পশু-পাখি কেনা হয় তা নয়। আয়ের বেশির ভাগই খরচ হয় দরিদ্রনারায়ণের সেবায়, যেমন শিল্প-বস্তুগুলোও কেনা হয় জনসাধারণের আনন্দ ও শিক্ষার জন্য।

বহু অনাথা বিধবা ও নিঃস্ব লোক মাসোহারা পান। রোজ দুপুরে ঠাকুরের ভোগের পর, এক হাজার গরিব লোক খেতে পায়। দুর্ভিক্ষের সময়, বিপদের সময় আর উদ্বাস্তুদের জন্য বহু অর্থ দান করা হয়।

একশো বছরের বেশি এই নিয়ম চলে আসছে ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। কেউ যদি ঐশ্বর্যকে যথার্থ সম্মান দিয়ে থাকেন, তিনি হলেন রাজা রাজেন্দ্র মল্লিক।

ভুতনি

আমি রোজ সকালে চান করে, ভুতনিকে কোলে নিয়ে আমাদের সামনের বারান্দায় বসে থাকতাম। কি ভালো জায়গাটা। বসে বসে দেখতাম আমগাছের ডালে এক জোড়া হুপো পাখি আমার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে আছে। তাদের পিঠে মাছের কাঁটার মতো ডোরা কাটা। ছাদের ওপর দিয়ে ছাই রঙের হাঁড়িচাঁচা উড়ে যেত, তাদের ল্যাজের মধ্যিখানের দুটো পালক কি লম্বা! কি সুন্দর দেখতে আর কি বিশ্রী

করে ডাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখি দেখতাম।

একদিন ছাদ থেকে বুগানভিলিয়া গাছের ডাল বেয়ে এই মোটা একটা মস্ত কালো সাপ নেমে এল। তাকে দেখে সব চড়াইরা, শালিখরা গুড়গুড়িরা মাটিতে নেমে ডানা ঝাপটাতে আর বিকট কিচির্-মিচির্ করতে লাগল।

আর একটা মস্ত গিরগিটি থপ্ করে ছাদের ওপর থেকে আমার পাশে পড়ে, কাঠ হয়ে রইল। ওর গা থেকে রামধনু রঙ ঠিকরোতে লাগল আর বুক টিপ্‌টিপ্ করতে লাগল। আমি দেখতে পেলাম।

ভুতনিও ভয়ে আমার কোলে মুখ গুঁজে রইল। ভুতনি আমার কালো রঙের বেড়াল-ছানা। ওকে আমি খুব ভালোবাসি। মাঝে মাঝে খিদে পেলে বেচারি মাছ-টাছ খেয়ে ফেলে। তখন সবাই বলে, 'ওকে দত্ত সাহেবের বাড়িতে দিয়ে এসো, সেখানে বড়ো ইঁদুরের উৎপাত।' আমি তখন খুব কাঁদি। ভুতনি নাম ভালো না? রাঙামামা নাম রেখেছে।

দুদিনের জন্য সিউড়ি গেলাম, ফিরে এসে দেখি বুগানভিলিয়া গাছের ডালে, ছোট্ট একটা সোনার সুতোয় বোনা টাকার থলির মতো কি একটা ঝুলে রয়েছে। ছোট্‌না বলল, "কাছে যেয়ো না দিদি, তা হলে বাসা ফেলে উড়ে চলে যাবে। আর আসবে না।"

"ও কে, ছোট্‌না?"

"ওর নাম মৌটুসি। মধু খেয়ে থাকে। ডিম দেবে বলে কেমন বাসা বানাচ্ছে দেখেছ? বেশি হাত-পা নাড়লে ও ভয় পাবে। চুপটি করে বসে দেখো।"

"বাসা বুনবার সোনার সুতো ও কোথায় পেল?"

"সোনার সুতো কোথায়, দিদি? ও তো শনের দড়ির, পাটের দড়ির পাক খুলে নিয়েছে। ভুট্টার দাড়ি জড়িয়েছে আর তোমাদের ফেলে দেওয়া রঙিন সুতো আর মাছের আঁশ দিয়ে সাজিয়েছে।"

চেয়ে দেখি ঠিক তাই।

এমন সময় মুখে একটুখানি শিমুল তুলো নিয়ে পাখি এল। ছোট্ট, আমার কড়ে আঙুলের চেয়েও ছোট। যত বড় গা, তত বড় ঠোঁট। ঐ ঠোঁট ফুলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বোধ হয় মধু খায়। গায়ের রঙটা সবুজ না হলদে বুঝতে পারলাম না। সুড়ুৎ করে বাসায় ঢুকে গেল।

মাসি এসে উল-কাঁটা নিয়ে আমার পাশে বসল। আমি ঠোঁটে

আঙুল দিয়ে বললাম, "চুপ। মৌটুসি ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে!"

মাসি চুপ করে বুনতে লাগল। কাঁটায় কাঁটায় টিক্ টিক্ শব্দ হতে লাগল। মৌটুসি বাসার মুখ থেকে মার্বেলের মতো ছোট্ট মাথা বের করেই আবার ঢুকিয়ে নিল। বললাম, "মাসি, তুমি যাও। ও ভয় পাচ্ছে।"

মাসি চলে গেল। মৌটুসিও অমনি বেরিয়ে এসে বুগানভিলিয়ার ডালে বসে পালক সাফ করতে লাগল। আমি বললাম, "ভুতনি, ঐ দ্যাখ। তোর মতোই নরম মিশ্টি, আওয়াজ করিস নে। ভয় পেলে পালিয়ে যাবে।"

ভুতনি আমার কোল থেকে নেমে, ল্যাজ খাড়া, পিঠ বাঁকা করে, নখ বের করে, ফ্যাঁস্ শব্দ করে, এক লাফ দিল। মৌটুসি সেই যে উড়ে গেল, আর এল না।

ভুতনিকে দত্ত সাহেবের বাড়িতে দিয়ে এসেছি। দেখছ না আমার চোখে জল?

স্বেন হেদিন

ছোটদের জন্য খুদে খুদে সত্যি গল্পই সব চেয়ে ভালো। শোনো বলি—

স্বেন হেদিন ছিলেন উনিশ শতকের শেষের ও বিশ শতকের গোড়ার দিকের সুইডেন দেশের পর্যটক। কিন্তু তাঁর ভ্রমণের জায়গা ছিল মধ্য এশিয়া, মধ্য ইউরোপ, তিব্বত, পামীর, হিমালয়। সরকারি সাহায্য ও বিস্তর লোকজন, জন্তু-জানোয়ার, যন্ত্রপাতি ও জিনিসপত্র নিয়ে তিনি ভ্রমণ করতেন। তাঁর কাজ ছিল বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা, মানচিত্র তৈরির জন্য মাপ-জোক করা, স্থানীয় অবস্থার নির্ভুল বিবরণী লেখা। কাজেই বুঝতেই পারছ তাঁকে কত তোড়-জোড় করে তবে বেরুতে হত। সুদূর সুইডেন থেকেও সে-সব জাহাজে বা কোনো গাড়ি করে পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমির উপর দিয়ে বয়ে নিয়ে যাওয়ার মেলা অসুবিধা। কাজেই ঐখানে গন্তব্য স্থানের যতটা কাছাকাছি সম্ভব তিনি গিয়ে ডেরা

বাঁধতেন। বলা বাহুল্য সেখানকার রাজসরকার ও অধিবাসীরা তাঁকে কম সাহায্য করত না। মাঝে মাঝে বিপদেও পড়তে হত। আবার মজার মজার ঘটনাও ঘটত।

একবার বোগদাদে আস্তানা গেড়েছেন। জিনিসপত্র, উট, খচ্চর, ঘোড়া, খাবার-দাবার, অনুমতি-পত্র, মাল-বাহক, পথ-প্রদর্শক সব জোগাড় হচ্ছে। এতটুকু নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই। তার উপর সাধু ফকির দরবেশের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠতে হচ্ছিল। একদিন সন্ধেবেলায়, সারাদিনের ক্লান্তির পর একটু বিশ্রাম নেবার অবকাশ পেয়েছেন, এমন সময় এক নাছোড়বান্দা দরবেশের পাল্লায় পড়লেন। সে লোকটা কিছুতেই নড়বে না, তাকে কিছু দিতেই হবে। স্বেন হেদিন বিরক্ত হয়ে তাকে একটা তামার পয়সা দিলেন। তাই দেখে সে চটে লাল। "কি, আমার মতো একজন শক্তিধর দরবেশকে মাত্র একটা পয়সা দেওয়ার মানেটা কি ?"

স্বেন হেদিন নিজে ও দেশের ভাষায় পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। দরবেশের সঙ্গে কথা বলতে তাঁর কোনো অসুবিধাই হচ্ছিল না। তিনি বললেন, "আচ্ছা, আগে তোমার শক্তির কিছু পরিচয় দাও, তার পর দেখা যাবে।"

লোকটা বলল, "বেশ, আমি পৃথিবীর সব ভাষায় কথা বলতে পারি। বলুন কোন ভাষা শুনতে চান।" হেদিনের ভারি মজা লাগল। তিনি বললেন, "তা হলে কিছু ভালো সুইডিশ কথা শোনাও তো দেখি।"

বলবামাত্র লোকটা মাথা তুলে বিশুদ্ধ সুইডিশ ভাষায়, অপূর্ব উচ্চারণে বিখ্যাত সুইডিশ প্রাচীন সাহিত্য থেকে গড়-গড় করে বলে যেতে লাগল। স্বেন হেদিনের অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার মতো অবস্থা। তখন সেই লোকটা থেমে, একটু হেসে, বোগদাদী ভাষায় বলল, "নাঃ, আপনাকে আর এভাবে বিস্ময়ে আড়ষ্ট করে রাখাটা উচিত নয়।"

এই বলে একটানে তার চুল দাড়ি খুলে ফেলল। স্বেন হেদিন দেখলেন তার নীচে থেকে বেরিয়ে পড়ল সুইডেনের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় উপসালার স্বনাম-ধন্য ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এবং তাঁরই বন্ধু।

আরেকটা গল্প শোনো। তোমরা নিশ্চয় জানো যে রবীন্দ্রনাথ নানান দেশে নিমন্ত্রিত অতিথি হয়ে ভ্রমণ করতেন। এতে ভারত সম্বন্ধে অনেক দূর দেশের কৌতূহল ও শ্রদ্ধা অনেকখানি বেড়ে গেছিল। তাঁর মতো

এত ভালো দূত আর কোথায় পাওয়া যাবে। তখন তো আর কোথাও দূত পাঠাবার জো ছিল না, কারণ তখনো এখানে বৃটিশ শাসন চলছিল।

সে যাই হোক, একবার কবি জাপানে গেলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ৺আর্যনায়কম। তাঁরই কাছে এ গল্প শুনেছি। জাপানে রবীন্দ্রনাথের সম্মানের অবধি ছিল না। তাঁকে দেখবার জন্য লোক ভেঙে পড়ল। বহু সভা, ভোজ ইত্যাদির আয়োজন হল। তিনি নিজেও পরে এ-সব বিষয়ে গভীর কৃতজ্ঞতার সাথে উল্লেখ করতেন। এইরকম একটা ভোজ-সভায় তিনিই ছিলেন সম্মানিত অতিথি। তাঁর পাশে আর্যনায়কম আর যতদূর মনে হয় শ্রদ্ধেয় ডক্টর অমিয় চক্রবর্তী মহাশয়ও ছিলেন।

একের পর এক জাপানের শ্রেষ্ঠ পদের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা, পণ্ডিত ও গুণিজন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে লাগলেন। কবি মুগ্ধনয়নে ও কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক ভাবে সমবেত জনতাকে, সুদৃশ্য সভাগৃহকে ও বাইরের অতুলনীয় দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

তার পর যখন তাঁর বক্তৃতার পালা এল, তিনি সকলকে অভিভূত করে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, তাঁর সেই মধুর গম্ভীর কণ্ঠে ইংরিজিতে যা বলতে আরম্ভ করলেন, তার সারমর্ম হল যে—মুখের ভাষার চেয়েও মর্মগ্রাহী একটা ভাষা আছে, সে হল হৃদয়ের ভাষা। সে-ভাষা বুঝতে হলে যে কথার মানে জানবার দরকার করে না, এ-সত্য আজ তিনি অন্তরে অন্তরে উপলব্ধি করলেন। এতগুলি বন্ধুর এত মধুর অভিবাদনের এক বর্ণও মানে না বুঝতে পারলেও, তাঁদের বক্তব্য গিয়ে একেবারে তাঁর হৃদয়ে পৌঁচেছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

তার পর বক্তৃতার শেষে তুমুল অভিনন্দনের মধ্যে কবি বসে পড়েই, আর্যনায়কমকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তুমি তখন আমার জামার হাতা ধরে বার বার টানছিলে কেন?"

আর্যনায়কম বললেন, "টানছিলাম, কারণ ওঁরা প্রত্যেকে বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন।"

সরোজিনী নাইডু

১৮৭৯ সালে ১৩ই ফেব্রুয়ারি হাইদ্রাবাদে সরোজিনী নাইডু জন্মেছিলেন। আমরা ছোটবেলা থেকে তাঁর নাম শুনে এসেছিলাম। সকলে বলত অসাধারণ নারী, ভারতীয় নারীত্বের প্রতিমূর্তি। অনেকে আক্ষেপ করে এ-ও বলতেন, ওঁর একমাত্র খুঁত হল বাঙালীর মেয়ে হয়েও বাংলা জানেন না।

অনেকদিন আগের কথা বলছি, তখনো রাজনীতির ক্ষেত্রে সরোজিনী ততটা প্রতিষ্ঠা পান নি, বরং সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর সম্মান ছিল খুব বেশি। কলকাতায় একবার সাহিত্য বিষয়ে বক্তৃতা দিলেন, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত কমলা বক্তৃতামালাও হতে পারে, ঠিক মনে নেই। অমনি ছাত্র মহলে, সাড়া পড়ে গেল। এমন অসাধারণ বক্তৃতা কেউ কখনো শোনে নি। অনেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর তুলনা করলেন। চেহারা ও বাচনভঙ্গি আলাদা হলেও, কার বক্তৃতা যে বেশি মধুর সে কথা বলা শক্ত, এ বিষয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল না।

পরতেন খদ্দর, দেশী গয়নাগাঁটি। দেখতে ভালো ছিলেন না; মোটা, মাথায় বেশি লম্বা নন, রঙ শামলা, মুখ-চোখের গড়নও ভালো নয়। কিন্তু যেই-না ঠোঁট দুটি ফাঁক করে দুটি কথা বললেন, অমনি শ্রোতারা সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত। যেমনি ভাব, তেমনি ভাষা। অমন মধুর ইংরিজি আর কোনো ভারতীয় মেয়ে বলেছে বলে মনে হয় না। মনে হত যেন রবি-রশ্মি লেগে হীরে থেকে আলো ছিটোচ্ছে।

অনেক পরে, তাঁর মৃত্যুর, এক-আধ বছর আগে, শান্তিনিকেতনে তাঁকে হয়তো সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে ভাষণ দিতে শুনেছিলাম। তেমনি মধুর, তেমনি মর্মস্পর্শী, তেমনি উজ্জ্বল, কিন্তু বড় ক্লান্ত। আসলে কিন্তু ঐটে তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিচয় ছিল না। যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক ভাষণের জ্বালাময়ী বাণী শুনেছিলেন, তাঁরা তাঁর প্রকৃত শক্তির আরেকটু পরিচয় পেয়েছিলেন। কথাকে তিনি মর্মান্তিক অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতেন, শত্রুকে লজ্জা দিতে, দুঃখী দেশবাসীকে

আশা দিতে, অলসকে জাগিয়ে তুলতে। ঐ অগ্নিময়ী ভাষার গুণে, গান্ধীজি যখন কারারুদ্ধ হতেন, সরোজিনী নাইডু দেশবাসীদের স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করে রাখতেন, এতটুকু নিরুৎসাহ হতে দিতেন না।

এও হয়তো তাঁর কাব্য-প্রতিভারই আরেকটি রূপ। ওঁদের পরিবারের অনেকেই কাব্যগুণকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। ওঁর বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় রসায়ন-বিদ্যায় পারদর্শী হলেও, সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। যা নিজে কাব্য রচনা করতেন। সরোজিনীর কনিষ্ঠ ভাই শ্রীহারীন্দ্রনাথও সুকবি।

সরোজিনী জন্মেছিলেন হাইদ্রাবাদে, পিতার কর্মস্থলে। ওঁরা ওখানকারই অধিবাসী হয়ে গেছিলেন, বাংলায় খুব যাওয়া-আসা ছিল না। তারই ফলে সরোজিনীরা বাংলা শেখেন নি। ইংরিজিই ওঁদের মাতৃভাষার মতো ছিল। তা ছাড়া আর কোনো ইংরেজিয়ানা ছিল না সরোজিনীর। এবং ঐ ইংরিজি ভাষাকেও তিনি ভারতের গুণগানের ও দেশপ্রেমের জয়গানের কাজে লাগিয়ে ছিলেন।

চেষ্টা করে কবি হবার দরকার হয় নি তাঁর। নিজেই বলেছেন যে এগারো বছর বয়সে অঙ্ক কষতে বসে, হঠাৎ একটা কবিতা লিখে ফেললেন। ঐখান থেকেই তাঁর কবি জীবনের শুরু হল। বারো বছর বয়সে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন প্রবেশিকা পাশ করলেন, তার আগেই দীর্ঘ এক কবিতা আর একটি নাটক এবং অনেক ছোট কবিতা লিখে ফেলেছেন।

মেয়ের প্রতিভা দেখে হাইদ্রাবাদ সরকার তাঁকে বৃত্তি দিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠালেন। সেখানে তিনি বছর তিনেক ছিলেন। লণ্ডনে কিংস কলেজে, কেম্ব্রিজে গার্টনে পড়েছিলেন। দুঃখের বিষয় স্বাস্থ্য ভেঙে যাওয়াতে দেশে ফিরে আসতে হয়েছিল। সকলে বলেছিল অতিরিক্ত খেটে ছিলেন বলেই অমন হয়েছিল।

ঐ তিন বছর বাস্তবিকই বৃথা কাটে নি। প্রতিভাময়ী কবি বলে ও-দেশে তাঁর প্রচুর খ্যাতি হয়েছিল। ভারতের বুলবুল পাখি বলে তাঁর নাম হয়েছিল। নামটি শুনেই বোঝা যায় ঐ সময়ে তিনি কি ধরনের কবিতা লিখতেন। নিজের দেশের বিষয়ে, মধুর ছন্দে মিষ্টি কবিতা। তাতে তাঁর কাব্যশক্তির পরিচয় পাওয়া গেলেও, ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয়

পাওয়া যায় না। তবু এই ভারতীয় মেয়েটির যে প্রবল একটি ব্যক্তিত্ব আছে, সে কথাও দেশের মনীষীরা অনেকেই বুঝতে পেরেছিলেন। ভারতীয় নারীর প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা জন্মেছিল।

দেশে ফিরে তাঁর বিবাহ হল, অ-বাঙালী এবং অ-ব্রাহ্মণ ডাক্তার গোবিন্দ রাজালু নাইডুর সঙ্গে। এতেই প্রমাণ হল গতানুগতিকের পথে চলবার মেয়ে তিনি ছিলেন না। দুই মেয়ে, দুই ছেলে হয়েছিল তাঁদের। তাদের নিয়ে কত সুখী হয়েছিলেন সরোজিনী, সে কথা তাঁর দুটি-একটি কবিতা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু গার্হস্থ্যজীবনে আবদ্ধ থাকবার জন্য তিনি জন্মান নি।

দেশে ফিরেই দেশের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁর যেন চোখ ফুটে গেল। ঐ সময়ে হাইদ্রাবাদে নিদারুণ বন্যা হয়েছিল। সরোজিনী ত্রাণ-কার্যে যোগ দিয়েছিলেন। মনের মধ্যে দেশপ্রেমের কুঁড়ি এবার ফুটে উঠল। দুঃখী দেশবাসীদের সেবায় তিনি যোগ দিলেন। সেখান থেকে গান্ধীজির দেশসেবার ব্রতে নিজেকে দীক্ষিত করাই স্বাভাবিক। ১৯১৫ থেকে ১৯৪৯ সালে জীবনের অবসান পর্যন্ত, সরোজিনী গান্ধীজির নির্দিষ্ট পথে চলেছিলেন। স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন তিনি, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একতার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। এর পর স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যতই তিনি জড়িত হয়ে পড়ছিলেন, ততই তাঁর আত্মপ্রত্যয় দৃঢ়তর হচ্ছিল। সব কবিদের হৃদয়ে যে একটি দুর্ধর্ষ নির্ভীক বিপ্লবীর আদর্শ থাকে, যে নানান ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে, সরোজিনীর হৃদয়ের মধ্যে থেকে সেই তাঁকে শক্তি জুগিয়েছিল। তিনি কাউকে ভয় করতেন না। যেখানেই দেখতেন দেশবাসীদের উপর অন্যায় করা হয়েছে, দেশমাতার অপমান হয়েছে, সেখানেই জ্বালাময়ী ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ করেছেন। ব্রিটিশ রাজপুরুষ তার কণ্ঠরোধ করতে পারে নি।

শুধু কথা বলেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। গান্ধীজির স্বাধীনতা সংগ্রামের আবর্তের মধ্যে সর্বদা তাঁকে দেখা যেত। তিনি অহিংসার নীতি মেনে নিয়েছিলেন। দেশে ও বিলেতে আলোচনার টেবিলে তাঁকে যেমন দেখা যেত, লবণ-আন্দোলনের সময় মিছিলের মধ্যেও তেমনি তাঁকে দেখা যেত। আশ্চর্য প্রাণশক্তি ছিল তাঁর। স্বাস্থ্য খুব ভালো নয়, দেহ খুব পটু নয়, তবু সংগ্রামের অগ্রভাগে ছিল তাঁর স্থান। নিশ্চিন্ত ভাবে কারাবরণ

করতেন।

ক্রমে জাতীয় কংগ্রেসের একজন সাধারণ কর্মীর আসন থেকে নেত্রীর স্থান নিতে হয়েছিল তাঁকে। তার পর যখন ১৯৪৭ সালে দেশ-ভঙ্গ ও স্বাধীনতা একসঙ্গে এল, তাঁকে করা হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল। তার দুই বছর পরে ৭০ বছর বয়সে, তাঁর মৃত্যু হয়।

সরোজিনী নাইডুর জীবন-বৃত্তান্ত নিয়ে আলোচনা করার সময়, অনেকে বলে থাকেন যে তাঁর জীবনটিকে দুটি আলাদা পর্যায়ে ভাগ করা যায়, এক হল তাঁর সাহিত্যকর্মের জীবন, আর হল তাঁর রাজনীতির জীবন। আপাতদৃষ্টিতে যাই মনে হোক-না কেন, আসলে এই দুটি পর্যায়ের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। কর্মক্ষেত্র ভিন্ন ছিল, এইমাত্র। প্রকৃত কবি যাঁরা, তাঁদের দেহ যতই ক্ষীণ হোক-না কেন, তাঁদের মধ্যে এক ধরনের প্রচণ্ডতা দেখা যায়। তাঁরা যাকে অন্যায় বলে মনে করেন, তার বিরুদ্ধে তাঁরা সিংহের বিক্রমে প্রতিবাদ করে থাকেন। তাঁরা যাকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেন, তার জন্য তাঁরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারেন।

সরোজিনীর সব কাজের মধ্যে এই প্রবলতার পরিচয় পাওয়া যেত। প্রথম বয়সে যে-প্রতিভার পরিচয় পেয়ে বিদেশী মনীষীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সেই প্রতিভাই উন্মোচিত হয়ে উত্তরকালে প্রবল ও প্রচণ্ড দেশ-প্রেমের রূপ নিয়েছিল। সে দেশপ্রেমে কোনো বিলাসিতা, আলস্য, কৃত্রিমতা ছিল না। সরোজিনী স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। তিনি গান্ধীজির পথ নিয়েছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর বাগ্মিতাই তাঁর প্রবল অস্ত্র। সেই বাগ্মিতার সঙ্গে মিলে ছিল তাঁর প্রচণ্ড সাহস ও প্রবল ব্যক্তিত্ব, যার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুর্দমনীয়। এক দিকে যেমন ছিল তার কবিদের প্রসাদগুণ, অপর দিকে ছিল তাঁর ঐ কবিদেরই প্রবলতা। সেই শক্তির জোরেই যখনই গান্ধীজিকে কারারুদ্ধ করে তাঁর মুখ বন্ধ করা হত, তখনি শোনা যেত সরোজিনী নাইডুর উদাত্ত কণ্ঠ। গান্ধীজি ছিলেন তাঁর গুরু; গুরুর আরব্ধ কাজ করে যাওয়াই ছিল তাঁর একমাত্র কাম্য ও কর্তব্য। ভারতীয় নারীত্বের এমন মহিমময়ী চিত্তগ্রাহী রূপ সহজে দেখা যায় না। তাঁর জন্মের পর ৯৪ বছর কেটে গেছে, কিন্তু সে রূপ এতটুকু ম্লান হয় নি। কবিরা রাজনীতির পথে নামলেও, তাঁরা হলেন চিরন্তন পথের পদযাত্রী।

একগুষ্টি

উত্তর কলকাতায় অ্যামহার্স্ট রো বলে একটি সরু রাস্তা আছে, বছর চল্লিশ আগে ঐখানে একজন দাড়িওয়ালা গুরুগম্ভীর লোককে দেখা যেত। দিব্যি দশাসই চেহারা, গলাখানিও তেমনি। 'ক্যা-রে!' বলে যেমনি একটা হাঁক দিতেন অমনি যে যেখানে থাকত একেবারে পাথর বনে যেত।

লোকটির বাড়ি ছিল বাঙাল দেশে, ওঁদের গাঁয়ের মধ্যে সেকালে বাঘ-টাঘ ঘুরে বেড়াত। সেখানকার লালচে রঙের আলু আর মিষ্টি আনারসের ভারি খ্যাতি ছিল। আর বাড়ির মেয়েরা ক্ষীর নিয়ে ছাঁচে ফেলে যে নাড়ু তৈরি করত, সে যে একবার খেয়েছে তার আর ভুলবার জো থাকত না।

লোকটির নাম ছিল সারদারঞ্জন রায়, যেমনি তাঁর শরীরের শক্তি, তেমনি বুদ্ধি আর মনের তেজ। যেমনি ভালো সংস্কৃত আর অঙ্কশাস্ত্র জানতেন, তেমনি খেলতেন ক্রিকেট। এমন-কি, লোকে তাঁকে বলত এদেশের ক্রিকেটের বাবা!

তখনকার দিনের খেলার মাঠের অবস্থা কি আর এখনকার মতো ছিল? ফুটবলের ছিল ভারি আদর, কিন্তু ক্রিকেটের মাঠে টিম্‌টিম্ করত কয়েকটি দর্শক। ঐ দাড়িওয়ালা লোকটির চেষ্টাতেই অনেক লোকে ক্রিকেট খেলার কদর শিখল।

মাছ ধরতেও ভারি ওস্তাদ ছিলেন; এদিকে অত বড় পণ্ডিত লোক, একটা কলেজের অধ্যক্ষ, ওদিকে ছুটি পেলেই ছিপ কাঁধে ছোট ভাইদের ডেকে নিয়ে, এখানে ওখানে মাছ ধরতে চলে যেতেন। চৌরঙ্গীর ধারে তাঁর মস্ত দোকান ছিল, সেখানে খেলার সরঞ্জাম আর নানারকম মাছ ধরবার ছিপ পাওয়া যেত। সেও যে-সে ছিপ নয়, তার বাঁশ আসত বর্মা থেকে। প্রত্যেকটি আলাদা করে বাছাই করা, এতটুকু খুঁত বেরুলে সে বাঁশটা ফেলে দেওয়া হত।

এক বাড়ি বোঝাই আত্মীয়-স্বজনের ছেলেপুলে মানুষ করতেন সারদারঞ্জন, যেমনি ছিল তাদের যত্ন, তেমনি তাদের কড়া শাসন। গান

বাজনা ইয়াকি রকবাজি কোনোরকমে চলত না। একবার একজন বয়স্ক ভগিনীপতি ছেলেদের সব নিয়ে গেলেন কোথায় যেন ফিল্ম-টিল্ম দেখানো হবে। তার মধ্যে একটাতে ছিল তাঁরই সুগন্ধি কোম্পানীর মজাদার বিজ্ঞাপন। এখন সেটি দেখতে গিয়ে অনেক রাত হয়ে গেল। ভগিনীপতি ঘোড়ার গাড়ি করে মোড়ের মাথায় ছেলেদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তারা বাড়ি গিয়ে দেখে ফটক বন্ধ, কাউকে নাকি ভেতরে ঢুকতে দেবার হুকুম নেই।

কি আর করা যায়। গেল সবাই ভগিনীপতির আশ্রয়ে। পরদিন সকালে তিনি গিয়ে অনেক অনুনয় করে বললেন যে, তাঁরই জন্য দেরি হয়েছিল, ছেলেদের মাপ করা হোক। সারদারঞ্জন গম্ভীরভাবে বললেন, 'হেমজাটার মা নেই, ওটা থাকুক। আর সব কটাকে বাড়ি থেকে দূর করে দাও, চরে খাক।'

অবিশ্যি তা আর হয় নি, হেমজার সঙ্গে সব সুড়্‌সুড়্‌ করে গিয়ে বাড়িতে ঢুকেছিল।

ঐ ভগিনীপতিটির নাম হেমেন্দ্রমোহন বসু, যার তৈরি কুন্তলীন, দেলখোস বিলেতী সুগন্ধি দ্রব্যের সঙ্গে পাল্লা দিত। তাঁর ছেলে নীতীন বসু ও মুকুল বসু ফিল্ম তৈরি করে বিখ্যাত হয়েছেন।

সারদারঞ্জন রায়ের মেজো ভাইয়ের নাম উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর আপন নাম ছিল কামদারঞ্জন রায়, এক কালে নামটি বদলান। তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকা বের করতেন। ছোটদের জন্য অমন মাসিক-পত্র আজ অবধি আর হল না এ দেশে। গুষ্টিসুদ্ধ সবাই মিলে, বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে এনে, ঐ কাগজে এমন সব গল্প, কবিতা, ধাঁধা, জীবনী, ভ্রমণ কাহিনী, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখতেন, এমন সব রঙিন ও সাদা কালো ছবি আঁকতেন, যে পুরোনো 'সন্দেশ' যদি খুঁজে পাও তো তোমাদের তাক লেগে যাবে। তার ওপর যেমনি কাগজ, তেমনি ছাপা।

উপেন্দ্রকিশোরের ছড়ায় লেখা 'ছোট্ট রামায়ণ' পড়লে তোমরা মুগ্ধ হয়ে যাবে, তা ছাড়া 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের গল্পে'র তো কথাই নেই।

তেল-রঙ দিয়ে চমৎকার ছবি আঁকতেন উপেন্দ্রকিশোর, আর সাদা কালো দিয়ে গল্পগুলোকে চিত্রিত করতেন।

ছাপাখানার জগতেও তিনি স্বনামধন্য। হাফটোন বুক প্রিন্টিং-এ ছবি

ছাপা এদেশে তিনিই প্রথম করেছিলেন। বিলেতেও সেজন্য খুব খাতির পেয়েছিলেন। এ-সবের ওপর গান লিখতেন, চমৎকার বেহালা বাজাতেন।

তাঁর বড় ছেলের নাম সুকুমার রায়। কি আর বলব সুকুমার রায়ের কথা! ছোটবেলা থেকে চারি দিকে একটা আনন্দের ঢেউ তুলে, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে মারা গেলেন। বড়-বড় চোখ, এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল, ইস্কুলে যখন পড়েন তখন থেকেই রসের উৎস। একজন মুসলমান বন্ধু জানতে চাইলে, কি করে ভাই চুলগুলো এমন কোঁকড়া করলে। তখুনি বললেন শুয়োরের তেল মেখে। সেও তোবা তোবা করে সরে পড়ল। কারো বিষয় হয়তো গল্প করলেন যে মাস্টারমশাইকে বইয়ের একটা সাদা পাতা দেখিয়ে দিয়ে বলেছে, 'এইটেই পড়ে এসেছি স্যার, অন্ধকারে দেখতে পাই নি।' ছোট ভাই সুবিনয় দারুণ স্বদেশী, তার নামে ছড়া বাঁধলেন—

"আমরা দিশি পাগলার দল,
দেশের জন্যে ভেবে ভেবে হয়েছি পাগল।" ইত্যাদি।

কবিতাটাতে দিশি জিনিসের কথা আরো আছে—

"দেখতে খারাপ, টিকবে কম, দামটা একটু বেশি,
তা হোক-না, তাতে দেশেরই মঙ্গল।"

তখনকার দিনে ভালো-দিশি জিনিস পাওয়া যেত না, সুবিনয়কে কেউ কিছু কিনতে দিলে, সে দিশি ছাড়া কিনত না, যেমন পেত তাই নিয়ে আসত। এই নিয়ে বাড়িময় একটা হাসির রোল উঠত। এখন চমৎকার দিশি জিনিস তৈরি হয়, সুবিনয় এবার শোধ তুললেন।

সুকুমার রায়ের লেখা বই তোমাদের ঘরে ঘরে আছে, তার বিষয় কিছু বলবার নেই, 'আবোল তাবোল', 'হ-য-ব-র-ল' 'খাই-খাই', 'বহুরূপী', 'পাগলা দাশু', 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ইত্যাদি কে না পড়েছে।

সুবিনয়ও গুণী লোক ছিলেন, ফরসা, লম্বা সুন্দর মানুষটি, ভারি মিষ্টি লেখা বেরুত তাঁর কলম থেকে। তাঁর 'আজব-বই', 'খেয়াল', 'বল তো', পেলেই পড়বে। তোমাদের এমন বন্ধু কম আছে।

এঁদের এক বোনের নাম সুখলতা রাও। এখনো আছেন তিনি, সাহিত্যসেবা করে যাচ্ছেন; সত্তর বছর বয়স হয়ে গেছে। অদ্ভুত মিষ্টি সব কবিতা কলমের আগা থেকে এখনো অজস্র ধারায় ঝরছে। তাঁর সব পরীদের গল্প, জানোয়ারদের গল্প আছে, 'গল্প আর গল্প' 'গল্পের

বই' এমনি ধারা কত কি। যখন যা লিখেছেন তাই ভালো হয়েছে।

উপেন্দ্রকিশোরের সেজো ভাইয়ের নাম ছিল মুক্তিদারঞ্জন রায়, কয়েক বছর হল বিরাশির ওপর বয়সে তিনি মারা গেছেন। অঙ্কের অধ্যাপক ছিলেন, মুখে বেশি কথা ছিল না, কিন্তু খেলাধুলোয় আর শারীরিক শক্তিতে সেকালের দুর্ধর্ষ মিলিটারী টিমগুলোকে পর্যন্ত অবাক করে দিতেন। তাঁরা জানতেন যে ঐ ষণ্ডামার্কা দাড়িওয়ালা ছেলেটা বড় সহজ পাত্র নয়, ওকে পেড়ে ফেলে এমন সাধ্য ছিল না কারো। তাঁর ছোট ভাই কুলদারঞ্জন রায়কে যেন ভুলে যেয়ো না। ইংরেজি ও প্রাচীন গ্রীস রোমের গল্প থেকে অনুবাদ করে তোমাদের কত উপহার দিয়েছেন তিনি। 'ওডিসিয়ুস', 'ইলিয়াড', 'রবিন হুড', 'শার্লক হোমসে'র গল্প ইত্যাদি। আমাদের দেশের পৌরাণিক কাহিনীরও তোমাদের জন্য কত নতুন সংস্করণ করে দিয়েছেন। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' আরো কত। সব চাইতে ছোট ছিলেন প্রমদারঞ্জন রায়। চাকরির কর্তব্যে বর্মা ও ভারতের বনে বনে ঘুরতে হয়েছিল, তার আশ্চর্য সব অভিজ্ঞতা লিখেছেন তাঁর 'বনের খবর' নামের বইতে। পড়ে দেখো। এঁরা দুজনেই নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন।

এই গুষ্টির আরেক ছেলে সত্যজিৎ রায়কে তোমরা নিশ্চয় চেনো। যেমন ভালো ছবি আঁকেন, তেমনি ভালো ফিল্ম তৈরি করেন। দেশে তাঁর নাম হয়েছে, তাতে ভারতেরও কত সম্মান হয়েছে। সুকুমারের ছেলে তিনি।

দেশপ্রেমিক কাকে বলে? যারা ঢাল বেঁধে পথে বেরিয়ে চ্যাঁচামেচি করে, এটা ওটা ভেঙে নস্যাৎ করে দেয়, তাদের? না যাঁরা দেশের জন্য এমন সব কাজ করে যান, যা থেকে তাঁরা মারা যাবার পরও বহুকাল ধরে, দেশের লোকে উপকার পায়, আনন্দ পায়, সম্মান পায় তাঁদের?

পৌরুষই-বা কাকে বলে? অনেকে ভাবে বুঝি কবিতা লিখলে, গল্প লিখলে, ছবি আঁকলে, বেহালা বাজালে, ছেলেরা সব মেয়েলী হয়ে যায়। বুঝি শরীরটাকে শক্ত করতে হলে, মনটাকে খানিকটা দাবিয়ে রাখা দরকার। বুঝি এগিয়ে যেতে হলে, আমাদের দেশের পুরোনোটাকে পেছনে ত্যাগ করে আসতে হয়। বুঝি খেলাধুলো করলে পড়াশুনা হয় না। এ-সব কথাই যে কত ভুল, এই একটি গুষ্টির খেলোয়াড়, গাইয়ে, বাজিয়ে, গল্প লিখিয়ে, ছবি আঁকিয়েরাই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

সুখলতা

সে আসলে ময়মনসিংহের মেয়ে, তার চোদ্দো পুরুষের বাস ছিল সেখানে, ব্রহ্মপুত্রের ধারে, মসুয়া নামের একটা গ্রামে। মাথায় অনেকের চাইতে একটু লম্বা, চুলগুলো একটু বেশি ঢেউ খেলানো, মুখখানি একটু বেশি গম্ভীর, গলার আওয়াজ বড় মিষ্টি। থাকে কলকাতায়, পড়ে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয় বলে একটা স্কুলে। বাপের নাম উপেন্দ্রকিশোর, ভারি আশ্চর্য মানুষ তিনি। ফরসা রঙ, টিকোল নাক, দেখতে ভারি সুপুরুষ। ছবি আঁকেন, বেহালা বাজান, ছোটদের জন্য বই লেখেন, রামায়ণের গল্প মহাভারতের গল্প, টুনটুনির বই, মহাকাশের কথা, সেকালের কথা। ছোটদের জন্য মাসিক-পত্রিকা নিজের ছাপাখানায় ছেপে বের করেন। নাম তার 'সন্দেশ'; যেমনি তার ছবি, তেমনি তার কবিতা, গল্প।

আশি বছর আগের কথা। সুখলতা তাঁর বড় মেয়ে। তুলি ধরলেই তার ছবি বেরোয়, কলম তুললেই গান হয়ে যায়, গল্প হয়ে যায়। কলকাতায় থাকলেও ছুটি-ছাটাতে সবাই মিলে দেশে যায়। সেখানকার আম কাঁঠাল বাগান, বড়-বড় পুকুর বড়ই ভালো লাগে। তার উপর বাড়িতে দুই হাতি ছিল। একটার নাম যাত্রামঙ্গল, যেমনি বড় তেমনি মেজাজ। নোংরা কাপড় পরা কাউকে দেখলেই তাড়া করত। একবার পরিষ্কার কাপড় পরে এক বুড়ি সামনে সামনে যাচ্ছিল তাকেও করল তাড়া। বুড়ি তো একবার তাকিয়েই পড়িমরি করে দে ছুট। হাতিও অমনি দৌড়তে লাগল। শেষটায় মাথার ওপরকার চালের পুঁটলি ফেলে বাঁশবনে ঢুকে বাঁচল। যাত্রামঙ্গল ময়লা কাপড় বাঁধা পুটলিটাকে তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে, আবার ভালো মানুষের মতো চলল।

অন্য হাতির নাম ছিল কুসুমকলি। নধর দেহ, মিষ্টি স্বভাব, পায়ে শুঁড় বুলিয়ে প্রণাম করত। এদের ছেড়ে যেতে কার ইচ্ছা করে?

ছুটির শেষে মনে দুঃখ নিয়ে সবাই ফিরে আসত। কোথায় এমন

নীল আকাশের নীচে, সবুজ গাছপালায় পাতা দিয়ে নৌকো করে বেড়ানো যায় ?

সুখলতা বড় ভালো মেয়ে ছিল। ছোট-ছোট ভাইবোন ছিল। তাদের মধ্যে সবার বড় সুকুমার, সে যে কি মজা করত বলা যায় না। মজার ছবি আঁকত, ছড়া কাটত, নাটক লিখত, অভিনয় করত, ভেংচি কাটত। তার পর পুণ্যলতা, তার লেখা মিষ্টি বই আছে, ছেলেবেলার দিনগুলি। তার ছোট সুবিনয়, সে-ও লিখত, গান গাইত। তার পর সুবিমল, উদ্ভট গল্প বানাতে ওস্তাদ। সবার ছোট শান্তিলতা ভারি চমৎকার কবিতা লিখত। মা বিধুমুখীর আদর-যত্নে সবগুলি মানুষ হল। এখন আর কেউ নেই, পুণ্যলতা আর সুবিমল ছাড়া। তাদেরও পঁচাত্তর ছাড়িয়েছে।

সুখলতার বিয়ে হয়েছিল ওড়িষ্যার বিখ্যাত মধুসূদন রাওয়ের ছেলে ডাক্তার জয়ন্ত রাওয়ের সঙ্গে। যেমনি ভালো আঁকতেন, লিখতেন, তেমনি সুন্দর ঘরকন্নাও করতেন। কত সুন্দর করে নিজের হাতে বাড়িঘর সাজাতেন, নতুন নতুন রান্না শিখে, সবাইকে খাওয়াতেন। আশ্চর্য মানুষ ছিলেন ; লোভ ছিল না, হিংসা ছিল না, মুখ দিয়ে কখনো মিথ্যা কথা বেরুত না, কারো অনিষ্ট করতেন না। তবে ছোটবেলায় একটু আরশুলো ইঁদুরকে ভয় পেতেন। সুকুমার যেই-না বলত, 'ডুলির নীচে লালচে মতো ওটা কি রে ?' অমনি পিঁড়ি থেকে উঠে চম্পট। চোর, মাতাল, গোরু-ঘোড়া দেখে ঘাবড়াতেন, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এতটুকু ঘাবড়াতেন না।

সুখলতার দাদামশাইয়ের নাম ছিল দ্বারিক গাঙ্গুলী, বেজায় তেজী সমাজ সংস্কারক ছিলেন তিনি। তাঁর যৌবনকালে একবার কোনো খবরের কাগজের সম্পাদক মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে বিশ্রীভাবে বিদ্রূপ করে-ছিলেন। দ্বারিক গাঙ্গুলী সেই লেখাটি কাঁচি দিয়ে কেটে পকেটে ভরে, হাতে একটা লাঠি নিয়ে, ঐ সম্পাদকের কাছে গিয়ে, কাগজটাকে গুলি পাকিয়ে জল দিয়ে গিলে খেতে বাধ্য করেছিলেন। ইংরিজিতে বলে "ইট ইয়োর ওয়ার্ডস," অর্থাৎ "নিজের কথা খাও।" তার মানে নিজে যা বলেছ, তা প্রত্যাহার কর। তাই করতেও হয়েছিল ঐ সম্পাদককে। এই দ্বারিক গাঙ্গুলীর মেয়ের মেয়ে তেজী হবে না তো কি হবে ?

দুই পুরুষ ধরে বাঙালী ছেলেমেয়েরা সুখলতা রাওয়ের হাতে লেখা

মিষ্টি মিষ্টি গল্প, কবিতা পড়ে মানুষ হয়েছে। দেশ-বিদেশের রূপকথা উপকথা সংগ্রহ করে সহজ বাংলায় তিনি লিখে দিয়েছেন। 'গল্পের বই' 'আরো গল্প' 'গল্প আর গল্প' আরো কত কি। আর সে যে কি মিষ্টি সব ছড়া। তার কিছু কিছু সুর দিয়ে কলকাতার বেতার থেকে বাজানো হয়েছে। তেল-রঙে জল-রঙে যে-সব ছবি আঁকতেন পাহাড় গাছপালা, আর অপূর্ব সব সমুদ্রের দৃশ্য। পুরীর সমুদ্র দেখে মনটা তাঁর অন্যরকম হয়ে গেছিল। ছোটদের জন্য বই লিখেছেন, 'নিজে পড়' 'নিজে শেখ' ইত্যাদি। আশি বছর যখন বয়স, তখনো মুখে এক কথা, কি লিখব, কি ভাবে লিখব। বছর দুই হল, তিনি চোখ বুজেছেন; কিন্তু বইগুলি ছবিগুলি আমাদের জন্য রেখে গেছেন, সব বাঙালী ছেলেমেয়েদের উত্তরাধিকার।

পুণ্যলতা

গত ২১শে নভেম্বর বালিগঞ্জের তিনকোনা পার্কের দক্ষিণে যে আশ্চর্য মানুষটি চোখ বুজলেন, তাঁর নাম ছিল পুণ্যলতা চক্রবর্তী, বয়স হয়েছিল ৮৫। তিনি ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দ্বিতীয়া কন্যা; জ্যেষ্ঠার নাম ছিল সুখলতা রাও; দুজনার মাঝে এক ভাই, তাঁর নাম সুকুমার; পুণ্যলতার পরে দুই ভাই সুবিনয় আর সুবিমল। তাঁদের দুজনার মাঝে শান্তিলতা বলে আরেক বোন ছিলেন, তিনি যৌবনেই মারা গিয়েছিলেন। এখন আর এই আশ্চর্য প্রতিভাসম্পন্ন ভাইবোনদের কেউই বাকি নেই। আছে সুকুমারের ছেলে সত্যজিৎ, সুবিনয়ের রুগ্ন ছেলে সরল, সুখলতার দুটি মেয়ে আর পুণ্যলতার দুই মেয়ে কল্যাণী কার্লেকর ও নলিনী দাশ এবং তাদের ছেলেমেয়েরা।

এঁদের অনেকের নাম এককালে বাংলার শিশুসাহিত্যের জগতে কিংবদন্তীর মতো ছিল। উপেন্দ্রকিশোরের প্রাচীনতম রচনা পাচ্ছি ১৮৮৫ সালের 'সখা'তে। ছোট একটি প্রবন্ধ, কোনো ইংরেজি প্রবন্ধ থেকে তার তথ্যও আহরণ করা, কিন্তু আশ্চর্য আধুনিক তার ভাষা। তখন থেকে শুরু করে ১৯১৫ সালে উপেন্দ্রকিশোর যখন অকালে

পরলোকে গেলেন, এই ত্রিশ বছরের মধ্যে বাংলা শিশুসাহিত্য যেন বীজ থেকে অঙ্কুরিত হয়ে, পূর্ণাবয়ব গাছ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাও মুষ্টিমেয় কয়েকজন আদর্শবাদী কর্মীর চেষ্টায়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও উপেন্দ্রকিশোর। এঁদের স্নেহচ্ছায়ায় পুণ্যলতা ও তাঁর ভাইবোনেরা মানুষ হয়েছিলেন।

পার্থিব সম্পত্তির মতো প্রতিভাও বংশ পরম্পরায় বর্তায় এ কথা নিয়ে তর্ক উঠতে পারলেও, সেকালের ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামের রায় পরিবারের সন্তানরা যে গান গাইতে, ছড়া কাটতে, সরস কথা বলতে পটু ছিলেন, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই পটুত্বই হয়তো তেমন তেমন আবহাওয়া পেলে প্রতিভাতে দাঁড়াতে পারে। উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারেও তাই হয়েছিল।

উপেন্দ্রকিশোর এবং তাঁর সহানুভূতিশীল বন্ধুদের সে-সময় একমাত্র প্রয়াস ছিল ছোটদের জন্য বাংলায় ভালো বই বের করতে হবে। তাতে ভালো রচনা ও ভালো ছবি থাকবে। ছাপা ও বাঁধাইও ভালো হবে। এমনি করে বাংলা শিশুসাহিত্যের একটা বলিষ্ঠ গোড়া-পত্তন হয়েছিল। এবং কয়েক বছরের মধ্যে তার মধ্যাহ্ন সূর্যও আকাশে দেখা দিয়েছিল।

পুণ্যলতার শৈশব কেটেছিল গান, গল্প, কবিতা, ছড়া, নাটিকার আবহাওয়ায়। এ-সব জিনিস আগেও কিছু কিছু লেখা হয়েছিল, তখন তার প্রধান উপজীব্য ছিল শিক্ষা। উপেন্দ্রকিশোরের মতো শিল্পীর হাত পড়ে, ছোটদের লেখা হয়ে দাঁড়াল রসাশ্রয়ী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই অসম্ভব-সাধন সম্ভব হয়েছিল যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও আরো কয়জনের সহযোগিতায়। তখনকার যত শিল্পী, সাহিত্যিক, সংগীতরসিক, সবাই এসে উপেন্দ্রকিশোরের বাড়িতে জড়ো হতেন। দুধ খাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের আলোচনা শুনে শুনে বাড়ির খুদে-খুদে জাত লেখকরা মানুষ হয়েছিল।

সাহিত্য রচনার যেমন কোনো নির্ধারিত পদ্ধতি নেই, তেমনি কোনো নির্দিষ্ট রূপও নেই। কবিতা মনের মধ্যে যেমনই ফুটবে, ঠিক তেমনি প্রকাশ পাবে। জোর করে লেখা যায় না। গল্পের ক্ষেত্র আলাদা। তবু মনে হয় সব শিশুসাহিত্যের বাইরের খোলসগুলো ছাড়াতে ছাড়াতে, যখন অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে পৌঁছনো যায়, সেখানে দেখা যায় রাজা-রানী পরী-জাদুকর, যোদ্ধা-অভিযাত্রী সবাই সরে দাঁড়িয়েছে, আছে শুধু একটি

উষ্ণ কোমল ঘর, দুটি মানুষ আর দুটি-একটি শিশু আর তাদের চার দিকে কয়েকটি বড় চেনা প্রাণী। সেই নরম গরম কেন্দ্রটি থেকে সব দুঃসাহসিক অভিযানের শুরু আর সেইখানে এসে তাদের শেষ। সব সুখ-দুঃখের কেন্দ্রবিন্দু সেইখানে, সব শক্তির সব আশার উৎস। পুণ্যলতা অতি সহজে তার সন্ধান পেয়ে গেছিলেন। এবং সারাজীবন তাকে মনের মধ্যে লালন করেছিলেন।

বেশি লেখেন নি পুণ্যলতা। সতেরো আঠারো বছর বয়সে বিয়ে হয়ে অবধি বিহারের শহরে শহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেখানেই গেছেন সেখানেই তার হাতে ছোট একটু করে স্নেহের নীড় তৈরি হয়েছে। তার চার দিকে কুকুর, বেড়াল, পায়রা, হাঁস, মুরগি, গোরু-বাছুর, পাখি, মৌমাছি, প্রজাপতি এসেছে গেছে। বছরে বছরে শীতের আগে গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে। কিছুই তার নষ্ট হয় নি। সব গিয়ে মনের মধ্যে জমা হয়ে থেকেছে। কত জন্মদিন, কত প্রিয়জনের আগমন, প্রতিদিনকার জীবনের কত স্নেহ, কত ত্যাগ, আবার তেমনি কত লোক, হিংসা, রেষারেষি। কিছু বাদ যায় নি।

পরে যখন অবকাশ হয়েছে একেকটি ছোট গল্প লিখেছেন, তার একটিও মন-গড়া নয়, ঘটনা যাই হোক-না কেন, গল্পের শিকড় হল মনের সেই গহন-গভীরে যেখানে কৃত্রিম কিছু পোঁছয় না। এইখানে সুখলতার সঙ্গে পুণ্যলতার গল্পের তফাত। সুখলতা দেশ-বিদেশের রূপকথা সংগ্রহ করে তাঁর অনবদ্য ভাষায়, বাঙালী ছেলেমেয়েদের মনের মতো করে সাজিয়ে দিয়েছেন, তবে তাতে মৌলিক কিছু নেই। সুখলতার মৌলিক অবদান তাঁর অপূর্ব কবিতায়। দুঃখের বিষয়ে তার বেশির ভাগই পুস্তকাকারে দেখা যায় নি।

পুণ্যলতার জীবনকালে তাঁর লেখা একটিমাত্র বইই প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর অতুলনীয় 'ছেলেবেলার দিনগুলি'। এই বইতে শুধু উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারের কটা বছরের কাহিনী বিধৃত নেই, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ কটা বছর আর বিংশ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলি, তাদের অপরূপ সম্ভাবনীয় ইঙ্গিত নিয়ে ধীরে ধীরে চোখের সামনে রূপ নেয়। সেইসঙ্গে বাংলার অদ্বিতীয় সুকুমার রায়ের শৈশবের আশ্চর্য এক ছবি পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা বলবার এমন একজন সরস প্রত্যক্ষ-

দর্শী বাংলায় বিরল। যতদূর মনে হয় হয়তো বছর দশেক আগে যুগান্তর পত্রিকায় পুণ্যলতা একালের শুরুর কথা নিয়ে ধারাবাহিকভাবে ছয়-সাতটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। দুঃখের বিষয়, সেই সময় ওঁর স্বামীর অসুখের জন্য লেখা তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। পরে মনের মতো করে আরেকবার শেষটুকু ঢেলে সাজাবার ইচ্ছা ছিল। সে আর হয়ে ওঠে নি। মনে হয় প্রবন্ধগুলির একটা ঐতিহাসিক মূল্যও আছে, দুঃখের বিষয় পরিচ্ছেদগুলি সংগ্রহ করে উঠতে পারে নি।

যারা পঁচাশি বছর বয়স অবধি পরিপূর্ণরূপে বাঁচতে জানে, তারা জীবনের শেষটুকুও নষ্ট হতে দেয় না। শেষ বয়সে পুণ্যলতার হাতে যখন অশেষ অবসর ছিল, তখন সারা জীবন ধরে জমিয়ে রাখা মনের পরিপূর্ণ ঘটটি থেকে একটি একটি করে রত্ন মাসে মাসে 'সন্দেশ' পত্রিকাকে উপহার দিয়েছেন। এক পাতার ছোট-ছোট গল্প, প্রাণের রসে ভরা।

সন্দেশের পাতায় আরো অনেক গল্প ছড়িয়ে আছে। সবগুলি মৌলিক নয়, দেশ-বিদেশের উপকথাও কিছু আছে। কোথাও এতটুকু নীতিশিক্ষা দেবার প্রয়াস নেই। তবু পড়তে পড়তে মনে হয় এই মানুষটি ধনদৌলত বিদ্যা ক্ষমতার ধার ধারে না। এর কাছে সব চাইতে ঘৃণ্য অপরাধ হল লোভ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা আর সব চাইতে বড় গুণ হল স্নেহ, মমতা, ক্ষমা। ঐ যে গোড়ায় বলা হয়েছিল, সব কাহিনীর খোলস ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে অন্তরের অন্তঃস্থলে গিয়ে যেখানে পৌঁছনো যায়, সেখানে ঐ-সব ছাড়া আর কিসেরই-বা আদর থাকতে পারে।

শুধু গ্রন্থের পরিমাণ দিয়ে সাহিত্যিক হয় না। রসের মৌচাকের মক্ষিরানীকে যে হাতের মুঠোয় ধরতে পারে, সেই হল জাত-সাহিত্যিক। সেইরকম লেখিকা ছিলেন পুণ্যলতা চক্রবর্তী। তাঁর মধ্যে তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধির সঙ্গে স্নিগ্ধ রসবোধের সমাবেশ হয়েছিল।

পুণ্যলতার একটি ছোটগল্পের উল্লেখ না করে পারছি না। গল্পের নাম, 'কাল বৈশাখী,' ১৩৮০ সালে সন্দেশের বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাসুর মা গরিব বিধবা। লোকের বাড়ি কাজ করে সংসার চালায়। বাসু স্কুলে পড়ে আর ছোট বোন ফেলিকে আগলায়। একদিন মার বড় কাজ, মুনিব বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া, দুপুরে মা বাড়ি

আসবে না। বাসুকে বলে গেছে ফেলিকে দেখতে। ফেলি ঘুমিয়ে পড়েছে, বন্ধুরা ডাকতে এসেছে, অমনি বাসু ছুটে চলে গেছে। খেলার পর ঘরে এসে দেখে ফেলি নেই। খুঁজে খুঁজে হয়রাণ। মা-ও ফিরে এসে দেখে বাড়ি খালি। সে-ও বেরিয়ে পড়েছে। পথে বাসুর সঙ্গে দেখা, দুজনে আকুল হয়ে খুঁজে, শেষে হতাশায় ভেঙে পড়ে থানায় গিয়ে দেখে ফেলি বসে লজেঞ্চুস খাচ্ছে। সে হামা দিয়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিল। পানওয়ালা তাকে অনেকক্ষণ কাছে রেখে, এখন থানায় নিয়ে এসেছে। তখন সকলে কি নিশ্চিন্ত, কি সুখী। বাইরে এসে দেখল, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে, মেঘ কেটে গেছে, নির্মল আকাশে চক্‌চকে চাঁদটাও তাদের দিকে চেয়ে হাসছে। এও তবু বড় গল্প, ছোটদের জন্য ছোট্ট গল্পগুলো আরম্ভ হতে না হতেই শেষ হয়ে যায়, তারই মধ্যে সব কথা বলা চাই। বাড়তি একটিও শব্দ থাকার অবকাশ নেই,। সাজসজ্জা উপমা অলঙ্কারের জায়গা নেই, চালাকি করে ছেলে ভুলোবার সুযোগ নেই। একটা নমুনা দিই। গল্পের নাম 'আমচোর'।

বাগানের গাছে অনেক আম হয়েছে।

একটা বাঁদর গুটি-গুটি সেই দিকে চলেছে দেখেই দুই কুকুর 'রাজা' আর 'রানী' তেড়ে গেল। বাঁদরটা সুট্ করে আমগাছে উঠে গেল। কুকুর তো গাছে চড়তে পারে না, ওরা গাছতলায় দাঁড়িয়ে রইল।

নীচে থেকে দুই কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে, উপর থেকে বাঁদরটা আম খেয়ে খেয়ে খোসা আর আঁটিগুলো ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারছে! ভীষণ রেগে ওরা পাগলের মতো ছুটোছুটি চেঁচামেচি করছে।

সারাদিন এমনি চলল। বাঁদরটা কুকুরের ভয়ে নামতে পারছে না, ডালে বসে কিচির্ মিচির্ করছে আর ভেংচি কাটছে।

কুকুররাও ভাবছে, 'যাবে কোথায় বাছাধন? এক সময় তো নামতেই হবে।' তারা গাছতলা থেকে নড়ছে না।

রোজ রাজা আর রানী একসঙ্গে এক পাতে খায়; আজ রাজা এসে আগে খেয়ে গেল, রানী বসে পাহারা দিল। তার পর রাজা গিয়ে পাহারায় বসল, তখন রানী খেতে এল।

রাত হয়ে গেল, তখন রাজা আর রানীকে ধরে এনে বেঁধে দেওয়া হল। সেই সুযোগে বাঁদরটা নেমে তিড়িং তিড়িং করে পালিয়ে গেল।

এইরকম মেজাজেই 'ছেলেবেলার দিনগুলি' বইখানি লেখা, তবে

সেখানি শুধু ছোটদের জন্য নয়। ছোট বড় সবার জন্য। ভাষার একটু নমুনা দিই, 'তখনকার ট্রাম ছিল ঘোড়ায় টানা। আবার খিদিরপুর ও আলিপুরের দিকে ট্রাম ছিল ইঞ্জিনে টানা। যতটা ধোঁয়া ছাড়ত আর শব্দ করত, ততটা জোরে চলত না। তবু ঘোড়ার ট্রামের তুলনায় মনে হত কতই-না তাড়াতাড়ি চলেছি। অমন প্রকাণ্ড ভারী গাড়ি টানতে টানতে বড়-বড় ঘোড়াগুলিও ক্লান্ত হয়ে পড়ত, তাই খানিক দূর অন্তর ঘোড়া বদল হত। গরমের দিনে ঘোড়ার মাথায় টুপি দেওয়া হত—অনেকটা সোলা হ্যাটের মতো টুপি। কিন্তু ঘাড়ের দিকে অনেকখানি লম্বা। টুপির দুই ধারে দুই ফুটো—তার মধ্যে দিয়ে কান দুটো বেরিয়ে থাকত।'

এইরকম লিখতেন পুণ্যলতা, সবার কথার নীচে প্রচ্ছন্ন একটা হাসির স্রোত বইত। ক্বচিৎ কলকল করে সেই স্রোত সূর্যের আলোর টানে নিজেকে দমন করতে না পেরে আত্মপ্রকাশ করত। অবিস্মরণীয় দুই ছত্র দিচ্ছি—

"বুড়ো বললি কোন্ আক্কেলে,
বুড়ো কি হয় দাড়ি পাক্‌লে?"

যে-গাছে সুকুমার ফুটেছিলেন, সেই গাছেরই ফুল।

বকধার্মিক

বকধার্মিক

ছোটবেলায় পাহাড়ের দেশে থাকতুম। সেখানে বাড়ির পেছনে ঢালুর নীচে নুড়ি পাথরের ওপর দিয়ে ছলছল করে পাহাড়ী নদী বয়ে যেত। সরল গাছের বনের মধ্যে দিয়ে হু হু করে হাওয়া বইত। রাতে নদীর ধারে ধারে ঝোপে ঝোপে হাজার হাজার জোনাকি জ্বলত।

ছোট শহর; চা বাগানের সাহেবরা অনেকে সেখানে বাড়ি নিয়ে মাঝে মাঝে থেকে যেত। ইস্কুল, ক্লাব, হাসপাতাল, আপিস, আদালত, ব্যাঙ্ক, জেলখানা সবই ছিল। তবু লোকে বলত এখানে কখনো কিছু হয় না। বাড়ির দরজা খুলে রেখেই বেড়াতে বেরুত, সই না নিয়ে টাকা ধার দিত, নগদ পয়সা দিয়ে কেউ কিছু কিনত না, মাস কাবারে মাইনে পেলে যে যার ধার শোধ করে দিত।

সবাই সবাইকে চিনত সেখানে; কাউকে বলত খুড়ো, কাউকে বলত দাদা। ম্যাজিস্ট্রেটকে সবাই ভয় করত; দারোগাবাবু, পোস্টমাস্টার, ইস্কুলের হেডমাস্টারকে খাতির দেখাত; হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে ভালোবাসত।

সবাই সবাইকে চিনত সেখানে; মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাঁটিও হত, তবু কারো বাড়িতে কোনো কারণে খাওয়া-দাওয়া হলে, পাড়াসুদ্ধ সকলের ডাক পড়ত।

তখন দিনকাল ছিল ভালো, ঘিয়ের সের টাকা টাকা, দুধ ছিল টাকায় সাত সের, মিলের কাপড় তিন টাকা জোড়া। তবু জেলখানা খালি থাকত না। কোথায় কে জুয়ো খেলেছে, নেশা করেছে, পাঁচ

কেটেছে, তাদের ধরে এনে, হাজতে জিম্মা করে দেওয়া হত। তাদেরই বলা হত দাগী চোর; ছাড়া পেয়ে পথ দিয়ে হেঁটে গেলে, লোকে তাদের আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। মাথা নিচু করে হাঁটত তারা।

সেই সময়কার কথা।

হঠাৎ একদিন সব পাল্টে গেল। তার আগের দিন সন্ধেবেলা পর্যন্ত কোনো কিছু জানা নেই, যেমনকে তেমন সব চলছে। সকাল-বেলাও নাপিতরা রোজকার মতো খেউরি করতে বেরিয়ে এ বাড়ির খবর ও বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে।

আপিস যাবে বলে আমাদের পাড়ার জগদীশদা স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছে, এমনি সময় ওর পিসিমা আলমারি খুলে একটা সোনার কৌটো বের করে বললেন, এটাকে কখনো দেখেছিস? এর ইতিহাস শুনেছিস?

জগদীশদা তো থ! গোল গোল চোখ করে বলল, ইস্, পিসিমা, এদ্দিন কোথায় রেখেছিলে এ জিনিস? পেলে কোথায়?

পিসিমা কাষ্ঠ হেসে বললেন, এত ভালো জিনিস এ পাপের সংসারে কি আর সদুপায়ে পাওয়া যায় ভেবেছিস? আমার বাবা এটাকে জুয়ো খেলায় জিতেছিলেন।

জগদীশদা হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি দেখি কিরকম জিনিস। আরে এ যে নস্যির কৌটো দেখছি। বাবা! সোনা দিয়ে গড়া, তার ওপর লাল সবুজ পাথর বসানো! কিন্তু ঢাকনির মাঝখানে ছ্যাঁদা কেন, পিসিমা? নস্যি পড়ে যাবে যে!

পিসিমা বললেন, আরে ঐখানে যে স্ক্রুপ দিয়ে একটা হীরের প্রজাপতি বসানো ছিল।

জগদীশদা বললে, কই, কই সেটা?

পিসিমা একটু চুপ করে থেকে বললেন, কি জানি।

জগদীশদা তখন খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, তোমার কাছে এত দামের জিনিস আছে, তবু তুমি কেন আমি মাইনে পেলেই খালি খালি টাকা দাও, টাকা দাও, কর?

পিসিমা তো অবাক!

ওমা, সে কি আমার নিজের জন্যে বলি রে? সব তো প্রায় তুইই খাস। আর এটাকে কি আমার নিজের জন্যে রেখেছি নাকি? তোর

বউ এলে, এতে সিঁদুর ভরে তাকেই দেব মনে করেছি।

জগদীশদা ফুটো দেখিয়ে বললে, কিন্তু ঐখান দিয়ে সিঁদুর পড়ে যে বউয়ের শাড়িতে মেখে একাকার হবে। প্রজাপতিটা কই?

পিসিমা তার কোনো উত্তর না দিয়ে, দেরাজ থেকে ছোট্ট এক টুকরো লাল সালু বের করে, তাই দিয়ে কৌটোটাকে বেশ করে মুড়ে, জগদীশদার হাতে দিলেন।

দ্যাখ্ এটাকে আর বাড়িতে রাখতে সাহস হচ্ছে না, তুই বরং আপিসে টিফিনের ছুটি হলে, ওটা ব্যাঙ্কেই জমা দিয়ে দে। খুব সাবধানে রাখিস কিন্তু, এর দাম শুধু টাকা পয়সা দিয়ে নয়। কে জানে এর জন্যে হয়তো আমার বাবা বেচারিকে নরক ভোগ করতে হচ্ছে। সে যাক গে; কিন্তু খবরদার, ব্যাঙ্কের লোহার দেরাজে তালাচাবি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত, এক মিনিটের জন্যেও একে হাতছাড়া করবি নে।

জগদীশদা পুঁটলিটাকে প্যান্টের পকেটে পুরতে পুরতে বলল, আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলতে হবে না।—আমার বউকেই দেবে তো ঠিক? শেষটা—

পিসিমা চটে গেলেন।

তোর বউকে দেব না তো আবার কাকে দেব? তুই ছাড়া আর তিন কুলে কে আছে রে আমার?

জগদীশদা কাগজপত্র গুছোতে গুছোতে হেসে বলল, থাকলে তো আমি বাঁচতুম।

পিসিমার মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। না রে জগদীশ, হাসিঠাট্টার কথা নয়। শুনেছি যার কাছ থেকে বাবা ওটাকে জিতে ছিলেন, সে নাকি প্রতিজ্ঞা করেছিল, যেমন করেই হোক, নাতনির বিয়েতে ঐটেকেই যৌতুক দেবে। তুই বলিস কিরে জগদীশ, এদ্দিনে তার বিয়ের বয়স হয়ে গেছে। ওটাকে আর বাড়িতে রাখা নয়।

তার পর দুগ্গা দুগ্গা বলে জগদীশদাকে রওনা করে দিতে দিতে আরো বললেন, দ্যাখ্ দিকিনি অন্যায়টা! কি এমন দোষ করেছিলেন বাবা বেচারি? যারা জুয়ো খেলবে তারাও যদি একটু-আধটু জোচ্চুরি করতে না পেল, তা হলে জোচ্চুরিটা করবে কে, তুইই বল? তাই বলে অমন কথা! কম পাজি তো নয় লোকটা।

আপিসে সেদিন খুবই কাজের তাড়া ছিল, তবু তারই মধ্যে থেকে থেকে জগদীশদা প্যান্টের পকেট চাপড়ে বার বার দেখেছিল কৌটো

ঠিক আছে। অথচ ব্যাঙ্কে গিয়ে, পকেট থেকে পুঁটলি বের করে জগদীশদার চক্ষুস্থির! কোথায় গেল সেই সালুতে মোড়া ঢাকনিতে ছ্যাঁদাওয়ালা সোনার কৌটো! এ যে একটা ন্যাকড়ায় জড়ানো কিমামের শিশি!

তার পর হাঁক-ডাক, থানা-পুলিশ, খানাতল্লাশি। কিন্তু কিছুতেই আর কিছু হল না। সোনার কৌটো কর্পূরের মতো উড়ে গেল।

এ-সমস্ত ঘটনা পরে জগদীশদার নিজের মুখ থেকে শোনা।

আর শুধু কি সোনার কৌটো? সেদিন থেকে আমাদের ছোট শহরে, যেখানে কখনো কিছু ঘটে না বলে লোকে আক্ষেপ করত, সেখানে যেন ভোজবাজি শুরু হয়ে গেল। সে চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবার কথা নয়। যেখানে আগে সবাই দরজা খুলে বেড়াতে যেত, সেখানে আর কারো কিছু রাখবার উপায় রইল না। যার-যা ভালো জিনিস সব বেমালুম চুরি হয়ে যেতে আরম্ভ হয়ে গেল।

অদ্ভুত সব ব্যাপার। বিশেষ করে স্কুলপাড়ায়, যেখানে আমরা থাকতাম। আমাদের শহরটা ছোট হলেও, পাড়াগাঁর মতো নয়। বলেছিই তো আপিস, আদালত, থানা, জেলখানা, ছেলেদের ইস্কুল, মেয়েদের ইস্কুল, হোটেল, ক্লাব, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক কিছুরই অভাব ছিল না। রেলগাড়ি অবিশ্যি ঐ-সব পাহাড়ে দেশে যাতায়াত করত না, কিন্তু মস্ত একটা মোটর আপিস ছিল, সেখানে মেলা লোকজনও কাজ করত।

জগদীশদার কৌটো যাবার পরদিনই আমাদের স্কুলের বড়দিদিমণির সেলাই-কলটা গেল। তার পর দু-চার দিন পর পর, শুপেদের হেড-মাস্টারের টাইপরাইটার, ব্যোমকেশবাবুর দু-দুটো ছাগল, আর পোস্টমাস্টারের সাইকেল উধাও।

সেখানেই থামল না। আমাদের কালেক্টর গুপ্ত সাহেবের দেয়ালঘড়ি, গ্রামোফোন আর বারান্দায় ঝোলানো দশরকমের অর্কিড ফুলের গাছ লোপাট। এমন-কি, সেগুলোকে পাহারা দেবার জন্য গুপ্ত সাহেব যে হলুদ রঙের ডালকুত্তো কিনেছিলেন, যার ভয়ে বাড়ির লোকেরা পর্যন্ত কেউ নিচু হত না, কারণ নিচু হলেই পেছন দিক থেকে তেড়ে এসে একাকার করত—সে কুকুরটা পর্যন্ত নেই।

পুলিশে আর কি করবে? শোনা গেল থানায় বড় ঘণ্টাটা আর পুলিশদের চব্বিশটা পেতলের লোটাও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না।

পকেট থেকে পুঁটলি বের করে জগদীশদার চক্ষুস্থির।

প্রথম প্রথম এ-সব শুনলে আমাদের দারুণ মজা লাগত, কিন্তু শেষটা যখন আমাদের বাড়ি থেকে, আমাদের ভালো কাপড়জামা সুদ্ধ বড় কালো তোরঙ্গটা অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন মোটেই হাসির কথা হল না।

সবাই ভারি সাবধানে চলাফেরা করতে লাগল। কিন্তু হলে হবে কি? চোরেরা আরো সেয়ানা। ডাক্তারবাবু বললেন, আর সেয়ানা হবে নাই-বা কেন? বোকা হলে তো সৎপথেই থাকত।

এমন কথা শুনে মা জ্যেঠিমারা খুব বিরক্ত হয়েছিলেন।

তার পর কত কাল কেটে গেছে, তবু এখনো সে-সব কথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। আমার জ্যাঠতুতো ভাই নেপু বলেছিল যে পিসির কাছে তাড়া খেয়ে জগদীশদা নাকি তিনজন সাক্ষী ডেকে, তামা তুলসি গঙ্গাজল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে চোর সে ধরবেই, সে যেমন করেই হোক। তাই নিয়ে রাত্রে ওরা লুচি মুরগি রেঁধে খাওয়া-দাওয়া করেছিল; তাই আর এখন কথার নড়চড় হবার জো নেই।

সে সময় শহরের মধ্যে যেখানেই যাও-না কেন, সবখানেই ঐ এক কথা, কে নিল, কেন নিল, কেমন করে নিল, কোথায় রাখল।

আমাদের স্কুলের মেয়েরাও টিফিনের সময় রোজই খুব জটলা করত। একদিন ইন্দুদি দেখলুম খালি হাতে ক্লাশে ঢুকলেন। এসেই বললেন, মেয়েরা তোমরা সময় থাকতে সাবধান হও। পরে আপসোস করে কোনো লাভ হবে না।

শুনেই আমরা যে যার চুড়ি, বালা, গলার হার আর কানের ইয়ারিং খুলে, ইন্দুদির ডেস্কে চাবি বন্ধ করে ফেললুম। তার পর টিফিনের সময় সবাই মিলে ডালিম গাছের নীচে খাবার-টাবার খেলুম, গাল-গল্প করলুম। ফিরে এসে যখন ডেস্ক খোলা হল, দেখা গেল, ওমা কি সর্বনাশ, গয়নাগাটি হাওয়া!

আমাদের নতুন বড় দিদিমণি, লাবণ্যদি তাই নিয়ে মহা গোলমাল করলেন। ইন্দুদি কেঁদে-কেটে একাকার; বাড়িতেও বকাবকি। থাক, সে-সব কথা ভেবে কোনো লাভ নেই।

রাত্রে খেতে বসে, নেপুর যেমন স্বভাব, ফোঁপরদালালি করে বলল, আমাদের অপূর্বদা বলছিলেন, এ-সমস্ত কোনো ফন্দিবাজ মেয়ে চোরের কাজ। এতটা নীচ, ছোটলোক আর ধূর্ত হওয়া শুধু স্ত্রীলোকেরই সাজে।

রাগে আমার গা জ্বলে গেছিল। কিন্তু আমাকে আর কিছু বলতে হয় নি। মা, জ্যেঠিমা আর অরুণা বউদি বাছাধনকে আচ্ছা করে দু কথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন।

সত্যি, ওদের ঐ অপূর্বদাটি একটি দেখবার মতো জিনিস। ইয়া লম্বা-চওড়া তার ওপর গা-ময় পাকানো পাকানো দড়ির মতো সব মাস্‌ল্‌, এই কুটি কুটি ছোট্ট করে চুল কাটা, কিন্তু কান পর্যন্ত টানা গোঁফ। নেপুটাকে একরকম অপূর্বদার চেলাই বলা যায়, নেহাত গোঁফটা গজায় নি।

জ্যেঠিমা নেপুকে বললেন, পাকামো রাখ, ঐ অত বড় তোরঙ্গ গ্রামোফোন সরানো মেয়েমানুষের কাজ না আরো কিছু। ও-সব পাচার করতে একটা ষণ্ডামার্কা পুরুষমানুষের দরকার।

অরুণাবউদি বললেন, আর তার গোঁফ থাকলে তো কথাই নেই।

নেপু রেগে চটে পাতে দুখানা গোটা হাতের রুটি ফেলেই উঠে চলে গেল।

বড়দা একটু হেসে বউদিকে বললেন, ওরকম বলতে হয় না। নেপুরা তা হলে তোমার নামে মানহানির মামলা করবে।

যাই হোক, চারি দিকে কতরকম জল্পনা-কল্পনাই যে চলতে লাগল, তার ঠিক নেই। শেষপর্যন্ত এমন হল যে সবাই সবাইকে সন্দেহ করতে লাগল।

একদিন ডাক্তারবাবুর গাড়ি থামিয়ে নতুন পুলিশ ইন্সপেক্টর ওঁর ব্যাগ তল্লাশি করলেন। ডাক্তারবাবু হাঁ হাঁ করে তুলোর প্যাকেট সরিয়ে রাখাতে, সন্দেহজনক লোকদের তালিকায় ওঁর নামটাও লিখে রাখলেন। পরে অবিশ্যি দারুণ পেটব্যথা হওয়াতে ডাক্তারবাবুর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।

সে যাক গে, এইভাবে বেশ দু-তিনটে মাস কেটে গেল, একটা জিনিস বা একটা লোক ধরা পড়ল না।

দুই

বলেছি তো আমাদের শহরটা ছিল পাহাড়ে, দারুণ শীত পড়ত সেখানে। রাতে লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে শুয়ে শুনতাম বাড়ির পেছনে, ছোট নদীর ওপারে, সরকারি জঙ্গলের মধ্যে শীত লেগে হুতুম প্যাঁচা ডাকছে। দূরে দূরে থেকে থেকে ক্যা-হুয়া ক্যা-হুয়া বলে শেয়াল চ্যাঁচাত। বাড়ির টিনের ছাদ সারাদিন রোদে তেতে, রাতের ঠাণ্ডায় মট্‌মট্‌ করত।

কিন্তু এ-সব শব্দের চেয়েও স্পষ্ট শুনতে পেতাম কারা যেন বাড়ির বাইরে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

একদিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর, বাবা ছুটে বেরিয়ে গিয়ে এক ব্যাটার গলা টিপে ধরেও ছিলেন। সে কিন্তু মহা ক্যাঁও-ম্যাও লাগাল, সে নাকি বাবার বন্ধু গোপেনবাবুর নতুন চাকর, কি চিঠি নিয়ে এসেছে! বেরও করে দিল একটা চিঠি, শেষপর্যন্ত তাকে ছেড়ে দিতে হল।

সত্যিকার চোর আর কেউ চোখেও দেখল না। অথচ কমিশনার সাহেবের বাগানের সমস্ত আলুগাছ রাতারাতি কে উপড়ে নিয়ে চলে গেল। তাতে আলু কত! এক একটা গাছেই কুড়ি বাইশটা করে। এরজন্য থানার ইন্‌চার্জ কোন অজ পাড়াগাঁয়ে বদলি হয়ে গেলেন, কিন্তু চোর ধরা পড়ল না।

তাঁর বদলে যিনি এলেন, তিনি এসেই শহরে নতুন যারা আসছে আর পুরোনো যারা বেরিয়ে যাচ্ছে, সবাকার নামধাম পেশা টুকে রাখলেন।

প্রতি বছর এই সময় শীতের মুখে, জগদীশদার পিসিমার গুরুদেব দশ-বারো দিন লুচি পাঁঠা ক্ষীর সর খেয়ে মোটা হয়ে, দুখানি নতুন কম্বল নিয়ে চলে যান। এ বছর যেই-না টিকিসুদ্ধ দেখা দিয়েছেন, অমনি ক্যাঁক্ করে পুলিশরা ধরেছে তাঁকে।

আমাদের ক্লাশের সব চাইতে ভালো মেয়ে পুঁটি, জগদীশদাদের পাশের বাড়িতে থাকে। সে বললে গুরুদেবকে ধরাতে পিসিমার সে কি রাগ!

আমার অমন সোনার ডিবে গেল, বলে তারই শোকে মলাম! আবার কিনা শ্রীভগবানকে ফাটকে দিয়েছে! এমন দেশে চুরি হবে না তো হবে কোথায় শুনি! দেখো, কেউ ধরা পড়বে না, কিচ্ছু পাওয়া যাবে না, আমার সোনার ডিবেও না। হাউ হাউ।

যখন সত্যি সত্যি বেশ কিছুদিন কেটে গেল, তখন একদিন কমিশনার সাহেবের বাড়িতে সকলের নেমন্তন্ন হল। বাগানের মধ্যিখানের খোলা জায়গাটিতে ছেঁড়া সতরঞ্চি পেতে বসিয়ে, চা আর আলু-ভাজা খাইয়ে দেওয়া হল। তার পর সকলে মিলে ঠিক করা হল যে এ আর একা পুলিশের কম্ম নয়, শহরসুদ্ধ সবাইকে কাজে নেমে যেতে হবে।

মিটিং করতে করতে সন্ধে হয়ে এল, দাঁড়কাকরা গাছে ফিরে এল, সুয্যি ডোবার সঙ্গে-সঙ্গে অন্ধকার নেমে এল।

বাড়ি ফেরবার পথে বাবা শশীবাবুর দোকান থেকে একটা লম্বা খাতা কিনে, ঘরে ঢুকেই আমার নতুন সবুজ কলমটা চেয়ে নিয়ে, চোর ধরবার লোকজনদের নাম লিখতে বসে গেলেন। কলমটা দিয়ে আবার গল্‌গল্‌ করে কালি বেরুত, সে-সব নতুন খাতায় মেখে-টেখে একাকার, বাবা তো রেগে কাঁই।

শেষটা পেনসিল দিয়ে লিখতে হল। নেপু আর আমি স্কুলে নাম দেব বলে, আমরা ছাড়া আর সকলের নাম ১নং ২নং করে লেখা হল।

আমাদের শঙ্কর ঠাকুর নাম লিখিয়ে সটান নিজের ঘরে গিয়ে বাক্স প্যাঁটরা বাঁধতে লেগে গেল। বলে, আজ নাম্‌অ লিগিলুঁ কাল ধরি নিলুঁ। আধ ঘণ্টা ধরে মা আর জ্যেঠিমা ওকে বোঝাতে লাগলেন। পরে অবশ্যি খুশি হয়ে মাছকাটা বঁটি নিয়ে শুল।

পরদিন নেপু ইস্কুল থেকে ফিরেই বলল, অপূর্বদারা প্রমাণ পেয়েছেন এ-সব কোনো মেয়ের কাজ, তোদের মাস্টারনীদের সাবধান হতে বলিস।

আমিই-বা ছেড়ে দেব কেন, একটা মান-সম্মান আছে তো? কাজেই বললাম, যার বিশে ডাকাতের মতো চেহারা তাকে অত কথা বলতে বারণ করিস।

নেপু রাগে ফুলতে ফুলতে বলল, তোদের লাবণ্যদিদিকে ওয়ার্ন করে দিস।

আমিও রেগে বললাম, অপূর্ব লোকটাকে উইল লিখে রাখতে বলিস। এই কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে মেয়েদের ইস্কুল আর ছেলেদের ইস্কুলের মধ্যে কি দারুণ রেষারেষি চলছিল।

নেপু হল আবার ওদের দলের সাব-ক্যাপ্টেন। গলায় একটা

দড়ি দিয়ে একটা বাঁশি ঝুলিয়ে বাড়ি এল। দেখে হেসে বাঁচি নে। ওদিকে আমাদের ইস্কুলেও রীতিমতো কাজ শুরু হয়ে গেছে, ছোট-ছোট দল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আমি একটা দলের অধিনেত্রী হয়েছি। একটা লাল রেশমী ফিতের ব্যাজও পেয়েছি, আমার পেনসিল বাক্সে সেটা লুকিয়ে রেখেছি। নেপুকে দেখাতে ভারি বয়ে গেছে। বাবা! যা হিংসুটে ছেলে, এক্ষুনি তাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করবে।

এ-সবের মধ্যে আবার শীত পড়ে গেল। নাসপাতি গাছের পাতা-গুলো সব লালচে হয়ে ঝরে পড়ে গেল। আর তারই সঙ্গে আমাদের বাৎসরিক পরীক্ষাও এসে গেল। নেপুরা শুনলাম দল বেঁধে ওদের হেডমাস্টারমশায়ের কাছে গেছল, নাকি চোর ধরার হাঙ্গামার জন্য ভালো করে পড়া তৈরি হয় নি, বড়দিনের ছুটির পর পরীক্ষাটা হোক। তাড়া খেয়ে বাবুরা ফিরে এসেছিলেন। ওদিকে চোর ধরার নাম নেই, এদিকে তাই নিয়ে বড়াই কত! আমরাও যে পরীক্ষা পেছোবার কথা ভাবি নি তা নয়, কিন্তু নেপুদের অবস্থা দেখে কথাটা আর পাড়ি নি।

সেকালে বাৎসরিক পরীক্ষার পর বারো দিন বড়দিনের ছুটি থাকত। ভেবেছিলাম তার মধ্যে কাজ হাসিল করতে পারলে কি মজাটাই না হয়।

বাড়িতেও এই-সব ব্যাপার নিয়ে বেশ একটা আলোড়ন চলত। বাবা তো খাতায় মা জ্যেঠিমাদের নাম লিখে নিয়েছিলেন। সন্ধেবেলায় জগদীশদার পিসিমা প্রায়ই একটা মোষের মতো রঙের আলোয়ান গায়ে দিয়ে আমাদের বাড়িতে আসতেন। জ্যেঠিমাদের বলে-কয়ে বাবার খাতায় তিনিও নিজের নামটা লিখিয়ে নিলেন।

যখন মা জ্যেঠিমাদের কাজ সারা হয়ে যেত, সবাই হাতমুখ ধুয়ে চুল-টুল বেঁধে, একটা করে নীল আলোয়ান জড়িয়ে জ্যেঠিমার শোবার ঘরের তক্তপোশের ওপর গোল হয়ে বসতেন। আজকাল বড্ড শীত পড়ে গেছে, বাগানে আর বসা চলে না।

কতরকম জল্পনা-কল্পনাই না চলত ওদের। কোথায় কবে কি চুরি ডাকাতি হয়েছিল তার গল্প শুনে শুনে আমাদের গা শির্‌শির্‌ করত। আবার মাঝে মাঝে বাইরে একটা পাতা খসার শব্দ শুনেই চমকে চমকে উঠতেন সবাই। ও দিদি! ও আবার কেমন ধারা আওয়াজ!

জ্যেঠিমার তো অন্ধকার হলে পর জানলার কাচ দিয়ে বাইরে তাকাতেই ভয় করে, উনি আবার চোর ধরবেন! অথচ বয়সে বড় বলে

উনিই হলেন ক্যাপ্টেন। মাকে ডেকে বলতেন, মেজোবউ, মা, দেখে আয় কিসের শব্দ।

আমার মা বন্ধ জানলার পর্দাটা আঙুল দিয়ে একটু সরিয়ে টুক্ করে একবার দেখেই বলতেন, কই, কিছু না তো। পাতা খসার আওয়াজ হবে।

একদিন ঐরকম জানলার কাছ থেকে ফিরে এসেই জগদীশদার পিসিমাকে বলে বসলেন, তুমি তো দিদি সব জানো। তবে কেন পুলিশের কাছে কথাটা খুলে বলছ না? ঐ যার কাছ থেকে তোমার বাবা জুয়ো খেলে সোনার কৌটো জিতেছিলেন, তুমিই তো বলেছ যে সেই লোকটা প্রতিজ্ঞা করেছে নাতনির বিয়েতে ঐ কৌটো দেবেই দেবে। তবে কেন তাকে ধরিয়ে দিচ্ছ না?

মার কথা শুনে বাকি সবাই কাঠ। পিসিমা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, আরে, কি যে বলিস পাগলের মতো। সে কি আর আছে যে ধরিয়ে দেব? কোন কালে মরে সগ্‌গে গেছে। পৃথিবীর নিয়মই হল হাড় পাজিরা বেশিদিন কষ্ট ভোগ করে না।

তাই শুনে আমার মা বললেন, আহা, তাকে না পাও, তার ছেলেকে তো জেলে দিতে পারো। সে সুদ্ধু তো আর মরে যায় নি!

পিসিমা বললেন, গেছে রে গেছে। পাজির গুষ্টি, সব কটা সগ্‌গে গেছে! এক আছে ঐ নাতি-নাতনি গুটিকতক! সব কটা নাকি সমান দুষ্টু!

জ্যেঠিমা বললেন, সেকি! তাদের তুমি চেন নাকি?

চেনবার কিছু দরকার করে না। ও বংশের কেউ ভালো হতে পারে না, তাই বলছি। আরে বাবা বেচারি নাহয় একটু জোচ্চুরিই করেছিলেন, তাতে কি আর এমন হয়েছেটা তাই তোরা বল? কত লোকে তো অমন করে! অথচ সে বুড়ো হতভাগা এমনি করতে লাগল যেন বাবা বেচারি কি অন্যায়টাই না করেছেন! শেষপর্যন্ত বেচারাকে কলকাতা ছেড়ে, নাম ভাঁড়িয়ে, এখানে এসে শেষ বয়সে ভগবানের নাম করে দিন কাটাতে হয়েছিল।

মা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা ঐ-সব নাতি-নাতনিদের—তা হলে হাজতে পোরা হচ্ছে না কেন?

পিসিমা রেগে-মেগে এবার উঠেই পড়লেন।

কি জ্বালা, তুই তো ভারি বোকা দেখতে পাচ্ছি! পুলিশকে কৌটো

হারানোর কথা বলি আর কি! তার পর বাবার জোচ্চুরির কথাটাও ফাঁস হয়ে যাক, তাতে ভালোটা কি হবে শুনি? তবেই আর কৌটো পাওয়া গেছে। তা ছাড়া তাদের ঠিকানাও জানি নে।

পিসিমা এবার সত্যি বাড়ি যাবার জন্যে আলোয়ানটা ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। যেতে যেতে আবার চাপা গলায় বললেন, জগদীশ একটা নতুন চাকর রেখেছে।

মা জ্যেঠিমারা আঁতকে উঠে বললেন, না, না, দিদি, আজকাল চারি দিকে যে কাণ্ড হচ্ছে, এ সময় অচেনা লোক না রাখাই ভালো।

পিসিমা হেসে বললেন, তোদের যেমন বুদ্ধি! আরে, ও আসলে হল গিয়ে একটা পাকা গোয়েন্দা। টিকটিকি গো। চাকর সেজে তদন্ত করছে। কই, শঙ্করা আমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসুক তা হলে।

পরদিন টিকটিকিটাকে নিজের চোখে দেখলাম পর্যন্ত। জগদীশদাদের বসবার ঘরের জানলায় পর্দা টানাচ্ছে।

কি চালাক দেখতে সে আর কি বলব! কে বলবে গোয়েন্দা, স্রেফ একটা চোরের মতো দেখতে! খুদে-খুদে করে চুল ছাঁটা, থ্যাবড়া নাক, ছোট্ট-ছোট্ট চোখ নাক ঘেঁষে রয়েছে, পাশ দিয়ে তাকায়, কুচ্‌কুচে কালো গায়ের রঙ আর এই এই হাতের পায়ের গুলি! আবার পরেছে হাতকাটা গেঞ্জি আর কালো হাফ-প্যান্ট।

পিসিমা দেখলাম লোকটার ওপর হাড়ে চটা। মাকে বললেন, বক-রাক্ষসের সঙ্গে ব্যাটার কোনো তফাত নেই। সারাদিন খালি খাই খাই। কোনো কিছু তুলে রাখবার জো নেই! কি জানি বাবা, সারাক্ষণ যদি গিলবেই তো চোর ধরবে কখন?

লোকটা দেখলাম ততক্ষণে পর্দা টানানো শেষ করে, রান্নাঘরের সিঁড়ির ওপর বসে এই বড় এক ঠোঙা মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে মেখে বেশ একমনে খাচ্ছে। এমন সময় জগদীশদা হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে বলল, গুটে কোথায়? এই ব্যাটা, তুই এখানে বসে মুড়ি গিলছিস আর মাইনে খাচ্ছিস, ওদিকে অপূর্ববাবুরা তো সব বের করে ফেলল!

গুটে মুখে আরেক মুঠো মুড়ি পুরে বললে, কি যে বলেন! চোর ধরবে ঐ স্টুপিড্‌টা? ধরে যদি এই শর্মাই ধরবে, কিন্তু একটু না খেলে খাটব কি করে?

ততক্ষণে পিসিমা জ্যোতিমারা জগদীশদাকে ঘিরে ফেলেছেন।

কি সর্বনাশ! ওমা, অপূর্বটারও পেটে পেটে এত বুদ্ধি! বাইরে দেখতে ঐ ভালোমানুষ। তা কটাকে ধরল? তাদের সব ফাঁসি হবে বোধ হয়?

জগদীশদা রেগে উঠল।

চুরির জন্যে ফাঁসি হয় কখনো? যা বুদ্ধি তোমাদের! চোর ধরা অত সহজ নাকি?

হয়েছে এই যে অপূর্বরা খেলার মাঠের ওপারের জঙ্গলে গিয়ে দেখে চারি দিকে ছড়ানো রয়েছে শুধু হাড় আর চেবানো মুণ্ডু—কি হল, অমন হাঁ হয়ে গেলে কেন? ব্যাটারা সেখেনে গিয়ে মহা ফিস্টি দিয়েছে, মেলা মুরগি রেঁধে খেয়েছে। সম্ভবত সব চুরি করা। চারি দিকে শুধু হাড় আর লুচির ঝোড়া আর রসগোল্লার হাঁড়ি। কিরকম সাহস বেড়ে গেছে ভেবে দেখ! বলতে গেলে একেবারে আমাদের দোর গোড়ায় বসে ভোজ মেরেছে আর ফন্দি এঁটেছে! এবার কি হয় কে জানে।—আচ্ছা পিসিমা, তুমি কি সেই-সব—।

আর বলতে হল না। পিসিমা বিষম রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, চোপ্, ইডিয়ট্! হাটের মাঝে হাঁড়ি কি না ভাঙলেই নয়!

গুটেটা একেবারে পিসিমার ঘাড়ের কাছে এসে, হাঁ করে সব কথা শুনছিল। পিসিমা বিরক্ত হয়ে নাকে কাপড় দিয়ে বললেন, কাঁচা পেঁয়াজ গিলে এসে আমার নাকের কাছে কি নিশ্বাস না ফেললেই নয়, বাছা? গুটে একটু সরে দাঁড়িয়ে জগদীশদাকে বললে, দেখুন জগদীশবাবু, আমাকে সব কথা খুলে না বললে কিন্তু চলবে না। তা না হলে আমি তদন্ত করব কি করে?

জগদীশদা বললে, আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে 'খন। তুমি এখন এসো তো।

গুটে কিছুতেই নড়বে না, বলে, আর দেখুন, নাহয় চাকরির খাতিরে চাকর সেজেই রয়েছি। তাই বলে আপনার পিসিমার কি উচিত হয় আমার সঙ্গে সত্যি চাকরের মতো ব্যবহার করাটা? দেখুন, একবার আমার হাতের দশাটা দেখুন। সেই যে সকাল থেকে আমার পেছনে লেগেছেন, এক মিনিটের জন্যে বিরাম নেই। এমন করলে কি বদ্দে পারি তাই বলুন?

জগদীশদা পিসিমাকে বললে, আচ্ছা পিসিমা, সব জানো, তবু এরকম কেন কর বল দিকিনি? চোর ধরতে পারলে সরকার থেকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে তা জানো? তোমার হরিদ্বার যাবার খরচটা উঠে যাবে।

পিসিমা কিছুতেই বোঝেন না। না বাপু। আমি যাই হরিদ্বারে, আর তোমার গুটে গুণধর বাকি গয়নাগুলো—জগদীশদা ছুটে গিয়ে মুখ চেপে ধরল।

গুটে আরেকটু এগিয়ে এল।

কি কি গয়না, মা-ঠাকরুন? কোথায় রেখেছেন সেগুলো? আহা, কিছুই যদি না বলেন তো সে-সব রক্ষে করব কি করে?

বাকিরা এতক্ষণ হাঁ করে সব শুনছিলেন। পিসিমা কোনো জবাব দিচ্ছেন না দেখে একটু রাগ করে জ্যেঠিমা বললেন, চলো তোমরা, এখানে আর নয়। দেখছ না, আমরা আছি বলে এঁদের কথাবার্তার অসুবিধে হচ্ছে। তা দিদি, তোমাদের ঐ-সব জুয়োখেলার জিনিসের ওপর আমাদের কোনো লোভ নেই। আমার বাবা আমাকে আশি ভরি সোনার গয়না দিয়েছিল, সেই আমার যথেষ্ট। আমি মলে অদ্দেক পাবে মণির বউ আর অদ্দেক পাবে নেপুর বউ। তা সে-সব এমনি লুকিয়ে রেখেছি যে আমি নিজে বের করে না দিলে, চোররা কেন, এরাও তার সন্ধান পাবে না। হ্যাঁ।

এই বলে জ্যেঠিমা আমাদের একরকম টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে এলেন। আমার একটুও আসতে ইচ্ছে করছিল না। চোর ধরতে হলে কথায় কথায় রেগে অকুস্থল ছেড়ে চলে যাওয়াটাও কিছু কাজের কথা নয়।

বাড়ি এসে দেখি নেপুটা ভারি লাফাচ্ছে।

পুলিশের লোকেরা কিছু পায় নি, অথচ আমাদের অপূর্বদা কতো হাড়-গোড় সংগ্রহ করেছেন!

শুনে বেজায় হাসি পেল। তাও যদি নরকঙ্কাল হত! মুখে শুধু বললাম, রেখে দে তোদের অপূর্বদার আস্ফালন। কে ওখানে পিকনিক করেছে, তাই দেখে কর্তা নেচে-কুঁদে একাকার!

নেপু চটে লাল।

কেউ পিকনিক করে না ঐ বনের মধ্যে। এটা তুই ভালো করেই

জানিস। সবাই জানে ওখানে ভূতের ভয়। বাইরের লোক না হলে ওখানে কেউ খাওয়া-দাওয়া করবে না, এটা তুইও বেশ জানিস। ও-সব তোর হিংসের কথা। তোদের লাবণ্যদিদির দিনই কাবার হয়ে যায় চোখে কাজল লাগাতে আর কপালে টিপ পরতে, ও আবার চোর ধরবে! জানিস, কাল সকালে পুলিশের সাহায্যে ঐ বন গোরুখোঁজা করা হবে। সরু চিরুনি দিয়ে আঁচড়ানো হবে। ভূতের বাড়িটা পর্যন্ত একেবারে চষে ফেলা হবে।

বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। কাল সকালে লাবণ্যদিদিদের সঙ্গে আমাদের ইস্কুলের দলও যে চোর খুঁজতে বনে যাবে।

তিন

ঐ পাহাড় দেশের সে দারুণ শীতের কথা আর কি বলব। একেবারে হাড়ের ভেতর ঢুকে যেত। রাত্রে শুতে যাওয়াই ছিল এক ব্যাপার। ঠাণ্ডার চোটে বালিশ বিছানা মনে হত ভিজে সপ্ সপে। একটা গরম জলের ব্যাগ দিয়ে বিছানা গরম করে নিয়ে তবে না শোয়া যেত। আর সকালে ওঠা? সে যে আরো কষ্ট। লেপের ভেতর থেকেই গরম জামা এঁটে, গরম মোজা পায়ে দিয়ে উঠতে হত।

ওদিকে সন্ধে সাতটা না হতেই যেন দুপুর রাত। পথে-ঘাটে জন-মানুষ নেই। আমাদের বাড়িতে ইলেকট্রিক আলো ছিল না। আমরা ছেলেপুলেরা একঘরে শুতাম আর তারই পাশের ঘরে জ্যেঠিমারা শুতেন। মাঝখানকার দরজা খোলা থাকত, সেখানে টিমটিম করে একটা লণ্ঠন জ্বলত।

মাঝে মাঝে ভালো ঘুম হত না। জল তেষ্টা পেত। কিন্তু উঠতে যত-না শীত করত, তার চেয়ে বেশি ভয় করত।

অথচ নেপুর কাছে কিছু বলবার জো ছিল না, অমনি পরদিন তাই নিয়ে সব বাড়িয়ে বাড়িয়ে পাঁচরকম কথা বলবে। শেষে লাবণ্যদি লতিকাদিদের অবধি টেনে আনবে। কি দরকার বাবা।

সেদিন অনেক রাতে ঘুম ভাঙতেই দেখি ঘর ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। আমার তো গায়ের রক্ত হিম। কান খাড়া করে থাকলাম। ওদিকে গলা শুকিয়ে তক্তা, জ্যেঠিমাকে ডাকি কি করে?

তার ওপর মনে হল কারা যেন কাছেই কোথাও ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে; কে যেন দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, খস্‌ করে সরে গেল। কারা যেন বাড়ির আশে পাশে পা টিপে টিপে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আরেকটু হলে ভয়ের চোটে মরেই গিয়েছিলাম আর কি, এমন সময় ওধারের দরজা খুলে, লণ্ঠন হাতে জ্যাঠামশাই এসে ওঘরে ঢুকলেন।

জ্যেঠিমা বললেন, ধরলে নাকি?

জ্যাঠামশাই যেন বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

এ কি ক্রিকেট বল নাকি যে ধরব? না, না, ও-সব তোমার মিছে ভয়। ভজহরি এসেছিল, বললে আমাদের আপিসের পিন্টো সাহেবের বাড়িতে সার্চ হয়েছে। এদানিং যে-সব জিনিস চুরি গেছে তার কোনোটাই পায় নি বটে, কিন্তু গত কুড়ি বছরের মধ্যে আমাদের আপিসের যা কিছু হারিয়েছে সব নাকি বেরিয়েছে।

জ্যেঠিমা বললেন, তা ভজহরি এসেছিল কেন?

না, ইয়ে কি বলে, ঐ পিন্টোর মেম একটু রাগী প্রকৃতির কি না, তাই সার্চ করতে যারা যারা গেছল, তাদের সবাইকে আইডিন লাগাতে হচ্ছে। কিন্তু ভজহরিরা তো অ্যালোপ্যাথিক লাগাবে না, তাই আমার কাছে এসেছিল আর্নিকা নিতে।

জ্যেঠিমা নাক অবধি লেপ টেনে বললেন, সখও আছে বাবা। এই শীতে আর্নিকার খোঁজ কচ্ছে!

জ্যাঠামশাই জুতো ছাড়তে ছাড়তে বললেন, তোমার বাপের বাড়ির কেউ তো আর হোমিওপ্যাথির মর্ম বুঝল না, তাই ঐরকম বল। তবে এও আমি বলে রাখলাম যদি ঠিক ঠিক ওষুধটি পড়ে একেবারে ধনুন্তরী!

এইরকম আরো কি কি সব কথাবার্তা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

কাল ছুটি। লাবণ্যদি লতিকাদি আমাদের দলের সাতজন খুব সাহসী মেয়ে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে বেড়াতে যাবেন, একেবারে ভূতের বাড়ি অবধি দেখে আসবেন।

সকাল থেকে সবার মুখে পিন্টো সাহেবের পেজোমি ছাড়া আর অন্য কথা নেই। নেপুর সবটাতেই কিছু বলা চাই, এঘরে এসে বলল, আরে, শুধু পিন্টো কেন, অনেক ওস্তাদের বাড়ি সার্চ করলেই, অনেক কিছু বেরুবে।

বলে এমন বিশ্রী করে হাসতে লাগল যে আমার আর বুঝতে বাকি রইল না যে লাবণ্যদিদিদের কথা বলছে।

তবু ওকে কিছু না বলে, মাকে বলে শঙ্করকে নিয়ে লাবণ্যদির বাড়ি চলে গেলাম।

কি সুন্দর বাড়ি লাবণ্যদির, আর রেঁধেছেন কি চমৎকার করে সাজিয়ে! দরজা জানলায় গোলাপী পর্দা, সিঁড়ির দু পাশে ছোট-ছোট টবে কত ফুল। সদর দরজা খোলা, ভেতরে বড়-বড় দুটো পেতলের ফুলদানি চক্‌চক্ করছে।

আর লাবণ্যদি নিজেও যে কি সুন্দর দেখতে সে আর কি বলব! মাথায় কত লম্বা, রঙটা খুব ফরসা না হলেও কেমন মোলায়েম, আর এক মাথা কালো কোঁকড়া চুল। নীল একটা শাড়ি পরেছেন, কোমরে দিব্যি করে আঁচলটা জড়িয়েছেন।

আমাকে দেখেই বললেন, বাঃ, এসে পড়েছ, ভালোই হল। সেখানে খাওয়া-দাওয়া হবে বলে এসেছ তো?

শঙ্করদা অমনি সর্দারি করে বলে উঠল, দিদিমণি কিন্তু মোটে ঝাল খায় না। ঝাল খেলেই দিদিমণির পেট—

এমন রাগ হল, খুব কষে ধমকে দিলাম, বললাম, আচ্ছা তোকে আর এর মধ্যে নাক গলাতে হবে না। তোর এখানে আর থাকবার দরকার নেই, তুই বাড়ি যা।

কিন্তু সে কিছুতেই যেতে চায় না, মা নাকি সঙ্গে যেতে বলে দিয়েছেন। কি মুশকিল! আমাদের সঙ্গে বাইরের লোক গেলেই-বা চলবে কি করে? দেখলাম লাবণ্যদিদির কি বুদ্ধি! চট করে বললেন, তুমিও যাচ্ছ, ভালোই হল। আচ্ছা বেশ, তা হলে আমাদের দশজনের খাবারের টিন আর জলের বোতলগুলো তুমিই বয়ে নিয়ে চলো।

তাই শুনে শঙ্করের সব উৎসাহ উড়ে গেল। সে বললে, না দিদি, আমার আবার পায়ে গুপো, অত পারব নি। তা ছাড়া আপনারাই যখন রইছেন আমার আবার যাবার দরকারটা কি? বাড়িতে মেলা কাজও জমে রয়েছে।

কথা শেষ হবার আগেই শঙ্কর রওনা দিল। লাবণ্যদিও খুশি হয়ে বললেন, দেখলে তো? ও ধমক-ধামকে কিছু লাভ হয় না, প্যাঁচ কষতে হয়।

তার পর আর কি! সবাই খেলার মাঠ পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

যেই-না ঢুকলাম অমনি চারি দিক ছায়া ছায়া ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নাকে কেমন একটা বুনো গাছপালার সোঁদা গন্ধ আসতে লাগল। অন্য আওয়াজ-টাওয়াজ সব কোথায় মিলিয়ে গেল, কানে আসতে লাগল শুধু বনের নিজের হাজাররকম সর্‌সর্‌, খস্‌খস্‌, মট্‌মট্‌ ঝির্‌ঝির্‌ ঝর্‌ঝর্‌ শব্দ।

কারো মুখে বেশি কথা নেই। প্রত্যেকেরই কাঁধে ঝোলানো একটা থলি, তাতে খাবার-দাবার, জলের বোতল, আইডিন, এই-সব। সঙ্গে লতিকাদি, দেখতে লাবণ্যদির মতো সুন্দর না হলেও, দারুণ গায়ে জোর। শুনেছি একদিন রাতে ওঁর ঘরে চোর ঢুকেছিল, তাকে ছাতা দিয়ে এমনি পিটেছিলেন যে, চুরি তো সে করতে পারেই নি, উপরন্তু অন্য জায়গা থেকে আনা মেলা জিনিসপত্র ফেলে কোনোমতে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিল।

লতিকাদি আজ আবার সেই গল্প আমাদের বলে বললেন, ভাগ্যিস পালিয়েছিল ব্যাটা! নইলে সেদিন যা রেগে গেছলাম, একটা এস্পার ওস্পার না করে ছাড়তাম না। সম্ভবত ওস্পার! মেয়েরা, তোমরাও ঐরকম করবে। এখন নাও তো, প্রত্যেকে শক্ত দেখে একটা করে গাছের ডাল ভেঙে নাও তো। দেখাই যাক-না, চোরদের একদিন, কি আমাদেরই একদিন!

তাই-না শুনে আমরাও আশে পাশের গাছ থেকে একটা করে নিচু ডাল ভেঙে নিয়ে, পাতা-টাতা ছাড়িয়ে দিব্যি লগুড় বানিয়ে নিয়ে চললাম। ভাগ্যিস গুপেটা কাছে ছিল না, নইলে এই নিয়েই আবার কি জানি বলত। হাড়গোড় ছড়ানো জায়গাটাও দেখলাম। ও বের করাতে অপূর্বদার কোনো বাহাদুরি ছিল না, একেবারে পথের ওপর। কথাটা লাবণ্যদিকে না বলে পারলাম না।

জানেন লাবণ্যদি, ছেলেদের ইস্কুলের অপূর্বদা এই মুরগির হাড় দেখে কি যে কাণ্ড লাগিয়েছেন, সে আর কি বলব!

লাবণ্যদি ভুরু তুলে বললেন, অপূর্বদাটি কোন জন?

বললাম, ঐ যে গুণ্ডা চেহারার শুঁকো লোকটা।

তাই শুনে মুখে রুমাল দিয়ে, লাবণ্যদি খুব খানিকটা হেসে নিলেন।

সব সময় এত ভালো ব্যবহার করেন। আমরা আর রুমাল কোথায় পাই, মুখের ওপর হাত দিয়েই খুব হাসলাম।

হঠাৎ লতিকাদি ঠোঁটে আঙুল চেপে বললেন, শ্—শ্—শ্। সাবধান! এই পথে খানিক আগেই অনেক লোক হেঁটে গেছে। ঐ দেখ ঘাস মাড়ানো, এখন পর্যন্ত সব শুয়ে শুয়ে রয়েছে, খাড়া হবারও সময় পায় নি। ও বাবা! ওটা কি!

সমস্ত জঙ্গল কাঁপিয়ে একটা বিকট গ্ গ্ ম্ ম্ ম্ করে আওয়াজ হল।

লাবণ্যদির পর্যন্ত মুখ সাদা হয়ে গেল। কিন্তু কি সাহস তাঁর! আমাদের বললেন, মেয়েরা, তোমরা আমার পেছন পেছন এসো। এ হয় বাঘ, নয় বন্দুক।

আমরা তখুনি লাইন বেঁধে, এর কাঁধে ও হাত রেখে একজনের পেছন একজন এগুতে লাগলাম। লতিকাদি সবার শেষে।

আবার গ্ গ্ ম্ ম্ করে আওয়াজ হল। লতিকাদি এক লাফে লাইনের শেষ থেকে মাঝখানে এসে ঢুকলেন। বললেন, শুনেছি সবার শেষেরটাকে সর্বদা বাঘ নেয়। আমায় নিলে, কে তোমাদের রক্ষা করবে?

মেয়েরা তখুনি ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় আমার চোখে পড়ল ঝোপের মধ্যে রামছাগলের পশ্চাদ্ভাগ।

ডালপালাতে শিং আটকে গেছে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়েও কিছুতেই ছাড়াতে পারছে না, তাই গ ম্ ম্ গ্ ম্ ম্ করে ডাকছে।

মহা মুশকিল। কেউ ছাগলের কাছে যেতে চায় না। তখন লাবণ্যদি নিজের থলি থেকে একটা মস্ত কলা বের করে, ছাগলের সামনে একটু তফাতে মাটির ওপর রাখলেন।

তাই দেখে রামছাগল এমনি জোরে এক ঝাঁপ দিল যে নিমেষের মধ্যে শিং ছেড়ে কলা সাবাড়। কি অদ্ভুত বুদ্ধি লাবণ্যদির।

আরেকটু এগিয়েই দেখা গেল পথের মাঝখানে একটা পেন্টেলুনের বোতাম পড়ে। লতিকাদি বললেন, পুলিশদের বোতাম। তারা এর বেশি আর এগোয় নি।

লাবণ্যদি বললেন, নাও, ওটাকে যত্ন করে তুলে রাখো, একটু আগেই পড়েছে, পরিষ্কার ঝক্‌ঝক্ করছে, একটু শিশির পর্যন্ত লেগে নেই। তাই

তখন লাবণ্যদি নিজের থলি থেকে একটা মস্ত কলা বের করে...

তো। বোতামটাকে তুলে যত্ন করে আমার থলিতে রাখলাম। বড় গোয়েন্দারা কখনো ছোট জিনিসকে অবহেলা করেন না।

তবে এও সত্যি যে আমার বুকটা একটু ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। আর আমাদের ক্লাসের মঞ্জির কথা আর কি বলব। ন্যাকার একশেষ। তার ওপর ওরা ভারি বড়লোক, নিজেদের মোটর চেপে ইস্কুলে আসে বলে অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না।

কত ঢং। রোজ নতুন নতুন শাড়ি পরা চাই, কানের গয়না বদলানো চাই, জুতোই আছে চার-পাঁচ জোড়া।

আবার নিজে সঙ্গে করে টিফিন আনে না, ঠাণ্ডা খাবার খেতে নাকি ওর গা ঘিন্ ঘিন্ করে—কথাটা কাদের ঠেস দিয়ে বলা হত সে আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকত না—ওর জন্যে রোজ একটা কোটপরা চাকর টিফিন-ক্যারিয়ারে ভরে লুচি, চপ, সন্দেশ এই-সব নিয়ে আসে আর ও আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে খায়। ঠিক হয়েছে। আজ জাদুকে নিজের খাবার নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে, হাতে ডাণ্ডা নিয়ে, আমাদের সঙ্গে আসতে হয়েছে। তবু কিন্তু ন্যাকামির শেষ নেই।

উঃ। লতিকাদি! কি একটা আমার পায়ের ওপর দিয়ে সড়্ সড়্ করে চলে গেল যে!

আমি বললাম, ও কিছু না। সাপ-টাপ হবে বা।

আর যায় কোথা!

ওঁ বাঁবাঁ। ওঁ লাঁবণ্য দিঁ!

বলে এক লাফে লাবণ্যদির পাশে। সেখানে আবার মাটিতে পা পড়বামাত্র ওরে বাবা রে সে কি চেল্লানি!

কি জ্বালা! কি হল কি, তাই বল না!

বলবে কি! ঠ্যাং চেপে মাটিতে বসে পড়েছে। আমরা অবাক হয়ে দেখি পা দিয়ে রক্তের গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে। আর পায়ের ঠিক সেই জায়গাটার মাঝখানে, একটা শিরার ওপর বিঁধে রয়েছে লাল পাথর বসানো একটা সোনার পিন।

আমাদের কারো মুখে কথা নেই। ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম।

লাবণ্যদি কিন্তু তখুনি ওর পা থেকে পিনটা টেনে বের করে ফেলে, জায়গাটাকে বোতলের জল দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে, আইডিন লাগিয়ে,

নিজের রুমাল দিয়ে বেঁধে ফেলেছেন।

অথচ তার কিছু দরকার ছিল না। আমাকে বললে, আমার সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ ছিল, বেশ বেঁধে দিতে পারতাম।

আর মঞ্জির সে কি ঢং!

ও লাবণ্যদি, আপনি আমার পায়ে হাত দিলেন! দিন দিন আপনার পায়ের ধুলো দিন, নইলে আমার পাপ হবে!

ছোঃ! সাধে কি নেপুটা মেয়েদের ঘেন্না করে।

চার

যাই হোক, মঞ্জির পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর আমরা সবাই লাবণ্যদিকে ঘিরে পিনটা দেখতে লাগলাম।

মোটেই পিন নয়, স্ক্রু-আঁটা একটা কানের ফুল। লাল সবুজ পাথর থেকে আলো ঠিকরোচ্ছে।

আমরা বলতে লাগলাম, ইস্ এরকম তো কখনো চোখে দেখি নি! অমনি মঞ্জিটা বলে উঠল, ও আর এমন কি! আমার ঠাকুরমার অমন মেলা আছে। তা ছাড়া হার আছে, বাজু আছে, রতনচূড় আছে, কানবালা আছে, বাউটি আছে—

লাবণ্যদি কিছু না বললেও, লতিকাদি শেষটা বাধা দিয়ে বললেন, আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের হয়েছে, তোমাদের বড়মানষির আর ফিরিস্তি দিতে হবে না!

আমিও আর থাকতে না পেরে বললাম, আমাদের বুড়ি ঝিরও ওরকম অনেক আছে।

অমনি লতিকাদি ধমক দিয়ে বললেন, তুমিও এবার থামো দিকিনি।

এতদিন পরে তবু চোরাই মালের একটা চিহ্ন পাওয়া গেল। আর একটা যখন পাওয়া গেল, বাকি বেরুতে কতক্ষণ। এ-সব ব্যাটাছেলেদের কম্ম নয়। আমার বাবাকে তো রোজ পাঞ্জাবির বোতাম খুঁজে দিতে হয়। অথচ নেপুটার কি চাল!

সবাই বলতে লাগল, তা হলে অন্য জিনিসগুলোও কাছেই কোথাও লুকোনো আছে। এটা কি করে অসাবধানে পড়ে গেছে। ঐ তো সামনে ভূতের বাড়ি, ওখানে থাকাও কিছুই আশ্চর্য নয়।

বিরাট বাড়ি। আশে পাশে বিশাল বিশাল শিশুগাছ। তাদের ঝোলানো পাতার ভেতর দিয়ে বাতাস বইছে—আর শিরশির করে শব্দ তুলছে। এখানে এত ঘন বন যে গাছের পাতার মধ্যে দিয়ে ভালো করে আলো আসে না, চার দিকটা সবুজ সবুজ, ভিজে ভিজে, গা ছমছম করে।

বাড়িটা প্রকাণ্ড, সারি সারি জানলার বেশির ভাগ ভেঙে ঝুলছে। দেয়ালে পুরু হয়ে শ্যাওলা জমে গেছে, ফাটলে ফোকরে বেশ বড়-বড় বট অশ্বত্থ গাছ গজিয়ে গেছে।

সদর দরজাটা হাঁ করে খোলা।

লাবণ্যদি সাহস দিয়ে বললেন, এত ভয়ও পাও তোমরা? আরে, এ-সব জায়গা তো পুলিশেই একবার দেখে গেছে। ওদের যত কাণ্ড, দরজাকে বন্ধ করে দিয়ে যায় নি পর্যন্ত। এখন ঘরে ঘরে বাঘ শেয়ালে আস্তানা গাড়ুক।

লতিকাদি সবার পেছন থেকে বললেন, চল্, চল্, এত আস্তে কেন? ঘরের ভেতরেই নাহয় আরাম করে বসে খাওয়া-দাওয়া করা যাবে।

ঢুকে তো পড়লাম। খিদেও পেয়েছিল দারুণ। এঘর ওঘর করে খাবার জন্যে একটা ভালো জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি, কেউ কেউ খিড়কি পুকুরে গেছে হাত-পা ধুতে।

হঠাৎ হাঁউমাউ! এ আবার কি জ্বালা! কে নাকি বারান্দার জমানো ধুলোতে পায়ের ছাপ দেখেছে। এমন ভীতুও হয় মেয়েরা!

লতিকাদি হঠাৎ দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির কাছে থেকে সরে এসে বললেন, ওপরে লোক আছে।

আমরা তখুনি যে যাকে পারি জড়িয়ে ধরলুম। লাবণ্যদি বললেন, না, ওরকম করলে চলবে কেন? চলো, ওপরে গিয়ে দেখে আসি। দেখতেই তো এসেছি।

গেলুম সবাই শেষপর্যন্ত। ওপরটা একটু আবছা মতন, জানলা অনেক বন্ধ রয়েছে। দুটো একটা যা ভেঙে ঝুলছে, তারই মধ্যে দিয়ে একটু একটু আলো আসছে।

যেখানেই যাই, খালি মনে হয় একটু আগেই সেখানে কেউ ছিল, এখুনি সরে গেছে। যেদিকে তাকাই খালি মনে হয় সেদিক থেকে কেউ আমাদের দেখছিল, এখুনি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মাঝখানে একটা বড় ঘর, দু পাশে দু সারি খালি ঘর। তবু মনে হয় কেউ আমাদের আড়ালে রেখে রেখে, নিজে সরে থাকছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা ভয়েই আধমরা, কারো মুখে কথাটি নেই।

হঠাৎ তাদের সঙ্গে একেবারে সামনাসামনি দেখা! নেপু আর তার অপূর্বদা। রাগে আমার গা জ্বলে গেল। অপূর্বদার পেছনে নেপুটা নিজের প্যান্ট আঁকড়ে কাঁচুমাচু মুখ করে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই বলল, এই, সেপ্‌টিপিন আছে?

কতকটা তাই শুনে, কতকটা ভয় কেটে যাওয়াতে, মেয়েরা সবাই একসঙ্গে হিহি হোহো করে হেসে উঠল। আমার কিন্তু একটু মায়া করতে লাগল। একটা বড় সেপ্‌টিপিন দিলুম ওকে।

ততক্ষণে অপূর্বদা লাবণ্যদিদিদের সঙ্গে আলাপ পাকিয়ে নিয়েছেন —চালাক তো কম নন—এখন শুনলুম সব একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়ার কথা হচ্ছে।

শেষ অবধি দু দলে মিলে, সারাদিন ধরে সারা বাড়িটাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল, কিচ্ছু পাওয়া গেল না। কানের ফুলের কথা ওদের বলতে লাবণ্যদি মানা করে দিয়েছিলেন।

সন্ধে লাগবার আগেই বাড়ি ফেরা হল। বাড়ি এসে শোবার ঘরে ঢুকেই, পকেট থেকে একটা জিনিস বের করে, পড়ার টেবিলের ওপর রেখে নেপু বললে, এই দ্যাখ্, তোদের লাবণ্যদিদির কেরামতি দ্যাখ্!

তাকিয়েই আমার পিলে চমকে গেল! টেবিলের ওপর আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া সেই লাল সবুজ পাথর বসানো কানের ফুলটা জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

নেপুর হাত চিপে ধরে বললুম, বল শিগ্‌গির কোথায় পেলি?

নেপু বললে, কেন, ভুতের বাড়িতে কুড়িয়ে পেয়ে অপূর্বদার ব্যাগে রেখেছিলাম। তার পর খেয়ে-দেয়ে তোমরা যখন হাত ধুতে গেলে, তোমাদের পেয়ারের দিদিমণিটির ব্যাগ সার্চ করতে গিয়ে দেখি, যা সন্দেহ করেছিলাম ঠিক তাই। কখন ওটি অপূর্বদার ব্যাগ থেকে সরিয়ে নিজের থলিতে লুকিয়েছেন। আমি আবার ওটি উদ্ধার করলাম।

আমার হাত কাঁপছিল। চেঁচিয়ে বললাম, নেপু থাম।

বলে আমার থলি থেকে ঐরকম আরেকটা কানের ফুল বের করে

সেটার পাশে রাখলুম। টেবিলের ওপর দুটিতে মিট্‌মিট্‌ করতে লাগল।

নেপুর মুখটা বোয়াল মাছের মতো হাঁ হয়ে গেছে। অবাক হয়ে থেকে, শেষটা বললে, কোথায় পেলি রে?

বনের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। লাবণ্যদির থলিতে রেখেছিলুম। নিশ্চয় ওটি সরিয়েছিলেন। আমরা হাত ধুয়ে এলে পর যখন তোরা হাত ধুতে গেলি, তখন অপূর্বদার ব্যাগ সার্চ করে আবার ওটি পেলুম। অপূর্বদা নিশ্চয় সরিয়েছিলেন।

খানিকটা চুপ থেকে আবার বললুম, অন্তত তাইতো মনে ভেবেছিলুম। এর মধ্যে কখন যে আবার জগদীশদার পিসিমা এসে পেছনে দাঁড়িয়েছেন তা টের পাই নি! হঠাৎ শুনি, ওমা! কোথায় যাব গো? এত ছোট কিন্তু এত সাংঘাতিক কে জানত! আমরা বলি খাতায় লেখাচ্ছি আর বনবাদাড়ে হাতড়ে মরছি, ওদিকে চোর বাছাধনরা ঘরের মধ্যে। ও শ্যামাদাস, ও হরিচরণ, ও বড়বউমা, মেজোবউমা, কোথা গেলে সব, দেখসে, কাণ্ড দেখে যাও!

মা জ্যেঠিমা তখুনি দুড়্‌দাড়্‌ করে ছুটে এলেন। পিসিমা কানের ফুল দুটোকে তুলে ধরে বার বার বলতে লাগলেন, ওমা এই-না আমার মানিকজোড়, এই-না আমার হারানিধি!

তার পর হঠাৎ এক হাতে নেপুর কান চেপে ধরে গর্জন করে উঠলেন, বল্‌ হতভাগা, কৌটো কোথায় রেখেছিস? ভালো চাস তো বল! উঃ, দেখে মনে হয় গাল টিপলে দুধ বেরুবে, এদিকে ভেতরে ভেতরে কালকেউটে!

কান ধরে ভীষণ এক নাড়া দিয়ে বললেন, দে শিগ্‌গির। নইলে আজ তোকে পুঁতেই ফেলব! এ-সব গয়না-পত্তরের জন্যে আমার পূজনীয় পিতৃদেব নরক ভুগছেন তা জানিস? ও কি আমি সহজে ছেড়ে দেব ভেবেছিস নাকি? বের কর বলছি—অ্যাঁক্‌!

ইতিমধ্যে জ্যেঠিমা হঠাৎ ছুটে এসে পিসিমার পিঠে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক কিল বসাতেই, যেই-না পিসিমা চমকে গিয়ে নেপুর কান ছেড়ে দিয়েছেন, অমনি নিমেষের মধ্যে সে তো হাওয়া।

আমি মাঝখানে পড়ে বার বার বলতে লাগলাম, ও জ্যেঠিমা, ও পিসিমা, আমার কথা শোনই না, নেপু ওগুলো নেয় নি, আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি!

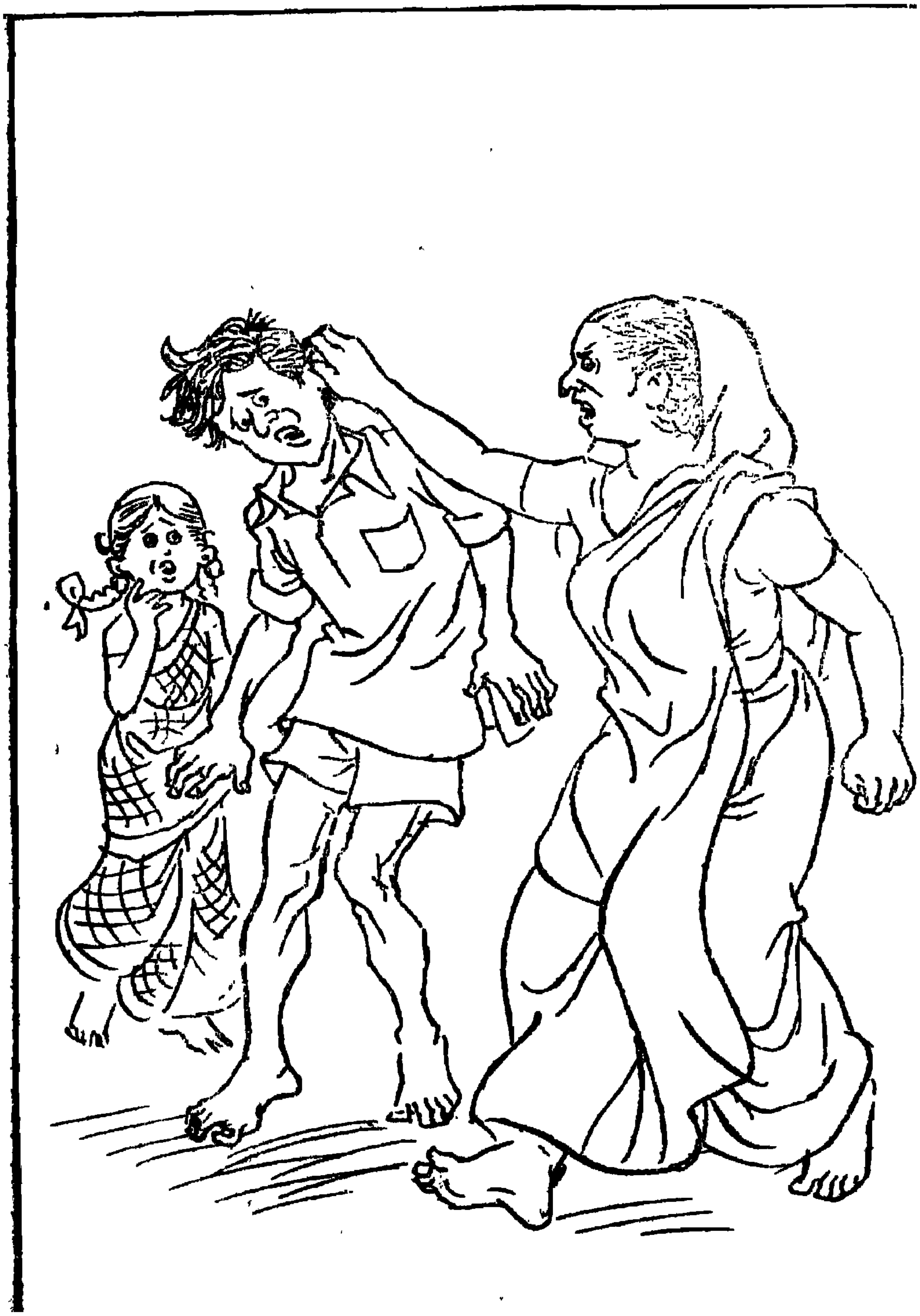

তার পর এক হাতে নেপুর কান চেপে ধরে গর্জন করে উঠলেন...

কিন্তু কে কার কথা শোনে। জগদীশদা বোধ করি পিসিমার সঙ্গেই এসেছিল, ব্যাপার দেখে কেমন ঘাবড়ে গিয়ে এতক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারছিল না। এবারে ঢোক গিলে বললে, আঃ, পিসিমা! তুমি তো আচ্ছা ফ্যাসাদ বাধালে দেখছি! শুটে থেকে নেপু পর্যন্ত সবাইকে সন্দেহ করলে কি করে চলে!

কি কষ্টেই যে শেষ অবধি পিসিমাকে ঠাণ্ডা করা হল সে আর কি বলব।

নেপু সেই যে কেটে পড়ল আর তার দেখা নেই। শেষপর্যন্ত আমাকে সারা দিনের সব ঘটনা খুলে বলতে হল। মা পিসিমার হাতে কতগুলো কচি কচি মটরশাকের গোছা গুঁজে দিতে দিতে বললেন, কি কি তোমার হারিয়েছে দিদি বুঝলাম না। এই শুনি কৌটো গেছে, আবার এখন বলছ সোনার গয়নাও গেছে, কি জানি!

পিসিমা মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসে বললেন, তবে কি আমি মিছে কথা বলছি নাকি, মেজোবউ? যার কৌটো গেছে তার কি গয়না যেতে নেই?

বলেই পিসিমার এমনি বুক ধড়্ ফড়্ শুরু হয়ে গেল যে তাঁকে ধরা-ধরি করে শোয়ানো হল আর শঙ্কর ছুটে গিয়ে ওঁদের বাড়ি থেকে গুরুদেবের চরণামৃত এনে দিল তবে না রক্ষে।

পাঁচ

সেকালে বড়দিনের বারো দিন করে ছুটি থাকত। একে একে তার প্রায় সবগুলিই কেটে গেল। সে যে কি ভীষণ শীত সে আর বলা যায় না। দূরে দূরে পাহাড়ের মাথায় সাদা সাদা বরফ জমে থাকতে লাগল। ঘুম থেকে উঠে রোজ দেখতুম হিম জমে বরফ হয়ে গিয়ে চার দিক সাদায় সাদা। ছোট-ছোট পাহাড়ে নদীগুলোর ওপর এক পরত বরফ খুদে-খুদে ঢেউসুদ্ধ জমে রয়েছে।

তার পর একটু রোদ উঠলেই সব বরফ গলে যেত। তখন শুধু ডালপালা থেকে টুপ্ টাপ্ জল পড়ত।

অন্য বছর এ সময় অনেকেই পাহাড় থেকে নেমে যেতেন। চার দিক নিঝুম হয়ে যেত। আমরা ক'ঘর বারোমেসে বাসিন্দারা এখানে

ওখানে টিম্‌টিম্‌ করে বেড়াতুম। বিকেল হতে না হতেই সন্ধে নেমে যেত, শীতের চোটে সবাই গিয়ে ঘরে উঠতুম।

এ বছর কিন্তু সবই আলাদা রকমের হল। শহর ছেড়ে যেতে কাকেও অনুমতি দেওয়া হল না, পাছে সেইসঙ্গে চোরাই মালও পাচার হয়ে যায়।

গাছের পাতা সব লাল হলুদ রঙ ধরে শেষটা খসে পড়ে গেছে। সবাই ছোট-ছোট গোল গোল লোহার আংটা কিনে তাতে কাঠ কয়লা জ্বেলে সকাল সন্ধে হাত-পা সেঁকে আরাম করতে চায়।

এ বছর আমাদের স্কুলের বোর্ডিং থেকে কেউ যাবার অনুমতি পায় নি। বাৎসরিক পরীক্ষাও হয়ে গেছে, নতুন বছরের পড়া শুরু হয় নি, কাজেই সবার হাতে দেদার অবসর। সেই সুযোগে এবার একটু আগে আগেই ইস্কুলের জন্মদিন করা হল।

খুব ফিস্টি হল, শহরসুদ্ধ সকলের প্রায় নেমন্তন্ন হল, মেলা চাঁদা তোলা হল। বাইরে বড় ঠাণ্ডা, সেখানে কানাৎ ফেলে উৎসব করলে সকলে শীতে কষ্ট পাবে। তাই আমাদের মস্ত হলঘরের স্টেজে 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' অভিনয় হল।

হলের ও-পাশ দিয়ে একটা সরু লম্বা ঢাকা বারান্দা। তার অন্য মাথায় সাজের ঘর। দামী দামী কাপড়-চোপড়ে ঠাসা রয়েছে।

সেকালে ওখানে আর পোশাক ভাড়া করার ব্যবস্থা ছিল না, তা ছাড়া ভাড়া করা পোশাক কেউ পরতও না। কাজেই যে যার বাড়ি থেকে ভালো ভালো সব গরদ, মাদ্রাজী, বেনারসী এনেছিল। অবিশ্যি গয়নাগাঁটি সব পেতলের আর কাঁচের। বাবা! ইন্দুদির ক্লাশের সেই ব্যাপারের পর থেকে কার বাড়ির লোকরা আর মেয়েদের হাতে গয়না দেবে।

মঞ্জিরা কেউ কেউ বড়মানুষি দেখিয়ে জড়োয়া গয়না আনতে চেয়েছিল, কিন্তু ইন্দুদি তাই নিয়ে খুব রাগারাগি করাতে আর আনে নি।

সারাদিন ধরে ধুমধাম চলল। বেলা এগারোটা থেকে খেলাধুলো। বিকেলে বাগানে বক্তৃতা। লাবণ্যদি একটা সাদা রেশমী শাড়ি পরে ইস্কুলের জীবনী পাঠ করলেন। পরীর মতো সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার পর চা, মিষ্টি, কমলালেবু খাওয়া হল। তখনকার দিনে জিনিস-পত্র সস্তা ছিল। পয়সা-পয়সা করে এই বড়-বড় কমলা পাওয়া যেত।

নেপুদের দলও গেছল। ওদের অপূর্বদা দেখলুম সেজেগুজে এসে,

গোঁফ নেড়ে নেড়ে লাবণ্যদির সঙ্গে ভারি ভদ্রতা করে এলেন। দেখেই আমার গা জ্বলে গেল। কানের ফুলের কথা এতদিনে পুলিশের ডায়রি পর্যন্ত হয়ে গেছে, তবু লজ্জা নেই। উল্টে ওঁর দলের লোকরা, অর্থাৎ নেপু ইত্যাদি বলে কিনা মেয়ে নইলে এত বোকা হয় কখনো, যে চুরি করবে এক জোড়া কানের ফুল, তার আবার একটা দুটো কোথায় পড়ে যাবে! আবার এসেছেন আমাদের ইস্কুলেই মুখ দেখাতে!

অভিনয় যেই-না শুরু হবার সময় কাছে এল, অমনি যে যেখানে ছিল সব হুড়্‌মুড়্‌ করে গিয়ে জায়গা দখল করল। যারা জায়গা পেল না, তারা দেয়াল ঘেঁষে সারি সারি দাঁড়িয়ে পড়ল।

সকলের পরনে গরম জামা থেকে কেমন একটা ভিজে কম্বলের মতো গন্ধ বেরুতে লাগল। ভিড় আরো বেশি হত, কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতেই দু-এক জনকে থেকে যেতে হয়েছে, পাহারা দেবার জন্যে।

সে যাই হোক গে, বিকেল থেকেই সাজঘরে মহা হৈচৈ শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু যেই-না অভিনয় আরম্ভ হবে, আমাদের গানের ওস্তাদ সেতারে একটু টুংটাং শব্দ তুলেছেন, অমনি সব ফাঁকা হয়ে গেল।

সবাই দৌড়ল রঙ্গমঞ্চের দিকে। উইংসের আড়াল থেকে, এদিক ওদিক থেকে কেউ স্টেজ দেখছে, কেউ ভিড় দেখছে।

সাজঘরে রইলেন আমাদের বোর্ডিং-এর বড় মাসিমা। ওঁর অভিনয় দেখবার এতটুকু আগ্রহ নেই। বলেন, কলকাতার বড়-বড় থিয়েটারে কত নামকরা অভিনেত্রীদের দেখে এসেছেন, এখন আবার এ-সব কি দেখবেন!

দিব্যি বড় একটা আরামকেদারায় বসে, মোড়ার ওপর পা দুটি উঠিয়ে নাকের ওপর চশমা লাগিয়ে, নাতনির জন্যে ক্রুশ দিয়ে লেস বুনতে লেগে গেলেন। ওদিকে কি হচ্ছে সে দেখবার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, মুখে গোটা দুই পান পুরে একমনে বুনছেন।

মিনিট দশেকও যায় নি, হঠাৎ মনে হল কে যেন তাঁকে একদৃষ্টে দেখছে। চমকে যেই-না মুখ তুলেছেন, অমনি টুপ্‌ করে ঘরের আলো নিভে গেছে।

চ্যাঁচাবার জন্যে হাঁ করেছেন, অমনি কে একটা নতুন গামছা মুখের মধ্যে ঠুসে দিয়ে, মাথার চার দিকে দুবার ঘুরিয়ে চেয়ারের পেছন দিকের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে দিয়েছে।

বড় মাসিমার হাত-পা তো পেটের ভেতর সেঁদিয়েছে!

পরে সবাই মিলে জেরা করতে বেরুল যে কেউ তাঁকে মারে নি, ছোঁয় নি। শুধু আলতো করে মুখ বেঁধে দিয়েছিল। পরে কে যেন গিঁটের ওপর একটু হাত দিতেই খসে পড়েছিল।

কিন্তু সে সময় বড় মাসিমার মনে হয়েছিল দারুণ ষণ্ডা একটা লোক হাতে নিশ্চয় ঘন লোম, আর ও-সব লোকের সঙ্গে যে দু দিকে ধার দেওয়া বেঁটে ছুরি নেই, তাই-বা কে বললে!

মনে হয়েছিল সে একাও নয়, সঙ্গে হাল্কা ওজনের কে একটা ঘরময় খুর্ খুর্ করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হয়তো একটি ছোট ছেলে। ডাকাতদের দলে নাকি ওরকম থাকে একটা, তার কোমরে দড়ি বেঁধে, ফোকর-ফাটল দিয়ে ভেতরে গলিয়ে দেওয়া হয়, আর তারাও নিঃশব্দে গেরস্তর যথাসর্বস্ব পাচার করে দেয়।

লোকগুলো নাকি বড় জোর ঘরে মিনিট পাঁচেক ছিল (তারই মধ্যে সব চেঁছেপুঁছে নিয়ে গেছে। একটু বাদেই মেয়েরা ড্রেস্ চেঞ্জ করতে এসে, বড় মাসিমাকে ঐ অবস্থায় দেখে যত-না অবাক হল, কাপড়-চোপড় সব লোপাট হয়ে গেছে দেখে হাঁউমাউ করল তার চেয়ে বেশি।

আমার বন্ধু অনু সেজেছিল লক্ষ্মী। ভাগ্যিস প্রথম থেকেই তার মার বিয়ের বেনারসীখানা পরা ছিল, নইলে সেটিও যেত। আর আমরা ছিলুম কিনিবিনির দলে, অত পোশাক-আশাকের দরকারই ছিল না আমাদের; ক্ষিরি যখন ঝি তখন আমরা ছেঁড়া চাদর জড়িয়ে, আর ক্ষিরি যখন রানী, তখন চাদর খুলে লাল নীল ঢাকাই কাপড়ে। কাজেই গেলুম বেঁচে।

কিন্তু মঞ্জি হয়েছিল ক্ষিরি। ওর বাবা সব চেয়ে বেশি চাঁদা দিয়েছিলেন, কাজেই আর কাকেও ক্ষিরি সাজানো যায় না। ওকে বারে বারে ড্রেস চেঞ্জ করতে হবে। পাছে কোনো গোলমাল হয়, তাই বোর্ডিং থেকে আলনা আনিয়ে, তাতে থাকে থাকে শাড়ি-জামা সাজিয়ে রেখেছিল। সে-সব হাওয়া!

মঞ্জির বাড়িসুদ্ধু সকলের সে কি চ্যাঁচামেচি!

পুলিশ এল। এসেই জগদীশদার পিসিমার কথায় গুটেকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিন্তু সেও যে কোথায় গিয়ে গা ঢাকা দিল, তার আর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না।

একটা নতুন গামছা মুখের মধ্যে ঠুসে দিয়ে মাথার চারি দিকে দুবার ঘুরিয়ে চেয়ারের পেছন দিকের সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে দিয়েছে।

সব চেয়ে দুঃখিত হলেন লাবণ্যদি। গেটের কাছে কাঁদো কাঁদো মুখে বলতে লাগলেন, সবই আমার বুদ্ধির দোষে হয়েছে। সাজঘরের কাছে আরো লোক রাখা উচিত ছিল।

সবাই মিলে, তখন তাকে নানাভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগল।

হল না অভিনয়, যে যার বাড়ি ফিরে গেল কিন্তু সে রাত্রে ঘুমোয় কার সাধ্যি। পুলিশের খাতায় সবার নাম উঠেছে, বাড়ি-বাড়ি সার্চ হচ্ছে।

জগদীশদা:দের বাড়ি যখন গেছে, পিসিমা তাদের বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।

আসল চোরকে ধরবার নামটি নেই। আবার প্যান্ট পরে বেল্ট এঁটে ভদ্দরলোকের বাড়ি গিয়ে গভীর রাতে হানা দাও ইত্যাদি!

জগদীশদা তো ভয়েই মরে, এই বুঝি পিসিমাকে ধরে নিয়ে যায়।

পরদিন বিকেলে বোর্ডিং-এর বড় মাসিমা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। জ্যেঠিমার সঙ্গে ভারি ভাব। এসেই বললেন, দিদি মনে যে কি দারুণ অশান্তি নিয়ে বেড়াচ্ছি সে আর কি বলব! সব কথা তো কাউকে বলি নি! ঐ লোকগুলো খুব মন্দ নয়। যাবার সময় আমার কোলে এই দশটা টাকা ফেলে দিয়ে গেছল। গরিব মানুষ, হাতছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না। নাতনিটার তো বিয়ে দিতে হবে।

এই বলে জ্যেঠিমার সামনে দশটা টাকা রাখলেন। সাধারণ টাকা নয়, যদিও সেকালের টাকা এমন কিছু খারাপ ছিল না, রুপো দিয়ে তৈরি, বেশ ভারীই ছিল। এগুলো তার চাইতে অনেক বড়, খুব পুরোনো, কালো হয়ে যাওয়া, ওপরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার ছাপ-মারা।

জ্যেঠিমা অবাক হয়ে বললেন, আরে এ তো যে-সে টাকা নয়। এ নিশ্চয় কারো জমানো টাকা হবে। এ সব তো আজকাল চলবে না। ওরা এ কোথায় পেল?

চলবে না শুনে বড় মাসিমার মুখ ফ্যাকাশে।

মা বললেন বাজারে না চললেও, ব্যাঙ্কে-ট্যাঙ্কে দিলে হয় তো এক টাকার জায়গায় পাঁচ টাকাই পাওয়া যাবে। এ-সব জিনিসের অনেক দাম। কোথায় পেল আমিও তাই ভাবি।

জগদীশদার পিসিমাও এসেছিলেন সেদিন, ঝুড়ি ঝুড়ি নালিশ নিয়ে। এতক্ষণ হাঁ হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ বলা-কওয়া নেই, লাফিয়ে

উঠে ঝড়ের মতো বেরিয়ে সোজা বাড়ির পথ ধরলেন।

পিসিমা চলে যেতেই, গোল-গোল চোখ করে বড় মাসিমা জ্যেঠিমাকে বললেন, তা দিদি, ওনাকে আপনারা নিজের লোক মনে করতে পারেন। কিন্তু উনিও কিছু কম যান না! বলুন তো, অত সোনাদানা পেলেন কোথায় যে আজ কৌটো হারায়, কাল কানের ফুল হারায়? বাবার দেওয়া না হাতি! সে বুড়োকে আমার বেশ মনে আছে! আট হাত কাপড় পরে সারা শীতকাল কাটিয়ে দিত, নিরামিষ খেত, গয়লাকে পয়সা দিত না। ওর ঘরে অত সোনাদানা কেমন করে আসবে গা?

মা ব্যস্ত হয়ে বললেন, না না, উনি বোধ হয় খুব কিপটে ছিলেন। গয়নাগাঁটি তুলে রাখতেন, খরচ-পত্র করতেন না।

বড় মাসিমা তবু বলতে লাগলেন, বুড়ো চোখ বুঁজলে পর কাউকে ভালো করে ফলার করালো না পর্যন্ত! কোত্থেকে ঐ জগদীশটাকে আনাল, শুনি নাকি ওর ভাইপো! কি জানি বাছা কে যে চোর আর কে যে সাধু বুঝি নে।

মা আরো ব্যস্ত হলেন, দেখুন ওঁরা সত্যি ভালো লোক। কাল যখন সাজঘরে অমন কাণ্ড হচ্ছিল, আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম জগদীশ আর তার পিসিমা, আমার সামনে বসে জায়গা নিয়ে মহা খ্যাঁচাখেঁচি করছে! বিশ্বাস করুন ওঁরা এর মধ্যে নেই।

বড় মাসিমা উঠে বলেন, যাই আমার আবার সন্ধেবেলায় ডিউটি আছে।

দরজা অবধি গিয়ে আবার ফিরে এলেন।

ভাই, এই সন্ধেবেলায় এখন আমার একাটি একাটি টাকাগুলো নিয়ে যেতে ভয় করছে, তুমি বরং রেখে দাও।

মা যেন ঘাবড়াচ্ছেন দেখে, আমিই বড় মাসিমার হাত থেকে টাকাগুলো নিয়ে আমার বইয়ের তাকে, বইয়ের পেছনে গুঁজে রেখে দিলাম।

বড় মাসিমা খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেলেন।

ছয়

এ-সব এতদিন আগের কথা যে ঘটনাগুলো কোনটা আগে কোনটা পরে ঠিক-ঠিক মনে নেই, তবে ঐ একটা গোটা বছর যে আমার জীবনের আর সব বছর থেকে একেবারে আলাদা এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই।

মনে আছে সে বছরটা খাওয়া-দাওয়া বেড়ানো-বুড়োনো এ-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। সকলের মুখে সর্বদা ঐ এক কথা, কে জানলায় লোহার শিক বসালে, কে লোহার সিন্দুক কিনল, সেটা কোথায় রাখা হল, কার গয়নাগাঁটি ব্যাঙ্কে জমা হল, কে সে-সব সেখানে পেঁৗছে দিল এই-সব।

নেপু বলত, বাঃ, চোরদের তো ভারি সুবিধে হয়ে গেছে, একটু কানখাড়া করে থাকলেই হল, সব খবর পেয়ে যাবে। কার কার কুকুর আছে, তাদের মধ্যে কারা কামড়ায়? কার ঘরে বন্দুক আছে, কে কে সে-সব ছুঁড়তে জানে—কিছুই কারো জানতে বাকি থাকল না।

ঐ ঘটনার পর যেই পিসিমা সন্ধেবেলায় আলোয়ান মুড়ি দিয়ে আমাদের বারান্দায় উঠেছেন, মা আর জ্যেঠিমা ওঁকে জেরা করতে লেগে গেলেন। ততক্ষণে পিসিমারও রাগ পড়ে গেছে, অনেক কথার উত্তর দিলেন। সবাই সে শুনতে এমনি মেতে গেল, যে মাছওয়ালী বুড়ি এক চুবড়ি বিকেলে ধরা পাহাড়ে কইমাছ নিয়ে এসে ডেকে ডেকে, সাড়া না পেয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। ভাগ্যিস আমি বুদ্ধি করে জ্যাঠামশাইকে বললুম, না হলে সেদিন মাছ খাওয়া হয়েছিল আর কি।

পিসিমারা তো গিয়ে জ্যেঠিমার শোবার ঘরে ঢুকলেন। আমিও একটু পরে সেখানে গিয়ে শুনি মা বলছেন. যাই বল ঠাকুরঝি, ঐ বুড়োর নাতি-নাতনিরা কে কোথায় আছে খোঁজ করা উচিত।

জ্যেঠিমা বললেন, আর তাই যদি হয় যে সোনার নস্যির কৌটো উদ্ধার করা ওদের উদ্দেশ্য, তবে সে তো হয়েই গেছে, তবু চুরি থামে না কেন?

পিসিমা জ্যেঠিমার খাটের ওপর পা গুটিয়ে বসে বললেন, তোরা কিছুই জানিস না নাকি? জুয়ো খেলায় আর চুরি করাতে, যতই সফল

হওয়া যায় ততই নেশা লেগে যায়।

মা'রা চুপ করে থাকছেন দেখে আবার বললেন, তা হলে তোদের সত্যি কথাটাই খুলে বলি। তোরা যেন আবার পাঁচ কান করিস নে।

কৌটো নাহয় চুরি গেছে, কিন্তু তার ঢাকনিটা আছে তো? এই এত বড় হীরের প্রজাপতি বসানো ঢাকনিটাই তো আসল। সেটি তো আর ওরা পায় নি। আমার তো মনে হয় সেটি উদ্ধারের চেষ্টা চলছে, এ আর কিছু নয়।

মা অবাক হয়ে বললেন, সেটি বুঝি ব্যাঙ্কে পাঠাও নি? পিসিমাকে যেন বিরক্ত মনে হল।

আরে তবে বলছি কি, খুঁজে পেলে তো পাঠাব। সে যে কোথায় রেখেছি সে আর কিছুতেই মনে করতে পাচ্ছি নে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, চোররা পাবে কি, আমিই পাচ্ছি না!

জ্যেঠিমা বললেন, এই যদি ব্যাপার হয় তো গুটেকে সন্দেহ করা কেন?

মাও আর থাকতে না পেরে আসল কথাটাই বলে বসলেন—

আর পরশু বোর্ডিং-এর মাসিমার টাকাগুলো দেখে অমন করে চলে গেলে কেন?

পিসিমা অমনি টুক্ করে খাট থেকে নেমে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললেন, ওমা, তোদের বাগানে এই শীতের মধ্যে ও আবার কিসের চারা গজিয়েছে রে? যাই, একবার দেখেই আসি।

এই বলে বাগান দেখার নাম করে সেখান থেকে দে পিট্টান।

জ্যেঠিমারা বোধ হয় খুব রেগে গেলেন, তাই এতক্ষণ কিছু বলেন নি, এবার হঠাৎ আমার দিকে ফিরে খুব ধমকধামক করতে লাগলেন, এইটুকু মেয়ে, তবু বড়দের কথা শোনা, হেনা-তেনা কত কি!

আরেকটু রাত হলে জগদীশদা এসে নিচু গলায় বললে, ও মামিমা, তোমরা কি একটা খুব ভালো চাকর রাখতে চাও? দশ টাকা মাইনে, দুবেলা পেট ভরে ভাত, দুবেলা চা জলখাবার, বছরে চারখানি কাপড়, ব্যস্।

জ্যেঠিমা বললেন, ঠাকুর ছুটি চাইছে, লোক অবিশ্যি আমাদের সত্যি দরকার, কিন্তু অত চায় কেন?

জগদীশদা কপালে চোখ তুলে বললে অত মানে কি ? তার বদলে কি পাচ্ছ জানো ? সাক্ষাৎ একটি দ্রৌপদী। ওর রান্না যদি একবার খাও তো সারা জীবন হা হুতোশ করে মরবে। চপ কাটলেট রাঁধে তো দাঁতের মধ্যে কুর্‌কুর্‌ করে ওঠে, আবার মুখে যেতেই মিলিয়ে যায়।

মাংস রাঁধে যেন ক্ষীর। আর পায়েস পিঠে বাঙালী হয়ে জন্মানোর দুঃখ ভুলিয়ে দেয়। রাখো তো বলো, গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, ডেকে আনি। খুব ভালো লোক, খুব চেনা আমার।

জ্যেঠিমা বললেন, তা রাখলে মন্দ হয় না, ঠাকুর তো পাস পার্মিট করিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে রয়েছে। তার দুমাস মানেই সাত মাস। কই তাকে আন তো দেখি।

জগদীশদা এক দৌড়ে গিয়ে একমুখ দাড়ি-গোঁফওয়ালা একটা লোককে ধরে নিয়ে এল।

আমার জ্যেঠিমা উঠে এসে লণ্ঠনটা তুলে ধরে মুখ দেখতে লাগলেন। চোখে আলো পড়াতে সে লোকটা চোখ পিট্‌পিট্‌ করতে লাগল।

আমি অবাক হয়ে বললুম, ইয়াকি পেয়েছ, জগদীশদা ? এই তোমাদের সেই চোরের সর্দার গুটে না ?

জ্যেঠিমা চমকে উঠে আরেকটু হলেই লণ্ঠনটা ফেলে দিচ্ছিলেন। জগদীশদা আমাকে এক ধমক, তুই থাম দিকিনি। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা!

গুটেও বিরক্ত হয়ে বলল, অত তেজ কিসের তোমার, দিদি ? জানো আমি ম্যাট্রিক পাশ ? গোয়েন্দাগিরির সার্টিফিকেট আছে আমার। ট্যাক্স দিই।

জ্যেঠিমা বাধা দিলেন, আচ্ছা, আচ্ছা ঢের হয়েছে, করবে তো রাঁধুনিগিরি, তা অত সার্টিফিকেট দিয়ে কি হবে ? দেখ, তোমাকে আমি রাখতে পারি ঐ মাইনেতে, কিন্তু তা হলে তুমি খালি মন দিয়ে রাঁধাবাড়া করবে। গোয়েন্দাগিরি যা করবার আমরা করব, আমাদের সার্টিফিকেট না থাকতে পারে, কিন্তু খাতায় নাম লেখা আছে।

বুঝলে বাবুরা বাজার করে দেবে, আমি দুবেলার ভাঁড়ার বের করে দেব, মেজোবউ কুটনো কুটে দেবে, আর তুমি কি রাঁধাবাড়া হবে সব নিজে ঠিক করে, মসলা বেটে, দুবেলা রাঁধবে, ব্যস্‌। তোমার পেছনে আমরা ম্যাও ধরে বেড়াতে পারব না বলে রাখলাম। এবার একটু তদন্ত করবার

তা হলে ফুরসত পাব।

গুটে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে, গোয়েন্দাগিরিটাই হল গিয়ে আমার পেশা, মা-ঠাকরুন, সেটাই ছেড়ে দিলে যে একেবারে রাঁধুনে বামুন বনে যাব।

জ্যেঠিমা আশ্চর্য হয়ে বললেন, মাইনে নিয়ে, দুবেলা পেটপুজো করে, লোকের বাড়ি রান্নার কাজ করবে আর রাঁধুনে বনবে না, সেটা কি করে হয় বাছা? আমার কথা ভালো না লাগে তো অন্য জায়গায় চেষ্টা করতে পার। তবে পুলিশে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেটা মনে রেখো।

গুটে একটু রেগে গেল, যা হয় একটা বললেই হল কিনা মা-ঠাকরুন! পিসিমার কথায় পুলিশে যদি আমাকে ধরে তো ক্ষতি হবে কার?

গুটে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ততক্ষণে জগদীশদা গিয়ে বাবা আর জ্যাঠামশাইকে ধরে এনেছে। তাঁরাও চপ-কাটলেট-মুর্গ-মশল্লমের নাম শুনে ছুটতে ছুটতে এসে হাজির।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, গুটেকে রাখা হোক। জগদীশ ওকে কদিন খাটের তলায় লুকিয়ে রাখতে পারে? না হে গুটে, তুমি এখন থেকেই কাজে বহাল হলে। বাপ্! পনেরো বচ্ছর ধরে রোজ দুবেলা শাক-চচ্চড়ি আর মাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে খাওয়ায় ঘেন্না ধরে গেছে না! তা, কাল সকালে কি রাঁধছ বল?

এই নিয়ে মহা একটা সোরগোল হয়েছিল। শেষ অবধি জ্যাঠামশাই বললেন যে, আমাদের বাড়ির মধ্যে গুটে গোয়েন্দাগিরি করবে না। কিন্তু রোজ সন্ধে সাড়ে সাতটার মধ্যে রাঁধাবাড়া সেরে চাকাচুকি দিয়ে চলে যাবে। আবার সাড়ে দশটায় জ্যাঠামশাই শুতে যান, তার মধ্যে ফিরে আসা চাই। তাই শুনে গুটে মহা ক্যাঁওম্যাও লাগাল, ও বাবা! রাতে আমি বেরুতে পারব না, আমার ভূতের ভয় করে!

জ্যেঠিমা দারুণ চটে গেলেন, নবাব! চাকরের কাজ করবেন, তাঁর আবার ভূতের ভয়! ও-সব বড়মানুষি এখানে চলবে না বলে রাখলুম!

কিন্তু যে যাই বলুক মুর্গ-মশল্লমের কথা শুনে অবধি, বাবা জ্যাঠামশাই গুটেকে ছাড়তে রাজি নন। বাবা বললেন, বেশ, তা হলে রোজ বেলা এগারোটার মধ্যে রান্না সেরে বেরিয়ে যাবে, চারটের সময় ফিরে চায়ের জল চাপাবে।

বলেই বাবা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, হ্যাঁ রে, দিনে বেরুলে তোকে পুলিশে ধরবে না?

গুটে সলজ্জ হেসে বললে, না স্যার, আমি লেডি সেজে থাকব। এর মধ্যে দুদিন ওরকম সেজে ইন্সপেক্টর বাবুর বাড়ি গিয়ে লেবু বেচে ওনাদের পরখ করে এসেছি। তবে আপনারা কিন্তু আমাকে শশীকলা বলে ডাকবেন। তাতে কোনো দোষ হবে না। শশীকলা হল গিয়ে আমার স্ত্রীর নাম, সে দেশে থাকে, জানতেও পারবে না। আপনাদের কোনো ভয় নেই, কাল সকালের মধ্যে দাড়ি চেঁচে শাড়ি পরে কেমন কাজে লেগে যাই দেখবেন।

যাবার আগে জগদীশদা বাবাকে বলল, দেখবেন মামা, ওটি একটি রত্ন। আপনার ঠাকুর ফিরে এলেও ওকে আপনার ছাড়তে ইচ্ছে করবে না। তখন কিন্তু আমার কাছে ফিরে দিতে হবে বলে রাখলাম। ততদিনে আশা করছি এদিককার গোলযোগ চুকেবুকে যাবে।

গুটে কিন্তু খুব আপত্তি করতে লাগল, ও আবার কি কথা, স্যার? গোলযোগ চুকে গেলেও আমাকে এরকম চাকরি করতে হবে নাকি? আমি হলাম গিয়ে গোয়েন্দা, অন্য কোথাও তদন্ত করতে চলে যাব।

জগদীশদা বিরক্ত হয়ে বললে, রাখো! তোমার তদন্তের চাইতে তোমার রান্না শতগুণে ভালো।

তার পর বাবাকে বললে, মামা, বড় উপকার করলেন, তার পুরস্কার হাতে হাতে ঐ গুটের হাতেই পেয়ে যাবেন রোজ দুবেলা।

সাত

এমনি করে শশীকলাদিদি আমাদের বাড়িতে এসে জুটলেন। মা-বাবা, জ্যাঠামশাই, জ্যেঠিমা, জগদীশদাদা আর আমি ছাড়া কেউ আসল ব্যাপারটা জানল না, নেপুও না। ওকে বলা মানেই অপূর্বদাকে বলা, তার মানেই খবরের কাগজে ছেপে দেওয়া।

তবে এ কথা সত্যি শশীকলাদিদি খাসা রাঁধে। প্রথম দিনটা মা জ্যেঠিমা একটু খেঁইমেই করছিলেন, বড্ড ঘি খরচ করে, ওঁরা রান্নাঘরে গেলে তেড়িয়া হয়ে ওঠে ইত্যাদি। কিন্তু একবার রান্না খেয়ে আর টুঁ শব্দটি করলেন না। একমনে এর ওর বাক্স সার্চ করতে লাগলেন।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। আমাদের সকলের ইস্কুল-টিস্কুল কবে খুলে গেল, নতুন বছরের পড়াশুনো শুরু হয়ে গেল, গোছা গোছা সব নতুন বই খাতা এল। কি সুন্দর যে তাদের গন্ধ, নাক লাগিয়ে পড়ে থাকতে ইচ্ছে করত।

নেপু দিস্তে দিস্তে হলদে কাগজ কিনে এনে, এক ভাঁড় ময়দার লেই বানিয়ে খাতায় মলাট দিতে লেগে গেল। অথচ পড়াশুনো করবে কচু!

চুরি-টুরি গুলোও কমতে কমতে একরকম বন্ধই হয়ে গেল। যাদের ধরা হয়েছিল, তাদের অনেকের বিরুদ্ধেই কোনোরকম প্রমাণ না পাওয়াতে বেশির ভাগই ছাড়া পেয়ে গেল। দেখলুম দিব্যি চেকনাই শরীর করে সব দলে দলে বেরিয়ে এলেন।

বিকেলে জগদীশদার পিসিমা আমাদের বাড়িতে এলেন।

দ্যাখ দিকিনি কাণ্ডটা! গুরুদেব সেখান থেকে আধখানা হয়ে এলেন, তবু তাঁর কাছে সব কথা খুলেই বলে ফেললাম। শুনে বললেন কৌটো গেছে আবার পাওয়া যাবে, কিন্তু হীরের প্রজাপতি দেয়া ঢাকনিটে হাত-ছাড়া করার কোনো মানেই হয় না, উটি ওঁর চরণে জিম্মা করে দিলে আর কারো বাবার সাধ্যি থাকবে না খুঁজে বের করে।

কিন্তু সে যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছি কিছুতেই মনে করতে পাচ্ছি নে। গোটা বাড়িটাকে ওলটপালট করে ফেললাম, তবু পেলাম না! কি করা যায় বল দিকিনি? ওটি এখন চুরি গেলেও তো টের পাব না! গুটেকে কেন যে তাড়ালাম। সে থাকলে ছোঁক্‌ছোঁক্ করে ঠিক বের করে দিত!

মা জ্যেঠিমা এ ওর মুখের দিকে তাকালেন, মা একটু আমতা আমতা করে অন্য কথা পাড়লেন, আচ্ছা ঠাকুরঝি, সেদিন মাসিমার হাতে পুরোনো টাকা দেখে অমন করে ছুটে চলে গেলে কেন, সে তো বললে না?

পিসিমা দু চোখ কপালে তুলে বললেন, ওমা বলি নি বুঝি? দ্যাখ দিকি কাণ্ড। তবে শোন, আমার বাবা চোখ বুজলে, শ্রাদ্ধশান্তির আগের দিন, ওঁর খাটের তলা থেকে বিরাট এক লোহার ট্রাঙ্ক বেরুল, এমন ভারী যে একা আমি সহজে নাড়াতে পারি নে!

একদম কানায় কানায় এই বড়-বড় ভারী ভারী রুপোর টাকায় ঠাসা, একেবারে অবিকল বোর্ডিং-এর মাসিমার ঐ টাকার মতন! তখন

আর সময় ছিল না, কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে, এক মুঠো তুলে ভালো করে দেখবার জন্যে আঁচলে বেঁধে ফেলে বাকি আবার বন্ধ করে ফেললাম। সে কি বন্ধ হয়! বাক্সের ডালায় চেপে বসে তবে বন্ধ করতে হল! অথচ শ্রাদ্ধশান্তির পর ডালা খুলে দেখা গেল কেবল ছেঁড়া কাগজ আর পুরোনো বই দিয়ে ঠাসা!

জ্যেঠিমা বললেন, ওমা! অত সব নিলে কে?

পিসিমা প্রায় কেঁদেই ফেলেন, কে নিল বুঝবে কে? এমন-কি, যখন টাকার কথা বললাম, কেউ বিশ্বাসই করে না। বলে, হ্যাঁ, এর বাড়ি ওর বাড়ি খেয়ে বেড়াত, ওর আবার অত টাকা আসবে কোত্থেকে?

পিসিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। মা বললেন, তার পর মাসিমার হাতে ও টাকা দেখে বুঝি ভাবলে যে তোমার গুলোই কেউ সরিয়েছে? বাড়ি গিয়ে কি দেখলে?

পিসিমা বললেন, দেখলাম, আমার পঁচিশটে টাকা ঠিকই আছে। অথচ এগুলোও সেইরকমই দেখতে বটে! কি জানি, কত কি মনে হচ্ছে!

শশীকলাদিদি এতক্ষণ দোরগোড়া থেকে সব শুনছিল, কেউ টের পায় নি। এবার একটা ছোট নোটবই আর কপিং পেনসিল বের করে বলে উঠল, আচ্ছা আপনার বাবা মারা যাবার সময় বাড়িতে কে কে ছিল?

পিসিমা বললেন, তোমার তাতে কি বাছা? তবে বলতে কোনো বাধা নেই, বাড়িতে ছিল না বিশেষ কেউ, বুড়ো কি আর কাকেও চটাতে বাকি রেখেছিল! ছিলাম আমি, আর জগদীশের বাবা ঘেঁটু আর আমার অধরদা, তার মেয়ে রেবতী আর আমাদের চাকর রামভজন। তাদের কাকেও সন্দেহ করা যায় না, পুরোনো লোক, নিকট-আত্মীয়, বিশ-পঁচিশ বছরের সব জানা। তা ছাড়া তাদের বাক্স-প্যাঁটরা খুলিয়ে নিজে দেখেছিলাম, তাইতেই তো সকলের সঙ্গে চিরকালের ছাড়াছাড়ি!—ও কি শশীকলা, আমার সব কথা টুকে রাখছ কেন? না মেজোবউ, বড়বউ, এ আমি ভালো বুঝি নে!

শশীকলাদিদি লজ্জা পেয়ে বললে, না, মানে, বাবু আমাদের সবাকার নাম লিখিয়েছেন কিনা, তাই সময় পেলেই একটু চেষ্টা-চরিত্তির করি।

জ্যেঠিমা শুকনো গলায় বললেন, সময় কোথায় পেলে বাছা?

শশীকলাদিদি আর দাঁড়াল না।

পিসিমা চলে গেলে পর জ্যেঠিমা রান্নাঘরে গিয়ে শশীকলাদিদিকে আচ্ছা করে বকে দিলেন।

মেয়েমানুষের অত কি বাপু? বলেছি না টিকটিকির কাজ আমরা করব, তুমি রাঁধাবাড়া নিয়ে থাকবে। বেলা এগারোটা থেকে চারটে অবধি বাড়ির বাইরে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো, তার ওপর আমাদের হাত নেই—কিন্তু এখন তুমি আমাদের রাঁধুনী—দাও শিগ্‌গির খাতা।

বলে খাতাখানা টেনে নেন আর কি! শশীদিদিও কিছুতেই দেবে না, উল্টে মহা হাঁউমাউ লাগাল! তাই শুনে বাবা জ্যাঠামশাই ছুটে এলেন, আহা, কর কি, কর কি, এদ্দিন বাদে চাট্টি ভালোমন্দ খেয়ে বাঁচছি, তা তুমি দেখছি সব পণ্ড করে দেবে! না, না, তোমার খাতা দিতে হবে না, এখন যাও দিকিনি রান্নাঘরের দিকে, আপ্‌গানি কাটলেট করবে বলেছিলে না?

বাস্তবিক শশীকলাদিদির সে রান্নার স্বাদ আজও আমার মুখে লেগে রয়েছে। কাজেই নেপু, আমি, বড়দা ইত্যাদি সবাই ওর ওপর মহাখুশি ছিলাম।

সন্ধেবেলা পড়ার ঘরে অঙ্ক কষছি, এমন সময় শশীকলাদি এসে হাজির!

ও দিদি, বলই-না সে টাকা দেখেছিলে নাকি?

আমি নেপুর দিকে তাকিয়ে বললাম, কোন টাকা?

সে বললে—ঐ যে বুড়ো মলে পর বাক্স থেকে উধাও হল, তার পর বোর্ডিং-এর বড় মাসিমা ঠিক সেইরকম দেখতে টাকা তোমার কাছে রাখতে দিলেন? দেখি না একবারটি।

নেপু রেগে গেল, আঃ শশীকলাদি, তুমি দেখছি আমাকে কাল বকুনি খাওয়াবে। এমনিতেই অঙ্ক হয় না!

সে চলে গেলে আমাকে জিগ্‌গেস করল, কোন টাকা রে?

আমি বললুম, হ্যাঁ, সে আমি তোমায় বলি আর তুমি গিয়ে কাপ্তান অপূর্বর কাছে লাগাও আর কি!

নেপু অঙ্ক-টঙ্কর কথা ভুলে গেল।

অপূর্বদার বিষয় তুই কি জানিস শুনি? জানিস ইন্টার-কলিজিয়েট সাঁতারের জন্যে উনি মেডেল পেয়েছিলেন? তা ছাড়া ভাগ্যিস ওঁর দল রাতে পাড়ায় পাড়ায় টহল দেয়, তাই চোরবাছাধনরা আর টুঁ শব্দটি

করতে পারছেন না।

বললুম, রেখে দাও! ওঁর নাকের সামনে আমাদের ইস্কুলে অমন ক্লান্ত হয়ে গেল, ভারি আমার ওস্তাদ রে!

নেপু তাই শুনে একটু মুচকি হেসে বললে, সে বিষয়ও কিছু এগোয় নি ভেবেছিস নাকি তোরা? শিগ্‌গির একদিন সব চোখ ট্যারা হয়ে যাবে দেখবি!

এমনি সময় শশীকলাদিদি দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, গরম গরম চপ ভেজেছি, খাবে নাকি দু-একটা?

এর পর তো আর কোনো কথাই হতে পারে না।

ও-সব ছোট্ট জায়গায় সেকালে কারো ঘরের কথা কারো জানতে বাকি থাকত না। দুদিনেই এ কথা জানাজানি হয়ে গেল যে জগদীশদার সঙ্গে অপূর্বদার কিছু নিয়ে মন কষাকষি চলেছে।

সত্যি আগে দেখতুম দুজনায় ভারি ভাব, কিন্তু আজকাল দেখা হলেই আমাদের কাছে জগদীশদা অপূর্বদার খুব নিন্দে-মান্দা করতে শুরু করত। প্রথমটা বেশ মজা লাগত।

পরে নেপুকে গিয়ে বলতুম আর সে তো রেগে টং!

ঐ স্টুপিডটাকে এ বাড়িতে আসতে দিস কেন রে? যার নিজের পকেট থেকে নিজেদের সোনার কৌটো চুরি যায়, অথচ নিজে টের পায় না, সে আবার একটা মানুষ নাকি? অপূর্বদার সঙ্গে ও ব্যাটার তুলনা কিসে আর কিসে, সোনায় আর সীসেয়! কই অপূর্বদা তো জগদীশদার বিষয় কিছু বলতে আসেন না!

শশীকলাদিদি যে কখন এসে আমাদের পেছনে দাঁড়িয়েছে সে আমরা টের পাই নি। সে বললে, তা সে বলবে কেন? একটা ধম্ম আছে তো? জগদীশবাবুর কাছে রাশি রাশি ঘুষ খেয়েছে না!

নেপু বললে, কি আবার ঘুষ খেয়েছে?

শশীকলাদিদি জিভ কেটে বললে, না, না, ও কিছু না, বলে তাড়াতাড়ি সরে পড়ল।

এবার আর মাসিমার ঐ টাকাগুলোর কথা নেপুকে না বলে পারলাম না। নেপু তো হাঁ!

কই, দেখা তো টাকাগুলো।

আস্তে আস্তে বইয়ের তাকের কাছে গিয়ে দেখি তাক তোলপাড় করে

কে খোজাখুঁজি করেছে।

নেপু বললে, সর্বনাশ। তবে তো সেগুলোও গেছে! না হেসে পারলাম না। তাকের তলা থেকে আমার পুরোনো জুতোটা টেনে বের করে, তার মধ্যে থেকে টাকা বের করে নেপুকে দেখালাম।

নেপু ওগুলোকে নেড়েচেড়ে বললে, এখন এর একেকটার দাম হয়তো পঁচিশ টাকা। সাধে মাসিমা কাছে রাখতে ভয় পান। দে আমাকে, অপূর্বদার কাছে রেখে দিই, কারো বাবাঠাকুর টেরটি পাবে না!

দিলাম না কিছুতেই।

ওদিকে জগদীশদাদের বাড়িতেও মহা গোলমাল। পিসিমার গুরু-দেব কায়েমী হয়ে বসেছেন। এমনিতে পিসিমার মুখের ওপর কিছু বলতে জগদীশদা সাহস পায় না, এবার কিন্তু দারুণ একচোট ঝগড়া হয়ে গেল। জগদীশদা বললে, দ্যাখ, তোমার গুরুদেবকে এবার কাশীবাসী হতে বলো, নইলে ভালো হবে না। একবার শ্রীঘর ঘুরে তো যথেষ্ট চেঞ্জ হয়েছে, আবার এখানে কেন? তা ছাড়া সন্নিসি মানুষের অত কি রে বাবা! রোজ রোজ গাওয়া ঘি, খ্যাসরাপাতি চালের ভাত, ছানার বড়া! কই আমাকে তো এর সিকির সিকিও দাও না! অথচ খালি খালি বল, টাকা দাও টাকা দাও। বলি, তোমার গুরুদেবকে পুষবার জন্যে তো আর আমি আপিসে চাকরি করি না!

পিসিমাও রুখে উঠলেন, ওরে হতভাগা! গুরুদেব শিবের মাথায় বেলপাতা দিলেন, তবে না চাকরি পেলি! আবার বড়াই! যা আছে তোর সবই তো গুরুদেবের দয়াতে।

জগদীশদা বললে, ইস্, তা তো বটেই! এই বাড়ি আমার ঠাকুরদা দেন নি আমাকে? গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি সবই আমার হত, তুমি যদি মাঝখান থেকে সেগুলো মেরে না দিতে! যাক গে, ওকে এখন ভালোয় ভালোয় কেটে পড়তে বল দিকিনি।

চ্যাঁচামেচি শুনে গুরুদেবও এসে হাজির! রাগের চোটে মুখের রং পাকা আম, চুল-দাড়ি খাড়া। চেঁচিয়ে বললেন, তাই কেটিয়ে যাবে রে। তখন তোর কি অবস্থা হয় দেখিয়ে দিব। দে বেটি, কৌটোর সে পুতুলটো দে, লিয়ে যাই।

পিসিমা গুরুদেবের পায়ে পড়ে বললেন, আর দুটো দিন সময় দেবেন ঠাকুর, কোথাও খুঁজে পাচ্ছি নে যে।

চ্যাঁচামেচি শুনে গুরুদেবও এসে হাজির। রাগের চোটে মুখের রং পাকা আম, চুল দাড়ি খাড়া

জগদীশদা তো থ !

খবরদার পিসিমা, বুড়োকে এ বাড়ি থেকে কোনো জিনিস দিতে পারবে না !

পরে পিসিমা জ্যেঠিমাকে বলেছিলেন যে জগদীশদার যে আবার এত তেজ এ তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। বললেন, কি বলব তোদের, ওকে দেখে নেকড়ে বাঘের কথা মনে হচ্ছিল। গুরুদেব বেচারা আর কথাটি না বলে, পোঁটলা-পুঁটলি বেঁধে রওনা ! একটু টিপিন পর্যন্ত দিতে পারলাম না ; মাঝের ঘরে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে জগদীশ বললে, একটা সটির দানা পর্যন্ত দেবে না ! উঃ ! রাঁধি নি, খাই নি, পেট জ্বলে গেল ! ফলপাকুড় কিছু থাকে তো দে !

মা সন্দেশ আর পাকা কলা এনে দিয়ে বললেন, জগদীশ কি খেল ?

পিসিমা বললেন, ও ব্যাটার কথা আর বলিস না। প্রফুল্ল কেবিন থেকে একরাশ গিলে এল। ভাবছি আজ তোদের এখানেই শোব !

আট

সত্যি সত্যি রাতটা পিসিমা থেকে গেলেন। শুলেন আবার আমার খাটে। সারারাত ঘুমুব কি ? খালি খালি ঠাণ্ডা খড়্‌খড়ে পা দুটো আমার লেপের মধ্যে গুঁজে দিয়ে গরম করতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ কড়াৎ করে ছিটকিনি খোলার শব্দ শুনে উঠে বসলাম। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি শশীকলাদিদি, টর্চ হাতে নিয়ে, রান্নাঘরের দোরে তালা লাগিয়ে খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বিছানায় ফিরে এসে কাউকে কথাটা জানাব কি না ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে রোজকার মতন শশীকলাদিদিকে ঘোমটা মাথায় ডিম রুটি পরিবেশন করতে দেখে জিগ্‌গেস করলাম, শশীদিদি কাল রাতে কোথায় গেছলে ?

শশীকলাদিদি এমনি চমকে উঠল যে ঘোমটা খসে গেল, তখুনি সেটাকে

টেনে দিয়ে বললে, রাত দুপুরে আবার যাব কোথায় ?

বললাম, কেন, পল্টু দেখলাম রান্নাঘরে তালা দিয়ে বেরুলে।

শশীকলাদিদি দারুণ চটে গেল, না বাপু! বাড়ির ছেলেপুলেরাও পেছনে লাগলে তো আর পারা যায় না! তা হলে তো কাজ করা দায় হয়ে ওঠে!

অমনি বাবা, জ্যাঠামশাই, নেপু, বড়দা সবাই আমাকে তাড়া!

খবরদার, ওর পেছনে লাগবে না বলছি! না, না, ও ছেলেমানুষ কি দেখতে কি দেখেছে, ওর কথায় কান দিয়ো না।

তার পর শশীকলাদিদির দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে নেপু জিগ্‌গেস করলে, ওকি? মুখে কাপড় জড়িয়েছ কেন? দাঁতব্যথা নাকি?

শশীকলাদিদিও অমনি ঘাড় নেড়ে বললে যে, হ্যাঁ, ভীষণ দাঁত কন্‌কন্!

আমি তো হেসে বাঁচি নে, কারণ—ঘোমটা খোলার সময় পল্টু দেখেছিলাম শশীদিদির গালে চড় খাওয়ার পাঁচ আঙুলের দাগ।

চা খাবার পর পিসিমাকে বাড়ি পৌঁছতে গিয়ে জ্যেঠিমা আর আমি অবাক!

দরজা-জানলা সব হাট করে খোলা। জিনিসপত্র তচ্‌নচ্! দেয়ালের ছবি ওলটানো, আলমারির বই মাটিতে, তোশক বালিশ ফালা ফালা। ভাঁড়ারের তালা ভাঙা, শিশি বোতল, বাক্স ভাঁড় সব নীচে। বাড়িতে জনমানুষের সাড়া নেই।

এতক্ষণ বাদে পিসিমা ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন।

ওরে জগদীশ ওরে লক্ষ্মীছাড়া, গুরুদেবকে অশ্রদ্ধা করেছিলি বলেই না তোর এ দশা হল! ভাঁড়ারের এই অবস্থা আর তুই কি আর আছিস রে!

কিছুতেই থামেন না। জ্যেঠিমা পিঠ থাবড়াতে লাগলেন। আমি একটা পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া করতে লাগলাম। কিন্তু পিসিমা সমানে চ্যাঁচাতে লাগলেন, ওরে হতভাগা! তুই মলে আমার প্রজাপতি কে খুঁজে দেবে বল্!

ঠিক সেই সময় সামনের স্নানের ঘরের দরজা খুলে, উস্কোখুস্কো চুল আর লাল টক্‌টকে চোখ নিয়ে জগদীশদা বেরুল। জামা কাপড়

ছেঁড়া, গা-ময় কালসিটে আর আঁচড়কামড়। ভাঙা গলায় বললে, থামো দিকিনি।

পিসিমাও অমনি হাত-পা এলিয়ে ভিমি!

সেই সময় লাবণ্যদি আর লতিকাদি এসে না পড়লে কি মুশকিলেই যে পড়া যেত। জগদীশদা ওঁদের দেখে এক দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে ছিটকিনি।

শেষটা লাবণ্যদিরা ধরাধরি করে পিসিমাকে খাটে শুইয়ে মাথায় ঘড়া ঘড়া জল ঢাললেন, তবে পিসিমা চোখ মেলে চাইলেন।

চেয়েই বললেন, বিছানা ভেজালে, এখন শুকুবে কি করে শুনি?

লতিকাদি শুনবেন কেন, বললেন, জল ঢালব না তো কি, আরেকটু হলেই যে চোখ উলটে গেছিল! বলে নিজেরাই হাতে হাতে ভঁাড়ার ঘর গুছুতে লেগে গেলেন। আমাকে বললেন, ছোকরা চাকরটা গেল কোথায়, গুদোমে গিয়ে খোঁজ নে।

দেখি সে এইমাত্র কোত্থেকে যেন ফিরে, চক্‌চকে পাম্পসু খুলে রেখে, পা ধুচ্ছে। বলল নাকি অপূর্বদা ওকে কাল রাত নটার বাইস্কোপে পাশ দিয়েছিলেন, ম্যানেজার ওঁর দোস্ত কি না। রাতে আর ফেরে নি, কোন বন্ধুর বাড়িতে খেয়ে-দেয়ে শুয়েছিল। এ বাড়ির রাঁধাবাড়ার তো কিছু ঠিক নেই। কাল দুপুরেও দোকানে গিয়ে তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি খেয়ে আসতে হয়েছিল। এখানে আর বেশিদিন ওর কাজ করার ইচ্ছে নেই। আরো কি কি যেন বলতে যাচ্ছিল, লাবণ্যদিরা ডাকাডাকি করাতে আর বলা হল না।

ওর হাতে চিঠি লিখে লাবণ্যদিই থানায় পাঠালেন। জগদীশদা অনেক ডাকাডাকি করাতেও ঘরের দোর খুলল না। শেষটা জ্যোঠিমা পিসিমার কাছে থাকলেন, লাবণ্যদিদিদের সঙ্গে আমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। আমার একটুও যেতে ইচ্ছে করছিল না।

ততক্ষণে পিসিমা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসেছেন! এঁটে খোঁপা বেঁধে লাবণ্যদিদিদের বললেন, একটু দাঁড়িয়ে যাও বাছা। আমার জন্যে অনেক করলে, দুজনায় এই শিশি দুটো নিয়ে যাও দিকিনি। ধরো লতিকা, লেবুর ঝাল আচার। ওটা সামান্য একটু গেঁজে গেছে, কিন্তু দুদিন রোদ্দুরে দিয়ে নিলেই কেউ টেরও পাবে না। আর লাবণ্য, তুমি বাছা এই পেয়ারা-জেলিটা নিয়ে যাও। কালো দেখে মনে কোরো না যে

খেতে খারাপ। খারাপ জিনিস আমার হাতে বেরোয়ই না কখনো, তবে ঐ একটু কালচিটে রং ধরে গেছে। এ কি আর আমি সহজে হাতছাড়া করি, নেহাত কোন অজাতে বেজাতে ছুঁয়ে দিয়েছে, তার কোনো ব্যামো-ট্যামো ছিল কি না তাই-বা কে জানে। আচ্ছা বাছা, এসো তা হলে, আমার এই বেলা অবধি জপ-সন্ধে কিছুই হল না।

এই বলে আমাদের সদর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। আমাকে কিন্তু কিচ্ছু দিলেন না। অথচ লেবুর আচার, পেয়ারা-জেলি আমিও যথেষ্ট ভালোবাসি।

বাড়ির বাইরে এসেই দেখি শীতের রোদ্দুরে সারা শহরটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। দূরে মাথার ওপর ঘন নীল আকাশে দুটো চিল ঘুরছে। ঝাউগাছের পাতা বাতাসে দুলছে, কোত্থেকে যেন কমলালেবুর গন্ধ আসছে। কে বলবে জগদীশদার বাড়ির মধ্যে এত কাণ্ড!

আমাদের চান খাওয়া সারা হয়ে যাবার কত পরে জ্যেঠিমা ফিরলেন। মা আর অরুণাবউদি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, খিদেও পেয়েছিল বোধ হয়, ওঁদের আবার চান করে উঠেই না খেলেই নয়। জ্যেঠিমা এসে ঢুকতেই দুজনে কি হল, কি হল করে হামলে পড়লেন।

জ্যেঠিমা মাথায় দু ঘটি জল ঢেলে একসঙ্গে খেতে বসলেন, সে এক কাণ্ড, বুঝলি মেজোবউ, বাড়িঘর ডালের কাঠি দিয়ে নাড়া, অথচ ঠাকুরঝি বলে কিনা কিছু হারায় নি। আবার হারায় নি বলে রাগ কত! বলে কিনা, কই করুক তো কেউ আমার মতো জ্যাম-জেলি, অথচ একটা ছোট শিশি অবধি নিল না! কেন, আমার জিনিস খারাপ নাকি? নাকি তোরাই ভালো জিনিস দেখলে চিনিস না? চুরি করতে এইচিস, অথচ কোনটা ভালো কোনটা মন্দ জানিস না। এ আবার কেমন ধারা চোর!

শেষটা পুলিশ ইন্সপেক্টর লোকজন নিয়ে এসে পড়াতে পিসিমাকেও থামতে হল, আর জগদীশদাকেও বেরিয়ে আসতে হল। বেরিয়েই পুলিশের ওপর রাগমাগ করতে লাগল।

ট্যাক্স নেবার বেলায় সব ঠিক আছেন, অথচ নিজের বাড়িতে নিরাপদে ঘুমুতে পারব না, ঠ্যাঙাড়ের দল এসে মেরে পিটিয়ে জিনিস নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবে! কেন, থানার লোকেরা কি করে কি?

কিন্তু জগদীশদা নিজে কিছুই বলতে পারে না। কটা লোক কোন দিক দিয়ে এল, কেমন চেহারা, সঙ্গে হাতিয়ার ছিল কি না কিছুই জানে না!

মা হেসে বললেন, তা জানবে কি করে? সাড়া পেয়েই বোধ হয় স্নানের ঘরে ঢুকেছিল। আমি বললাম, ওমা, না, তা হলে অমন বেদম পিটল কি করে ওকে?

ব্যস্, সবাই মিলে আমাকে সে কি বকুনি! জ্যাঠা মেয়ে, বড়দের কথায় কথা বলতে আসে, এই-সব। চুপ করে সব শুনলাম, কিচ্ছু বললাম না।

সন্ধেবেলা পড়ছি, নেপু গেছে তার গুরুঠাকুর অপূর্বদার বাড়ি, কি নাকি জরুরী দরকার! হেসে বাঁচি নে। এমন সময় শশীকলাদিদি আস্তে আস্তে দোরগোড়ায় দাঁড়াল।

ও দিদি, সবই তো জানো, এদিকে আমি যে গাল-ব্যথায় মলাম। উঃ, দাঁতের গোড়াসুদ্ধ নড়িয়ে দিচ্ছে বোধ হয়! দাও না ঐ যে কি বড়ি আছে তোমাদের, নইলে আর তো পারছি না!

তাকিয়ে দেখি শশীদিদির গাল ফুলে চালকুমড়ো! বললাম, দেব, যদি বল কে মেরেছে।

শশীকলাদিদি শিউরে উঠে বলল, ও দিদি, দাও দিদি লক্ষ্মীটি, তোমাকে এক্ষুনি গরম পেঁয়াজি খাওয়াব। কুটে রেখে এসেচি ও ঘরে, কড়াইতে তেল ঢেলেছি, দাও দিদি, পায়ে পড়ি!

আমি উঠে বললাম, তা হলে বলবে না? এই আবার বসলাম।

শশীদিদি প্রায় কেঁদে ফেলে, ওকি আবার বসলে কেন? না দিলে যে মরে যাব! বলব কোন সাহসে, ফালা করে চিরে ফেলবে যে! তবু এইটুকু বলছি যে জগদীশবাবুকে রোগা-পট্‌কা দেখে মনে কোরো না যে ওনার হাতে জোর নেই!—দাও দিদি দুটো বড়ি!

বড়ি নিয়ে শশীকলাদিদি চলে গেলে পর, নেপু এসে জুতো খুলতে খুলতে বলল, অপূর্বদার খুব জ্বর, সর্দিকাশি। বেরুতে পারছেন না, তাই আমাকে একটা কাজ দিয়েছেন।

আমি কিছুই বিশ্বাস করি নি। মুখে বললাম, কাকে? তোকে? আর হাসতে পারি নে বাবা!

নয়

অবিশ্যি নেপু কি বলে না বলে আমি থোড়াই কেয়ার করি। তবু এর দুদিন পরে যখন একদিন বিকেলে জঘন্য নোংরা প্যান্ট সার্ট পরে এসে, এক ঘণ্টা ধরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, ভিজে হাত দিয়ে চেপে চেপে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, তুই অপূর্বদার যত খুশি নিন্দে করতে পারিস, কিন্তু তোদের নেকি লাবণ্যদিদিমণি দারুণ খাতির করেন। জানিস, ওঁকে এক বোতল পেয়ারা-জেলি পাঠিয়েছেন?

তখন অবাক না হয়ে পারলাম না।

নেপু আমার দিকে না তাকিয়ে, মুখটাকে আয়নার খুব কাছে নিয়ে গিয়ে মাথার মাঝখানকার খাড়া চুলগুলোকে প্লেন করতে করতে বলল, জানিস, অপূর্বদা রোজ সকালে একমণি মুগুর ভাঁজেন। তার পর একপো শেকড়ওয়ালা কাঁচা ছোলা খান। আমাকেও খেতে বলেছেন, তা তোদের বাড়িতে কি ও-সব হবার জো আছে? বলতে না বলতে মা তেড়ে আসবেন। জানিস, অপূর্বদা একবার একটা পাগলা মোষের শিং চেপে ধরে, এমনি করে এক মোচড় দিয়ে, তাকে রাস্তার মাঝখানে একেবারে কুপোকাৎ—এর বেশি আর বলা হল না, কারণ কায়দাটা দেখাতে গিয়ে নেপুর হাত থেকে চিরুনি ছুটে গিয়ে, জানলার কাঁচে পড়াতে, কাঁচ ভেঙে চৌচির আর নেপু জিভ কেটে পগার পার। একা একা কত হাসব?

কিন্তু আজকাল আর খেয়ে-দেয়ে কোনো সুখ নেই, বাবা জ্যাঠা-মশাইদেরও মন খারাপ। শশীকলাদিদি কেমন যেন বিগড়ে আছে, কখনো বলে দাঁতব্যথা, কখনো বলে পেট কামড়াচ্ছে। মোটে রান্নাঘরের দিকে যায় না। মা জোঠিমাকে আবার হাঁড়ি ঠেলতে হচ্ছে।

সবাই মিলে শশীদিদির কম তোয়াজ করা হয় নি। মুখে গলায় গরম জলের সেঁক, কাগজি লেবু দিয়ে কই মাছের ঝোল ভাত, হেনাতেনা কত কি। আমার যেন বাড়াবাড়ি মনে হত, কিন্তু আমাদের কথা তো আর তখন কেউ শুনত না।

ওবাড়িতে জগদীশদার শরীর ভালো নেই, তার ওপর সারাক্ষণ গুম্ হয়ে থাকে। পিসিমা রোজ রোজ এসে বলেন ওর নাকি ভয় ভয় করে। শেষটা মাদের বলে-কয়ে, ওবাড়িতে নেপুর আর আমার শোয়ার ব্যবস্থা

করে নিলেন।

বেশ ভালো লাগত। রাতে আমরা ওখানেই খেতাম। পিসিমা নিজের হাতে লুচি, বেগুন ভাজা, আলুর দম, ক্ষীর, এই-সব করতেন। খাবার সময় ওঁদের ছোটবেলাকার কত গল্প বলতেন। জগদীশদার বাবা কিরকম দুষ্টু ছিলেন আর উনি নিজে কি ভালো! ওঁরা নাকি খুব বড়লোক ছিলেন, পাড়ার লোকের চোখ টাটাত। তার পর জিগ্গেস করলেন বোর্ডিং-এর মাসিমার টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়েছি কি না। বললাম, মা রাখতে মানা করেছেন তাই দিয়ে এসেছি। তাই শুনে পিসিমা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, ঠিক আমার বাবার টাকার মতন দেখতে ওগুলো। ওরই মধ্যে পুলিশরা দু-চার দিন এসে জগদীশদাকে দিয়ে সেই রাতের কথা সব লিখিয়ে নিয়ে গেল। নাকি তিন-চার জন দারুণ ষণ্ডা লোক এসে জগদীশদাকে চেয়ারের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলেছিল। তবু যখন জগদীশদা বলতে লাগল বাড়িতে আর সোনাদানা কিচ্ছু নেই, তখন নাকি রেগেমেগে, চুল টেনে কান মলে, একাকার করে দিল।

জগদীশদাও ছেড়ে কথা বলে নি। তবে হাত-পা বাঁধা, কি আর করতে পারে, কষে দু কথা শুনিয়ে দিয়েছে। ব্যাটাদের কান লাল হয়ে উঠেছিল।

পুলিশরা চলে গেলে, পিসিমার ওপর জগদীশদার সে কি রাগ! ওর বিশ্বাস ওর ওপর রেগে, পিসিমার গুরুদেব তাঁর শিষ্যদের দিয়ে এই-সব করাচ্ছেন। আমাদের সামনেই পিসিমাকে ডেকে বললে, হীরের প্রজাপতি বসানো ঢাকনিটা কোথায় রেখেছ বলই না! ভুলে গেছি আবার কিরকম কথা? সমস্ত বাড়ি তচ্‌নচ্‌ করেও পাওয়া যায় না, ও আবার কিরকম লুকোবার জায়গা?

পিসিমা হাউ হাউ করে কেঁদে বললেন, পেলে তো গুরুদেবকেই দিয়ে দিতাম।

নেপু আর আমি সকালে উঠে গিয়ে, পড়াশোনা করি, স্নান করে খেয়ে ইস্কুলে যাই, বিকেলে জলখাবার খেয়ে এবাড়ি চলে আসি। সঙ্গে আবার হাতের লেখার খাতা আর পদ্য মুখস্থর বই নিয়ে আসতে হয়।

আমাকে পৌঁছে দিয়ে নেপু অপূর্বদার কাছ থেকে একবার ঘুরে আসে। ফিরে এসে, রোজ মিথ্যে করে বলে—অনাথদার কাছে অঙ্ক

বোঝাতে গেছলাম ; এই-সব। কারণ আজকাল অপূর্বদার নাম শুনলেই জগদীশদা রেগে যায়।

আমাদের বাড়িতে শশীকলাদিদিকে নিয়ে খুব গোলমাল চলছে। তার নাকি আজকাল রোজ চোখে ব্যথা করে। তাই নিয়েই একদিন রাতে জগদীশদার কাছে এল।

পিসিমা রান্নাঘরে, নেপু ফেরে নি, আমি খাটের পায়ের দিকে মাটিতে বসে ভূত-প্রেত পড়ছি, সেদিকে কারো নজর পড়ে নি।

শশীকলাদিদি খুব গজ্‌গজ্‌ করতে লাগল, এবার আমার পাওনা টাকা চুকিয়ে দিয়ে ছুটি দিয়ে দেন, বাবু। নইলে একেবারে রাঁধুনী বামনী বনে যাব!

জগদীশদা এক ধমক দিয়ে বলল, খুটে খবরদার! তোর পেছনে না পুলিশ ঘুরছে! বলেছি তো গোলমাল চুকে গেলে তোকে আমার এখানেই চাকরি দেব। কদিন চুপ করে থাক, যাবার কথা মুখে আনবি নে!

শশীদিদি বললে, কি চাকরি দেবেন বাবু? আমি পাশ-করা গোয়েন্দা, আমি তো আর বাবুর্চি নই।

জগদীশদা চটে গেল, চোপ্‌! তুই একটা থার্ড ক্লাশ টিকটিকি কিন্তু ফার্স্ট ক্লাশ বাবুর্চি! যার যেটা কাজ। আর দেখ, ফের যাবার কথা মুখে এনেছিস কি আমি সেই সাইকেলের ব্যাপারটা বলে দেব! তাই শুনে শশীদিদির মুখে আর কথাটি নেই। জগদীশদা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক সেই সময়, পড়বি তো পড় আমার হাত থেকে বইটা ঝুপ্‌ করে পড়ে গেল!

দুজনেই প্রথমে দারুণ চমকে গেছিল, তার পর আমাকে দেখে সে কি রাগ! ভাগ্যিস ঠিক সেই সময়ে রাঁধাবাড়া সেরে কলতলা থেকে পিসিমা আমাকে ডাকলেন, নইলে আর রক্ষে ছিল না।

শশীদিদি সুড়ুৎ করে কোথা দিয়ে যে কেটে পড়ল টেরও পেলাম না!

দশ

ভীষণ রেগে গেছলাম। পরদিন সকালে মাকে সব বলে দিলাম। মা তো রেগে কাঁই।

তুমি তো আচ্ছা মেয়ে শশীকলা। কাজকর্মের নাম নেই, দুবেলা থালা থালা ভাত ওড়াবে আর দিব্যি পাড়া বেড়াবে। তোমার মাইনে কাটা হবে।

শশীদিদিও মার মুখের ওপর ভীষণ বেয়াদপি করতে লাগল।

যান আপনারা অন্য লোক দেখুন গে, এত কাজ আমার পোষায় না। একটা গোটা পরিবারের প্রত্যেকটা লোক যে এরকম সাংঘাতিক পেটুক হতে পারে এ আমি ভাবতে পারতাম না।

তাই শুনে জ্যেঠিমা বউদি-টউদি সবাই মিলে মহা চেঁচামেচি লাগালেন। তার পর বাবা জ্যাঠামশাইরা বাড়ি ফেরবার আগেই আমাকে শশীদিদির মাইনের হিসেব কষিয়ে, তার হাতে দিয়ে, তাকে বিদায় করে দেওয়া হল।

আমি বার বার করে বলতে লাগলাম, ও শশীদিদি, যেখানে সেখানে ঘুরো না, তোমাকে পুলিশে ধরবে। সটান জগদীশদার কাছে চলে যাও।

শশীদিদির কি দেমাক! চোখ ঘুরিয়ে বললে, সেখানে যেতে আমার বয়ে গেছে। তা আমার জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না। একটা চাকরি নাহয় খেয়েই দিয়েছ, জানো রাজরাজড়ারা আমাকে লুফে নেবে। কই রাঁধুক তো কেউ আমার মতো হোসেনি কারি। তা যতই লাগানি ভাঙানি কর-না কেন।

বলে এক হাত ঘোমটা টেনে বড়-বড় পা ফেলে চলে গেল।

রাত্রে আমার কাছে সব কথা শুনে জগদীশদা এমনি রাগারাগি করতে লাগল যে, শেষপর্যন্ত নেপু, পিসিমা আর আমি আমাদের বাড়িতে চলে আসতে বাধ্য হলাম।

পরদিন সকালে পিসিমা মা জ্যেঠিমার সঙ্গে-সঙ্গে তরকারি কুটতে কুটতে বললেন.. আসল কথা তোদের বলাই হয় নি। আমার বাবা ছিলেন লাখপতি কিন্তু এমনি হাড়কিপটে যে লোকে বলত সকালে ওঁর

নাম করলে হাঁড়ি ফাটে। তোরা এখানে ওঁর যে নাম জানিস সেটা ওঁর নাম নয় মোটেই। সেই সব্বনেশে বুড়োর ভয়ে নাম ভাঁড়িয়ে এখানে এসে ঘাপ্‌টি মেরে ছিলেন। এখন পর্যন্ত নাকি লোকে ওঁকে এখানে ওখানে খুঁজে বেড়াচ্ছে!

সে যাক গে, এখানে বাকি জীবনটা ভগবানের নাম করে কাটিয়ে, শেষটা যখন চোখ বুজলেন, থাকবার মধ্যে রইলাম আমি আর জগদীশের বাবা। আর তাল-তাল সোনাদানা আর গোছা-গোছা টাকা!

শুনে মা জ্যেঠিমা কুটনো ফেলে গালে হাত দিয়ে বললেন, দেখছ কি, কাণ্ড! তা সে-সব গেল কোথায়? তোমাদের তো দেখি মাসকাবারে বেশ টানাটানি!

পিসিমা দুঃখু করে বললেন, আরে সে কথা আর বলিস নে! বাবার শ্রাদ্ধের পর কে যে সব চেঁচেপুঁছে নিয়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। ঐ যা দুটো একটা বাবার পা টেপার সময় বাঁ হাতে করে সরিয়ে রেখেছিলাম, সে ছাড়া আর কিচ্ছু পেলাম না। আমি আর থাকতে না পেরে বললাম, বাঁ হাতে করে সরানো মানে কি? অমনি মা জ্যেঠিমা চোখ পাকিয়ে উঠলেন, তোর সব কথাতে কি দরকার? যা পড়্‌গে যা!

আমি সরে গিয়ে দরজার ওপাশে বসলাম। পড়া আমার কখন হয়ে গেছে। পিসিমা বলতে লাগলেন, সে এক মজার ব্যাপার। বাবা বলতেন সিন্দুকের মধ্যে কোনো দামী জিনিস রাখতে হয় না। কারণ চোররা এসে আগেই সিন্দুক ভাঙে, বাক্স খোলে। তাই বাবা করতেন কি গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি পুঁটলি বেঁধে চ্যবনপ্রাশের টিনের পেছনে, চ্যাঙারি করে খাটের নীচে, কাগজে মুড়ে যেখানে সেখানে ফেলে রাখতেন। বাবাও চোখ বুজলেন আর সে-সব হাওয়া! ঐ দু-চারটে যা আমার কাছে ছিল, তাই-বা রাখতে পারছি কই? জগদীশটা তো অত দামের কৌটো হারাল, হীরের প্রজাপতিটাও খুঁজে পাচ্ছি নে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, একটু হেসে পিসিমা আবার বললেন, তবে একটা ভালো হয়েছে এই যে সে বুড়োও আর ও কৌটো ভরে নাতনির বিয়েতে সিঁদুর দিতে পারবে না!

সব চাইতে আশ্চর্য ব্যাপার হল যে প্রায় এক বছর ধরে এত সব হাঙ্গামার পর আবার আমাদের শহর আগেকার মতন চুপচাপ হয়ে গেল।

আবার সবাই বলতে লাগল, এখানে কোনোদিনও কিচ্ছু হয় না, বিশ্রী একটা জায়গা। আবার ডিমওয়ালার, রুটিওয়ালার কাছ থেকে সবাই এর বাড়ির ওর বাড়ির খবর জোগাড় করতে লাগল। আমার একটুও ভালো লাগত না। এত যে জিনিস গেল, চোর ধরা পড়বে কবে?

শশীদিদির জন্যে মন কেমন করত, রোজ নেপুকে আমাকে এটা ওটা ভেজে খাওয়াত। অথচ সেই যে চলে গেল আর তার টিকিটির দেখা নেই। নিজের বাক্সটা অবধি নিয়ে গেল না, তাতে অবিশ্যি কাগজ-পত্র ছাড়া কিছু ছিল না। আমরা আবার আগের মতন শাক-চচ্চড়ি খেতে লাগলাম। রোজ খেতে বসে বাবারা শশীদিদির জন্যে আক্ষেপ করতেন।

তবে জগদীশদাদের বাড়িতে খানিকটা অদল-বদল হল। সেই যে পিসিমার ওপর চটে গেল, সেই থেকে জগদীশদার পিসিমার সঙ্গে কথা বন্ধ। রোজ রাত্রে এক টুকরো কাগজে পরদিন কি কি খাবে, তার একটা ফর্দ লিখে, পিসিমার দরজায় আলপিন দিয়ে এঁটে রাখত।

শেষটা একদিন সন্ধেবেলায় একগাল হাসি নিয়ে আমাদের বাড়িতে দেখা করতে এল। জ্যেঠিমার তক্তপোশের ওপর কেঠো কেঠো ঠ্যাং দুটো তুলে বসে বললে, কলকাতায় আমার খুব ভালো চাকরি হয়েছে, আমি কাল সকালের মোটরেই চলে যাচ্ছি। দিন, চাট্টি পায়ের ধুলো দিন। তবে ঐ একটা দুঃখ থেকে গেল, গুটেকে হারালাম।

জগদীশদা চলে গেলে আমাদের খুব মন কেমন করেছিল। এমন সময় বিকেলবেলায় নেপু বাড়ি এল, মাথা-ধরা, পেট-ব্যথা আর জ্বর নিয়ে।

নেপুর মাম্প্‌স্‌ হল, আমার মাম্প্‌স্‌ হল, বড়দার মাম্প্‌স্‌ হল, শঙ্কর ঠাকুর দেশ থেকে ফেরবামাত্র ওর মাম্প্‌স্‌ হল। সব গাল ফুলে চাল কুমড়ো, ইস্কুল যাওয়া, কাজ-কম্ম, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ।

শুধু আমাদের নয়, শহরসুদ্ধ সকলের মাম্প্‌স্‌ হল—পিওনদের, পুলিশদের, দোকানদারদের, মাস্টারমশাইদের, এমন-কি, ডাক্তারবাবুর স্ত্রীর পর্যন্ত মাম্প্‌স্‌ হল!

ছেলেদের ইস্কুল, মেয়েদের ইস্কুল, পাহাড়তলির প্রাইমারি ইস্কুল সব বন্ধ হয়ে গেল। বোর্ডিং-এর ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাদের মাম্প্‌স্‌ হয় নি, তাদের সব বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হল।

লাবণ্যদি, লতিকাদিও একটা বড় দল মেয়ে নিয়ে কলকাতা চলে

গেলেন। যাবার আগে আমাকে কত আদর করে গেলেন।

নেপুর অপূর্বদাও গেলেন। যাবার আগে গালস্ফুলো নেপুকে দেখতে এলেন। উনি চলে গেলে পর নেপু বললে, অপূর্বদা আমাকে একটা ভারী কাজ দিয়ে গেছেন। কি, তা বলব না।

আমার তো শুনতে ভারি বয়ে গেছে। এমনিতেই ভীষণ গাল টন্‌টন্‌ করছে, খিদে-খিদে পাচ্ছে।

এগারো

আমরা অসুখ করে যে যার বিছানায় পড়ে থাকি। নেপু উঠে মাঝে মাঝে ঘুর্‌ ঘুর্‌ করে বেড়ায়, তবে ঘর ছেড়ে বার হবার হুকুম নেই। খুব জ্বালায় আমাকে। রাতে আমাদের চোখে ঘুম আসে না। মা জ্যোঠিমারা কতরকম গল্প বলেন, ওঁদের ছেলেবেলার গল্প, ভূতের গল্প, জানোয়ারদের গল্প।

কেমন করে জ্যোঠিমার ঠাকুরদাদা নৌকো করে গঙ্গাসাগরে তীর্থ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে পেঁছবার ঠিক আগে কুয়াশায় চারদিক ছেয়ে গেল, তার পর জোর জল ঝড় উঠল, নৌকো কোথায় ভেসে গেল তার ঠিক নেই। ভোরে দেখেন একেবারে গহিন সাগরে গিয়ে পড়েছেন। জলের মাঝখানে উঁচু উঁচু দুটো কালো পাথর উঠে রয়েছে। সেই পাথরের ওপর থেকে কি সুন্দর গান ভেসে আসছে। মনও কেমন করে, আবার ভয়ও করে শুনলে। মাঝিরা ওঁকে নিয়ে কোনোরকমে নৌকো চালিয়ে এল। ফিরে আবার গঙ্গাসাগরে যখন পেঁছুল সবাই বললে বড় বাঁচা বেঁচে গেছ। কিন্তু তার পর থেকে ঠাকুরদাদা কেমন যেন হয়ে গেলেন, আর কোনো সুখভোগ ভালো লাগত না তাঁর।

কেমন করে এক সন্ন্যাসীঠাকুর আমার মার দাদামশাইয়ের বাবাকে একটা কালো পাথর দিয়েছিল, বলেছিল তাই দিয়ে যা ছোঁয়াবে তাই সোনা হয়ে যাবে যদি মনে পাপ না থাকে। দাদামশায়ের চোখের সামনে একটা বটফলকে সোনা করে দিয়েও ছিল। কিন্তু সে চলে গেলে পর আর কিছুকে সোনা করা গেল না। পাপ নেই এমন লোক কোথায় আছে?

বড়বউদিও বললেন, আমাদের একজন পূর্বপুরুষ একবার ঘোর

জঙ্গলে শিকার করতে গিয়ে দেখেন, একজন পরমাসুন্দরী মেয়ে গাছ-তলায় বসে হাউহাউ করে কাঁদছে। তাকে যত্ন করে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন, কিন্তু বাড়ি পেঁৗছেই মেয়েরা তাকে যেই-না চান করাবার জন্যে শ্বেতপাথরের বাঁধানো চৌবাচ্চায় জলের মধ্যে নামিয়েছে, অমনি সে চিনির মতো গলে গেল। জলের নীচে তার দুহাতের দুখানি মোটা মোটা সোনার বাউটি থাকল। সে বাউটি এখনো আমাদের দেশের বাড়িতে সিন্দুকে বন্ধ আছে।

আমাদের শঙ্কর ঠাকুরও কম্বল মুড়ি দিয়ে, মাথায় মঙ্কি-ক্যাপ্ পরে দোরগোড়ায় বসে গল্প শুনছিল, সে বললে, আমাদের দেশে সন্ধের পর ওনাদের ভয়ে কেউ পথে বেরুতে চায় না। আমাদের পিস-শাশুড়ি কি যেন মাড়িয়ে, সন্ধেবেলায় পুকুরঘাট থেকে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়ে ফিরছেন, এমন সময় দেখেন কাদের যেন ছোট মেয়ে ঘাটের কাদায় আছাড় খেয়ে পড়ে গেছে।

পিসিমাও অমনি আহা, বাছারে—বলে ছুটে গিয়ে তাকে কোলপাঁজা করে তুলেছেন, আর অমনি ঝোপের আড়াল থেকে সাদা কাপড়-পরা তার মা বেরিয়ে এসেছে। পিসিমা তার কোলে মেয়ে দিয়ে, বাড়ি ফিরে পিদ্দিমের আলোতে অবাক হয়ে দেখেন যে, তাঁর হাতের শাঁখাজোড়া আর আঁচলের চাবিগাছি আগাগোড়া সোনার হয়ে গেছে।

গল্প বলার মাঝে মাঝে একেকবার সবাই থেমে যাচ্ছে, আর অমনি বাইরের গাছ থেকে পাতা খসার শব্দ, টিনের ছাদের মট্‌মট্ শব্দ, বাড়ির পেছনে ছোট নদীর ওপারে সরলগাছের বনে হু-হু করে বাতাস দেয়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

অদ্ভুত সব চুরির গল্পও হল। তার কাছে আমাদের এখানকার চুরির কথা কোথায় লাগে।

জ্যেঠিমাদের বংশ-পরিচয়তে লেখা আছে যে বাংলাদেশে এসে বসবার আগে, ওঁদের পূর্বপুরুষরা বেহারে কোথাও থাকতেন। তাঁরা নাকি সেখানকার রাজা ছিলেন। একদিন ছেলেরা সব মৃগয়া করতে গেছেন, আর মেয়েরা সেই সুযোগে, দরজায় বড়-বড় কুলুপ এঁটে, দাস-দাসী, পাহারাওয়ালা, সেপাই-সান্ত্রী সব নিয়ে গ্রামের মাঠে ছট্ পুজো দেখতে গেছেন। ভোরবেলা বাড়ি ফিরে দেখেন সব ভোঁ ভাঁ, কোথাও কিছু নেই। বাড়ি-ঘর, পুকুর, বাগান, বাঁধানো ঘাট, কোনো কিছুর

এতটুকু চিহ্ন নেই। চার দিকে শুধু অসংখ্য হাতির পায়ের ছাপ! এই-সব কারণেই বেহার ছেড়ে ওঁরা বাংলাদেশে এসে বসতি করতে লাগলেন।

জগদীশদার পিসিমাও কদিন আমাদের এখানে আছেন। একা বাড়িতে ভয় করে। পুবের আধখানাতে ভাড়াটে এলেই আবার নিজের বাড়িতে ফিরে যাবেন।

ঐ-সব গল্প শুনতে শুনতে পিসিমা একেবারে জ্যেঠিমার গা ঘেঁষে বসে বললেন, বাবা! এ-সব কথা শুনলেও গায়ে কাঁটা দেয়। তবে এতে অবাক হবার কিছু নেই। দশ বছর আগেও—ও বাবা! ওটা কি?

ঠক্ করে কি একটা ভারী জিনিস জানলার একটা শার্শি ভেঙে পিসিমার কোলের কাছে পড়ল। পিসিমা প্রায় ভির্মি যান আর কি!

আমি সেটাকে তুলে দেখি একটা বেশ বড় নুড়ি পাথরের চারি দিকে জড়ানো একটা সাদা কাগজ, তাতে লাল পেনসিল দিয়ে আঁকাবাঁকা হরফে লেখা, 'প্রজাপতির জন্যে ধন্যবাদ'!

চিঠি পড়ে পিসিমার সত্যি সত্যি হাত-পা এলিয়ে গেল। জ্যেঠিমার গায়ে একেবারে ঢলে পড়লেন।

এমনি সময় বাবা আর জ্যাঠামশাই ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কি সব বলাবলি করতে করতে এসে উপস্থিত হলেন। ডাক্তারবাবু আমাদের পেট-টেট টিপে; ওষুধ লিখে দিয়ে বললেন, তার পর তোমাদের গোয়েন্দাগিরির তা হলে এখেনেই ইস্তফা, কি বল নেপুবাবু? নেপু বললে, কেন, কেন?

ডাক্তারবাবু খুব হাসলেন, ওমা, খবর শোনো নি বুঝি? থানায় যে উড়ো চিঠি এসেছে, জঙ্গলের মধ্যে ভূতের বাড়ির দেওয়ালের মধ্যে চোরা কুঠরিতে সব চোরাই-মাল গুম্ করা আছে। আর অর্কিডফুল কোথায় জানো? ম্যাজিস্ট্রেটের সামনের বারান্দা থেকে তুলে নিয়ে, আস্তাবলের পেছনের বারান্দায় ঝোলানো!—আচ্ছা, এবার তা হলে সোনাহানা মুখ করে এই তেতো ওষুধগুলো গিলে ফেল দিকিনি। অ্যাঁ, এই ঠিক হয়েছে, এবার বাছাধনরা যে যার শুয়ে পড়ো তো।

ডাক্তারবাবু ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ করে হাসতে হাসতে পাশের ঘরে গিয়ে বসলেন, অনেক রাত অবধি গল্পগুজব চলল। মা জ্যেঠিমারাও কেউ আমাদের ঘরে এলেন না। আমরা খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে, যে যার

লেপ গায়ে দিয়ে অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম, এ আবার কি কথা ? চোর কি তা হলে ধরা পড়বে না ? যে জিনিস ফিরিয়ে দেয় সে কি চোর ?

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাই নি।

বারো

পরদিন শহরে সে কি হৈ-চৈ। সে সময়কার কথা বললে সহজে কেউ বুঝতে পারবে না। সারা বছর শহরটা যেন ঘুমিয়ে থাকত, একটা কিছু ঘটলে হঠাৎ জেগে উঠে বসত। তাই নিয়ে সে যে কি উত্তেজনা চলত, যারা আজকালকার শহরে বাস করে, তারা কোনোমতেই বুঝতে পারবে না।

বাজার পর্যন্ত ভালো বসল না সেদিন। সকালে দুধওয়ালা, রুটি-মাখনওয়ালা, ডিমওয়ালা কেউ এল না। মাছওয়ালাও অনেক বেলা করে এসেছিল, তাও নেহাত না এলে মাছ পচে যেতে পারে বলে।

দলে দলে সবাই বনের মধ্যে ভূতের বাড়িতে কি পাওয়া গেল দেখতে চলল।

বড়দাও গেছল। এসে বলল, দুটো দেওয়ালের মাঝখানে লুকোনো একটি ফালি ঘর। দরজার মাথার উপর নকশা করা একটা ফুল, তারই মাঝখানটা টিপলে, পাশের দেওয়ালের খানিকটা ফাঁক হয়ে গিয়ে, চোরা কুঠরি বেরিয়ে পড়ে।

মাটি থেকে ছাদ অবধি জিনিসপত্রে ঠাসা। যেখানকার যেমন হারিয়েছিল ঠিক তেমনি অবস্থায় রাখা রয়েছে। অবিশ্যি খাবার জিনিস-গুলো নেই। ম্যাজিস্ট্রেটের কুকুরটাও নেই।

সারাটা দিন, তার পর আরো চার-পাঁচ দিন লেগেছিল, নিজেদের জিনিস চিনে নিয়ে, পুলিশের কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনতে।

জিনিস হারানোর সময় যত-না হুলুস্থুল হয়েছিল, এ তার চাইতেও বেশি হল।

আমাদের বাক্সটাও বন্ধ অবস্থাতেই পাওয়া গেল। বাক্সের ওপর একটা পাথরের থালা চাপানো ছিল, সেটাসুদ্ধু তেমনি রয়েছে।

বিকেলে জ্যোঠিমা বললেন, একে আবার চুরি বলে নাকি ? জিনিস

না হারালে আবার চুরি কি ?

জগদীশদার পিসিমা বললেন, জিনিস হারায় নি তো আমার সোনার কৌটো কই ? হীরের প্রজাপতিটা কই ? তোমাদের এত ফুর্তি কিসের গা ? চোর ধরা পড়বে না ? তার সাজা হবে না ? আমার জিনিস ফিরে পাব না ?

নেপু বললে, ইস্কুল খুললে অপূর্বদা এসে একবারটি দেখলেই সব বুঝে নেবেন। অপূর্বদা বলেছেন বিলেতে কিছু গেলে, ঘরের জিনিসপত্রের ওপর কি একটা গুঁড়ো ছড়িয়ে, তার পর ফোটো তোলা হয়। ব্যস্, চোরের আঙুলের ছাপের ছবি পাওয়া যায়। তাপর আর কি, ঐ ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দুদিনেই চোর গ্রেপ্তার হয়। দেখিস এসেই ঐ-সব করাবেন।

শুনে পিত্তি জ্বলে গেল। বললাম, রেখে দে তোর শুঁফো মাস্টারের ক্যারদানি। ভূতের ভয়ে রাতে জানলা না বন্ধ করলে যার ঘুম হয় না, তার আবার কথা!

নেপুও চটে গেল, মোটেই ভূতের ভয় নয়। ওর হাঁপানির রোগ আছে।

বললুম, রেখে দে তোর হেঁপো মাস্টারের কথা।

নেপু রেগে পেয়ালা থেকে অনেকখানি দুধ মাটিতে ঢেলে ফেলে দিয়ে বললে, রেখে দে তোর ললিতা মাস্টারনীর কথা।

কিরকম আস্পর্ধা দেখলে তো ? কিসের থেকে কি টেনে আনা! ঐ বলে আবার দুম্‌দুম্ করে পা ফেলে খাটে গিয়ে শুলো।

সে যাই হোক গে, আস্তে আস্তে সবাই সেরে উঠলাম। মাগুর মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলাম, ঘর থেকে ছাড়া পেলাম। মাম্পসের ছুটির সঙ্গে, পুজোর বারোদিন ছুটি জুড়ে, মস্ত লম্বা ছুটির পর শেষটা আবার ইস্কুল খোলবার সময় হয়ে গেল। বোর্ডিং-এর মেয়েরা ফিরে এল। শুনলাম ললিতাদি, লাবণ্যদি এসেছেন। নেপুর অপূর্বদাও এলেন।

তখনো ইস্কুল খুলতে দুদিন বাকি আছে, জগদীশদার পিসিমা দিন চারেক হল বাড়ি গেছেন, ও দিকটাতে ভাড়াটে এসে গেছে। হন্ত-দন্ত হয়ে সন্ধেবেলা আমাদের বাড়িতে ছুটে এলেন। খুশিতে ফেটে পড়ছেন।

ও বউমা, ওরে মিনু, ওরে নেপু সুখবর শুনেছিস ? ডবল বিয়ের

নেমন্তন্ন খাবি যে সবাই! অপূর্বর সঙ্গে লাবণ্যর বিয়ে, আর জগদীশের সঙ্গে লাবণ্যর বোন মলিনার বিয়ে। লাবণ্যর মা'টা সবাই আজ এসে পৌঁছেছেন, এখানেই বিয়ে হবে।

বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। লাবণ্যদির সঙ্গে শুঁফো অপূর্বদার বিয়ে! তাই কখনো হয় নাকি?

পিসিমা আরো বললেন, নাকি জগদীশদাও আসছে। বিয়ের পর অপূর্বদারাও চলে যাবে। জগদীশদার আপিসেই কাজ করবে। আগেও নাকি তাই করত। জগদীশদার কাজ নাকি ও-ই ঠিক করে দিয়েছিল। কি জানি!

হয়তো সবাই কলকাতায় গিয়ে ট্রামরাস্তার ওপর থাকবেন, ঘড় ঘড় করে সামনে দিয়ে ট্রাম যাবে, মাথার ওপর বিজলি পাখা ঘুরবে, সন্ধে হলে কুলপি বরফওয়ালাকে ডেকে সবাই কুলপি খাবেন।

সেই পাহাড়-দেশের প্রচণ্ড শীতে, লেপের ভেতর পা গুটিয়ে শুয়ে, এ-সব কথা মনে করে দারুণ কান্না পেতে লাগল।

কিন্তু নেপুটার এতটুকু দুঃখ নেই। আবার সে কি তড়পানি! বললে, ভালোই তো, আসছে বছর আমার বারো পুরবে, তার পর তিন বছর বাদে পরীক্ষেটা কোনোমতে পাশ করে নিয়েই, কলকাতা চলে যাব। ব্যস্, আর কি? হস্টেলে থাকব, রোজ সন্ধেবেলা অপূর্বদার বাড়িতে গিয়ে মালাইবরফ খাব। তোর লাবণ্য মাস্টারনী রাঁধতে পারে তো?

চব্বিশ ঘণ্টা কেবল খাবার তালেই আছে। আমি কিন্তু রোজ রাত্রে বালিশে মুখ গুঁজে খুব কেঁদে নিতাম।

ইস্কুলের মেয়েরা সবাই চাঁদা তুললাম। লাবণ্যদিকে খুব ভালো করে ফেয়ারওয়েল দিতে হবে। 'সুখে থাকো' লেখা সোনার পিন কেনা হল সাড়ে তেরো টাকা দিয়ে। তখন সোনা কত সস্তা ছিল; সবাই শাড়ির কাঁধে সোনার পিন লাগাত।

এ-সব নিয়ে নেপুর সে কি বিশ্রী হাসাহাসি। বলে, কিরে তোদের বালতি-টালতি কেনা হল? নইলে মেয়েরা চাঁদা করে কান্নাকাটি করবে কি করে?

এই ধরনের ঠাট্টা আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। তবু চুপ করে থাকলাম, নইলে আরো কত কি বলবে, বিশ্বাস কি!

অরুণাবউদি কিন্তু আহ্লাদে ওর কান পেঁচিয়ে দিয়ে বললেন, মেয়েদের

একটু সমীহ করতে শেখ্, লক্ষ্মীছাড়া !

তখন একটু না হেসে পারলুম না। লাবণ্যদি নিজে একদিন আমাদের বাড়ি এসে দেখা করে গেলেন। মাখনের মতো রঙের একটি শাড়ি পরে কি যে সুন্দর সে আর কি বলব !

আমার গালে একটা চুমো খেয়ে বললেন, কলকাতায় গেলে আমাদের বাড়িতে যেয়ো, কেমন ?

শুনে খুব আনন্দও লাগল, আবার কান্নাও পাচ্ছিল। তার পর মাকে বললেন, শেষটা ভূতের বাড়ি থেকে জিনিসপত্র উদ্ধার হল ! সেদিন আমরা যখন সেখানে বেড়াতে গিয়ে কানের ফুল কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল। তবে বড্ড অন্ধকার ছিল কিনা, ভালো করে খোঁজাই গেল না। নইলে আমরাই হয়তো পেয়ে যেতাম।

সত্যি, কি বুদ্ধি যে লাবণ্যদির। ওঁর বোনকেও সঙ্গে এনেছিলেন, তিনিও ওঁরই মতন সুন্দরী, তবে আমার ওঁকে ততটা ভালো লাগে নি। কেমন যেন একটু দেমাকি বলে মনে হল। কথাই বললেন না ভালো করে। তবু জগদীশদার সঙ্গে বিয়ে হলে একটুও মানাবে না মনে হল। কি কাঠ-কাঠ হাত-পা জগদীশদার, মাথায় কি কম চুল।

চার দিকে তখন বিয়ে ছাড়া অন্য কোনো কথা নেই। লাবণ্যদির মা আমাদের জন্যে পুলিপিঠে করে পাঠিয়ে দিলেন। বাবা জ্যাঠামশাই মহা খুশি।

তবু ঐ চুরির কথাটা আমার প্রায়ই মনে হত। আর পিসিমার তো মহা দুঃখ, এদ্দিন বাদে বউমা আসছে ঘরে, কিন্তু সিঁদুর রাখবার জন্যে হীরের প্রজাপতি বসানো সোনার কৌটোই নেই।

তেরো

সেকালের ব্যাপার ছিল আলাদা। লোকে থাকত ভারি সাদাসিধে ভাবে। বিকেলে কেউ কারো বাড়ি গেলে, গরম লুচি ভেজে, লাল কাশীর চিনি দিয়ে খেতে দিত। বেশি দামের কাপড়-চোপড় পরারও রেওয়াজ ছিল না।

তবে বন্ধু-বান্ধবের বাড়িতে কারো বিয়ে থা হলে পাড়াসুদ্ধ এসে জুটে যেত। পরামর্শ দিত দেদার, সাহায্যও কম করত না।

এক মাস আগে থাকতে হৈ-চৈ লেগে যেত। মফঃস্বল শহর, সব বন্দোবস্তই আগে থাকতে করতে হত। ব্যবসাদাররা, কারিগররা বায়না নিয়ে, এক মাস আগে থেকেই কাজে লেগে যেত। আর এবার তো মাসখানেকও নেই, তার পর ডবল বিয়ে! ঝগড়াঝাঁটি ভুলে সবাই মিলে আমোদ করতে লেগে গেল।

কোথায় মেরাপ বাঁধা হবে, কশো চেয়ার পড়বে, কি খাওয়া হবে, কি দেওয়া হবে, এখন সবার মুখে কেবল ঐ এক কথা।

জগদীশদার পিসিমা নতুন মানুষ বনে গেলেন। আনন্দের চোটে মোষের মতো রঙের আলোয়ানটা চাকরটাকে দিয়ে দিলেন। কাঁঠাল কাঠের বাক্স খুলে পুরোনো একখানা হলদে হয়ে যাওয়া গরদ বের করে পরলেন। বাদামী রঙের একটা কাশ্মীরী শাল গায়ে জড়ালেন। গলায় একটা দশভরি বিছে হার পরলেন।

আর দিনরাত কেবল জগদীশদার প্রশংসা। কেমন সোনাহানা মুখ করে যা দেওয়া যায় তাই খায়। সাত চড়ে রা নেই—এই-সব। আমরা তো দেওয়ালে সেই পিন দিয়ে কাগজ আঁটার কথা শশীদিদির গালে চড়ের দাগের কথা মনে করে, হাঁ হয়ে যেতুম।

তার ওপর বউমাকে আশীর্বাদ করবেন বলে সুন্দর একটা পুরোনো গয়নাও বের করলেন। জ্যেঠিমা তো রীতিমতো চটেই গেলেন, কিরকম কঞ্জুষ বুড়ি দেখলি? এতকাল এর বাড়ি ওর বাড়ি ফলপাকুড়টা, ক্ষীর সন্দেশটা খেয়েই বেরিয়েছে, হাত উপুড় করে একটা পয়সা ঢালে নি। অথচ ঘরে তার এত দামের গয়না!

পিসিমা ওদিকে জাঁক করে বলে বেড়াতে লাগলেন, বাবা, আমি কি তেমনি মেয়ে! কৌটো পাবামাত্র পেতলের হাঁড়িতে উটিকে ভরে, রান্নাঘরের মেঝেতে তিন হাত মাটি তুলে, রাতারাতি পুঁতে ফেললাম। তাপর তার ওপর উনুন পেতে দিব্যি রাঁধাবাড়া করতে লেগে গেলাম। আর এও সত্যি বলছি, তার পর থেকে ডাল ঝোলগুলোও খেতে লাগত যেন মধু! উদিকে দেয়ালের ওধারে ডাকাতের সর্দার গুটে নিশ্চিন্তে রাঁধছে, আর সুবিধে পেলেই এঘর ওঘর হাতড়ে বেড়াচ্ছে! ঐ কানের ফুলটি ছবির পেছনে লুকিয়ে রেখে ভুলেছিলুম, ব্যস্ অমনি সেটি গাপিয়েছে! কিন্তু এটাতে কিছুতে হাত লাগাতে পারে নি!

বলেই পিসিমা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। মা'রা ব্যস্ত হয়ে

উঠলেন, ওকি ঠাকুরঝি? বুক ধড়্‌ফড়্‌ কচ্ছে নাকি? ওরে, হাত-পাখাটা নিয়ে আয়।

পিসিমা মাথা নেড়ে বললেন, না, না, শরীর খারাপ হয় নি, হীরের প্রজাপতি কেমন করে নিল তাই ভাবছি। আবার চিঠি লিখে জানাল সে কথা। অথচ একদিনও চোখে দেখলাম না ওদের।

লাবণ্যদিদিদের বাড়িতে লোক ধরে না। ওঁর মা কাশী থেকে বেনারসী শাড়ি আনিয়েছেন, দূর দূর পাড়া থেকে মেয়েরা তাই দেখতে আসে। তখন এ-সব সৌখিন জিনিস বেশি দেখবার সুযোগই পেত না কেউ।

কলকাতা থেকে গয়না গড়িয়ে এনেছেন। তবে পিসিমার ঐ পুরোনো কানবালা জোড়ার কাছে সে-সব দাঁড়াতেই পারে না।

দলবল নিয়ে জগদীশদাও এল বিয়ের দুদিন আগে। অপূর্বদার বাড়িতে উঠল সব। এখন দেখি দুজনার ভারি ভাব। অথচ দুমাস আগেও জগদীশদার কাছে অপূর্বদার নাম করা যেত না।

জগদীশদাকেও চেনা যায় না। এই অল্প সময়ের মধ্যেই চেহারাটা দিব্যি চেকনাই হয়েছে। সিল্কের পাঞ্জাবি, জংলা শাল, সাদা পাম্পসু পরেছে।

তার পরে চল্লিশ বছরের ওপর কেটে গেছে, কিন্তু সেই ডবল বিয়ের কথা আমার আজও মনে আছে। বিয়ের আগের দিন, পাড়ার ছেলেরা পাড়ার ক্লাবের পক্ষ থেকে কংস-বধ থিয়েটার করল। শহর ভেঙে সব দেখতে এল। সে থিয়েটারের কথাও আমি ভুলি নি। কি সব চেহারা, মঞ্চের ওপর লাফিয়ে চড়ে কংসের সে কি আস্ফালন! এই বড়-বড় লাল চোখ ঘুরিয়ে সে কি তর্জন-গর্জন! ভয়ে হাত পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে গেছল! তার পর মল' যখন, উঃ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম!

তখন সবে শীত পড়ে আসছে, হিমেতে আর চাঁদের আলোতে চার দিক ঝিক্‌মিক্‌ করছে। অথচ এতটা ঠাণ্ডা পড়ে নি যে বাইরে বেরুতে কষ্ট হয়।

মফঃস্বল শহরে তখনকার দিনে বিয়ের খাওয়া-দাওয়াও আলাদা রকমের ছিল। এই বড়-বড় লুচি, ছোলার ডাল, কুমড়োর ছোকা আর পাঁঠার মাংস। রাঙা আলুর অম্বল, টক দই আর লাল লাল বোঁদে। তার ওপর লাবণ্যদির মা কলকাতার মেয়ে, রাশি রাশি পান্তুয়ার ব্যবস্থা

করেছিলেন। সবাই তাঁর খুব প্রশংসাও করেছিল।

লাবণ্যদি আর মল্লিনাদিকে সেজেগুজে পাশাপাশি বসে, দেখাচ্ছিল যেন পরীদের দুই রানী।

আমরা সেজেগুজে, ঘুরে ফিরে, খেয়ে-দেয়ে, পান চিবিয়ে গাল পুড়িয়ে, এমনি ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম যে শেষপর্যন্ত বাড়ি এসে, কাপড়-চোপড় ছেড়ে লেপের মধ্যে ঢুকতে পারলে বাঁচি। নেপু নাকি তেরোটা পান খেয়েছিল। দুটো পান পাঞ্জাবির পকেটে করে বাড়িতেও এনেছিল, এমনি অসভ্য। পকেটে খয়েরের দাগ লাগার জন্যে, তেমনি বকুনিও খেয়েছিল জ্যেঠিমার কাছে।

বড়দা, নেপু, বাবা, জ্যাঠামশাই সব গেছলেন অপূর্বদার আর জগদীশদার বরযাত্রী হয়ে। আমরা মেয়েরা হলুম কনে বাড়ির লোক। এমনি করে সেই ডবল বিয়েটা হয়েছিল।

শুনলুম, লাবণ্যদি মল্লিনাদি নাকি যমজ বোন, ওঁদের মা দুজনাকে সব একরকম জিনিস দিয়েছিলেন।

তার পর দিন রাত্রে অপূর্বদা আর জগদীশদা সবাইকে বায়োস্কোপ দেখালেন। সেকালে কেউ সিনেমা বলত না, সবাই বলত বায়োস্কোপ। সে শুধু দেখা যেত, কানে শোনা যেত না, ছবির নীচে নীচে কথাবার্তা লেখা থাকত আর একদল সায়েব মতন লোক কোট পেন্টেলুন পরে, থেকে থেকে হার্মোনিয়ম, বেহালা, ক্ল্যারিয়োনেট বাজাত।

বায়োস্কোপ দেখানোর পর খুব খাওয়াল অপূর্বদারা, চা, সিঙাড়া, খাস্তা কচুরি আর নানারকম মণ্ডা মেঠাই।

তার পর দিন সকালের মোটরে অপূর্বদা, জগদীশদা, লাবণ্যদি, মল্লিনাদি দলবলের কয়েকজনের সঙ্গে চলে গেলেন।

আমরাও ফুলের মালা-টালা নিয়ে, মোটর আপিসে গিয়ে খুব কেঁদে-টেঁদে ওদের বিদায় দিলুম। লাবণ্যদিদিদের মা বাকি দলবলের সঙ্গে জিনিসপত্র গুছিয়ে তুলবেন বলে আরো একদিন থেকে গেলেন।

মোটর ছাড়বার ঠিক আগে, সকলের সামনে তিনি হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে, কোঁচড় থেকে দুটো সিঁদুর কৌটো বের করে, মেয়েদের হাতে দিয়ে বললেন, ওরে এগুলো তোদের ঠাকুরদা তোদের জন্যে রেখে গেছিলেন। যত্ন করে রাখিস।

পিসিমা আবার চোখে একটু কম দেখেন, একে ওকে জিগ্গেস করতে

লাগলেন, কি দিল বেয়ান তার মেয়েদের?

শেষপর্যন্ত মেয়েরা হাতের মুঠি খুলে কৌটো দুটি তাঁকে দেখাল। লাবণ্যদিদিরটা আগাগোড়া এই বড়-বড় মুক্তো বসানো। আর মল্লিনাদিদিরটা সোনার তৈরি, গায়ে লাল সবুজ পাথর আর চাকনির ওপর এই এত বড় একটা হীরের প্রজাপতি ঠিক যেন এখুনি ডানা মেলে উড়ে যাবে।

পিসিমা সেদিকে একবারটি তাকিয়ে, আঁক্ আঁক্ শব্দ করে, একেবারে মুচ্ছো!

তখন জল কই, হাতপাখা কই, করে চার, পাঁচ জন লোক ছুটোছুটি করতে লাগল। তারই মধ্যে মোটর ছাড়বার সময়ও হয়ে গেল। ওঁরাও চলে গেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় পিসিমাকে ডাক্তারবাবুর টমটমে তুলে দিয়ে, আর সবাই যেমন সেখানে সেকালে সবাই যেত, হেঁটে চলল।

জ্যেঠিমা তখন লাবণ্যদিদির মাকে বললেন, কিছু মনে করবেন না দিদি, ঠাকুরঝির ফিটের ব্যামো আছে।

বাড়ি এসে মাকে বললেন, ঠাকুরঝিও যেমন! কৌটো যেন ওঁর বাবার ছাড়া আর কারো থাকতে পারে না।

মা আস্তে আস্তে বললেন, যেমন শুনেছিলাম, এটা কিন্তু অবিকল সেইরকম দেখতে।

চোদ্দো

পরদিন লাবণ্যদিদিদের মারা রওনা হয়ে গেলে পর, সন্ধেবেলা পিসিমা আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, দ্যাখ দিকি কাণ্ড! ও কৌটো যদি আমার সেই হারানো কৌটো না হয় তো কি বলেছি! তা তোরা আমাকে কিছু বলতেই দিলি নে!

জ্যেঠিমা বললেন, বাবা! কি ভয়ে ভয়েই যে কালকের দিনটা কাটিয়েছিলাম। খালি ভাবি এই বুঝি তুমি বেয়ানকে বেফাঁস কিছু বলে বসো! ঘরের কথা বেয়াই বাড়িতে বলতে হয় না, ঠাকুরঝি।

পিসিমা হেসে বললেন, কেন বলব? ও তো আমার জগদীশের বউয়ের জন্যই রেখেছিলাম। তা সেই যখন পেয়ে গেল, আমার আর

বলবার কি থাকতে পারে ? খালি ভাবি কৌটোটা যেমন করেই পাক প্রজাপতিটে পেল কোত্থেকে ?

দরজার কাছ থেকে ফস্ করে কে বললে, সে আর আশ্চর্য কি ? আপনি নিজেই যখন হাতে করে ওনাদের কাছে তুলে দিলেন।

সবাই হাঁ করে দেখি গুটে সেই হাতকাটা গেঞ্জির ওপর আলোয়ান জড়িয়ে এসে কখন দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছে।

মাথা চুলকে বললে, আমার বাক্সটা নিতে এলাম, মা, সার্টিফিকেটটা ওরই মধ্যে কিনা। ওকি পিসিমা, দরজায় খিল দিচ্ছেন কেন ? আমি যাব যে।

পিসিমা দরজায় খিল এঁটে তাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে; জ্যেঠিমাকে বললেন, বড়বউ, তুই ছাতাটা নিয়ে এপাশে খাড়া থাক তো দেখি। এই হতভাগা, এবার বল্ ওরা আমার কৌটো কি করে পেল ?

গুটে আমতা আমতা করতে থাকে, আমার ওপর কারো চোখ পড়বার আগেই আমি টুপ্ করে বাবার বড় চেয়ারটার আড়ালে বসে পড়লাম। কি জানি কখন এরা আমাকে কি বলে বসে।

গুটে হঠাৎ মাথা তুলে বললে, বেশ তবে বলেই ফেলি, আমার আর কি ? গোড়া থেকেই শুনুন তবে। একটু বসতে পারি ?

বলে মাটিতেই আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ে বললে, গলাটা শুকিয়ে যাচ্ছে, যদি একটু চা—

জ্যেঠিমা কর্কশ গলায় বললেন, ঐ কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে খাও, বাছা। সব কথা শোনবার পর চা আর মালপো দেব।

গুটে তো মহা খুশি।

তা হলে সব কথাই শুনুন। অপূর্ববাবুদের অবস্থা এককালে খুব ভালো ছিল, আমার বাবা ওঁদের বাড়ির সরকার ছিলেন। আমি ওখেনেই মানুষ হয়েছি। ম্যাট্রিক পাশ করে, গোয়েন্দাগিরি শিখেছি ওনাদের খরচায়। তবে অবস্থা এখন পড়ে গেছে।

গত বছর পুজোর সময় জগদীশবাবু কলকাতা গেছলেন মনে আছে তো ? সেইখেনে অপূর্ববাবুদের সঙ্গে আলাপ। লাবণ্যদিদির সঙ্গে অপূর্ববাবুর বিয়ে ঠিক হয়েছে, কিন্তু দিদিমণির মা কিছুতেই বিয়ে দেবে না যদ্দিন না কি এক সোনার কৌটো খুঁজে পাওয়া যায়। ওনার শ্বশুরের জিনিস, কে এক জোচ্চোর বদমাশ চালাকি করে হাতিয়ে নিয়েছে—

এই অবধি বলেই জিভ কেটে, গুপ্টে পিসিমাকে বললে, কিছু মনে করবেন না, পিসিমা, গুপ্টে নস্করের মুখ থেকে সর্বদাই হক্ কথা বেরিয়ে পড়ে।

পিসিমা বললেন, বাজে কথা রাখো। তার পর কি হল?

তার পর আর কি হবে? লাগাও গুপ্টে গোয়েন্দাকে, সে জোচ্চোর বুড়োকে খুঁজে বের করুক। দেরিও হল না বের করতে, জগদীশবাবুই কথায় কথায় সব ফেঁসে দিলেন। হল কি, লাবণ্যদিদি মলিনা-দিদির জন্মদিনে ওনারও নেমন্তন্ন হল। প্রেজেণ্ট দিলেন একমুঠো সেকালের টাকা। সে টাকা তো আপনারা পরে বোর্ডিং-এর মাসিমার কাছে দেখেওছেন—যাকগে সে কথা। তাপ্পর আর কি, এখেনে ইস্কুলে সব চাকরি খালি আছে, সেও জগদীশবাবুর কাছেই শোনা। অপূর্ববাবু আপিস থেকে এক বছরের ছুটি নিয়ে এখানে চলে এলেন। লাবণ্যদিদিও মেয়ে ইস্কুলের বড়দিদিমণি হয়ে বসলেন।

আমিও এলাম আমাদের গোয়েন্দা সিণ্ডিকেটের যত সব বেকার গোয়েন্দা জুটিয়ে এনে। কৌটো উদ্ধার করতে হবে তো। লোক নইলে চলবে কেন।

নিজে গা ঢাকা দিয়ে থেকে ঘরে ঘরে দলের লোক চাকর সাজিয়ে ঢোকালাম। বিশ্বাস না হয় খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন এর মধ্যে সবার বাড়ির এক আধটা ভালো চাকর ভেগেছে কি না। আমাদের সব ট্রেনিং দেয়া লোক, করুক তো কোনো সত্যি চাকর ওদের মতো কাজ?—একটু চা নইলে সত্যি আর বলতে পারছি নে মা।

জ্যেঠিমা খিল খুলে চা করতে গেলেন, বাকিরা পাহারায় থাকল। কারো মুখে কথা নেই। গুপ্টে বার বার বলতে লাগল, গোয়েন্দাগিরি কি সোজা কথা, পিসিমা? এর জন্যে কি না করতে হয়।

ততক্ষণে চা এসে গেল, চা খেয়ে গুপ্টে বললে, পান। মা পেতলের বাক্স থেকে দুটো পান দিলেন। গুপ্টে বললে, চুন। মা চুন দিলেন। গুপ্টে বললে, হ্যাঁ, তাপ্পর শুনুন। সমিস্যে হল কৌটো জগদীশবাবুদের বাড়িতে থাকলেও, সে বিষয় জগদীশবাবু যে কিছুই জানে না সেটা ঠিক।—কিছু মনে করবেন না, পিসিমা, ওনাকে একটু মাছের মুড়ো খেতে বলবেন, তাতে বুদ্ধি খোলে। অবিশ্যি আমাদের তাতে সুবিধে হল এই যে ওনার কাছ থেকে মেলা খবর বের করে নেওয়া গেল,

উনি আমাদের এতটুকুও সন্দেহ করলেন না।—একটু জল খাব।

এবার অরুণাবউদি নিজেই কুঁজো থেকে জল ঢেলে দিল। জল খেয়ে গুটে বললে, এখন কৌটোটাকে বাইরের হাওয়ায় বের করা যায় কি করে? হরিসভার মহিলাসমিতিতে আমাদের চর ছিল, না পিসিমা তার নাম কিছুতেই বলব না, তা ছাড়া সে এখন এখানে নেইও—সে করলে কি, পিসিমার প্রাণে চোরের ভয় ঢুকিয়ে দিল। ব্যাস্ অমনি কৌটো আলোতে বেরিয়ে এল।

পিসিমা ভাঙা গলায় বললেন, নিলি কি করে?

গুটে তো অবাক। ও আর এমন কি শক্ত? ব্যাঙ্ক তো আমাদের লোকেই ঠাসা ছিল। জগদীশবাবু যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাগজে সই দিচ্ছেন তখন পকেট থেকে কৌটো সরিয়ে, কিমামের শিশিই যদি ভরে দিতে না পারে তো আবার তারা গোয়েন্দা কিসের? কৌটোর কথা তো ব্যাঙ্ক সুদ্ধু সবাই শুনল, জগদীশবাবু এমনি ফলাও করে বললেন।

কিন্তু ঘরে এসে দেখা গেল কৌটোর মুখের হীরের প্রজাপতিটাই নেই। উঃফ্! বাপ্! সেটি বের করতেই তো প্রাণ যাবার জোগাড় হয়েছিল।

জ্যেঠিমা বিরক্ত হয়ে বললেন, কি বলছ, বাছা, গুছিয়ে বল।

গুটে বললে, মানে কি বুঝলেন না? দলের লোকেরা মনে করেছিল সাতদিনে কাজ হাসিল করে যে যার চলে যাবে। পিসিমা যদি প্রজাপতি না সরাতেন তো হতও তাই। আচ্ছা, ওরকম কৌটো এক জায়গায়, প্রজাপতি আরেক জায়গায়, অন্য গয়না অন্য জায়গায়—ওরকম থানে থানে জিনিস রাখবার মানে কি?

পিসিমা বললেন; ওমা, কি বলে! এ আবার কিরকম গোয়েন্দা! এক জায়গায় জিনিস রাখি, আর সব একসঙ্গে যাক আর কি! তা ছাড়া প্রজাপতি তো খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। তোমরা কোথায় পেলে?

গুটে বললে, কি যে বলেন, পিসিমা, আমরা আর পেলাম কোথায়? এদিকে দলের লোক উস্‌খুস্ করছে, তাদের কাজ না দিলে নাকি তারা স্রেফ চাকর বনে যাবে। তাই এটা ওটা সরাবার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল, হাতসাফাই বিদ্যেটা অন্তত চালু থাকুক! তবে যার যারটা ফিরে পেয়েছে কি না বলুন?

আমি আর থাকতে না পেরে উঠে বললুম, কোথায় সব ফিরে

পেয়েছে? আলুগাছ পায় নি, পাঁঠা পায় নি, ম্যাজিস্ট্রেটের কুকুরটা পায় নি।

গুটে বিরক্ত হয়ে উঠল। কি যে বোকার মতন কথা বল দিদি। ইস্কুলে গিয়ে কি শেখো? খাবার জিনিস খেয়ে ফেললে আবার আসবে কোত্থেকে? আর কুকুরটা তো চার পাঁচ জনকে কামড়ে-টামড়ে পালিয়েই গেল। এতদিনে নাকি ফিরেছে।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম যেন?—ও, হ্যাঁ, সেই হীরের প্রজাপতিটে কোথাও পাই নে। তার ওপর পিসিমা দিলেন পুলিশ লেলিয়ে, পালিয়ে পথ পাই নে! শেষটা রাতে দলবল নিয়ে ওনাদের বাড়ি সার্চ করা ছাড়া উপায় থাকল না! উঃ। সে কি কাণ্ড! সেইদিন জগদীশবাবু প্রমাণ পেয়ে গেলেন যে অপূর্ববাবুরা কি উদ্দেশ্যে ওনার সঙ্গে ভাব পাকিয়েছেন। অবিশ্যি কিছুদিন থেকেই নানান কারণে ওঁর সন্দেহ হচ্ছিল। বিশেষ করে মাসিমার কাছে টাকাগুলো দেখে অবধি। ওটা একটা ভুল চাল হয়েছিল, আমি তখনই মানা করেছিলুম, তা কে শোনে! আমাকে তো সে রাত্রে বিরাশি সিক্কা ওজনের এক চড়ই কষিয়ে দিলেন—এখনো দাঁত কন্‌কনানি যায় নি—আর অপূর্বদার ওপর মহা চটে গেলেন।

জ্যেঠিমা বললেন, অতই যদি চটল তো পুলিশে দিয়ে দিল না কেন তোমাদের সবাইকে বাছা? অত যত্ন করে আমাদের এখানে লুকিয়ে রাখার মানেটা কি?

গুটে তো হাঁ!

বাঃ, তা রাখবেন না? আমার মতন কে রেঁধে খাওয়াতে পারে সেটা বলুন? জানেন, রাজরাজড়ারা—আর পুলিশে দেবেন কি করে? তা হলে লাবণ্যদিদির মা মলিনাদিদির সঙ্গে ওনার বিয়ে দিলেন আর কি!

ঢোক গিলে, পিসিমা বললেন, কিন্তু হীরের প্রজাপতিটা কোথায় গেলে?

গুটে একটু চুপ করে থেকে বললে, কেন, পেয়ারা-জেলির শিশিতে। সেখানে আপনিই লুকিয়ে রেখে থাকবেন। তাপ্পর শিশিসুদ্ধু দিয়ে দিলেন।

পিসিমা পুরো এক মিনিট হাঁ করে গুটের দিকে চেয়ে রইলেন। তার পর ঝুপ্ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। দরজাটাকে ঠেস

দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন, এবার দরজাটাও অমনি হাট করে খুলে গেল। আর গুটেও এতক্ষণ বাদে দরজা খোলা পেয়ে, নিজের বাক্সটা তুলে নিয়ে, চোঁ চাঁ যে দৌড় দিল, আর তাকে দেখি নি।

পনেরো

এ সবের পরে আমাদের সেই পাহাড় দেশের ছোট শহরটা অমনি আবার ঝিমিয়ে পড়ল। ঐ এক বছরের কাহিনী আস্তে আস্তে সবার মন থেকে মুছে গেল। গুটের গল্প সত্যি কি মিথ্যে কিছুই বোঝা যায় নি। পিসিমাও এর পরেই বাড়ি বেচে কাশী চলে গেলেন।

কিন্তু নেপু নাকি কলকাতায় যখন পড়তে গেছিল, অপূর্বদাদের খোলাখুলি জিগ্‌গেস করেছিল। তাঁরা সব শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন!

বলিস কি রে! ও সিঁদুরের কৌটো দুটো যে তোর লাবণ্যদিদির ঠাকুরদাদা নাতনিদের বিয়েতে দেওয়া হবে বলে কবে থেকে লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন! গুটেও পিসিমার ভয়ে বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলল, আর তোরাও অমনি বিশ্বাস করলি? দেখলি কাণ্ড, অবিনাশ?

আর অবিনাশ বলে অপূর্বদার একতলার ভাড়াটে, এক মুখ দাড়ি গোঁফসুদ্ধু মাথা নেড়ে বলল, অদ্ভুত! খাসা রাঁধত নাকি ঐ অবিনাশ, নেপুকে খাইয়েছিল।